স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র

ও

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব্ববঙ্গে
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্মান্দোলনের
আংশিক চিত্র।

শ্রীহেমলতা সরকার
প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য
২৫ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৯১৫

মূল্য ১।০ মাত্র

উৎসর্গ।

নবযুগের সুপ্রভাতে

যিনি

নব উদ্যমে

প্রথম জাগ্রত হইয়াছিলেন

সেই

অশ্রান্ত কর্ম্মী

ব্রজসুন্দরের জীবন কাহিনী

পূর্ব্ব বঙ্গবাসীর হস্তে

পরম শ্রদ্ধার সহিত

অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকর্ত্রী

ভূমিকা।

স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের নাম এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। সে সময়ের জনসাধারণ তাঁহাকে অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল তিনি ইহজীবনের লীলাক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল জীবনপটের উপর কালের প্রবাহ এত দিন প্রবাহিত হইয়া তাহার উপর কত স্তরের পর স্তর বিন্যাস করিয়া দৃষ্টিপথের অনধিগম্য করিয়া তুলিয়াছে। যে স্মৃতি একদা কত উজ্জ্বল ছিল, আজ তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কালে বা তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় এরূপ সংশয় হইতেছে। কিন্তু একথা নিশ্চিত ভূতত্ত্ববিৎ যেমন ভূস্তর দেখিয়া পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করেন, তেমনি পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে গেলেই ব্রজসুন্দরের কার্য্য আবিষ্কৃত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ কখনই তাঁহাকে বিস্মৃতির অতলজলে নিক্ষেপ করিতে পারে না। যে অদ্ভুত কর্ম্মময় জীবনের কাহিনী বহু পূর্ব্বেই প্রথিত হওয়া উচিত ছিল তাহা এত দিন প্রকাশিত না হওয়া অত্যন্ত পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়। যে সকল উজ্জ্বল জীবন পূর্ব্ববঙ্গের ললাটের বিজয়টীকা স্বরূপ, তাহা লুপ্ত হইতে দেখিলে কি প্রাণে ক্ষোভের উদয় হয় না? ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে জানিতেন, তাঁহারাও ক্রমে বিরলতর হইয়া আসিতেছেন। এখনও যে দুই চারি জন আছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার জীবনের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা তাঁহার জীবনকাহিনী বঙ্গবাসীর নিকট প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত নন, তাঁহারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের চরিত্র মহাপুরুষ-দিগের ন্যায় কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য কি না? আমরা এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিব না। তাঁহার জীবনবৃত্তান্তই তাহার সদুত্তর।

বঙ্গদেশ আজ সমগ্র ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যদি বঙ্গদেশকে তুলিয়া না ধরিতেন তাহা হইলে আজও এ দুর্ভাগ্য জাতি যে কোথায় পড়িয়া থাকিত তাহার ঠিকানা নাই। ইঁহারা জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, আজ বঙ্গদেশের যাহা কিছু আশা ভরসা। সেইরূপ ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তিগণ পূর্ব্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ না করিলে আজ তাহার মুখশ্রী অন্যরূপ হইত। পূর্ব্ববঙ্গের অশেষ কল্যাণের বীজ যিনি স্বহস্তে রোপন করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়া কর্ত্তব্যপালনের বিমল আনন্দ উপভোগ করিব এইরূপ সংকল্প করিয়া আজ প্রায় সাত বৎসর হইল দারজিলিং সহরে এই গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করি এবং নরদেহের অস্থিসংস্থানের ন্যায় ইহার একটা কলেবর রচনা করি। কিন্তু দেখিতে পাই যে আমার দ্বারা অনেক স্থান পূর্ণ হইতেছে না, বাহির হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। সেই জন্য অপর কাহারও দ্বারা ইহাকে পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য ব্রজসুন্দর বাবুর কনিষ্ঠা দুহিতা শ্রীযুক্তা জ্ঞানদা মজুমদারকে অনুরোধ করি। এমন সময় স্নেহভাজন স্বর্গীয় ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত প্রণয়ন উপলক্ষে ঢাকায় গমন করেন এবং ঐ সংস্পর্শে ব্রজসুন্দর বাবুর জীবনের কতক কাহিনী অবগত হন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ব্রজসুন্দর বাবুর কনিষ্ঠা কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার পিতার জীবনচরিত লিখিবার জন্য আগ্রহ-প্রকাশ করেন। ইহাতে সম্মত হইয়া ব্রজসুন্দর বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহাকে তথ্য সংগ্রহের জন্য দুইবার ঢাকা ও মৈমনসিংহ প্রেরণ করেন। তিনি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেন এবং স্থানে স্থানে তাহা লিখিয়া দিয়া আমেরিকায় গমন করেন।

ব্রজসুন্দর বাবুর দৌহিত্রী-জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রকুমার ঘোষ এম্,এ, নববিধান আচার্য্য শ্রদ্ধেয় বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় এবং স্বর্গীয় অভয়া-

কুমার দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীকুমার দত্ত এম্, এ, বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কলেবর রচনায় তাঁহাদের বিশেষ হস্ত আছে। আমি তাহা যথাস্থানে গাঁথিয়া দিয়াছি। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ গুহ মহাশয় প্রভৃতিও অনেক সাহায্য করিয়াছেন। যিনি যাহাই করুন্, ব্রজসুন্দর বাবুর কনিষ্ঠা কন্যার বিশেষ যত্নে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের স্বহস্ত রচিত চন্দ্রদ্বীপ নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত। তৃতীয় অধ্যায় বাবু শচীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন। কর্ম্মজীবন ও ব্রাহ্মসমাজ অধ্যায়ের উপকরণগুলি ব্রজসুন্দরের ডায়েরী, তাঁহার নিকট লিখিত চিঠিপত্র এবং ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা হইতে ও বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রজসুন্দর বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা "বিধবাবিবাহ" এবং "বহুবিবাহ" অধ্যায়ের অনেক ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। শেষ অধ্যায়ের অধিকাংশই মিত্র মহাশয়ের ডায়েরী হইতে গৃহীত। এই গ্রন্থরচনা কালে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রজসুন্দরের ডায়েরী, চিঠিপত্র, চব্বিশ বৎসরের হিসাবের খাতা, ১৮৫২ সন হইতে রেভেনিউ রিপোর্ট, ঢাকা রিভিউ, পুরাতন তত্ত্ববোধিনী ও ধর্ম্মতত্ত্ব, আচার্য্য কেশবচন্দ্র, চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস, রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ, সেবক পত্রিকা, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী, Hunter's History of Rural Bengal, Beveridge's History of Bakergunge, History of the Brahmo Samaj by Pandit Sivanath Sastri and University Calenders.

আমি দূরে বাস করি এবং নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি বলিয়া এই গ্রন্থের সকল খুঁটীনাটী দেখিতে পারি নাই। গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে অত্যন্ত ভুল ও ত্রুটী লক্ষিত হইতেছে এবং অন্যান্য বিষয়েও যথেষ্ট অসৌষ্ঠব দেখা যাইতেছে। পাঠক পাঠিকাগণ তাহা উপেক্ষা করিয়া

পাঠ করিবেন এই অনুরোধ। দ্বিতীয় সংস্করণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

১লা সেপ্টেম্বর
১৯১৫।

গ্রন্থকর্ত্রী।

পুনশ্চ—আমরা অতিশয় পরিতাপের সহিত লিখিতেছি এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকা হইতে "লুসিটেনিয়া" জাহাজে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনকালে জার্ম্মান টরপেডো কর্ত্তৃক আটলাণ্টিক মহাসাগরের অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনা কার্য্যে তিনি নানা প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ কবে প্রকাশিত হইবে বলিয়া কত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তক প্রকাশিত হইল, তিনি দেখিলেন না, এ ক্ষোভ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। আজ তাঁহার পরিচিত হস্তাক্ষর আমাদিগকে পীড়া দিতেছে।

স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র

স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র।

প্রথম অধ্যায়।

চন্দ্রদ্বীপ।

স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় উলাইলের বিখ্যাত মিত্র-মজুমদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই মিত্র-মজুমদারগণই এক সময়ে চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বাঙ্গালার ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। এখন এই রাজবংশের পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব সমৃদ্ধি কিছুই নাই। ইঁহাদের সুবৃহৎ রাজ্যখানি ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে স্বল্পায়তন হইতে হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে। অতীতের সেই গৌরবময়ী কাহিনী এখন বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গালার ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপের এই রাজবংশের স্থান অতি উচ্চে। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ কেবল যে বাহুবলে রাজ্যশাসন করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা তদানীন্তন পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সমাজের সমাজপতি ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কুলীন কায়স্থগণ এক সময়ে তাঁহাদিগের হস্ত হইতেই কৌলিন্য মর্য্যাদা গ্রহণ করিতেন। ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের জীবন-কাহিনী বিবৃত করিবার পূর্ব্বে এই রাজবংশের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার অন্য উদ্দেশ্য এই যে, এই বংশের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের

সংস্রব আছে। অনেকেরই এই বংশের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য উৎসুক হইবার সম্ভাবনা। ৯৯৯ শকাব্দে বঙ্গাধিপ প্রবল প্রতাপান্বিত আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন কায়স্থও এদেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণ কান্যকুব্জ হইতে আগত এই সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সন্তান।

কান্যকুব্জ হইতে আগত সেই পাঁচজন কায়স্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল —

১। মকরন্দ ঘোষ।

২। পূষণ বসু অথবা দশরথ বসু।

৩। বিরাট গুহ অথবা দশরথ গুহ।

৪। কালিদাস মিত্র অথবা তারাপতি মিত্র।

৫। পুরুষোত্তম দত্ত।

এইরূপ কথিত আছে যে যজ্ঞ সমাপন করিয়া এই সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু স্বদেশে তাঁহারা পতিত বোধে পরিত্যক্ত হয়েন। তখন অগত্যা তাঁহারা স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে পুনরায় আগমন করিয়া তথায় স্থায়ীরূপে বাস করিতে লাগিলেন। আদিশূরের প্রসিদ্ধ বংশধর বল্লাল সেন কর্ত্তৃক ইঁহাদিগের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুর পরগণায় রাজাপুর আদিশূর ও বল্লাল সেনের রাজধানী ছিল। আদিশূরের রাজধানীর পূর্ব্ব গৌরবের নিদর্শন বর্ত্তমান সময়ে আর নাই, কেবল কয়েকটী চিহ্ন মাত্র সেই অতীত গৌরব কাহিনী দর্শকের সুপ্ত স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়া দেয় ও তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পতিত হয়। রাজাপুর নামও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লোকে সে স্থানকে রামপাল বলে। রামপাল মুন্সীগঞ্জ পুলিশ ষ্টেসনের অধীন একখানি সামান্য গ্রাম মাত্র!

বল্লালের ঐতিহাসিক গৌরবমণ্ডিত রাজধানীর এখন ইহাই পরিণাম। এক সময়ে এখান হইতেই সমুদায় বঙ্গদেশের ভাগ্য নির্ণীত হইত। সে সকল বৃহৎ গড় পরিখা, সে সকল প্রাসাদ, প্রমোদ উদ্যান, সে সকল মন্দির, ধর্ম্মশালা, সে সকল মঠ হর্ম্ম্য বিপণি কিছুই আর নাই। আছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, পুরাতন দীঘি, অর্দ্ধলুপ্ত পুষ্করিণী, সুদীর্ঘ রাজপথ! এখানে বল্লাল বাড়ী নামে একটী বৃহৎ চতুষ্কোণ স্থান আছে তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখা ছিল বোধ হয়, এখন এই স্থানটীতে ধান্য রোপিত হয়। বল্লাল বাড়ীর অদূর দক্ষিণে রামপাল দীঘি নামে এক বৃহৎ দীঘি আছে। অর্দ্ধলুপ্ত রাজপথ গুলির মধ্যে কাঁচকী দরজা নামে একটী রাজপথ পশ্চিমে পদ্মানদী পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিম্বদন্তী এই যে এই পথে প্রত্যহ পদ্মানদী হইতে বঙ্গাধিপের জন্য কাঁচকী মৎস্য আনীত হইত।

রামপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানের ভূমি খনন করিতে করিতে কত লোক কত বহুমূল্য প্রস্তর, স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রা সকল প্রাপ্ত হইয়াছে। একবার বারুই জাতীয় এক ব্যক্তি এইরূপে একখণ্ড প্রস্তর পাইয়াছিল। সে তাহার মূল্য না জানিয়া একজন স্বর্ণকারকে যৎসামান্য মূল্যে বিক্রয় করে; পরে জানা যায় যে ঐ প্রস্তর অতি মূল্যবান্। তখন এই ঘটনা লইয়া দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ডাক্তার টেলারের টপগ্রাফি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কালের গতিই এই প্রকার! কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আজ যেখানে অমরাবতীতুল্য রাজভবন, ভবিষ্যতে সেই স্থানেই হয়ত শৃগাল কুকুরের বাসস্থান হইবে, হয়ত বা তাহা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইবে। এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। বঙ্গদেশে সে রাজত্বও নাই, সে রাজধানীও নাই—সে রাজঐশ্বর্য্যও নাই, সে সকল রাজচিহ্নও আর নাই। দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! নদীও তাহার গতির পরিবর্ত্তন করিয়াছে, রাজধানীও শ্মশান হইয়াছে।

কথিত আছে আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ রামপালের নিকটবর্ত্তী

পঞ্চসার গ্রামে বাস করিয়াছিলেন—তাঁহারা ঠিক কোন্ স্থানে বাস করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কায়স্থগণের বাসস্থান নির্ণয় করা তদপেক্ষা দুঃসাধ্য। বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কায়স্থগণ বঙ্গজ এবং রাঢ়ীয় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতে থাকেন।

পূর্ব্ববঙ্গের বঙ্গজ কায়স্থগণের পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম এই:—

১। মকরন্দ ঘোষের পুত্র শুভাশিব ঘোষ।

২। পূষণ বসুর পুত্র দিবাকর বসু।

৩। বিরাট গুহের পুত্র নারায়ণ গুহ।

৪। কালিদাস মিত্রের পুত্র গোষ্ঠ মিত্র।

৫। পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র অর্ক দত্ত।

কি বঙ্গজ, কি রাঢ়ীয় দত্ত বংশীয়েরা কোথাও কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই;

"দত্ত কারো ভৃত্য নয়, শুন মহাশয়!
সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয়।"

এই বাক্য দ্বারা দত্তগণ যেরূপ আত্মমর্য্যাদার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে কৌলিন্য মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইয়াও তাঁহারা গৌরবান্বিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

এইরূপে বঙ্গজ কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইলে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী চন্দ্রদ্বীপে এক বৃহৎ কুলীন কায়স্থ-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন বাখরগঞ্জ জেলার সেলিমাবাদ পরগণা ব্যতীত আর সকল পরগণাই চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত এবং বাকলা চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া তাহা খ্যাত ছিল। কান্যকুব্জ হইতে কায়স্থগণের আসিবার পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতীয় অনেক লোক ছিলেন। নবাগত কায়স্থগণ তাঁহাদের সহিত প্রথমে কোনও সংশ্রব রাখেন নাই। পরে তাঁহাদের অধস্তন পুরুষেরা পূর্ব্বতন কায়স্থগণের সহিত মিলিত

হইয়াছিলেন। যে সময়ে চন্দ্রদ্বীপে কায়স্থ-সমাজ স্থাপিত হয় সেই সময়ে ভরদ্বাজ গোত্রীয় দনুজমর্দ্দন দে নামক এক ব্যক্তি চন্দ্রদ্বীপের অধিকারী ছিলেন। কথিত আছে চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থগণ তাঁহাকেই আপনাদের সমাজপতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। বীরতারা গ্রাম নিবাসী মজুমদারগণ এই দনুজমর্দ্দন দের বংশোদ্ভব বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিক্রমপুর পরগণায় চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি ভগবতী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেবীর একান্ত ভক্ত সেবক হইয়া উঠিলেন; তিনি অবিরাম ভগবতী মন্ত্র জপ করিতেন। কিন্তু দৈবযোগে তিনি ভগবতী নাম্নী এক বালিকাকে বিবাহ করিয়া বসেন। এ বিষয় তিনি বিবাহের সময় জানিতে পারেন নাই। পরে যখন জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার চিত্তে অনুশোচনার ভাব উপস্থিত হইল; তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে ইষ্ট দেবতার নাম অবিরাম ভক্তিভরে জপ করেন, স্ত্রীকে কিরূপে সেই পবিত্র নামে সম্ভাষণ করিবেন? ভগবতী বলিয়া স্ত্রীকে সম্বোধন করিবামাত্র তাঁহার প্রাণে এমন এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় যে স্ত্রীকে আর তিনি স্বামীর চক্ষে দর্শন করিতে পারেন না, তিনি দেবী হইয়া যান; তবে কি তিনি পত্নীর উপাসক হইবেন? কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হৃদয়ের আবেগে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া এক ক্ষুদ্র তরণীতে একাকী অকূল সমুদ্রে ভাসিলেন। দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রে একাকী ভাসিয়া চলিয়াছেন এমন সময়ে তিনি দেখিলেন এক ধীবর কন্যা একাকী নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে—চন্দ্রশেখর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি কোন্ সাহসে একাকী এই ভীষণ সাগরে নৌকা বাহিয়া চলিয়াছ?" সে বালিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "আমি জেলের মেয়ে, চিরজীবন জলে থাকি আমার সাগরে ভয় কি? ভাল ব্রাহ্মণ! তোমারই বা সাহস কি, তুমি একা সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছ?" তখন চন্দ্রশেখর তাহাকে নিজের সমুদ্রযাত্রার কারণ বলিলেন। শুনিয়া বালিকা হাসিয়া বলিল "ব্রাহ্মণ!

তুমি কি নির্ব্বোধ! ভগবতী কোন্ নারীর ভিতর আবির্ভূতা নহেন? শক্তিরূপিণী ভগবতী নারী মাত্রেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা; তোমার স্ত্রীর নাম ভগবতী তাতে আর কি আসে যায়?" চন্দ্রশেখর ধীবর কন্যার মুখে এই অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা শুনিয়া লম্ফ দিয়া তাহার নৌকায় উঠিয়া তাহার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "মা ভগবতি! তুমিই দয়া করিয়া আমায় দেখা দিয়াছ, আমি আর তোমার চরণ ছাড়িব না।" তখন ধীবর কন্যা স্বীকার করিলেন তিনিই ভগবতী এবং ব্রাহ্মণকে বর দিয়া বলিলেন যে সেই স্থান শুষ্ক হইয়া একটী দ্বীপ উত্থিত হইবে তাহার নাম হইবে চন্দ্রদ্বীপ এবং চন্দ্রশেখরই সেই দ্বীপে বাস করিবেন। আর এক প্রবাদ এইরূপ; চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। দনুজমর্দ্দন দে নামে তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য ছিল। দনুজমর্দ্দনকে লইয়া তিনি দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন;—একদিন দুইজন জলপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন; রাত্রে উভয়ে নৌকায় নিদ্রিত আছেন এমন সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন ভগবতী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন, "এই জলতলে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি নিহিত আছে তুমি তাহা উদ্ধার কর।" পরদিন প্রাতে তিনি শিষ্যকে সেই স্থানে তিনবার ডুব দিতে বলিলেন। প্রতিবারে তিনি এক একটী দেবমূর্ত্তি উদ্ধার করিলেন। গুরু চতুর্থবার ডুব দিতে আদেশ করিলেন না, সেইবার ডুব দিলে তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিতে পারিতেন। মাধবপাশার রাজবাটীতে ঐ সকল দেবমূর্ত্তি আছে। চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এই স্থান শুষ্ক হইয়া এক দ্বীপ হইবে তুমি তাহার রাজা হইবে।" শিষ্য বলিলেন, "গুরো! আপনার আদেশে তাহার নাম আমি চন্দ্রদ্বীপ রাখিব।"

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকাই থাকুক না কেন, চন্দ্রদ্বীপে এক বিশাল কায়স্থ-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং দনুজমর্দ্দন দে তাহার প্রথম অধিপতি হইয়াছিলেন এ সম্বন্ধে কতকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। বল্লাল সেনের পরেই চন্দ্রদ্বীপে এই কায়স্থ-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলমানগণ যখন বঙ্গদেশ অধিকার করেন তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। আকবরের সময়ে বঙ্গদেশে বারো জন রাজা বা ভূইঞার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে ও উত্তরে এই বারো জন ভূইঞার রাজ্য ছিল। এই বারো জন ভূইঞার মধ্যে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি একজন ভূইঞা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। আকবর সাহের সময় সেই বারো জন ভূইঞার নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

১। চন্দ্রদ্বীপে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়।

২। যশোহরে রাজা প্রতাপাদিত্য রায়।

৩। ভুলুয়ায় রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য।

৪। বিক্রমপুরে রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায়।

৫। চাঁদ প্রতাপের রাজা চাঁদগাজী।

৬। ভূষণায় রাজা মুকুন্দ রায়।

৭। খিসরপুরে ইসা খাঁ মসনদ আলি।

৮। ভাওয়ালে কজল গাজী।

৯। সা তৈলের রাজা রামকৃষ্ণ।

১০। রাজসাহী জেলায় পুঠিয়ার রাজা।

১১। রাজসাহী জেলায় তাহিরপুরের রাজা।

১২। দিনাজপুরের রাজা।

এই সকল রাজারা স্বাধীন ছিলেন বলিলেই হয়, কখনও নাম মাত্র দিল্লীশ্বরের অধীন ছিলেন। ইঁহাদের সৈন্য, গড়, বিচারালয়াদি রাজত্বের সকল লক্ষণই ছিল। তাঁহারা মুসলমানদিগের বিশেষভাবে অধীন হইলেও এই সকল রাজলক্ষণ হীন হন নাই।

চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে চিরদিন অভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাই তদানীন্তন কায়স্থ-সমাজের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহারা কৌলিন্য মর্য্যাদার সমুদায় বিধি ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন; সেই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাঁহারা ইচ্ছামত সকলকে কুলভ্রষ্ট করিতেন। কায়স্থ-সমাজপতি চন্দ্রদ্বীপাধিরাজ আপনার সমাজের এই-

রূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন :—পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তর সীমা ঢাকা জেলার ইছামতী নদী, পশ্চিম সীমা তেলিহাটী পরগণা ও সেলিমাবাদ পরগণা, দক্ষিণে আসমুদ্র সমুদায় দেশ। তাঁহারা এইরূপ নিয়ম করিলেন যে এই সীমার বাহিরে কোনও কুলীন বাস করিলে কুলভ্রষ্ট হইবেন। এইরূপে বঙ্গজ কায়স্থদিগের স্বস্থান হইল চন্দ্রদ্বীপ এবং কায়স্থগণের গণনীয় রাজা হইলেন চন্দ্রদ্বীপাধিপতি। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই পরে যশোহরে আর একটী কায়স্থ-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল—তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপাধিপতির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না।

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পারস্থিত ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ভুলুয়া প্রভৃতি স্থানে বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগে, ত্রিপুরার উত্তর ভাগে, শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামের কায়স্থগণ বৈদ্যদিগের সহিত আদান প্রদান করিতেন, এখনও করিয়া থাকেন। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, শ্রীহট্টের কায়স্থগণ সাহাদিগকেও কন্যাদান করেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ এরূপ ভাবে কায়স্থ-সমাজ শাসন করিতেন যে রাজার অনুমতি ব্যতীত কেহ পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেন না—এবং বিবাহের সময় রাজাকে মধ্যস্থ দিতে হইত। কেহ কোনও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে রাজা তাহাকে বিধিমতে শাস্তি দিতে পারিতেন। প্রথমে দে-বংশীয় পাঁচ জন রাজা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। যথাক্রমে তাঁহাদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। রাজা দনুজমর্দ্দন দে।

২। রাজা রমাবল্লভ দে।

৩। রাজা কৃষ্ণবল্লভ রায়।

৪। রাজা হরিবল্লভ রায়।

৫। রাজা জয়দেব রায়।

এই পাঁচজন দেবংশীয় রাজগণের রাজত্বের বিশেষ বিবরণ। বড়

পাওয়া যায় না। কচুয়াতে রাজা দনুজমর্দ্দন দের রাজধানী ছিল; তাঁহার বংশীয়েরা ক্রমে ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন। ইঁহারা সকলেই কায়স্থদিগের সমাজপতি ছিলেন। দে বংশীয় পঞ্চম রাজা অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর দেহুড়গাঁদি নিবাসী কুলীন বসুবংশীয় দৌহিত্র পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইলেন। রাজা পরমানন্দ রায় তাঁহার আদি পুরুষ পূষণ বসু হইতে ত্রয়োদশপুরুষ নিম্নে অবস্থিত। রাজা পরমানন্দ রায় হইতে বসুবংশীয় যে আটজন রাজা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন তাঁহাদের নাম ঃ—

১। রাজা পরমানন্দ রায়।
২। রাজা জগদানন্দ রায়।
৩। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়।
৪। রাজা রামচন্দ্র রায়।
৫। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়।
৬। রাজা বাসুদেবনারায়ণ রায়।
৭। রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়।
৮। রাজা প্রেমনারায়ণ রায়।

এই বংশের দ্বিতীয় রাজা জগদানন্দ রায় সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। কথিত আছে রাজা জগদানন্দ রায় শক্তি উপাসনায় একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি গঙ্গার নিকট এই বর ভিক্ষা করিয়াছিলেন যেন অন্তিমে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। একদা গঙ্গার (পদ্মার) জল উচ্ছ্বসিত হইয়া রাজবাটীর দ্বার পর্য্যন্ত ধাবিত হইল, তখন রাজার সহসা স্মরণ হইল যে বোধ হয় তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত, তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গার প্রতি এই নিবেদন করিলেন, "মা! যদি আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে তবে আমায় গ্রহণ করুন।" তখন গঙ্গাদেবী বাহু প্রসারণ করিয়া রাজাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। রাজাও পরমানন্দে দেবীহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। অমনি নদীর জল স্বস্থানে সরিয়া গেল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে প্রথমে কচুয়াতেই

চন্দ্রদ্বীপের রাজাদিগের রাজধানী ছিল, পরে মগদিগের উপদ্রবে ক্রমে তাঁহারা বাসুরিকাঁটি, হোসেনপুর ও ক্ষুদ্র কাটিতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। রাজার সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থগণও উক্ত রাজধানী চতুষ্টয়ের নিকটে ও দূরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ হইতেই কতকগুলি কায়স্থকে যশোহরে লইয়া এক পৃথক্ কায়স্থ-সমাজ স্থাপন করেন। এই বংশের চতুর্থ রাজা রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহের করুণ কাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। বহু সমারোহে বিবাহার্থী রাজা রামচন্দ্র বরবেশে রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। যথাযোগ্য সমারোহে ও আনন্দোৎসবের ভিতর বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। বিবাহের পর বাসর গৃহে রামচন্দ্র শুনিতে পাইলেন প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে হত্যা করিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজত্ব ও কায়স্থ-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সমুদায় আয়োজন করিয়াছেন। সেই রাত্রেই তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। আর ইহাও শুনিতে পাইলেন, যে খাল দিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে আসিতে হয় তাহা বড় বড় কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। পলায়ন করিবার কোনও উপায় নাই। যাহা হউক তিনি নবপরিণীতা ভার্য্যা কিম্বা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায়ের সাহায্যে কোনও মতে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রামমোহন মাল নামে একজন পুরাতন ও বিশ্বস্ত সর্দ্দার ছিলেন, তিনি অতি বলবান পুরুষ ছিলেন। তিনি চৌষট্টি দাঁড়ের কোষ-নৌকা ভৃত্যদিগের সাহায্যে সেই নিমজ্জিত কাষ্ঠের উপর দিয়া বাহুবলে উঠাইয়া ত্বরিত গতিতে খাল পার করিয়া লইয়া গেলেন এবং কিছু দূর গিয়া নৌকাস্থিত কামানের ধ্বনি করিয়া শত্রুগণকে পলায়নের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রামচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু শ্বশুরকুলের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন, নবপরিণীতা পত্নীর নাম কখনও উচ্চারণ করিতেন না। এইরূপে কয়েক বৎসর গত হইলে রামচন্দ্রের পত্নী

স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি কাশী-যাত্রাচ্ছলে বহুসংখ্যক দাস দাসী, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে নৌকায় করিয়া চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু রাজাকে আপনার পরিচয় দিলেন না। তাঁহার সঙ্গিগণের দৈনিক অভাব মোচন করিবার জন্য ক্রমে সেখানে একটী হাট বসিয়া গেল। সেখানে অবশ্য এখন আর কোনও হাট নাই তথাপি লোকে সে স্থানকে এখনও "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" বলিয়া থাকে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ এই অখ্যায়িকাটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার চিরকরুণ "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" নামক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে রামচন্দ্রকে যেরূপ অপদার্থ কাপুরুষ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসে তিনি সেরূপ চরিত্রের লোক বলিয়া বর্ণিত হন নাই। ঔপন্যাসিকের কল্পনা ঐতিহাসিক সত্যের বন্ধন সকল সময় স্বীকার করে না, রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসেও সে বন্ধন স্বীকৃত হয় নাই। বলা বাহুল্য ইতিহাস লিখিতে বসিলে রবীন্দ্রনাথ কখনই এরূপ করিতে পারিতেন না। রাজা রামচন্দ্রের রাজভবনে এই বার্ত্তা গেল,—রাজমাতা লোক পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে নৌকায় তাঁহারই বধূমাতা অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি বধূকে গৃহে আনয়ন করিবার জন্য স্বয়ং নৌকায় উপস্থিত হইলেন। প্রতাপাদিত্যের কন্যা এক থালা মোহর দিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিলেন। পরে তিনি মহা সমারোহে বধূকে গৃহে লইয়া গেলেন। বধূকে গৃহে আনিয়া রাজমাতার সাধ পূর্ণ হইল না। রাজা রামচন্দ্র এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া তিন দিন গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া রহিলেন, পত্নীর মুখ দর্শন করিলেন না। রাজপত্নী একবার মাত্র পতির চরণ দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া কত ক্রন্দন করিলেন। রাজার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তিল মাত্র বিচলিত হইল না। প্রতাপাদিত্যের বংশের কাহারও মুখ তিনি দর্শন করিবেন না—সেই প্রতাপাদিত্যের কন্যাই তো তাঁহার পত্নী, সেই জন্য স্ত্রীর মুখও তিনি দর্শন করিলেন না। রাজপত্নী ভগ্নহৃদয়া হইয়া কাশীবাসিনী হইলেন।

রাজা রামচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটী গল্প আছে তাহাও এস্থলে বিবৃত হইতেছে। রাজা রামচন্দ্রের পিতা কন্দর্পনারায়ণের সময়ে মেঘনা নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী ভুলুয়া পরগণায় লক্ষ্মণমাণিক্য নামে অন্য এক রাজা ছিলেন। তিনিও চন্দ্রদ্বীপের রাজার ন্যায় বারো ভূইঞার এক ভূইঞা ছিলেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ অতিশয় বলিষ্ঠ এবং বীরপুরুষ ছিলেন—রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যও তদনুরূপ বীর ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ গর্ব্বও ছিল। রাজা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইলে রামচন্দ্র বালক বলিয়া লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতেন। ইহাতে রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজ্য আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণমাণিক্য যখন শুনিতে পাইলেন বালক রামচন্দ্র তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন তখন ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া একাকী রামচন্দ্রের নৌকার নিকট উপস্থিত হইয়া এক লম্ফে তাঁহার নৌকার উপর পড়িলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি নৌকার ভিতরে এমন অবস্থায় পড়িলেন যে হঠাৎ উঠিতে পারিলেন না। তখন রামমোহন মাল প্রভৃতি রামচন্দ্রের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া নৌকার কাষ্ঠের সহিত তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। রামচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল গৃহে লইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন কিন্তু রাজমাতা তাঁহার বলিষ্ঠ রাজোচিত সুন্দর দেহ দেখিয়া, পুত্রকে এমন বীরপুরুষকে হত্যা করিতে নিষেধ করেন। লক্ষ্মণমাণিক্যকে এক লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এক দিন স্নানের পূর্ব্বে রামচন্দ্র তৈল মাখিতেছেন এমন সময়ে লক্ষ্মণমাণিক্যকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া আনাইলেন। লক্ষ্মণমাণিক্যের হৃদয়ে বৈরনির্য্যাতনের ইচ্ছা দিবানিশি জাগরূক ছিল; তিনি সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। সে দিন এক বৃহৎ নারিকেল বৃক্ষে হেলান দিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন—রামচন্দ্রের মস্তকোপরি সেই বৃক্ষ ফেলিবার উদ্দেশ্যে তিনি এমন ভাবে তাহাতে হেলান দিলেন যে গাছটী সজোরে রামচন্দ্রের নিকটে পড়িল বটে, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিল না।

রাজমাতা এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন আর লক্ষ্মণমাণিক্যকে গৃহে রাখিতে চাহিলেন না। তখন রামচন্দ্র মাতার অনুমতি ক্রমে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ নবাবের আহার্য্য সামগ্রীর আঘ্রাণ লইয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে সিংহাসণ-চ্যুত হন। তিনি একজন মহা যোদ্ধা ছিলেন। তাহার পরে তাঁহার ভ্রাতা বাসুদেবনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের বসু বংশীয় অষ্টম অথবা শেষ রাজা প্রেমনারায়ণ অল্প বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন। তাঁহার সহোদর কেহ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার পিতৃ-দৌহিত্র উলাইলের মিত্র-মজুমদার বংশীয় উদয়নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজ-সিংহাসন অধিকার করিলেন।

মালখা নগর প্রভৃতি গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ বসুবংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপের এই বসু রাজগণের বংশোদ্ভব।

রাজা উদয়নারায়ণ রায় তদ্বংশীয় আদি পুরুষ কালিদাস মিত্র হইতে সপ্তদশ পুরুষ নিম্নে অবস্থিত। বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা গেল না।

মিত্র বংশীয় এই কয়জন রাজা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১। রাজা উদয়নারায়ণ রায়।

২। রাজা শিবনারায়ণ রায়।

৩। রাজা জয়নারায়ণ রায়।

৪। রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়।

৫। রাজা বীরসিংহনারায়ণ রায়।

৬। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।

রাজা উদয়নারায়ণের রাজত্ব লাভ করিবার পরেই নবাবের শ্যালক খাদি মজুমদার তাঁহাকে রাজ্যাধিকার হইতে চ্যুত করেন। উদয়নারায়ণ এই প্রকারে রাজ্যচ্যুত হইয়া নবাবের নিকট খাদি মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। নবাবের বিচিত্র মতি—তিনি উদয়নারায়ণকে বলিয়া বসিলেন, তুমি যদি এক ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়া

আসিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি রাজ্যাধিকার ফিরাইয়া দিব। মহাবল রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং দ্বিতীয় সের সাহের ন্যায় ব্যাঘ্রকে বাহুবলে নিহত করিয়া অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিয়া নবাবের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু নবাবের বেগম কিছুতেই নবাবকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে দিলেন না। উদয়নারায়ণ অবশেষে নানা কলকৌশলে রাজ্যাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। উদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর পুত্র শিবনারায়ণ রাজা হইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী নিন্দাকাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। রাজা শিবনারায়ণ সুলতান-প্রতাপ পরগণার ষষ্ঠভাগের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রতারণা পূর্ব্বক রামগোপাল দালাল নামক এক ব্যক্তিকে ঐ পরগণার সমুদায় অংশ আপনার বলিয়া ইজারা দেন। উলাইল নিবাসী ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়েরই প্রপিতামহ দেবীপ্রসাদ মিত্র-মজুমদার প্রভৃতি এই কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে ঢাকার দেওয়ানী আদালতে নালিশ উপস্থিত করেন। দেবীপ্রসাদ মিত্র-মজুমদার এবং রামগোপাল দালাল রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা গঙ্গাদাসকে মধ্যস্থ স্থির করেন। সেই সালিশের সাক্ষাতে রামগোপাল ইজারা ইস্তফা করিয়া উক্ত জমিদারী ফিরাইয়া দেন। এই মোকদ্দমার রায় পারসীতে ও বাঙ্গলাতে লিখিত হয়। মোকদ্দমার তারিখ ২রা ডিসেম্বর ১৭৭২। জজদিগের নাম এন্ গ্রোরব ও রায় হরিরাম মল্লিক। মোহর সাহ আলম বাদসাহ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামাঙ্কিত ছিল। এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাহ আলম বাদসাহের নিকট বঙ্গদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজা শিবনারায়ণ অত্যন্ত ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তিনি শীঘ্রই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। শিশু পুত্র জয়নারায়ণ রায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কর্ম্মচারী শঙ্কর বক্‌সি শিশু রাজাকে বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। সাত বৎসর এইরূপ চলিল তৎপরে রাজমাতা দুর্গারাণী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সাহায্যে সমুদায় অধিকার স্বীয় করতলস্থ করেন। দুর্গারাণী বিস্তর ব্যয়

করিয়া এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, এখনও লোকে তাহাকে দুর্গাসাগর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

রাজা জয়নারায়ণের সময় লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রসিদ্ধ দশশালা বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে কোটালিপাড়া, ইদিলপুর, সুল-তানাবাদ, বুজরুগ—উমেদপুর প্রভৃতি অনেক স্থান চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিভক্ত হইয়া যায়। এই সকল স্থান পৃথক্ হইয়া গেলেও অতিবৃহৎ জমিদারী অবশিষ্ট রহিল। জয়নারায়ণের সহিত কোম্পানীর সেই জমিদারীর বন্দোবস্ত হইল। এই সময় হইতেই চন্দ্রদ্বীপের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইল। দেখিতে দেখিতে বৃহৎ জমিদারী নিলামে বিক্রীত হইতে লাগিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন নির্দ্দিষ্ট দিনে খাজনা না দিতে পারিলে, খাজনার উপযুক্ত জমি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিয়া খাজনা আদায় করিয়া লইতেন। তখনকার দিনে জমিদার-গণের নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে কালেক্টরীতে খাজনা জমা দেওয়া অভ্যাস ছিল না এবং কর্ম্মচারিগণও অতি অধার্ম্মিক ও শঠ ছিল। সুতরাং অনেক জমিদারের খাজনা বাকি পড়িতে লাগিল এবং খাজনার দায়ে জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাইতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের অবস্থাও তদ্রূপ দাঁড়াইল। বৎসরের পর বৎসর খাজনার দায়ে জমিদারী খণ্ড খণ্ড হইয়া নিলামে বিক্রীত হইতে লাগিল। ঢাকার দল সিং মেঃ জন পেনিয়টি প্রভৃতি চন্দ্রদ্বীপের ভূসম্পত্তি নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে রাজার খানা বাড়ির সীমার মধ্যে মাণিক মুদী নামে এক মুদী ছিল সেও অবশিষ্টাংশ ক্রয় করিল। রাজা ঐ মাণিক মুদীর ক্রীত অংশ পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত নালিশ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। নিম্ন আদালতে তিনি ডিক্রী প্রাপ্ত হন, কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতে ঐ ডিক্রী রহিত হয়। রাজা প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করেন; প্রিভি-কাউন্সিলে আপীলে রাজা জয়ী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলাফল জানিবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র নৃসিংহনারায়ণ রায় রাজা হন। তাঁহার মাতা

রাণী করুণাময়ী পুত্রের হইয়া সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। নৃসিংহনারায়ণ দেখিতে অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন কিন্তু তাঁহার ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। প্রিভিকাউন্সিলের মোকদ্দমা চালাইয়া ঋণভারে জড়িত হইয়া সমুদায় জমিদারী ছারখার হইয়া দুই চারিখানি তালুকে পরিণত হইল। এখন এই চন্দ্রদ্বীপ বংশীয়েরা ক্ষুদ্র তালুকদাররূপে অতি সামান্য ভাবে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহাদের পরিচারক ও আশ্রিত জনেরাই বরিশাল লাখুটিয়া প্রভৃতি স্থানে জমিদার-রূপে পরিগণিত হইতেছেন। ১৮৭২ সালে লর্ড নর্থব্রুক যখন ঢাকা নগরী পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন তখন পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ভাওয়াল, ত্রিপুরা, জয়ন্তী, দুর্গাপুর প্রভৃতি রাজগণের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল এবং তখনও অতীত গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ চন্দ্রদ্বীপের রাজাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সম্মানিত আসনও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার পরে আর কোনও রাজ প্রতিনিধি বোধ হয় ইহাদিগকে স্মরণ করেন নাই।

যে চন্দ্রদ্বীপ প্রায় ১০০০ শকাব্দ হইতে এতাবৎকাল পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছিল এবং বার ভুইঞার এক ভুইঞা-রূপে কত রাজা ও জমিদারদিগের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছিল, দিল্লির বাদসাহের ও নবাবের নিকট হইতে কত সনন্দ, সম্মান ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল, যে চন্দ্রদ্বীপ হয়, হস্তী, সৈন্য পদভরে কম্পিত হইত, যে চন্দ্রদ্বীপ রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির, অতিথিশালা, ব্রাহ্মণ ও কুলীন-দিগের বাসভবনে সমাকীর্ণ ছিল, যে চন্দ্রদ্বীপ শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল; এবং যাহার অশেষ শোভা সম্পদ দেখিয়া লোকে ইহাকে লক্ষ্মীর চির-আবাস বলিত, সেই চন্দ্রদ্বীপের ৯০০ বর্ষব্যাপী সৌভাগ্যের পরিণাম এই! পূর্ব্ববাঙ্গালা যখন মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচারে নিপীড়িত হইতেছিল, তখন কত ধনী জমিদার কত ভদ্র পরিবার, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কত জ্ঞানী ও গুণী এই চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। যে চন্দ্রদ্বীপ সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থগণের সমাজপ্রতিরূপে রাজমধ্যস্থতার জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি রাজা প্রতাপাদিত্যেরও ঈর্ষানল প্রজ্বলিত

করিয়াছিল; ঘটক, কুলাচার্য্য ও স্বর্ণামত্যদিগের দ্বারা কুলীনদিগের জন্য নানারূপ জটিল বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা তদানীন্তন বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজকে নিপীড়ন করিয়াছিলেন, যাহার জন্য এখনও অল্লাধিক পরিমাণে কায়স্থ-সমাজ নিপীড়িত হইতেছে। কালপ্রবাহে সেই প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কতিপয় দীর্ঘিকা, চিলছত্রাদি দুই চারিটী ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকালয় ও দুই একটী বৃহৎ কামান ব্যতীত অতীত গৌরবের আর কোনও চিহ্নই দেখা যায় না। *

কামানটী এক গৃহের পত্তন স্থান হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার উপরে বঙ্গাক্ষরে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের নাম এবং '৩১৮' এই অঙ্কটি খোদিত রহিয়াছে। এই অঙ্কটি বোধ হয় কামানের সংখ্যা হইবে। চন্দ্রদ্বীপের রাজারা যে যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহাদের যে কামান প্রভৃতি যথেষ্ট যুদ্ধ সজ্জা ছিল এই কামানটী সেই অতীতকালের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

---

* বাখরগঞ্জের কালেক্টর মিঃ বিভারিজ বলেন, যে তিনি অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন যে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীর নিকট এক পুষ্করিণী আছে তাহার নাম কামান-তলাও, সেখানে অনেক কামান থাকা সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উলাইলের মিত্র-মজুমদার বংশ।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা উদয়নারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ থাক মিত্র কোনও কারণে চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিয়া ইছামতী নদীর উত্তরে বংশ নদের পশ্চিম-তটে ছোটবাজুস্থিত উলাইল গ্রামে প্রথমে বসতি করেন। থাক মিত্র কি কারণে চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। বোধ হয় তখনকার বসু বংশীয় রাজার সহিত কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ কুলীনদিগের জন্য যে সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, উলাইল গ্রাম তাহার অন্তর্ভুক্ত নয়। সেই জন্য থাক মিত্র উলাইলবাসী হইয়া কুলভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পরে কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদান করিয়া কুলজ মর্য্যাদা পুনঃপ্রাপ্ত হন। কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে কালিদাস মিত্র অন্যতম ছিলেন। থাক মিত্র তাঁহারই দশম পুরুষের পর্য্যায়ভুক্ত। চন্দ্রদ্বীপের রাজা উদয়নারায়ণ উলাইলের এই মিত্র-মজুমদার বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ও এই বংশোদ্ভব। ইঁহাদের দান ধ্যান ক্রিয়াকলাপ যাগ যজ্ঞের সমারোহ এবং নিয়ম নিষ্ঠায় ব্রাহ্মণগণও ইঁহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক ও সমাজ-পতিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

এই গ্রন্থে ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের যে বংশ-পত্রিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তদ্দারা জ্ঞাত হওয়া যায় তিনি কালিদাস মিত্র হইতে একবিংশ পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। উলাইলের মিত্র-মজুমদারগণ এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ধন মান ঐশ্বর্য্যে সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের প্রবল প্রতাপে উলাইল টলমল করিত। মিত্র-মজুমদারগণ দিল্লীশ্বর, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাবদিগের অধীনে অতি উচ্চ উচ্চ পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে বলিতে গেলে নবাবদিগের কর্ম্মচারীরাই প্রকৃত

প্রস্তাবে নবাব ছিলেন। তাঁহাদের প্রভুত্ব ও গৌরবের সীমা পরিসীমা ছিল না। তাঁহাদের ভ্রূকুটিতে কত জমিদার, কত ধনী ব্যক্তির প্রাণ কম্পিত হইত। জন সাধারণ তাঁহাদের প্রসাদই নবাবের প্রসাদ এবং তাঁহাদের বিরাগই নবাবের বিরাগ মনে করিত। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বংশের প্রভাব আরও অধিকতর রূপে স্বীকৃত হইতেছে। সুতরাং ব্রজসুন্দর মিত্রের জীবনবৃত্তান্তে এই বংশীয়দিগের কিঞ্চিৎ উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিশেষতঃ এই বংশীয়গণের সম্বন্ধে এত সুন্দর সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে যে, তাহার দুই চারিটী গল্প উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। এই পরম গৌরবান্বিত মিত্রগণের মধ্যে সানন্দ মিত্র বা শ্রীরাম খাঁ এবং তাঁহার প্রপৌত্র হরিনারায়ণ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হরিনারায়ণ মিত্রই প্রথম নবাব সরকার হইতে মজুমদার উপাধি লাভ করেন এবং সেই সময় হইতে ইঁহারা মিত্র-মজুমদার নামেই পরিচিত। স্বয়ং দিল্লীশ্বর ইঁহাকে নানা প্রকারে সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং বিবিধ সনন্দ প্রদান করেন।

নবাব সরকারে ইঁহাদের ক্ষমতা এবং সমাদরের সীমা পরিসীমা ছিল না। দেশের অনেক রাজা জমিদার ইঁহাদের প্রসাদে নবাবের আক্রোশ-বহ্নি হইতে উদ্ধার পাইতেন। নিম্নলিখিত দুইটী দৃষ্টান্ত হইতে তৎকালীন দেশের অবস্থা এবং মিত্র-মজুমদারদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিশেষ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

১। একদা বঙ্গাধিপ দিবাশেষে সান্ধ্য সমীরণ সেবনার্থ পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে বিচিত্র নৌকায় অরোহণ করিয়া নদীবক্ষে বিহার করিতে-ছিলেন। দুর্দৈব ক্রমে সেই সময় ঢাকা জেলার অন্তর্গত চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার তৎকালীন জমিদার জনৈক ধনীবর (সম্ভবতঃ বাবু শশাঙ্কমোহন রায় ও রাজমোহন রায় জমিদার মহাশয়দিগের পূর্ব্ব পুরুষ কোন জমিদার) বহু সমারোহে নবাবের সদৃশ অন্য এক নৌকায় আরোহণ করিয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছিলেন; নৌকা-দ্বয় পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী হইলে জমিদারের নৌকার ক্ষেপণী নিক্ষিপ্ত বারিকণা

নবাবের দেহ স্পর্শ করিল। নবাব আরোহীর ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। তৎপরদিন রাজসভায় সমাসীন হইয়া উক্ত হতভাগ্য জমিদারের সমুদায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। কথিত আছে তৎকালে মিত্র-মজুমদার বংশীয় জনৈক ব্যক্তি উক্ত নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। তিনি মধ্যস্থ হইয়া দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত বঙ্গাধিপের কোপানল হইতে জমিদার মহাশয়কে উদ্ধার করেন।

২। সকলেই জানেন যে ইংরাজ রাজের আমলে যেরূপ সুনিয়মে ও সদয়ভাবে রাজস্ব আদায় হয় মুসলমানদিগের আমলে সেরূপ হইত না। তখন রাজস্ব আদায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে ও অনিয়মে হইত। রাজস্ব অনাদায় থাকিলে রাজা ও জমিদারগণের উপর নানা প্রকার নিষ্ঠুর উপায়ে, বল প্রয়োগ করিয়া রাজস্ব আদায় করা হইত। একবার চন্দ্রদ্বীপের বসু বংশজ রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে বহুকাল রাজস্ব অনাদায় থাকে। রাজা কোন মতেই স্বীয় দেয় পরিশোধ করিতে না পারায় নবাবের সৈন্যগণ তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী হইতে মুর্শিদাবাদে লইয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। রাজা মুর্শিদাবাদের কারাগারে বহুদিন অসহ্য যন্ত্রণায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের আর কোনও উপায় ছিল না। এমন সময় সহসা তাঁহার স্মরণ হইল উলাইলের হরিনারায়ণ মিত্র-মজুমদারের নবাবের উপর যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। হয়ত তিনি সদয় হইলে তাঁহাকে এই বিপদ-পারাবার হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। অনেক চেষ্টা করিয়া তিনি হরিনারায়ণ মিত্রকে স্বীয় দুর্দশার কথা জানাইলেন। তিনি চন্দ্রদ্বীপাধিপতির ঈদৃশ কষ্ট যন্ত্রণা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং বহু চেষ্টায় চন্দ্রদ্বীপাধিপতিকে কারামুক্ত করিয়া চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজা প্রতাপনারায়ণ হরিনারায়ণের এই মহোপাকারের প্রতিদানের কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। হরিনারায়ণ- মান সম্ভ্রম, ধন ঐশ্বর্য্যে সকলের অগ্রগণ্য; তাঁহার প্রত্যুপকারের কোনও উপায় নাই। তখন

তিনি হরিনারায়ণের হস্তে আপনার অনূঢ়া কন্যাকে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। হরিনারায়ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না,—পুত্র গৌরীচরণের সহিত চন্দ্রদ্বীপের রাজকন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; প্রতাপনারায়ণ একান্ত পুলকিত হইয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন বিপুল সমারোহে এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। গৌরীচরণের পুত্র উদয়নারায়ণই পরে মাতামহের সিংহাসন অধিকার করিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। এই সূত্রেই মিত্রগণ চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই রাজা প্রতাপনারায়ণের অন্যতম কন্যার বরিশালের অন্তর্গত গুহ ঠাকুরতাদিগের গৃহে বিবাহ হইয়াছিল। উলাইলের মিত্র-মজুমদারগণ যে কেবল ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া বিপুল ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে তাঁহাদিগের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি ও ছিল। তখনকার দিনে তাঁহারা পরগণা সুলতান-প্রতাপ এবং ইষপসাহী, নরুল্লাপুর প্রভৃতি অন্যান্য বহু পরগণার অধিকারী ছিলেন। এই মিত্র-মজুমদারদিগের আর একটী বিশেষত্ব ছিল; সেটি ইহাদিগের গৃহ স্থাপিত বিগ্রহ সেবা। বিগ্রহদিগের বহুসমারোহে নিত্য সেবা হইত। দেশ দেশান্তর হইতে বহুলোক আসিয়া ইঁহাদের পূজা দিতেন। এই কারণেও মিত্র-মজুমদারদিগের দেশ মধ্যে অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। মিত্র বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত অতি প্রাচীন তিনটী দেবমূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে।

১। গোপীজন-বল্লভ—এটি এখনও ব্রজসুন্দর বাবুর বাটীতে আছে।

২। বাসুদেব—ইহাদের সদর কাছারী ধামরাই গ্রামে অবস্থিত।

৩। দশভুজা—এটিকে নবাবের কোপদৃষ্টিতে পতিত দর্পনারায়ণ মিত্র পাবনা জেলার অন্তর্গত দৌলতপুরে স্থাপিত করেন। উলাইল হইতে পলায়ণ কালে তিনি দশভুজাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ ও তাঁহার বংশধরেরা আর কখনও উলাইলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সেই হেতু পাবনার অন্তর্গত দৌলতপুরে মিত্রদিগের এক শাখা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকল বিগ্রহ যে

কত প্রাচীন তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের ঘটনাটী উল্লেখ করিতেছি। তালিপাবাদে যশোপাল নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার গৃহে যশোমাধব নামে এক বিগ্রহ ছিল। সে রাজবংশ ধ্বংস হইলে রাজ-পুরোহিত উক্ত বিগ্রহকে 'ঠাকুরবাড়ী' পঞ্চাশ নামক গ্রামে নিজ-গৃহে লইয়া আসেন। ঐ বিগ্রহ লইয়া যাইবার জন্য নবাব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া রাজ-পুরোহিত ঐ বিগ্রহকে ধামরাই গ্রামস্থিত নিজ জামাতৃ-গৃহে রাখেন। এই বিষয় লইয়া নবাবের নিকট এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল; তাহাতে ঐ পুরোহিতের জামাতা ঐ বিগ্রহের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির তারিখ ১০৭৯।১০ই আষাঢ়। মিত্র বংশীয়দিগের বাসুদেব এই যশোমাধবের অনেক পূর্ব্ব হইতেই স্থাপিত। এই যশোমাধবই পূর্ব্ব অঞ্চলে বিখ্যাত ধামরাইএর মাধব নামে পরিচিত, ধামরাইএর মল্লিক বংশীয়েরা এই বিগ্রহের অধিকারী। ইঁহারা সেই রাজা যশোপালের রাজ-পুরোহিতের জামাতার বংশধর। এই মল্লিক বংশেই ব্রজসুন্দর বাবুর অন্যতম বন্ধু দীনবন্ধু মৌলিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রজসুন্দর বাবুর সহিত দেশের সংস্কার কার্য্যে বিশেষ যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, প্রজাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্টের বিরাগ-ভাজনও হইয়াছিলেন।

কি কারণে দর্পনারায়ণ মিত্র দিল্লীশ্বরের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইলে মুসলমান রাজত্বকালে জমিদারগণ কিরূপ উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করিতেন, তাহার আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

একবার নবাব মুরসিদ কুলীখাঁর দেওয়ান পুটিয়ার দর্পনারায়ণ কোনও কঠিন কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া সম্রাটের নিকট বহুমূল্য খেলাত পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ঘটনাক্রমে যে দিন রাজসভায় প্রকাশ্য-ভাবে খেলাত প্রদত্ত হইল, তখন কৃতী দর্পনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন না। দর্পনারায়ণের নাম উল্লেখ করিবা মাত্র হরিনারায়ণ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

দর্পনারায়ণ অগ্রসর হইয়া খেলাত গ্রহণ করিলেন। তখন রাজসভায় এ ভ্রম প্রকাশ পাইল না। ক্রমে ক্রমে দিল্লীশ্বর যখন শুনিতে পাইলেন ভুল-ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া এই খেলাত লইয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধের উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঢাকার নবাবকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন মিত্র-মজুমদার বংশীয় দর্পনারায়ণকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে হইবে। উলাইল গ্রামে এই সংবাদ পৌছিবামাত্র মজুমদারগণ ভূসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। দর্পনারায়ণ সপরিবারে পাবনা জেলার অন্তঃপাতী দৌলতপুর গ্রামে পলায়ন করিলেন। এইরূপে রাজীবলোচন মিত্রের পরিবার ভাওয়ালের অন্তর্গত কাশীমপুর অঞ্চলে, রামরাম মিত্রের সন্তানগণ জাফরগঞ্জ থানার অন্তঃপাতী দশচিড়া গ্রামে, মণিরাম মিত্রের সন্তানগণ ঐ স্থানেরই সন্নিকটে জালালদি গ্রামে ও দেবীপ্রসাদ মিত্র (ব্রজসুন্দর বাবুর প্রপিতামহ) পাটপাসার অঞ্চলে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে নবাবের কর্ম্মচারিগণের নিদারুণ অত্যাচার মন্দীভূত হইলে, অথবা উৎকোচাদি দানে উপশমিত হইলে, দর্পনারায়ণ ও মণিরাম ব্যতীত আর সকলেই উলাইলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, নিজ নিজ বিষয় সম্পত্তি পূর্ব্ববৎ ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মিত্র বংশীয়দিগের এক শাখা চন্দ্রদ্বীপে, এক শাখা দৌলতপুরে, এক শাখা জালালদিতে এবং অবশিষ্ট শাখা সকল এক উলাইল গ্রামে থাকিয়া পরে বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে রেনেল সাহেব বঙ্গদেশের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করেন। তাহাতে দেখা যায়, যে উক্ত সময়ে উলাইল গ্রামে বহু ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল। ঐ সকল অট্টালিকায় মিত্র-মজুমদারগণের বহুগোষ্ঠী বাস করিত। কবে সে গ্রাম নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে; বঙ্গদেশের আধুনিক মানচিত্রে উলাইলের চিহ্ন আর নাই; কিন্তু এখনও ঐ অঞ্চলের অতি প্রাচীন ও প্রাচীনার নিকট মিত্র-

দিগের অনেক কীর্ত্তি এবং দানশীলতা ও উদারতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

মিতড়ার ভট্টাচার্য্যগণ এখনও অর্দ্ধকালীর সন্তানরূপে দেশমধ্যে বিশেষভাবে পূজিত হন। মিতড়ার এই ভট্টাচার্য্যগণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহাকেও মন্ত্র দিতেন না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য শিষ্য ছিল না। কায়স্থগণের মধ্যে এই বংশীয়েরাই প্রথমে তাঁহাদের শিষ্য হইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহাদিগের এক কীর্ত্তির বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে-ঘটনা সূত্রে তাঁহারা উক্ত ভট্টাচার্য্যদিগের শিষ্য হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন সে ঘটনাটীতে কিছু বিশেষত্ব উপলব্ধি হয়। ঘটনাটী এইরূপে কথিত হইয়া থাকে ;—

হাটিপাড়া নিবাসী রায়োপাধিধারী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ একব্যক্তি তাঁহার কন্যার বিবাহ সভায় তাঁহার গুরু উক্ত মিতড়ার ভট্টাচার্য্য বংশীয় একব্যক্তিকে প্রথমে চন্দন দিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাহাতে উপস্থিত কুলীনগণ তাহার বিরোধী হইলে কন্যাকর্ত্তা চন্দন দান বন্ধ রাখিলেন এবং সেই বিবাহ ও স্থগিত রাখিলেন। কন্যাকর্ত্তার প্রতিজ্ঞা, গুরুকেই প্রথমে চন্দন দিবেন। এজন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে আমার গুরু কুলীনদিগের অগ্রে চন্দন পাইতে পারেন ? কুলীনগণ বলিলেন, যদি ইনি আমাদের মধ্যে প্রধান কুলীনকে কন্যাদান করিয়া সমগ্র কুলীন-সমাজের সম্বর্দ্ধনা করিতে পারেন, তাহা হইলে উহা হইতে পারে। কিন্তু উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন ভট্টাচার্য্য ও রায়দিগের তাহার সঙ্গতি ছিল না। তাহাতেই ভট্টাচার্য্যেরা উলাইল নিবাসী ঐ মিত্র পরিবারকে শিষ্য করেন। ঐ শিষ্যদিগের অতুল ব্যয়ে উক্ত গুরু বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন-প্রধান এক ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। এই কার্য্যোপলক্ষে ঐ শ্রেণীস্থ প্রধান প্রধান কুলীন ও কুলজ্ঞগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ক্রিয়া দ্বারা উক্ত ভট্টাচার্য্যেরা প্রধান শুদ্ধ শ্রোত্রীয় পদ প্রাপ্ত হয়েন। এ পর্য্যন্ত রায়-পরিবারের বিবাহ ক্রিয়া স্থগিত ছিল, এই কার্য্যদ্বারা উক্ত গুরু চন্দন

গ্রহণ যোগ্য হওয়াতে গুরু কুলীনদিগের অগ্রে চন্দন প্রাপ্ত হইলেন।

উপরোক্ত দর্পনারায়ণ মিত্র-মজুমদার যখন উলাইল ত্যাগ করিয়া দৌলতপুরে পলায়ন করেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ মিত্র-মজুমদারের পুত্র কালীচরণ মিত্রকে স্বীয় সম্পত্তির আদায় উসুলের যে অধিকার পত্র প্রদান করেন, সেই অধিকার পত্র দ্বারা সেকালে সাদা কাগজে বিনা রেজেষ্টরীতে বিনা কবুলীয়তে কি প্রকারে অধিকার দেওয়া হইত নিম্নে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে—

অধিকার পত্র—

শ্রীশ্রীরাম

কাগজ পত্র বুঝিয়া ইস্তক সন ১১২১ সাল সুরু পুণ্যা নাগাদ আখের কীফাইত হয় পাইব টোটা হয় দিব হিস্যা মজকুর বিনা টোটা না দিয়া আমল করিতে না পারিব। ইতি

শ্রীদর্পনারায়ণ মিত্রস্য—

ইয়াদিকির্দ্দ সকল মঙ্গলালয়—

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র-মজুমদার

পরম কল্যাণবরেষু—লিখিতং শ্রীদর্পনারায়ণ মিত্র পত্র মিদং আগে আমার তালুক ও চৌধুরাই * পরগণে সুলতান প্রতাপ তপে ধামরাই ও পরগণে খলিলাবাদ ও পরগণে নুরুল্ল্যাপুর তপে হাজীপুর পরগণে সৈদপুর ও তালুক পরগণে মকীমাবাদ আমার হিস্যা দুই আনা আট গণ্ডা তোমার হাওয়ালে করিলাম হিস্যা মজকুর আমল করিয়া বজায় রাখিয়া সদর মালগুজারী করিবা সাল আখের জমা খরচ ও গয়রহ নওয়াজীমাও কাগজ আমাকে বুঝাইবা। কীফাইত হয় পাইব, টোটা হয়

* জমিদারী

তাহার নিশা করিব আর আমার হিস্যা মজকুরের নফর * শূদ্র ও চণ্ডাল আমার খেদমতের উপযুক্ত জে হয় তাহা দিবা বাকী জে থাকে তুমি আমল করিয়া তালুক মজকুরের সরবরাহ করিবা আমার হিস্যা মজকুর দখল আমল করিতে চাহি আমল করিব কাগজ বুঝিয়া টোটা হয় তাহার নিসা করিব কীফাইত হয় পাইব। ইতি তারিখ ২৫ বৈশাখ সন ১১২১ সাল সদর।

ইঁহাদিগের উদারতা ও দানশীলতা সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি আছে। ইঁহারা নিতান্ত সাধ্যাতীত না হইলে যাচককে কখনও নিরাশ করিতেন না। শত্রু মিত্রে সমান ব্যবহার করিতেন। এ স্থলে একটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। এইরূপ জনশ্রুতি আছে;:— ধলেশ্বরী নদীর পূর্ব্বতট নিবাসী ফুলবেড়ের চৌধুরীদিগের সহিত পশ্চিম তট নিবাসী উলাইলের মিত্রদিগের সহিত ধলেশ্বরীর স্বত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়; এই বিবাদ ক্রমে মোকদ্দমায় পরিণত হয়। মোকদ্দমায় মিত্রদিগের জয়লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া চৌধুরিগণ এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। বৈশাখ মাসের নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় তাঁহারা কয়েকজনে মিলিয়া দুই প্রহরের পর মজুমদারদিগের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অতিথিগণকে পাইয়া মজুমদারদিগের গৃহে সমারোহ পড়িয়া

* নফর শব্দের অর্থ সেবাকারী ভৃত্য। প্রাচীনকালে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ লোকদিগের যেরূপ অস্পৃশ্য ঘৃনার্হ জাতি ছিল, এসময়ে অর্থাৎ দর্পনারায়ণ মিত্রের সময়ে সেরূপ ছিল না; এ সময়ে শূদ্রগণ গৃহমধ্যস্থ সকল কর্ম্মই বোধ হয় করিত। বহির্ভাগের নিকৃষ্ট কার্য্য সকল সম্পাদন করিবার জন্য আর এক দল ভৃত্য ছিল তাহারা চণ্ডাল শ্রেণীর; তাহারাই প্রাচীন কালের শূদ্রের ন্যায় উক্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের নিকট অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপ নফর-বংশীয়গণ এখনও পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারদিগের অধীনে দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে শূদ্র নফরগণ শিকদার এবং চণ্ডাল নফরগণ শানা নামে আখ্যাত। কায়স্থগণ যে শূদ্র হইতে উচ্চশ্রেণীর লোক তাহা উক্ত কায়স্থ মহাশয়ের এই ভৃত্য গণনা দ্বারা প্রকাশ পায়।

গেল ; জলযোগের নানা আয়োজন হইল। তাঁহারা বলিলেন আমরা কিছুই আহার করিব না, শুধু জল চাই, আমরা বড় তৃষ্ণার্ত্ত। কর্ত্তা-মহাশয় অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৃক্ষ হইতে ডাব পাড়িতে আদেশ করিলেন, ডাব আনীত হইলে তাঁহারা বলিলেন সামান্য ডাবের জলে আমাদের তৃষ্ণা দূর হইবে না আমরা ধলেশ্বরীর জল চাই। কর্ত্তা গলবস্ত্র হইয়া অধীনকে কৃতার্থ করুন বলিয়া ব্রাহ্মণ অতিথিদিগকে ধলেশ্বরী দান করিলেন। ধলেশ্বরী নদী যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন ইহা কিরূপ রাজোচিত দান।

এই বংশীয়দিগের অন্যান্য বিষয়েও বহুতর কীর্ত্তি ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থাপিত বিগ্রহদিগের নিত্য ও পর্ব্বাহ কৃত্য সকল বহু সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইত। অন্নকোটি, রাস, রথ, বারুণী, দোল, পুষ্প, স্নান, নৌকাযাত্রা প্রভৃতি চব্বিশটী যাত্রাদ্বারা বিপুল সমারোহে বিগ্রহদেব গোপীজন-বল্লভের সেবা হইত। জীবন্ত জাগ্রত দেবতা বলিয়া এই গোপীজন-বল্লভের খ্যাতি ছিল। ভোগদিবার ও মানস-রক্ষার জন্য বহুলোক দূর দূরান্তর হইতে ঐ দেবমন্দিরে উপস্থিত হইতেন। ধলেশ্বরী নদী দিয়া এমন নৌকাই গমন করিত না যে নৌকার আরোহী ও মাঝি মাল্লাগণ গোপীজন-বল্লভের মন্দির লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিত না।

তখন মুসলমান রাজত্বের অবসানকাল ; ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুত্থান হইলেও দেশের সুদূর প্রদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দেশ অরাজক। দেশে রাজা নাই, প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলের রক্ষার কোনও উপায় ছিল না। দেশে যখন রাজা ছিল না তখন জমিদারের নিকট হইতেই লোকের ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করিবার কথা, কিন্তু বিচার করিবে কে, যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক। ক্রমে ইঁহারা ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন ইঁহাদিগের অত্যাচার কাহিনী শুনিলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সতীর সতীত্ব রক্ষা হইত না, গরীবের প্রাণ রক্ষা হইত না। কত লোককে ইঁহারা শূলে চড়াইতেন,

দেবতাতুল্য কত ব্রাহ্মণকে ইঁহারা জীবন্তে সমাধি দিতেন। জীবন্তে সমাধিস্থ হইতে হইতে ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া উলাইল ও উলাইলের মিত্র বংশকে অভিসম্পাত করিতেন। এইরূপ অত্যাচার করিতে করিতে এবং দুর্ব্বলের অভিসম্পাতে মিত্র বংশ ক্রমে ধ্বংশের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও সুনিয়মে রাজস্ব আদায়ের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় দশ শালা বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। এই বন্দোবস্তের পর হইতেই উলাইলের মিত্র বংশীয়গণ হঠাৎ দুরবস্থায় পতিত হইতে লাগিলেন। মুসলমান নবাবদিগের আমলে জমিদারগণ বাকি খাজনার জন্য অশেষরূপে নিগৃহীত অথবা কারারুদ্ধ হইলেও তাঁহাদিগের জমিদারী অটুট থাকিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাকি খাজনার জন্য নিলামের আইন জারী করাতে তৎকালীন অনেক পুরাতন জমিদারেরই জমিদারী হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

নিলামের দিনে সূর্য্যাস্তের মধ্যে খাজনা বহন করিয়া কালেক্টরের হস্তে প্রদান করা এদেশীয়গণের পক্ষে একান্ত অনভ্যস্ত ব্যাপার ছিল। জমিদারী পরিচালনের উপযুক্ত বুদ্ধি বিবেচনাও কাহার বড় ছিল না, অধিকাংশই নিতান্ত মূর্খ এবং অমিত মদ্যপায়ী ছিলেন। কর্ম্মচারিগণ ও অত্যন্ত অধার্ম্মিক ও স্বার্থপর ছিল। খাজনার জন্য রক্ষিত টাকা পথি-মধ্যেই লুট হইয়া যাইত, হয়ত গৃহেই ডাকাতি হইয়া যাইত। দেশ এমন অশাসিত ছিল যে "জোর যার মুল্লুক তার" এই প্রকার ভাবই প্রবল ছিল। অত্যাচারের কোনই প্রতিকার হইত না। হয়ত বা খাজনার টাকা কর্ম্মচারিগণ নিজেরাই বণ্টন করিয়া লইত। খাজনার টাকা যথাস্থানে পৌছিবার পক্ষে এইপ্রকার নানা প্রতিবন্ধক ছিল। এইরূপে বৎসরের পর বৎসরে পরগণার পর পরগণা নিলামে বিক্রয় হইয়া যাইতে লাগিল। সাভার, ফুলবেড়িয়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের, ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের অনুগৃহীত ব্যক্তিগণই ইঁহাদিগের জমিদারী ক্রয় করিতে লাগিলেন। কলিকাতার পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর বংশীয়গণও ইঁহাদিগের

জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের জমিদারী স্বল্পায়তন হইয়া যাইতে লাগিল আর সে অতুল প্রতাপ রহিল না। এই সময়ে ব্রজসুন্দর বাবুর প্রপিতামহ, দেবী প্রসাদ মিত্র-মজুমদারই জ্ঞাতিগণের মধ্যে একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নবাবের অধীনে কাননগু দপ্তরের সর্ব্বোচ্চ পদে কার্য্য করিতেন অর্থাৎ ঢাকা অঞ্চলে নবাবের মকিমাবাদ প্রভৃতি যে সম্পত্তি ছিল তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ইনি একজন সাধক ব্যক্তি বলিয়াও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার জ্ঞাতিপুত্র নন্দরাম মিত্রের প্রতি সে ভার অর্পিত হয়। তাঁহার অমনোযোগিতায় নবাবের সেই সম্পত্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। এই সময় হইতেই ইঁহাদিগের সহিত মুসলমান নবাবদিগের এত কালের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রজসুন্দরের জন্মকালে দেশের অবস্থা।

ব্রজসুন্দরের জন্মকাল বঙ্গদেশে ঘোর পরিবর্ত্তনের সময়। মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু নবাবী আমলের চিহ্ন তখন পয্যন্ত বিলোপ হয় নাই। লোকের আচার ব্যবহারে, আইন আদালতে, এবং রীতি নীতিতে তখন পর্য্যন্ত মুসলমান রাজত্বের প্রভাবই বিদ্যমান ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক তখন কেবল মাত্র অতি সন্তর্পণে অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গ-সমাজে প্রবেশাধিকারের চেষ্টা করিতেছিল। তখনও গঙ্গাতীরে শত শত রমনী ভ্রান্তমতের বশবর্ত্তিনী হইয়া মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতানলে প্রাণত্যাগ করিতেছিল, তখনও গঙ্গাসাগরে পুত্র কন্যা বিসর্জ্জন দিয়া কত পিতা মাতা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গৃহে ফিরিত, তখনও নৃমুণ্ডমালিনী কালীমূর্ত্তির নিকট নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। যদিও রামমোহন রায় ব্রজসুন্দরের জন্মিবার ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া সতীদাহ নিবারণ ও নিরাকার ব্রহ্মোপসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার সাধু চেষ্টা তখন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র বড় বড় সহরের অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল মাত্র। রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি এতদূর হীনাবস্থা ও নিজ্জীবতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে কেবল মৃত্যুর লক্ষণই অনুভূত হইত। জীবনীশক্তির অভাবে মানব সমাজ যে প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত থাকে দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গ-সমাজে তাহাই হইয়াছিল।

রাজনৈতিক অবস্থাঃ—ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালির রাজনৈতিক ক্ষমতার বিলোপ হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার উচ্চ রাজকর্ম্ম

হইতে তাহারা অধিকারচ্যুত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুরা যেমন রাজস্ববিভাগে তেমন সৈনিক ও অপরাপর বিভাগে ও বড় বড় কর্ম্ম করিতেন। মুসলমান রাজত্বের সময় তাঁহারা আপনাদিগকে নিতান্ত পরাধান বলিয়া কখনই অনুভব করিতেন না। মুসলমান-শাসন জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল বলিয়াই মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে বঙ্গদেশে হিন্দু জমিদারবর্গের প্রাবল্য থাকিলেও তাঁহারা সমবেত হইয়া মুসলমান রাজত্বের ধ্বংশ সাধন করিয়া হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হন নাই। ইংরেজ রাজত্বের বহু গুণের মধ্যে একটী গুরুতর দোষ এই যে এত কালের মধ্যেও ইহা জাতীয় আকার ধারণ করিতে পারিতেছে না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আইন আদালত এবং বিচার প্রণালী অধিকাংশ স্থানেই প্রায় নবাবী আমলের অনুরূপই ছিল। ইংরাজ বিচারকগণ দেশীয় ভাষায়, এবং দেশীয় কর্ম্মচারিবর্গ এবং উকিল মোক্তার ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকার দরুণ পার্শি ভাষা তখন কোর্টের ভাষা ছিল। দেশীয় ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ইংরেজ বিচারকদিগের সাহায্যের জন্য একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমান সহকারী বিচারক থাকিতেন। প্রকৃত পক্ষে বিচার কার্য্য তাঁহাদের দ্বারাই সম্পন্ন হইত। নবাবী আমল হইতে উৎকোচ গ্রহণের যে প্রবল পিপাসা রাজকর্ম্মচারাদিগের মধ্যে জন্মিয়াছিল ঐ সময় পর্য্যন্ত তাহা কিছু মাত্র প্রশমিত হয় নাই। দেশীয় বিচারকেরা অত্যন্ত অল্প বেতন পাইতেন অথচ সাক্ষ্য গ্রহণ দলিল দস্তাবত পরীক্ষাকরণ এবং রায় লিখিবার ভার পর্য্যন্ত ইহাদের উপরই ন্যস্ত থাকিত।

প্রকৃত পক্ষে বিচার কার্য্য দেশীয় বিচারকদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইত। গুরুতর কার্য্যভার অতি অল্প বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীর হস্তে থাকাতে যে সকল অনিষ্ট হইয়া থাকে ঐ সময়ে তাহাই হইত। অধিকাংশ স্থানেই বিচার ফল উৎকোচের পরিমাণানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইত। বিচারালয়ের অল্পতা হেতু এবং সাধারণ প্রজাবর্গের নিকট আইনের

তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকাতে হাঙ্গামা প্রিয় জমিদারবর্গের মধ্যে সর্ব্বদাই লড়াই চলিত। এই সময় অনেক ইউরোপীয় জমিদার ও নীলকর এই প্রকার বিবাদে লিপ্ত থাকিত। অপরের সম্পত্তি বল পূর্ব্বক হস্তগত করিবার স্পৃহা জমিদারবর্গের মধ্যে এত বলবতী ছিল যে প্রত্যেক জমিদারই আত্মরক্ষার জন্য বহু সংখ্যক লাঠিয়াল প্রেরণ করিত। ইহারা ঢাল, শরকি, বল্লম, তরবারি ও বড় বড় লাঠি লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত। বহু অশ্ব এবং হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে নীত হইত। এই সকল লাঠিয়ালের দল স্বীয় স্বীয় প্রভুর স্বার্থ রক্ষার জন্য যেরূপ সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করিত তাহা রণ নিপুন শিক্ষিত সৈনিকের নিকটও প্রশংসনীয়।

শিক্ষা ঃ—মুদ্রাযন্ত্র এবং সংবাদপত্র যাহা বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান সহায় পূর্ব্ববঙ্গে, কেবল পূর্ব্ববঙ্গে কেন—বঙ্গদেশের কোন স্থানেই তাহার কোন চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হইত না। কলিকাতা ও শ্রীরামপুরে ২।১টি মাত্র দৃষ্ট হইত। অপরাপর দেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও প্রজা সাধারণের মধ্যে তৎকালে বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। উচ্চ শ্রেণাস্থ লোকদের মধ্যে সামান্য লেখা পড়ার কথঞ্চিৎ বন্দোবস্ত ছিল। গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য কিছু লেখা পড়া শিক্ষা হইত। তখনকার উচ্চ শিক্ষার স্থল ছিল, পণ্ডিতদিগের চতুষ্পাঠী এবং মৌলবীদের মোকতব। বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ শিক্ষা বলিয়া আমরা যাহা বুঝি, পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। তাহাদের শিক্ষায় জ্ঞানের বিকাশ, হৃদয়ের প্রশস্ততা জন্মিত না। যে শিক্ষা শাস্ত্রের নিগড় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যাহাতে স্বাধীন চিন্তা উদ্রেক করে না সে শিক্ষা জনসমাজের মঙ্গল সাধন না করিয়া বরং অনেক সময় তাহাকে সর্ব্বপ্রকার মানসিক দাসত্বের দিকেই লইয়া যায়। রাজসরকারে কর্ম্ম প্রার্থীদিগকে আরবি ও পার্শি ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ের ইংরেজী শিক্ষার ন্যায় বাঙ্গালীর পক্ষে উক্ত দুইভাষা শিক্ষা অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া গণ্য হইত। পুরুষদিগের শিক্ষারই যখন এমন অবস্থা তখন স্ত্রীশিক্ষার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। স্ত্রীলোকদের লেখা

পড়া শিক্ষার কোন্ ব্যবস্থা ছিল না। বরং স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয় এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল ছিল। গবর্ণমেণ্ট তখন পর্য্যন্ত লোক-শিক্ষার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। কি প্রণালিতে এদেশ বাসীদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে সে বিষয় লইয়া কেবল অল্প বিস্তর বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল।

সাধারণ প্রজাবর্গের অবস্থাঃ—প্রজাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবি। কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্গের অত্যাচারে এবং অবৈধ নিয়মে, দেশীয় লোকের শিল্প বাণিজ্য একপ্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যে বঙ্গদেশ এক সময়ে বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং সিংহল, চিন, জাপান, আরব, পারস্য এমন কি ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী দেশ সমূহ হইতে প্রভূত ধন সম্পদ অর্জ্জন করিয়া ধন গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল, ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে সেই বঙ্গদেশ অর্থাগমের পথ, শিল্পবাণিজ্য হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। জমিদারবর্গের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইলেও প্রজা সাধারণের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর ছিল বলিয়া দেশের মধ্যে অর্থের অভাব যথেষ্ট অনুভূত হইত। এদেশীয় লোক বিলাসবিমুখ ছিল বলিয়াই কোন প্রকারে কৃষিজাত দ্রব্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত এবং এক প্রকার সুখেই কাল কাটাইত। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জীবন সংগ্রামের তীব্রতা তখন কেহই অনুভব করিত না। প্রজাদের বিচারের ভার জমিদারের হাতেই ছিল। উকিল মোক্তারের অভাব ছিল বলিয়া তখন মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি হইত না।

ধর্ম্ম ও সমাজঃ—পৃথিবীতে যখনই কোন নবধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখনই দেখা যায় যে নূতন ধর্ম্মমত মানবাত্মার কোন একটা বিশেষ ভাবকে ব্যক্ত করিয়া জনসমাজকে সেই ভাবের অনুবর্ত্তী করিতে প্রয়াস পায়। কিছুদিন উৎসাহের সহিত সেই নব ভাব মানব মনকে কিছু দূর অগ্রসর করাইয়া যখনই তাহার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে অসমর্থ হয়, তখনই তাহার মধ্যে যে একটা আধ্যাত্মিকতা ছিল সে তাহা হারাইয়া

বসে, এবং কেবলমাত্র কতকগুলি আড়ম্বরপূর্ণ বৃথা ক্রিয়াকলাপে পর্য্যবসিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাংশে বিরোধী না হইলেও তিনটী বিভিন্ন ধর্ম্ম মত বঙ্গ-সমাজে স্থান পাইয়াছিল। শাক্ত, মুসলমান, এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম আপনাপন বিশেষত্ব লইয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত না থাকাতে এই সকল ধর্ম্মমত ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্ম মানব-সমাজের প্রাণস্বরূপ। প্রাণশূন্য মৃতদেহ যেমন পূতিগন্ধ বিস্তার করে এবং জীবননাশক নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি করিয়া মারিভয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই প্রকার প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া মৃতধর্ম্ম নানাপ্রকার দোষে কলুষিত হইয়া মানব আত্মার অশেষ অকল্যাণকর পাপের সৃষ্টি করে। বঙ্গদেশে উক্ত ধর্ম্মত্রয়ের এই শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। শাক্তধর্ম্ম আপনার আধ্যাত্মিকতা টুকু হারাইয়া তান্ত্রিকতার ঘোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পঞ্চ 'ম'কারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মও নিজের সজীবতা হারাইয়া নাম মাত্র নিরাকার ঈশ্বরবাদে পরিণত হইলে আত্মদৃষ্টির অভাবে ধর্ম্মের উদার ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল গোঁড়ামি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল। ইহার ফলে আজ পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজ নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট। এখনও ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনেক পাপ মুসলমান-সমাজকে সভ্যতার চক্ষে হীন করিয়া রাখিয়াছে। জাতি নির্ব্বিশেষে প্রেম ভক্তি বিতরণের জন্য যে চৈতন্য-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা ক্রমে গোঁসাই প্রভুদের গোঁড়ামির হাতে পড়িয়া এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আলিঙ্গনে স্বীয় মহান্ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কিশোরী-ভোজন প্রভৃতি নানাবিধ ব্যভিচারের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গ-সমাজকে কলুষিত করিতেছিল। জ্ঞানকে বিদায় দিয়া কেবল ভক্তির তরঙ্গে ভাসিলে যাহা হয়, চৈতন্য-ধর্ম্মের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। জ্ঞান ধর্ম্মের জনক, ভক্তি তাঁহার প্রসূতি। দুইয়ের সম্মিলন ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

জ্ঞান যখনই ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তখনই তাহার পদস্খলন ঘটিয়াছে। জ্ঞান শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া নাস্তিকতা উৎপন্ন করিয়াছে। জ্ঞানের এই প্রকার দুরবস্থা ঘটিলে ভক্তি তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে। জ্ঞানের প্রতি তাহার উপেক্ষা ও অবজ্ঞা আসিয়া পড়ে। জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তি যখনই একাকিনী চলিয়াছে তখনই স্খলিতচরিত্রা ব্যভিচারিণী রমণীর ন্যায় সমাজকে কলুষিত করিয়াছে। বঙ্গ-সমাজ এই জ্ঞান ও ভক্তির মিলনাভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত প্রায় ২। ৩ শত বৎসর কাল বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এ সময়কে বঙ্গদেশের ঘোর অমানিশার কাল বলিয়া নির্ণয় করা যায়।

রাজশাসন এবং ধর্ম্মশাসন দুর্ব্বল হওয়াতে জমিদারবর্গ এবং সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই সময়ে এমন বিলাসপ্রিয় হইয়াছিল যে তাহাদের অত্যাচারে গরিব প্রজাকুলের মান সম্ভ্রম লইয়া বাস করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। যে দুষ্কার্য্য আজ ভারতের সম্রাটের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে হয়ত তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত হইতে হয়, তাহা একজন জমিদার অবলীলা ক্রমে সম্পন্ন করিয়া সমাজের উপর স্বীয় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইত। বহুবিবাহ হিন্দু ও মুসলমান সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার অনিষ্ট-কারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হিন্দু এবং মুসলমান শাস্ত্রকারেরা এই কুপ্রথাকে নিয়মিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বার্থপর ও বিলাসী লোকেরা স্বীয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এবং শাস্ত্রের আদেশ উপেক্ষা করিয়া বহুবিবাহের প্রশ্রয় দিয়াছে। মুসলমান-সমাজে অর্থশালী এবং সঙ্গতিপন্ন লোকদের মধ্যেই বহুবিবাহ প্রধানতঃ প্রচলিত ছিল, কিন্তু হিন্দু সমাজে এমন সকল কুলীন সন্তানেরা বহুপত্নী গ্রহণ করিত যাহাদের মাথা রাখিবার পর্য্যন্ত স্থান ছিল না। কৌলীন্য প্রথার প্রাবল্য হেতু বিবাহ যখন ব্যবসায়ে পরিণত হইল তখন কোন কোন নিঃস্ব কুলীন ব্রাহ্মণ শতাধিক পত্নী গ্রহণ

করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানস্ত্রীগণকে স্বামী ভরণ পোষণ করিত কিন্তু হিন্দু রমণীদিগের ভাগ্যে তাহা হইত না। বিবাহিত জীবনের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্বভার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহু পত্নী গ্রহণে প্রবৃত্ত হইত। এই প্রকারে বহু বিবাহের দ্বার অবারিত থাকাতে সমাজে যে নানা প্রকার ব্যভিচারের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হতভাগিনী কুলীন রমণীদিগের মধ্যে অনেকে হয়ত জীবনে একবার ভিন্ন দুইবার স্বামীর মুখ দর্শন করিতে পায় নাই। কৌলীন্য প্রথার অত্যাচারে অনেক কুলীন কুমারী আজীবন অবিবাহিতা রহিয়া যাইতেন। যাহাদের জীবন ভারবহ, যাহাদের ভবিষ্যৎ আশার ক্ষীণালোকেও উদ্দীপ্ত নহে তাহাদের দ্বারা জন সমাজে অশেষবিধ অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই কুলীন কুমারীদের মধ্যে অনেকে বিপথগামিনী হইয়া সমাজে পাপের স্রোত প্রবাহিত করিত। বহুকৃতদার এক ব্যক্তির মৃত্যুতে বহুনারীর এক সময়ে বৈধব্যদশা উপস্থিত হইত। পাঁচবৎসরের বালিকা হইতে অশীতিপরা বৃদ্ধা পর্য্যন্ত বহু সঙ্খ্যক নারী এক সময়ে এই প্রকার দুর্দশা গ্রস্ত হইয়া জীবনে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিত। ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে দেশাচার এমন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল যে এই কুসংস্কাররূপ ভয়ঙ্কর রাক্ষসের নিকট আপনার কন্যা ও ভগিনীদিগকে অক্লেশে বলিদান দিত। এই কুপ্রথা বঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজকে জগতের সভ্য সমাজের নিকট অতি হীন করিয়া রাখিয়াছে। যদিও জ্ঞানের ও আত্মমর্য্যাদার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আজ কাল শিক্ষিত হিন্দু সমাজ হইতে বহুবিবাহ এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে তথাপি ইহার প্রকোপ অনেক মুসলমান ও অশিক্ষিত হিন্দু পরিবারে দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মধ্যে যে সকল দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল তন্মধ্যে বাল্যবিবাহ একটী প্রধান। বাল্যবিবাহ যেমন এক দিকে বালবিধবার সঙ্খ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকে তেমনি নানাবিধ পারিবারিক দুর্দশাও উৎপন্ন করিয়া থাকে। বাল্যবিবাহের আতিশয্য এবং বিধবা

বিবাহের অপ্রচলন-হেতু সমাজে যে সকল অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতেছে ঐ সময়ে তাহাদের অনিষ্টকারিতা অধিকতর রূপে বিদ্যমান ছিল।

সমাজের এই প্রকার দুর্দ্দশার মধ্যেও প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার একটী শক্তি অন্তর্বাহিনী ফল্গুনদীর ন্যায় হিন্দু সমাজে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। দুর্দিনে এই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির পরিচয় কেহ পায় নাই কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে যতই এই পুঞ্জীকৃত ভস্মরাশি উড়িয়া যাইতেছে ততই আমরা তাহার অনুসন্ধান পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে যে আমরা বাঙ্গালীর সর্ব্বতোমুখী একটা প্রতিভার পরিচয় পাইতেছি এবং তাহার সঙ্গে যে প্রাচীন সভ্যতার একটা গভীর যোগ রহিয়াছে এ কথা বোধ হয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালির সৌভাগ্য এই যে দুর্দশার দিনেও পূর্ব্বপুরুষগণের অর্জ্জিত-পুণ্যফলের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। যে সকল মহাত্মা এবং কৃতী পুরুষ প্রাচীন ও নবীনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উভয়ের মধ্যে যোগ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার জন্মকালকে ভারতীয় নবযুগের ঊষাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তখন কলিকাতা সহরে ঘোর পরিবর্ত্তনের যুগ। সমগ্র বঙ্গদেশ যে বর্ত্তমান সময়ে উন্নত চিন্তা, জাতীয় শক্তির বিকাশ, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে অগ্রসর বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহার সূত্রপাত এই সময়ে হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা তখন তমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশকে নবালোকে আলোকিত করিতে আরম্ভ করিতেছে। তিনি একদিকে যেমন সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া মানব মনকে শাস্ত্রের দাসত্ব হইতে উন্মুক্ত করিতেছিলেন অপরদিকে তেমনি সামাজিক কুসংস্কার দূর করিয়া হিন্দু সমাজকে পবিত্র ও উন্নত করিবার জন্য সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বন্ধু David Hareকে সঙ্গী করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার বহ্নি সংযোগে বঙ্গের নিবিড় অন্ধকারময় অরণ্যরাশি ভস্মীভূত

করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ উন্নতির সপক্ষে তিনি যে গভীর দুন্দুভি বাদন করিয়া গিয়াছেন তাহার ধ্বনি কৈশোরে ব্রজসুন্দরের কর্ণে নিশ্চয়ই প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

জন্ম ও বাল্যকাল।

ব্রজসুন্দরের প্রপিতামহ দেবীপ্রসাদের মৃত্যুর পর একমাত্র সুলতানপ্রতাপ পরগণা এবং অন্যান্য স্থানের সামান্য অংশ ব্যতীত প্রায় সমুদায় পৈত্রিক বিপুল ভূসম্পত্তিই ইহাঁদিগের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। দেবীপ্রসাদের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি দীর্ঘাকৃতি, দীর্ঘশিখ, বুদ্ধিমান ও মিতভাষী ছিলেন। উলাইলের মিত্রগণের ন্যায় তিনি বিলাসী বা সুরাসক্ত ছিলেন না। গৃহে থাকিয়া তিনি স্বল্পায়তন জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। একমাত্র তিনিই লেখা-পড়া জানিতেন বলিয়া সদর কাছারী-বাড়ী ধামরাই হইতে চিঠি-পত্রাদি আসিলে তিনিই সকল সরিকের পক্ষ হইয়া তাহার উত্তর প্রত্যুত্তরাদি প্রদান করিতেন। তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে এমনই একটী গাম্ভীর্য্য ছিল যে জ্ঞাতিগণ এবং প্রজাগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষে দেখিতেন। তিনি লোকের বিপদে বন্ধু ও মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। মিত্রগণের তখনও যে ভূসম্পত্তি ছিল তাহাতে সকলেই স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে পারিতেন।

কিন্তু পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত গোপীজন-বল্লভ ও দ্বাদশটী শালগ্রাম শিলা, সূর্য্যকান্ত মণি (প্রকাণ্ড হীরক) প্রভৃতি গৃহদেবতাগণের নিত্য এবং বৎসরে ২৪টি যাত্রা-পর্ব্বাহ ক্রিয়া এবং শারদীয়, জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক, কালী প্রভৃতি দেবদেবীগণের পূজা পূর্ব্ববৎ সমারোহ সহকারে চলিতে থাকায়, দেবসেবার বৃহৎ ব্যাপারে ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব প্রায় সমস্তই ব্যয় হইয়া যাইত, বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রায় কিছুই উদ্বৃত্ত থাকিত না।

এরূপ শ্রুত হওয়া যায় পিতা দেবীপ্রসাদের আমলের মোহর দিয়া গোবিন্দপ্রসাদ কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন। গোবিন্দপ্রসাদ

পুত্র ভবানীপ্রসাদকে তৎকালীন নিয়মানুসারে পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত করিয়াছিলেন। ভবানীপ্রসাদ প্রথমে বাকরগঞ্জে, পরে দিনাজপুরে জজ-আদালতে সেরেস্তাদারের কর্ম্ম করিতেন। সেইজন্য তিনি দেশে বড় থাকিতে পাইতেন না। বর্ত্তমান মাণিকগঞ্জ সবডিভিসনের অধীন বুতুনী সীমুলিয়া গ্রামের সুজাবাদ পরগণার জমিদার প্রেমনারায়ণ গুহ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কাশীশ্বরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সীমুলিয়ার রায় বাবুগণ সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। তাঁহাদিগের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারা যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের বংশসম্ভূত ছিলেন।

এই কাশীশ্বরী দেবীর গর্ভে ব্রজসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। ১২২৭ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় বৃহস্পতিবারে (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) তিনি মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েন।

তাঁহার সূতিকা গৃহের একটী অতি সুন্দর গল্প এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে কাশীশ্বরী আসন্ন প্রসবাবস্থায় পিত্রালয়ে গমন করেন, তখন তাঁহার এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নীও তদবস্থায় পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। তিনি আদাজানের দুর্গাকান্ত ঘোষের পত্নী। ঘটনাক্রমে দুই ভগ্নী একই সময়ে এক গৃহে প্রসূত হইলেন। জ্যেষ্ঠার পূর্ব্বে এক কন্যা হইয়াছিল পুনরায় তাঁহার কন্যাই হইল, কাশীশ্বরীর পুত্রের উপর পুত্রই জন্মিল। জ্যেষ্ঠা উপর্য্যুপরি দুই কন্যা দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইলেন। তাঁহাদের জননী জ্যেষ্ঠার দুঃখ দেখিয়া কাতর হইয়া কাশীশ্বরীকে বলিলেন "মা তোমাদের কাহার কি সন্তান হইয়াছে এখন পর্য্যন্ত বাহিরের কেহই জানে না। তোমার দিদির পর পর দুই কন্যা হইল তোমার দুই পুত্র হইল, তোমরা যদি এই সময়ে সন্তান বদল কর তাহা হইলে তোমাদের দুজনেরই একটী ছেলে একটী মেয়ে হইবে। দিদির বড় দুঃখ হইয়াছে, দিদির দুঃখ দূর হইবে।" সন্তান বদল কি সহজ ব্যাপার! দিদির দুঃখ, মার অনুরোধ, নিজ হৃদয়ের আকুলতা তাঁহাকে ক্ষণেক নির্ব্বাক্ করিল। তাহার পর

মৃদুকণ্ঠে জননীকে বলিলেন "মা তুমি তো জান আমি কোন্ ঘরের বৌ; আমি কেমন বাঘের মত শ্বশুরের ঘর করি। এ কথা কখনও চিরদিন গোপন থাকিবে না; যদি তাঁহারা এ কথা ঘূণাক্ষরে জানিতে পারেন তবে আর আমার শ্বশুরগৃহে স্থান হইবে না।" জননী বুঝিলেন বাস্তবিক কাশীশ্বরীর কথাই ঠিক। বলিলেন "থাক, কাজ নাই, ভগবান যাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহাই ভালো, তিনি দয়া করিলে উহার কত পুত্র হইবে।" ব্রজসুন্দর মায়ের ক্রোড় হইতে মাসীর ক্রোড়ে যাইতে যাইতে রহিয়া গেলেন। কালক্রমে কাশীশ্বরীর আর এক পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ তারাপ্রসাদ, মধ্যম ব্রজসুন্দর, কনিষ্ঠ দুর্গাদাস। পুত্রত্রয় অতি প্রিয়দর্শন ছিলেন, পিতামহ গোবিন্দপ্রসাদ জ্ঞাতিগণের ঈর্ষার ভয়ে কখনও তিন পৌত্রকে একত্র লইয়া কোথাও নিমন্ত্রণে গমন করিতেন না। জ্যেষ্ঠ তারাপ্রসাদের অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়। প্রথম সন্তান শোক জননীর প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হয়। বালক ব্রজসুন্দরের কোমল হৃদয়েও অল্প আঘাত লাগে নাই। তিনি প্রবীন বয়সেও তাঁহার দাদা সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া ব্যথিত হইতেন। তাহা এই ঃ—

একদিন জননী তিন পুত্রকে একত্রে বসাইয়া আহার করাইতেছিলেন। আহার সমাপ্ত প্রায়, তখন হঠাৎ কি মনে করিয়া ব্রজসুন্দর তারাপ্রসাদের হস্ত হইতে কৈ মাছ কাড়িয়া আপনার মুখে দিলেন, জননী তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। অল্পদিন পরেই তারাপ্রসাদের মৃত্যু হইলে ব্রজসুন্দর এই বিষয় মনে করিয়া বিস্তর অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কৈ মাছ দেখিলেই তাঁহার এই কথা স্মরণ হইত। বাল্যের দুঃখময় স্মৃতি তাঁহার হৃদয়কে চিরদিন ব্যথিত করিত। বাল্যকালে কত বালকই তো এ প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু বাল্যের সামান্য একটী অন্যায়ের জন্য এমন অনুশোচনা করিতে সচরাচর দেখা যায় না।

তাঁহার বাল্যকালের সহৃদয়তা সম্বন্ধে আর একটী সুন্দর গল্প আছে। যখন ব্রজসুন্দরের বয়স ৫ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তখন একদিন শিকদার-

জেঠি* সূতা কাটিতেছেন। তখন অনেক গৃহস্থই তন্তুবায়কে নিজ নিজ বস্ত্রের সূতা প্রদান করিত। ব্রজসুন্দর তাহার গলা ধরিয়া, পিঠের উপরে ঝুঁকিয়া, জেঠিকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতেছিলেন, এবং নানা উৎপাত করিতেছিলেন। শিকদারজেঠি বিরক্ত হইয়া বলিল, "ছাড় বাবা, কোটা বাড়ী তো সব জলে গেল, কবে বা তোমরা পাকা বাড়ী করিবে একটু চূণ মিলিবে, যে ছাই চূণ তাতে আর হাত নাড়িয়া দিও না সব সূতা ছিঁড়িয়া যাইতেছে।" অর্থাৎ আঙ্গুলে চূণের গুঁড়ো মাখাইয়া তবে সূতা কাটিতে হইত। জেঠির কথার উত্তরে ব্রজসুন্দর বলিয়া উঠিলেন "জেঠি, আমার মামাবাড়ী ঢের চূণ আছে, যখন মামাবাড়ী যাইব তখন তোমার জন্য চূণ আনিব।" কিছুদিন পরে কাশীশ্বরী তিন পুত্র লইয়া পিত্রালয়ে গেলেন। সেখানে কয়েক মাস বাস করার পর যখন পুনরায় নিজ বাটীতে আসার জন্য নৌকা আনিত হইল, সমস্ত জিনিষপত্র নৌকায় তোলা হইতেছে এমন সময় ব্রজসুন্দর বড় বড় মানকচুর পাতা কাটিয়া চূণের ঘর হইতে কিছু চূণ লইয়া বড় একটী পোঁটলা করিলেন ও নিজে মাথায় করিয়া লইলেন। বাড়ী হইতে নদীর ঘাট তিন মাইল দূর। অতটুকু ছেলের সাহস দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। জিনিষ বহন করিবার মাঝিরা হাসিয়া বলিল "বাবু তুমি পারিবে না আমাদের কাছে দেও।" বাটীর আত্মীয়েরাও মাঝিদের নিকটেই চূণ দিতে বলায় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চূণ নিজে আর বহিয়া নিলেন না। কিন্তু যখন ২।৩ দিন পরে নৌকা নিজেদের ঘাটে পৌছিল তখন চূণের

* নফরের স্ত্রী। ইহারাই মনিবের সন্তান লালনপালন করিত ইহাদিগের সকলেরই স্বতন্ত্র বাড়ী ছিল। মনিবের নিকট হইতে ইহারা বাড়ী, ধানিজমী ও ছনজমী প্রাপ্ত হইত। বিবাহাদি ক্রিয়ার ব্যয়ও মনিবকেই দিতে হইত। ইহাদিগের পরিবারের কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগকে মনিবগৃহের পরিচর্য্যা করিতে হইত এবং আপদে বিপদে মনিবকে সাহায্য করিতে হইত। প্রজাগণ অপেক্ষাও ইহাদিগের উপরই মনিবের বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

পোঁটলা মাথায় করিয়া জেঠির বাটীতে গেলেন। জেঠি ব্রজসুন্দরকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন ও মাথায়, গায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, তোমার সোণার দোয়াত কলম হউক।" এই চূণ ডেলা করিয়া সেই শিকদার জেঠি এবং পরে তাহার কন্যা আমরণকাল সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল। ইহা সকলকে দেখাইত আর বলিত, "আমার ধন আমার জন্য নিজে মাথায় করিয়া এই চূণ আনিয়াছিল।"

ব্রজসুন্দরের ভ্রাতৃত্রয়ের যথাসময়ে কোষ্ঠিপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল; আচার্য্য জ্যোতিষী একমাত্র তাঁহার কোষ্ঠিপত্রিকাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্বের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কোষ্ঠিকার ব্রজসুন্দরের ভবিষ্যৎ জীবন যতই কেন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করুন না, তাঁহার জন্ম হইতেই তাঁহাদের পরিবার ঘোর দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইল এবং উপর্য্যুপরি নানা বিপদপাতে তাঁহারা একেবারে অকূল সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনী সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না। আমরা একাদিক্রমে তাহার উল্লেখ করিব।

প্রথমঃ—ব্রজসুন্দর যে বৎসর জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই বৎসরই ধলেশ্বরীনদীর গাজিখালি নামক শাখানদী, সাভার নামক স্থানাভিমুখে নির্গত হইয়া, উলাইল গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বংশনদীর সহিত মিলিত হইয়া যায়। ইহাতে বংশনদীর স্রোত এমন প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিল যে এত দিনের উলাইল আর তিষ্ঠিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে কত দেবমন্দির ও সৌধমালাশোভিত উলাইল গ্রাম নদী গর্ভে বিলীন হইতে লাগিল; উলাইলের ভাগ্যে যে এমন দুর্ঘটনা ঘটিবে ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। সকলে বলিতে লাগিল, মিত্রদিগের অত্যাচারে এবং ব্রাহ্মণদিগের অভিসম্পাতে উলাইল রসাতলে গেল। মিত্র বংশীয়েরা যতদূর পারিলেন ঢাকা এবং নিকটবর্ত্তী লোকদিগের নিকট আপনাদিগের ইষ্টক ও কাষ্ঠ বিক্রয় করিলেন। কিছু কিছু সরঞ্জাম

বহিয়া আনিয়া বংশনদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কর্ণপাড়া * গ্রামে বসতি স্থাপন করিলেন। লেখা বাহুল্য যে বিশেষ কিছুই বহন করিয়া আনিতে পারেন নাই, প্রায় সমুদায়ই নদীগর্ভে গেল।

উলাইলের অনুরূপ স্থান বিভাগ ও রাস্তা, ঘাট, দোকান, বাজার, হাট নির্ম্মাণ করিয়া কর্ণপাড়ায়ও বসতি নির্ম্মিত হইল। ব্রাহ্মণ, শিকদার, নফর, ভূঁইমালী, চণ্ডাল প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ যথাযথ স্থান পাইল। উলাইলের বেশ্যা পল্লী পর্য্যন্ত কর্ণ পাড়ায় স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু পূর্ব্বের সে সমৃদ্ধি আর হইল না। পূর্ব্বে ছিল ইষ্টকালয়, এখন হইল চৌরী বা আটচালা।

দ্বিতীয়ঃ—ব্রজসুন্দরের বাল্যকালের দ্বিতীয় দুর্ঘটনা পিতৃ-পিতামহ বিয়োগ। কর্ণপাড়ায় স্থানান্তরিত হইবার পরেই পিতামহ গোবিন্দ-প্রসাদ পরলোক গমন করেন; পিতামহের মৃত্যুর অতি অল্পদিন পরেই পিতা ভবানীপ্রসাদ দূর প্রবাসে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তখন ব্রজসুন্দরের বয়স ৭ বৎসরের অধিক হইবে না। কাশীশ্বরীর এইখানেই দুঃখের পরিসমাপ্তি হইল না, তিনি অচিরে জ্যেষ্ঠপুত্র তারাপ্রসাদকে হারাইলেন। বৎসর পূর্ণ না হইতেই পতিপুত্র শ্বশুর সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয়ঃ—তারাপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রচণ্ড অগ্নিদাহে কর্ণপাড়ার নব নির্ম্মিত আবাস সকল ভস্মসাৎ হইয়া গেল। গৃহহীনা

* কর্ণপাড়া গ্রাম তাঁহাদিগের জমিদারীরই অন্তর্গত ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং কর্ণ খাঁর কীর্ত্তিকাহিনী ও কীর্ত্তিচিহ্নে কর্ণপাড়া পরিপূর্ণ। কেহ কেহ বলেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী রাণী কর্ণবতীর নামানুসারে তাঁহার এই বিলাসভবনের নাম কর্ণপাড়া হইয়াছে; কেহ বা বলেন কর্ণ খাঁর নামানুসারেই কর্ণপাড়া হইয়াছে। এখানে একটী উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ দেখা যায়, কেহ কেহ অনুমান করেন তাহা একটী বিশাল বৌদ্ধ স্তূপ। এই স্থানের অনতিদূরে জিয়স পুকুর নামে একটী পুরাতন জলাশয় আছে। এতদঞ্চলবাসিনী রমণীগণ সন্তান কামনায় এই জলাশয়ে পূজা দিয়া থাকেন।

পতিপুত্রবিয়োগবিধুরা কাশীশ্বরীর নিকট সমুদায় জগৎ এককালে অন্ধকার হইয়া গেল। পিতা প্রেমনারায়ণ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুপ্রসাদও সময় বুঝিয়া পরলোক গমন করিলেন। শ্বশুরালয় শ্মশান হইলে কাশীশ্বরী যে পিত্রালয়ে গিয়া একটু শান্তি পাইবেন দৈব তাহাতেও প্রতিকূল হইলেন। পিত্রালয়ে দারুণ শোকানল প্রজ্বলিত হইল। কাশীশ্বরীর পুত্রদিগের যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল তাহা জ্ঞাতিগণের হস্তেই রহিল। তাহা নিতান্ত কম ছিল না। তাঁহার পুত্রগণ সুলতান প্রতাপ পরগণার চারি আনি হিস্যার অধিকারী ছিলেন। তখন কেহই পারগ পক্ষে বিধবাকে তাহার ন্যায্য অধিকার দিতে সম্মত হইত না। একটী অল্পবয়স্কা সুন্দরী বিধবার পক্ষে সে সময়ে এরূপ বিপদ পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া উঠা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তিনি অসাধারণ চরিত্র বলে এ বিপদে মুহ্যমাণ না হইয়া সুদৃঢ়চিত্তে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছিলেন। এই তেজস্বিনী গরিয়সী রমণীর বিষয় পরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এই অগ্নিকাণ্ডের পর শ্বশুরালয়ে বাস করা কাশীশ্বরীর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যনারায়ণ তাঁহাকে সিমুলিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে মাতুল গৃহে ব্রজসুন্দর ও দুর্গাদাস বেশ আদর যত্নেই রহিলেন। কাশীশ্বরী পিত্রালয়ে গমনের কিছুকাল পরেই বানিয়াজুড়ার জয়নাথ ঘোষের পত্নী, কাশীশ্বরীর অন্যতমা ভগ্নী তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। এত দিন পরে পতিপুত্রহীনা কনিষ্ঠা ভগ্নিকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইল। বিশেষতঃ বালক দুটীর জন্য তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি কাশীশ্বরী ও তাঁহার পুত্রদ্বয়কে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য ভ্রাতাকে অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কিন্তু ভগ্নী যখন বালকদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ ও সুবিধার বিষয় বারম্বার বলিতে লাগিলেন তখন অগত্যা সম্মত হইলেন। ভ্রাতা সূর্য্যনারায়ণ ভাবিলেন ভাগিনেয় উচ্চকুল জাত হইয়াও মাতুলালয়ে

প্রতিপালিত হইলে কোনও দোষ ঘটে না কিন্তু কুটুম্ব গৃহে প্রতিপালিত হইলে চিরদিনের জন্য একটা কলঙ্ক রহিয়া যাইবে। এই সব ভাবিয়াও ভগ্নীর আকুল হৃদয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয় উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে, কাশীশ্বরীর শ্বশুর ও স্বামী বর্ত্তমানে এই জয়নাথ ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র দীননাথ ঘোষের বিবাহের সময় জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠা কাশীশ্বরীকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন গোবিন্দপ্রসাদ সগৌরবে বলিয়াছিলেন "আমাদের ঘরের বধূরা কখনও কুটুম্ব গৃহে যায় না।" তখন ধন অপেক্ষা বংশ এবং কুলের এতই অহঙ্কার ছিল। যাহাহউক ঘটনাচক্রে গোবিন্দপ্রসাদের সেই রাজবংশীয় বধূ এবং পৌত্রগণ সেই প্রত্যাখ্যিত কুটুম্ব গৃহেই প্রতিপালিত হইতে চলিলেন। উপরোক্ত ঘটনা স্মরণ করিয়াও সূর্য্যনারায়ণ ভগ্নী ও ভাগিনেয়দিগকে বিদায় দিতে কাতর হইলেন এবং অনেক চক্ষের জল ফেলিয়া ইঁহাদিগকে ভগ্নীর হস্তে দিলেন।

মাসীর বাড়ী।

এইরূপে জয়নাথ ঘোষের পত্নী পরম যত্নে ভগ্নী ও ভগ্নিপুত্রদিগকে আপনার গৃহে আনিয়া রাখিলেন। এই ঘোষ পরিবারের তখন বিশেষ সমৃদ্ধির অবস্থা। জয়নাথ ঘোষ তখন কুচবিহারের রাজার দেওয়ান ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দীননাথ ঘোষ তখন ঢাকা কমিশনারের সেরেস্তাদার ছিলেন। পিতা জয়নাথ ও পুত্র দীননাথ অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তখনকার দিনে উৎকোচ গ্রহণ কিছু মাত্র নিন্দনীয় ছিল না, তথাপি দীননাথ অতি ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইতেন। মোকর্দ্দমার পূর্ব্বে উভয় পক্ষই উৎকোচের টাকা দাখিল করিত, দীননাথ যে পক্ষ জয়লাভ করিত তাহাদের টাকা রাখিয়া বিজিত পক্ষের টাকা ফিরাইয়া দিতেন, ইহাতেই ইহার ন্যায়পরতার এত প্রশংসা! তখন যে সময় ছিল তাহাতে ইহা প্রশংসনীয় ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দীননাথ

সহস্র সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন। এই ঘোষ পরিবারের আয় যেরূপ অপর্য্যাপ্ত ছিল দান ধ্যানও তদনুরূপ ছিল। ইহারা মুক্তহস্তে আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে সাহায্য করিতেন। এমন গৃহে ব্রজসুন্দর এবং দুর্গাদাস যে সমাদরলাভ করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? শৈশবে মাসীমার আদর যত্নের স্মৃতি ব্রজসুন্দরের হৃদয়ে চিরদিন মুদ্রিতছিল। মহৎ প্রকৃতির অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে কৃতজ্ঞতা একটী প্রধান লক্ষণ। ব্রজসুন্দরের হৃদয়ে এই গুণটী বিশেষভাবে উজ্বল ছিল। জীবনের উন্নততম অবস্থায়ও এই স্নেহময়ী মাসীমার গুণের কথা বলিতে বলিতে গদ্‌গদ্ হইতেন। * বাস্তবিক

* ব্রজসুন্দরের মাসীমার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটী উল্লেখ করা গেল। জীবনের শেষ দশায় তাঁহার এই মাসীমা কাশী বাসিনী হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তথায় দেখিতে যাইতেন। তাঁহাকে দেখিবার উপলক্ষ্য করিয়া কাশী গিয়া তাহারা যত কিছু দ্রষ্টব্য স্থান আছে তাহা দেখিয়া আসিতেন, জয়নাথ ঘোষের স্ত্রীর কাছে তাঁহারা অতি অল্প সময়ই থাকিতেন। একবার ব্রজসুন্দরও কুমিল্লা হইতে অল্পদিনের ছুটী লইয়া মাসীমাকে দেখিবার জন্য কাশীতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি সর্ব্বদাই মাসীমার নিকট থাকিতেন। মাসীর ঘরে বসিয়াই নিজের কাযকর্ম্ম করিতেন, কখনও কখনও বা দেশের নানা গল্প করিতেন। মাসী সর্ব্বদাই বলিতেন "যাও বাবা বিরজু একটু বেড়াইয়া এসো, ঘরে কেন বসিয়া থাক; বিশ্বেশ্বরের মন্দির, মণি-কর্ণিকার ঘাট প্রভৃতি কত কি আছে দেখিয়া এসো।" তখন ব্রজসুন্দর হাসিয়া উত্তর দিতেন "মাসিমা, আমিতো বিশ্বেশ্বরের মন্দির কি মণিকর্ণিকার ঘাট দেখিতে আসি নাই, আমি যে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি, যতক্ষণ পারি আপনার নিকটেই থাকিব এর পরে যখন বেশীদিনের ছুটী লইয়া আসিব তখন ওসব দেখিব।" মাসীর সুমিষ্ট সহবাস ত্যাগ করিয়া কাশীতে বেড়াইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। মাসীমা নিজ পুত্রগণ হইতেও এরূপ ব্যবহার পাইতেন না। তাঁহার কথায় অন্তরে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিতেন "বিরজু যেমন আমাকে লইয়াই থাকিতে ভালবাসে এমন আর কাহাকেও দেখি না।" আর সকলে

এমন মাসীমা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে মিলে। আমরা বাল্যকালে একটী কথা মুখে মুখে শুনিতাম "মা মরুক মাসী জিয়ুক।" কে মাকে মরিতে ছুটী দিয়াছিল জানিনা। তার মাসী কি ব্রজসুন্দরের মাসীর মত ছিল! বোধ হয় এমন মাসী পাইলেই লোকে মার অভাব বিস্মৃত হয়! ব্রজসুন্দরের মাসীমার যে পুত্রের অভাব ছিল তাহা নয় তাঁহার গুণবান পুত্র থাকা সত্ত্বেও ভগ্নীপুত্রগণকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। বাস্তবিক এই গুণবতী রমণী রূপে গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। ব্রজসুন্দরের জননী বুদ্ধিমতী সহৃদয়া হইলেও বাহিরে অত্যন্ত উগ্র ও কর্কশ প্রকৃতির ছিলেন। আত্মমর্য্যদাপ্রিয় গর্ব্বিত প্রকৃতি দুঃখ দারিদ্রের পেষণে মধুর না হইয়া কঠোরভাব ধারণ করে। কাশীশ্বরী ভগিনীর ন্যায় সুখ সৌভাগ্যবতী হইলে হয়তো তাঁহার এই কঠোরতা মাধুর্য্যের রূপ ধারণ করিত। ব্রজসুন্দরের মাসীমা যেভাবে তাঁহার ভগ্নীপুত্রদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহাতে যে কেবল তাঁহার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি এবং সদ্বিবেচনারও পরিচয় পাওয়া যায়। ভগ্নী ও ভগ্নিপুত্রগণ একাদিক্রমে তাঁহার বাড়ীতে থাকিলে পাছে তাঁহাকে শ্বশুর কুলের নিকট হতমান হইতে হয়, এই ভয়ে এবং ভগ্নিপুত্রগণ পিতৃকুলের সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া পাছে তাহারা নিজ উচ্চকুল, পৈত্রিক-বিষয় ও জ্ঞাতিগণ সম্বন্ধে উদাসীন হয়, এই ভয়ে কর্ণপাড়ায় পরিত্যক্ত দগ্ধ ভিটায় এক বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। নৌকা বোঝাই করিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দিয়া বৎসরের কয়েক মাস ভগ্নী ও ভগ্নি-পুত্রদিগকে কর্ণপাড়ায় পাঠাইয়া দিতেন মাসীমার এই সুন্দর ব্যবস্থার গুণে ব্রজসুন্দরের পৈত্রিক বাটী এবং মাতুলালয়ের সহিত সম্বন্ধ চিরদিন সুদৃঢ় ছিল। কাশীশ্বরী যখন ভগ্নীর বাড়ী থাকিতেন তখন

তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া "রথ দেখা কলা বেচা" দুই কর্ম্মই সমধা করিত। নিরবচ্ছিন্ন প্রেমভক্তি তাঁহাদিগকে তো কাশীতে টানিয়া আনে নাই; ব্রজসুন্দর মাসীমার শ্রীচরণ দর্শন করিতেই আসিয়াছিলেন তিনি তাহাই দেখাইয়াছিলেন।

তাঁহার দিদি কিছুদিনের জন্য তাঁহার হস্তে সংসারের সমুদায় ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। এই ভারটী অতি গুরুভারই ছিল। এখন আমরা গৃহস্থের পরিবার পরিজন বলিতে যাহা বুঝি তখনকার দিনে আর সেরূপ ছিল না। এখন স্ত্রী পুত্র লইয়াই আমাদের পরিবার; তখনকার ধনী গৃহস্থের পরিবারে তাঁহার সন্তান সন্ততি, আত্মীয় কুটুম্ব, অতিথি, আশ্রিত দাস দাসী, এমন কি কুটুম্বের কুটুম্ব আশ্রিতের আশ্রিত, অতিথির অতিথি লইয়া গৃহস্থের পরিবার গোষ্ঠি রচিত হইত। তখনকার দিনে পুর-নারীগণ অনেক কার্য্য স্বহস্তে করিলেও ঘোষদিগের বাটীতে দাসীই ৩২ জন ছিল। সেই অনুরূপ কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গ ছিল। এই বৃহৎ পরিবার এবং বিচিত্র প্রকৃতির লোক লইয়া সুশৃঙ্খল রূপে গৃহিণী-পণা করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু কাশীশ্বরী অতি যোগ্যতার সহিত এই গুরুভার বহন করিতেন। ভগ্নীর বাটীতে সকলেই তাঁহাকে মান্য এবং ভয় করিত।

বিদ্যারম্ভ।

পারিবারিক নানা দুর্ঘটনায় যথা সময়ে ব্রজসুন্দরের বিদ্যারম্ভ হয় নাই। তাঁহার পিতৃমাতৃ কুলের কোন বালকই পাঠশালায় যাইত না। তখনকার দিনে উচ্চবংশের কোন বালকই গ্রাম্য পাঠশালায় গমন করিত না। বানিয়াজুড়ীতেও সেই নিয়ম ছিল। সকলেই বাড়ীর দেওয়ানের নিকট বিদ্যারম্ভ করিত। ব্রজসুন্দর ৮৷৯ বৎসর বয়সে বাটীর দেওয়ান গৌরকিশোরের নিকট বিদ্যারম্ভ করিলেন। বিদ্যারম্ভ হওয়া অবধি বালক ব্রজসুন্দর আশ্চর্য্য অভিনিবেশ সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। পাঠে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে দীননাথ ঘোষ উভয় ভ্রাতাকে ঢাকার বাসায় লইয়া গেলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের এই প্রথম জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া যাইতে দুর্গাদাস অত্যন্ত কাতর হন, কিন্তু ব্রজসুন্দর তত কাতর হন নাই। বিদ্যাশিক্ষা করিতে বিদেশে যাইতেছি এই উৎসাহে বালক অধীর। অতি বাল্যকাল

হইতেই বালক ব্রজসুন্দরের অনুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। যাহা দেখিতেন তাহাই শিখিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। ছুতার মিস্ত্রির ও ঘরামীর কাজ আগ্রহের সহিত দেখিতেন ও শিখিতেন। তাঁহার পিতামহ জীবিত থাকিতে—তখন বয়স ৫ বৎসরের অধিক হইবে না—মিস্ত্রিরা কাজ করিতে করিতে কার্য্যান্তরে গিয়াছিল, সেই সময় অস্ত্র লইয়া তাহাদের মত কাজ করিতে গিয়া বালক পায়ে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, বহু রক্তপাত হইলেও তাঁহার চক্ষে জল না দেখিয়া কিম্বা মুখে কোনও আর্ত্তনাদ না শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎজীবনে তিনি যে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? ব্রজসুন্দরের মিস্ত্রির কার্য্য দেখা সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। শিশুকালে তিনি যখন মাসীর বাড়ী ছিলেন তখন বানিয়া-জুড়ীর বাটীর কোনও প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইতেছিল; রাজমিস্ত্রিরা যে সকল কাজ করিত বালক ব্রজসুন্দর দাঁড়াইয়া একান্ত মনে তাহা দেখিতেন এবং তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন করিতেন। মিস্ত্রিরা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিত এবং যথেষ্ট স্নেহও করিত। একদিন এইরূপে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের গৃহ নির্ম্মাণ দেখিতেছিলেন; এমন সময়ে প্রধান মিস্ত্রি বলিল "বাবু আপনি কি দেখিতেছেন আপনার যখন কোটাবাড়ী হইবে তখন আমি খুব সুন্দর করে আপনার বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিব; কেমন এই কথা রহিল তো"। বালক মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। আশ্চর্য্য যোগাযোগে এমন ঘটিল যে সেই মিস্ত্রি আমরণ ব্রজসুন্দরের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ব্রজসুন্দর বাবুর কন্যা গল্প করিয়াছেন যে তাঁহারা বানিয়াজুড়ীর সেই আরজু মিস্ত্রিকে আশৈশব দেখিয়া আসিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ মিস্ত্রির ভবিষ্যৎবাণী অতি আশ্চর্য্যরূপে সফল হইয়াছিল।

ঢাকার নলগোলায় দীননাথ ঘোষের বাসা বাড়ী ছিল। সে বাটী আত্মীয়স্বজন ও বিদ্যাশিক্ষার্থী বালকে পূর্ণ থাকিত। নানা কার্য্যোপলক্ষে সহরে যাঁহাদের থাকিবার প্রয়োজন হইত, তাঁহারা

সকলেই দীননাথের বাসায় থাকিতেন। দীননাথ সকলকে প্রতিপালন করিতেন বটে, কিন্তু বাসার জন্য কোনও পাচক নিযুক্ত ছিল না; সকলকেই পালা করিয়া দীননাথের বাসায় রন্ধন করিতে হইত। নলগোলার বাটীতে এক বেলগাছ বেষ্টন করিয়া দীননাথের পূজার গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি সেই বেলগাছ তলায় অতি নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন পূজা অর্চ্চনা করিতেন।

ব্রজসুন্দর এবং দুর্গাদাস অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় পালা করিয়া রন্ধন ও পূজার আয়োজন করিতেন। ব্রজসুন্দরের পড়াশুনায় এতদূর মনযোগ ছিল যে তিনি রন্ধন করিবার সময়ও একমনে পুস্তক লইয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। অধিকাংশ দিনই ভাত ডাল সব পুড়িয়া যাইত আর যাহা বা রন্ধন করিতেন, কেহ তাহা আহার করিতে পারিত না, সকলের নিকট তিরস্কৃত হইতেন। দুর্গাদাসের একে পড়ায় তত মন ছিল না, তাহাতে ভ্রাতার প্রতি তিরস্কার দেখিয়া অতি মনোযোগ দিয়া রন্ধন করিতেন, সকলে খাইয়া তৃপ্ত হইতেন এবং ব্রজসুন্দরের পালার দিনও দুর্গাদাসকে রন্ধন করিতে বলিতেন। ইহাতে ব্রজসুন্দর পাঠের আরও সুযোগ পাইলেন। কিন্তু উত্তর কালে জননী এই কারণে ব্রজসুন্দরকে অনেক তিরস্কার করিতেন "ছোট ভাইএর লেখাপড়া হইল না কেবল তোর জন্য, তাহাকে দিয়া কেবল রাঁধাইয়া মারিয়াছিস্।" কিন্তু বাস্তবিক ইহার কোন মূল্য ছিল না কারণ বাসাতে বহু লোক থাকিত, বহুদিন পরে এক এক জনের পালা পড়িত। বালকবৃন্দের পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য একজন মৌলবী নিযুক্ত ছিল। বহুদর্শী দীননাথ ঘোষ বাসাস্থ বালকবৃন্দের মধ্যে ব্রজসুন্দরের লেখাপড়ায় অভিনিবেশ দেখিয়া বলিতেন "আর কাহারও কিছু হইবার নয়, যদি কেহ মানুষ হয় সে আমাদের বিরজু"। এই জন্য তিনি যখন কাছারী যাইতেন ব্রজসুন্দরকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সেখানে তিনি ঘরে বসিয়া কার্য্য করিতেন ও তাঁহার চক্ষের সমক্ষে বারান্দায় মাদুরে বসিয়া বালক ব্রজ পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেন। তখন

কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে সেই কাছারিতেই তাঁহাকে একদিন হাকিমের বেশে বসিতে হইবে। বাল্যের সেই লীলাভূমিতে মনুষ্যত্ব, জ্ঞানে, গুণে বিভূষিত সেই ব্রজসুন্দর হাকিম হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইংরাজী শিক্ষা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে ঘোর অজ্ঞানতার, ঘোর অরাজকতার রাজ্য ছিল। মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরাজ রাজত্বের উষাকাল বঙ্গদেশের পক্ষে বড় শুভ সময় ছিল না। তখন দেশের সর্ব্ববিভাগে, সর্ব্ববিষয়ে অরাজকতা। একশত বৎসরের কথা দূরে থাকুক ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশের কি অবস্থা ছিল এবং এখনই বা কি অবস্থা! তখন জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, উচ্চ পরিবারের পুরুষগণের মধ্যেও বর্ণ জ্ঞান কাহার ছিল না। টোলে, চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণগণ অতি সামান্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন। বাঙ্গালাভাষায় ভাল একখানি পাঠ্যপুস্তকও ছিল না। লোকে ভাল করিয়া বাঙ্গালা লিখিতেও জানিত না। মুসলমানদিগের আমলে উচ্চ রাজকর্ম্মপ্রার্থী ভদ্রসন্তান পারসী ভাষা শিক্ষা করিত, তখন তাহারও অপ্রচলন হইয়া আসিতেছিল। ইংরাজগণ দেশের রাজা হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের শাসনভিত্তি সুদৃঢ় হয় নাই। এদেশীয়গণ ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পরে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লীগ্রামগুলি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানালোকবিহীন ছিল। এখন জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে কত ইংরাজী বিদ্যালয়। এখন ভদ্রলোকদিগের ভিতর নিরক্ষর ব্যক্তি নাই বলিলেই হয়, কত বঙ্গরমণী এখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী। এখন বাঙ্গালীর লেখনীমুখে, বাঙ্গালীর রসনায় এমন সুন্দর ইংরাজী উৎসরিত হয়, যাহা শ্রবণ করিয়া ইংরাজেও শত সাধুবাদ দিয়া থাকেন—অধিক আর কি, ইংরাজী ভাষা

এরূপভাবে বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে যে ভাই ভাইকে, পিতা পুত্রকে ইংরাজীতেই পত্র লেখেন। বাঙ্গালীর গৃহে প্রবেশ করিলে ইংরাজীভাষাই সেখানে প্রতিধ্বনিত হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রজসুন্দরের বাল্যকালে বঙ্গদেশের পক্ষে সেই একদিন আর আজ আর একদিন। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বক্ষে লইয়া জননী যদি নিদ্রিত হন এবং নিদ্রাভঙ্গে দেখেন তাঁহার পার্শ্বে সেই শিশু যৌবনে উপনীত হইয়া হাস্য করিতেছে, তাহাতে জননীর যে বিস্ময়ের না উদয় হয় এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার ততোধিক পরিবর্ত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা যখন সে সময়ের সামাজিক বিবরণ শ্রবণ করি তখন ভাবি—এদেশেও কি এমন ছিল!

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকাতে প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রিজ সাহেব তাহার প্রথম হেড মাষ্টার, প্যারীচরণ সরকার দ্বিতীয় শিক্ষক এবং গান সাহেব তাহার তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসেন। এই গান সাহেব বহুকাল জীবিত ছিলেন। ব্রজসুন্দরের মৃত্যুর পরেও বোধ হয় ১৭।১৮ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কলেজিয়েট স্কুলের ধার দিয়া পুরাতন ইডেন ফিমেল স্কুলের দিকে লক্ষ্মীবাজারের যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার একটী বাটীতে, কলেজিয়েট স্কুলের নিকটেই তিনি বাস করিতেন। তিনি যে জীবিত আছেন সংসারের লোকে তাহা জানিত না। তিনি ত্রিশ বৎসরের অধিক সেই বাটীতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সকলে জানিতে পারিল গান সাহেব এতদিন জীবিত ছিলেন। একটীমাত্র ভৃত্য পশ্চাদ্দিকের দ্বার দিয়া যাতায়াত করিয়া তাঁহার সেবা করিত।

যাহা হউক এই ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেই ব্রজসুন্দর ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন। মনের প্রবল বাসনা কিছুদিন মনের ভিতরই লুকাইয়া রাখিতে হইল। যখন ঢাকায় ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল তখন কিন্তু জনসাধারণের ইংরাজী শিক্ষার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ততা ছিল না বরং ইংরাজী শিক্ষার প্রতি

সকলের বিরাগ ও অবিশ্বাস ছিল ; ইংরাজী শিক্ষাকে সকলেই ভীতির চক্ষে দর্শন করিতেন। ইহা হইতে জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশ প্রভৃতি কত অনর্থের আশঙ্কা করিতেন। এই সব আশঙ্কায় কেহ ইংরাজী শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইত না। বরং ইংরাজী শিক্ষা এক নিন্দার কারণ বলিয়া জনসমাজে গণ্য হইত। বৃদ্ধগণ ইংরাজী শিক্ষার নামে শিহরিয়া উঠিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিতেন। এরূপ অবস্থায় ব্রজসুন্দরের মনে ইংরাজী শিখিবার বাসনা প্রবল হইলেও তিনি সাহস করিয়া একথা কাহাকেও বলিতে পারিলেন না। দীননাথ ঘোষকে তিনি বাঘের মত ভয় করিতেন। এমন ভয়ঙ্কর কথা তিনি কিছুতেই তাঁহাকে বলিতে সাহসী হইলেন না। মনে ভাবিলেন "ছুটীর সময় বানিয়াজুড়ী গিয়া মাকে আগে বুঝাইয়া বলিব এবং তাঁহার দ্বারা বড়দাদার মত করাইব।" কি উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবে এই চিন্তা হৃদয়ে অহর্নিশ জাগ্রত রহিল। যাহা হউক অভিলষিত দিন অবশেষে আসিল। দেশে গিয়া জননীর নিকট একান্তে বসিয়া মনের সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। মাতা শুনিয়া প্রথমতঃ চমকিয়া উঠিলেন "বলিস্ কি, সে কি কথা! ইংরাজী শিখিলে আর জাতিধর্ম্ম থাকিবে না, একথাও কি হয় তোর বড় দাদা শুনিয়া কি বলিবে, না বাবা ও সব পরামর্শ ছাড়িয়া দাও" পুত্র ছাড়িবার পাত্র নহেন। ব্রজসুন্দরতো আর সামান্য বালক ছিলেন না ; তিনি সহজে ভগ্ন মনোরথ হইবার পাত্রই নহেন। যে চিন্তা এতদিন জপমালার মত মনে জাগিতেছে, ভবিষ্যতের কত উজ্জ্বল চিত্রই যাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে ; আজ জননীর বাক্যে কি আর ব্রজসুন্দর নিরস্ত হইতে পারেন? ব্রজসুন্দর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তিনি জননীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন "মা ভয় কি ইংরাজী শিখিলে জাতই বা যাইবে কেন, ধর্ম্মই বা যাইবে কেন? বিদ্যাশিক্ষাতো আর খাওয়া বসা নয়— ইংরাজী শিখিলে কত জানিতে পারিব, কত বড় চাকুরী করিব, সাহেবদের সঙ্গে চেয়ারে বসিব, সকলে তোমাকে সাহেবের মা বলিবে, আমি চাকুরী করিলে তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে। তোমার কোন ভাবনা

নাই অমি খৃষ্টান হইব না, তুমি বড়দাদাকে বল"। স্নেহময়ী মাতা সন্তানের আকুল প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সময় এবং সুযোগ বুঝিয়া অতি সন্তর্পণে, অতি ভয়ে ব্রজসুন্দরের আন্তরিক বাসনার কথা দীননাথের নিকট প্রকাশ করিলেন।

তিনি যেরূপ ভয় করিয়াছিলেন দীননাথ কিন্তু সে ভাবে গ্রহণ করিলেন না; তিনি যেন বেশ খুসি হইয়াই বলিলেন "বিরজুর এত ইচ্ছা ইংরাজী শিখিতে, আচ্ছা এবার ঢাকায় গিয়া তাহাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিব"। বুদ্ধিমান দীননাথ বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজী শিক্ষার বড় প্রয়োজন, তিনি নিজে ইংরাজী জানিতেন না সেজন্য বোধ হয় অসুবিধা ভোগ করিতেন। জননী যখন পুত্রকে বলিলেন যে দীনুর সম্মতি আছে তুমি ইংরাজী পড়িতে পার। বালক ব্রজসুন্দরের তখনকার আশাদীপ্ত উজ্জ্বল মুখশ্রী সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বহু দিনের অঙ্কুরিত আশালতা এত দিনে ফলবতী হইবার সূচনা হইল। ঢাকায় গিয়াই ব্রজসুন্দর ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখন সে স্কুলের বেতন দিতে হইত না। তিনি ভর্ত্তি হইবার দুই বৎসর পরে রীজ সাহেব এবং প্যারীচরণ সরকার হুগলী বদলী হইয়া গেলেন। সিন ক্লেয়ার সাহেব হেড মাষ্টার হইয়া আসিলেন। এই ইংরাজী স্কুলে ব্রজসুন্দর তিন বৎসর মাত্র পড়িয়াছিলেন। সে সময়েও তিনি পারস্য ভাষা রীতিমত শিক্ষা করিতেন।

দীননাথ ঘোষ বাসাস্থ সমুদায় বালককে প্রতি দিন আধ পয়সা করিয়া জলপানি দিতেন। সকলে চিড়া মুড়ি যা ইচ্ছা কিনিয়া খাইত, বালক ব্রজ অভুক্ত থাকিয়া সেই পয়সা সঞ্চয় করিতেন এবং তাহা দ্বারা কাগজ কলম কিনিতেন। পুস্তক অভাবে অনেক সময় তাঁহাকে অন্যের পুস্তক দেখিয়া হাতে নকল করিয়া লইতে হইত। তখন কোনও হিন্দু বালক ইংরাজী স্কুলে পড়িত না। মুসলমান, আর্ম্মানি ও পোর্ত্তুগিজ বালক লইয়াই স্কুল আরম্ভ করা হয়; ক্রমে ১।২টী করিয়া হিন্দু বালক ভর্ত্তি হইতে লাগিল।

ইংরাজী স্কুলে পাঠ করিবার সময়ের একটী সুন্দর গল্প আছে—এক দিন ব্রজসুন্দর সহাধ্যায়ী একটী বালকের সহিত ঢাকার রাস্তায় বেড়াইতেছেন; এমন সময়ে সহসা একটী পুস্তকের দোকান দেখিতে পাইলেন। ঢাকায় ইতিপূর্ব্বে পুস্তকের দোকান ছিল না। নূতন পুস্তকের দোকান দেখিয়া বালকদ্বয় কৌতূহলী হইয়া দোকানে প্রবেশ করিল এবং নানা পুস্তক দেখিতে লাগিল। পুস্তক দেখিতে দেখিতে একখানি অভিধান দেখিয়া ব্রজসুন্দরের সেই বই খানি কিনিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। বিক্রেতাকে পুস্তকের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অর্থ দরিদ্র ব্রজসুন্দরকে কে দিবে?

আগ্রহ এবং নিরাশা তাঁহার মুখখানিকে নানাবিধ ভাবের লীলাভূমি করিয়া তুলিল। কত আগ্রহের সহিত, কি লুব্ধ নেত্রে পুস্তকখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। বইখানি পাইলে তাঁহার লেখা পড়ার কত সুবিধা হইবে ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু টাকা কোথায় পাইবেন এই চিন্তায় তাঁহার মুখ নিরাশায় অন্ধকার হইয়া যাইতে ছিল। অর্থ সংগ্রহের নানা উপায় চিন্তা করিতে করিতে পুস্তক বিক্রেতাকে বলিলেন "আমি কাল আসিয়া মূল্য দিয়া বইখানি লইয়া যাইব।" পথে আসিতে আসিতে এইরূপ একখানি ডিকসনারি হইলে পড়াশুনার বিশেষ সুবিধা হইবে বন্ধুকে একথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন। কি উপায়ে অভিধান খানি কিনিবার অর্থ যোগাড় করিবেন, রাত্রে সেই চিন্তায় বালকের নিদ্রা হইল না। পর দিন অনেক কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকের দোকানে ছুটিলেন। বিক্রেতাকে ডিকসনারীর মূল্য দিয়া পুস্তক চাহিলেন। কিন্তু দোকানদার বলিল "সেরূপ ডিকসনারি আর নাই, একখানি মাত্র ছিল সেখানি কাল যে বাবুটী আপনার সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনিই কাল রাত্রে লইয়া গিয়াছেন।" ব্রজসুন্দরের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, ও বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "কই সে ত আমার নিকট একবারও ডিকসনারিখানি কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই? যদি সে কিনিবে বলিত তাহ'লে আমি আর এত

কষ্টে টাকা জোগাড় করিতাম না, অনিদ্রায় রাত কাটাইতাম না, যাক সে লইয়াছে বেশ হইয়াছে।" ব্রজসুন্দর ছলছল নেত্রে নিরাশ মনে গৃহে ফিরিলেন। এই সহাধ্যায়ী তাঁহার আজীবনের বন্ধু অভয়াকুমার দত্ত।

এই ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকগণ ব্রজসুন্দরের বিদ্যাশিক্ষার জন্য একান্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শিক্ষকগণ সর্ব্বত্রই শিক্ষানুরাগী ছাত্রকেই ভালবাসেন। ইহাঁদিগের সহিত ব্রজসুন্দরের চিরদিনের মত সম্পর্ক হইয়া গিয়াছিল। এই স্কুলে ব্রজসুন্দর যে সকল বালকের সহিত পাঠ করিতেন, তাহাদিগের সহিতও তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। এই সকল সহাধ্যায়ী বালকগণের মধ্যে আবদুলগণি (পরে যিনি নবাব আবদুলগণি হইয়াছিলেন); ছোট আদালতের জজ অভয়াকুমার দত্ত, রামশঙ্কর সেনের জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা দ্বারকানাথ সেন, আর্ম্মাণী জমিদার হার্ণি ও পোগোজ সাহেব, ঢাকা মৌলবী বাজারের জমিদার মৌলবী আবদুল আলি, মৌলবী আবদুল আজিজ, সায়েস্তা বাদের জমিদার ও ছোট আদালতের জজ সৈয়দ আবে আবদুল্লা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক বিখ্যাত হিন্দু ও মুসলমান ছিলেন। স্থানান্তরে সুবিধা হইলে ইহাঁদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। ব্রজসুন্দরের বন্ধু নির্ব্বাচনের আশ্চর্য্য শক্তি ছিল; পরে যখন কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন আশ্চর্য্যের বিষয় তখন যেখানে যে সৎলোকটীকে পাইতেন তাঁহাকেই চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিতেন।

কলিকাতা যাত্রা।

ব্রজসুন্দর ঢাকায় তিনবৎসর অধ্যয়ন করিবার পর দীননাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শীতলচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা হইতে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার নিকট কলিকাতা সহরের জাঁকজমক, সভ্যতা, স্কুল প্রভৃতির কথা শুনিয়া বালক ব্রজসুন্দরের মনে কলিকাতা দেখিবার ও

এখানে আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। আমরা যেমন বিলাত প্রত্যাগত যুবক দেখিলেই বুঝিতে পারি যে ইনি শ্বেত ভূমিতে পদার্পণ করিয়া আসিয়াছেন, তেমনি শীতল চন্দ্রের হাবভাব চাল চলনে তাঁহার কলিকাতা প্রবাস বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতা প্রত্যাগত শীতলচন্দ্র বালক ব্রজসুন্দরকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল। বালক ভিতরে ভিতরে লুকাইয়া কলিকাতা যাত্রার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তখনকার দিনে ঢাকা হইতে কলিকাতা যাত্রা সহজ ব্যাপার ছিল না, এখনকার বিলাত যাত্রাও তাহার নিকট সহজ বলিয়া মনে হয়। রেল ছিল না, ষ্টীমার ছিল না, সুন্দরবন দিয়া অনেক ঘুরিয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিতে হইত, পথে ডাকাতের বিষম উৎপাত ছিল। তখন দেশ এমন অশাসিত ছিল যে জলে স্থলে সর্ব্বত্রই দস্যুভয় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ দস্যুদমনের নানারূপ ব্যবস্থা করিতেন। রাজত্ব পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে এই সকল ব্যবস্থার অন্তর্ধানের সহিত দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণের একাধিপত্য একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। দেশীয় লোকের কথা দূরে থাকুক উহারা সুযোগ পাইলে ইংরাজ রাজপুরুষদিগকেও আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সার জেমস্ রেনেলের মত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগকেও ইহাদিগের হস্তে কত না লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। ইহারা রেনেল সাহেবকে চিরকালের মত বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। কাপ্তেন হল্যাণ্ডের ন্যায় ইংরাজকেও কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার পথে দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

যদিও ইহার অনেক বৎসর পরে ব্রজসুন্দর কলিকাতায় আসিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তখনও দেশ সুশাসিত হয় নাই; তখনও দস্যু ভীতি এমন প্রবল ছিল যে সাভার হইতে ঢাকা আসিতে বা কতক্ষণ লাগে ইহার মধ্যে কতস্থানে দস্যুদিগের আড্ডা ছিল।

সে কালে কলিকাতা আসা কতদূর বিপজ্জনক ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কলিকাতায় আসিতে প্রায় একমাস সময় লাগিত, ব্যয়ও বিস্তর হইত। বহুসংখ্যক নৌকা একত্র হইলে তবে সকলে অগ্রসর হইত। ইহাতে অনর্থক বিস্তর ব্যয় ও সময় লাগিত।

ব্রজসুন্দর কলিকাতায় আসিবেন মনে মনে স্থির করিলেন কিন্তু কাহারও নিকটে মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। কপর্দ্দকহীন বালকের পাথেয়ও নাই, কোথা হইতে কি প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিবেন, বালক ভাবিয়া আকুল হইল। ছোট ভাই দুর্গাদাসের হস্তে একখানি সোনার বাজু ছিল, তাহার মূল্যই বা কত হইবে? দুর্গাদাসের নিকটে বাজুখানি চাহিলেন বলিলেন "দুর্গা আমার বড় টাকার দরকার হইয়াছে তোমার বাজুখানি আমাকে দেও আমি বড় হইলে তোমাকে অনেক ভাল বাজু গড়াইয়া দিব।" দুর্গাদাস জননীর ভয়ে বাজু দিতে প্রথমে সম্মত হইলেন না কিন্তু শেষে দাদার অনেক অনুরোধে বাজু খুলিয়া দিলেন। ব্রজসুন্দর বাজুখানি বাঙ্গালা বাজারে এক পোদ্দারের দোকানে বিক্রয় করিয়া কয়েকটী টাকা সংগ্রহ করিলেন। ইহাই হইল কলিকাতা যাত্রার সম্বল। এই সম্বল লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া ব্রজসুন্দর এক মহাজনী নৌকায় কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। নৌকা স্থানে স্থানে অনেক বিলম্ব করিয়া প্রায় এক মাসে কলিকাতায় পৌঁছিল; যে কয়টী মুদ্রা ছিল পাথেয় এবং আহারে তাহা পর্য্যবসিত হইল। শূন্য হস্তে বান্ধবহীন অবস্থায় কলিকাতারূপ মহারণ্যে ব্রজসুন্দর পদার্পণ করিলেন। নৌকায় মাথা রাখিবার স্থান ছিল এবং এক মুষ্টি অন্নও জুটিত। কলিকাতায় আসিয়া উভয়ের আর স্থিরতা রহিল না। নৌকা হইতে নামিয়া বাক্সটী মাথায় করিয়া বালক রাজপথে আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন, কাহার দ্বারস্থ হইবেন তাহাও জানেন না। অনেক ঘুরিলেন অনেক অনুসন্ধান করিলেন কোথাও একটু আশ্রয় পাইলেন না।

অবশেষে অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, ঢাকা স্কুলের একজন সহাধ্যায়ী নন্দকিশোর ঘোষ, সদর দেওয়ানীর মোক্তার মানিকগঞ্জ বুতুনী নিবাসী কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করে। এত দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ এত অন্বেষণের পর একটী পরিচিত ব্যক্তির সূত্র পাওয়া গেল। অমনি কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়ের গৃহাভিমুখে ব্রজসুন্দর যাত্রা করিলেন। কিশোরী মোহনের গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া সে রাত্রে সেখানে বিশ্রাম করিলেন।

বালকের এমনি জ্ঞানানুরাগ যে একদিনও সুস্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না। ঢাকা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক প্যারীচরণ সরকার তখন হুগলী শাখা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। ব্রজসুন্দর তাঁহার অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি প্যারী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। পরদিনই নৌকাযোগে হুগলী যাত্রা করিলেন। বালকের দুর্ভাগ্যক্রমে স্রোত এবং বায়ু প্রতিকূল হওয়ায় নৌকা হুগলীতে না পৌঁছিয়া বালি পর্য্যন্ত গিয়া থামিল। এদিগে সন্ধ্যা সমাগমে আকাশ ঘন ঘটায় ঘোরতর অন্ধকারময় হইয়া আসিল। অসহায় বালক অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের মধ্যে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া, একেবারে ভয়ে ভাবনায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কি করেন কোথায় যান, কাহার নিকটেই বা আশ্রয় ভিক্ষা করেন কিছুই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। বালকের নিকট জগৎ অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল।

এমন সময়ে সহসা মনে হইল হয়ত বা নৌকায় সহযাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ হুগলীতে যাইতে পারে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন তাহাদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তি হুগলীর পথে যাইবে। বালক অমনি তাহাদের সঙ্গ লইলেন। ক্রমে তাহারা একেবারে কোথায় কোন পথে অদৃশ্য হইল বালকের আর তাহাদের অনুসন্ধান করা সম্ভব হইল না। অনেক অনুসন্ধানের পর হুগলীর স্কুলের ঠিকানা

হইল, সেখানে উপস্থিত হইয়া, প্যারীচরণ সরকারের আবাস নির্ণয় করিতে আর বিলম্ব হইল না।

ব্রজসুন্দরকে দেখিয়া প্যারীচরণ বাবু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে যখন বালকের আগমনের কারণ শ্রবণ করিলেন তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; বালকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যাকুলতাকে সহস্র সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রজসুন্দরের প্রতি তাঁহার স্নেহ উথলিত হইয়া উঠিল। পরম আদরে তাঁহাকে সে রাত্রে গৃহে রাখিলেন। ব্রজসুন্দর তাঁহার নিকটে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন তিনি বলিলেন "তুমি হিন্দু কলেজের ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবে না হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হও" এবং নিজ কনিষ্ঠ সহোদর প্যারী বল্লভের নিকট ব্রজ সুন্দরকে উক্ত স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য একখানি পত্র দিলেন। ব্রজসুন্দর সেই পত্রখানি লইয়া তৎপর দিন আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

সেই দিনই হেয়ার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্কুলে পাঠ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিয়মের অধিক অবৈতনিক ছাত্র গ্রহণ করিতে অথবা বয়স অধিক হইয়াছে বলিয়া—তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হেয়ার সাহেব অসম্মত হইলেন। প্যারীবাবু এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া পুনরায় হেয়ার সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া হেয়ার সাহেব কেমন বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন প্যারীবাবু তাঁহাকে হুগলী স্কুলে পাঠ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। বালক পুনরায় বালি হইতে পদব্রজে হুগলী গমন করিলেন। সেখানেও ঐ এক অন্তরায়। হুগলীতেও পাঠ করা হইল না। আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যিত হইয়া, নানা দুর্ঘটনায়, শ্রমে, অনাহারে, অল্পাহারে বালকের দেহ মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি কোনও বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঠ করিবার আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

অবশেষে অনেক হাঁটাহাঁটি করিয়া সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়ের এক অনুরোধ পত্র লইয়া ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্ষেত্রবাবু তখন জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনিষ্টিটিউসনের (General Assembly's Institution) চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। ক্ষেত্রবাবুর অনুগ্রহে ব্রজসুন্দর এত আকিঞ্চনের পর জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনিষ্টিটিউসনের (General Assembly's Institution) প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। বিদ্যাশিক্ষার উপায় ত হইল কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যে ঢাকা নিবাসী কৃষ্ণকুমার সেন নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। ব্রজসুন্দর অমনি ঐ শিক্ষকতা পদের প্রার্থী হইলেন। ভগবানের কৃপায় ঐ পদে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার সমুদয় অভাব মোচন হইল। প্রায় এক বৎসর কাল তিনি এই শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধু বৈদ্যনাথ জোয়াতদারের নিতান্ত আগ্রহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র জোয়াতদারের বাসায় অবস্থান করিলেন। ব্রজসুন্দর যখন যেখানে যাইতেন, সেইখানেই তাঁহার বন্ধু জুটিয়া যাইত, বন্ধুর অভাব হইত না।

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ব্রজসুন্দর একান্তচিত্তে, অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রখর স্মৃতিশক্তির সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক শিক্ষা করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান পিপাসা পাঠ্য পুস্তক পাঠে পরিতৃপ্ত হইত না, তিনি চতুর্দ্দিক হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করিয়া নানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতেন। ব্রজসুন্দরের এ জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার অবসর হইল না। তাঁহার মাসীমাতা বৃদ্ধ হইয়া কাশীবাসী হইলেন, পারিবারিক নানা বিশৃঙ্খলা চলিতে লাগিল। জননীর দুঃখ বিমোচনের জন্য তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চাকরীর উদ্দেশ্যে ঢাকায় প্রত্যাগমন করিতে হইল।

ব্রজসুন্দর বন্ধু বান্ধব বিহীন বিদেশে আসিয়া বিদ্যালাভের জন্য কত দুঃখ না সহ্য করিয়াছিলেন তিনি আরও দীর্ঘকাল এ সকল কষ্ট সহ্য করিয়া প্রসন্নমনে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিতেন; কিন্তু দুঃখিনী জননীর প্রতি কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহাকে এ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিল। বোধ হয় তাঁহার কলিকাতা বাস দুই তিন বৎসরের অধিক হয় নাই।

ব্রজসুন্দরের জ্ঞানানুরাগ।

বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও ব্রজসুন্দরের জ্ঞান পিপাসা কখনই তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। পাঠে তাঁহার চিরজীবন একান্ত আসক্তি ছিল। জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত তিনি নিয়মিতরূপে জ্ঞানালোচনা করিয়াছেন। প্রথম জীবনে তাঁহাকে ঘোর দারিদ্র্যের সহিত যেরূপ অবিরাম সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহাতে ইচ্ছামত পুস্তকাদি কিনিয়া যে জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি অপরের নিকট পুস্তক চাহিয়া পাঠ করিতেন, কখনও বা তাহা স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন। পাঠ্যাবস্থায় একখানি ডিক্সনারী কিনিবার জন্য কতই না ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে বালক অপরিচিত দেশে অজানিত লোকের মধ্যে আসিয়া অশেষ কষ্ট, ঘোর দারিদ্র, সহ্য করিয়াছিলেন; যিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কত প্রত্যাখ্যিত হইয়াছিলেন, জ্ঞানলাভের বাসনা যাঁহার জীবনের কুহক মন্ত্র ছিল তিনি যে আজীবন জ্ঞানার্জ্জনে রত থাকিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? লোকে আলেয়ার পশ্চাতে যেরূপ ছোটে ব্রজসুন্দর তেমনি জ্ঞানপথে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের পশ্চাতে চিরজীবন ছুটিয়াছিলেন। এই প্রগাঢ় জ্ঞান পিপাসা তাঁহাকে কখনও সুস্থির হইতে দেয় নাই। বালক ব্রজসুন্দর পুস্তকের জন্য লালায়িত হইয়াও পুস্তক লাভ করিতে পারেন নাই, বিদ্যাশিক্ষার জন্য ঐকান্তিক বাসনা সত্ত্বেও বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তিনি যে পরজীবনে অর্থের মুখ দেখিয়াই প্রাণের সাধ মিটাইয়া পুস্তক সংগ্রহ করিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? পুস্তক

সংগ্রহ তাঁহার এক নেশা ছিল এবং পুস্তকের জন্য অর্থব্যয় করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি নিজে যেমন জ্ঞানলাভ করিয়া তৃপ্ত হইতেন অপরেও জ্ঞানলাভ করুক ইহাও তাঁহার চিরজীবনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই বলবতী ইচ্ছাই তাঁহাকে উত্তরকালে সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অন্যূন ৫০টি বিদ্যালয় স্থাপনে যত্নবান করিয়াছিল। পাঠার্থী দরিদ্র বালকদিগকে সর্ব্বদাই পুস্তক দান করিতেন। যেখানে দান করিবার সুবিধা হইত না পাঠকের নাম ধাম লিখিয়া পুস্তক পড়িতে দিতেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ খাতাখানি পর্য্যন্ত পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা বলিতে গেলে অতি অল্পই হইয়াছিল। গুরুতর পরিশ্রমের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও তিনি নিয়ম মত পুস্তক পড়িতেন। পরজীবনে সংসারের ব্যয় বাহুল্য দেখিয়া যখন গৃহিণীকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেন, তখন গৃহিণী বলিতেন "কোন্‌দিককার খরচ কমাই বল, আলোর খরচও তো কম না, আমলাদের আলো, স্কুলের ছাত্রদের পড়ার আলো, মেয়েদের পড়ার আলো, বুড় কর্ত্তার পড়ার আলো, কোন্‌টা কমাইব বল?" ব্রজসুন্দর আর কথা কহিতে পারিতেন না। তিনি নিজ চেষ্টায় গণিত, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, হিন্দুদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, ইংলণ্ডীয় দর্শনশাস্ত্র, আইন সমূহ আলোচনা করিয়াছিলেন। বন্ধুগণ তাঁহার পুস্তক সংগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। হাফেজ, শাখিজ, তাব্রিজ প্রভৃতি পারসিক কবিগণের কবিতা অতি প্রিয় ছিল। তাঁহার পারস্য ভাষার পুস্তক সংগ্রহও কম ছিল না, তাহার মধ্যে হস্ত লিখিত গ্রন্থও দেখা যায়। অনেক সময় পারসিক কবিগণের কবিতা আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার পারস্য ভাষার গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হইয়া অনেক মৌলবী তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। কখনও কখনও তাঁহার সহিত মহা তর্ক বিতর্ক বাধিয়া যাইত। সকালে বিকালে তাঁহার দর্শনার্থী লোকদিগের মধ্যে অনেক মুসলমান মৌলবীও থাকিতেন। ব্রজসুন্দর সংস্কৃত ভাষা রীতিমত শিক্ষা

করিয়াছিলেন কিনা এবং কোথায় কখন করিয়াছিলেন তাহার কিছুই জানা যায় না, তবে তিনি যে কিছু কিছু সংস্কৃত জানিতেন তাহাতে সংশয় নাই। কন্যাদিগের নিকট যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ব্যাখ্যা করিতেন এরূপ শ্রুত হওয়া যায়; পণ্ডিতদিগের সহিতও হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন লইয়া তাঁহার তর্ক বিতর্ক হইত। তাঁহার গৃহ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত-গণের আশ্রয় স্থান ছিল। জ্ঞান বিষয়ক সকলই তাঁহার পরম প্রিয় বস্তু ছিল, কি পণ্ডিত কি পুস্তক। তিনি পণ্ডিতদিগকে যথাসাধ্য মুক্তহস্তে দান করিতেন; কেহ আপত্তি করিলে বলিতেন পণ্ডিতদিগকে পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য নতুবা কি করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানালোচনা করিতে অবসর পাইবেন? বলা বাহুল্য যে তিনি হিন্দু মুসলমান কিছুই প্রভেদ করিতেন না। প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসী ফকিরদিগের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে পারিলে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও বহুদূর হইতে অনেক সাধুসন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ছিলেন।

আমরা শ্রদ্ধেয় বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, যে তিনি ব্রজসুন্দরের দর্শনার্থী লোকদিগের মধ্যে প্রায়ই এক সন্ন্যাসীকে দেখিতেন। একদিন ব্রজসুন্দর বঙ্গবাবুকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলুন তো ইঁহার ধর্ম্মলাভ হইয়াছে কি না?" উত্তর করিলেন "না ইঁহার ধর্ম্মলাভ হয় নাই কিন্তু ইনি সাধনার অবস্থায় আছেন, ইঁহার নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভ হইবে।" সংসারে পুত্রের যেমন কোনওরূপ উন্নতি হইলে পিতার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠে ব্রজসুন্দরের মুখ এই উত্তর শ্রবণে আনন্দে তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বঙ্গবাবু তখন নব্যযুবক, সাধুসন্ন্যাসীর কথার দিকে তাদৃশ মনোযোগ দিলেন না কিন্তু ব্রজসুন্দরের উচ্ছ্বসিত মুখখানি তাঁহার মনে রহিয়া গেল। অনেক দিন পরে সে সন্ন্যাসীর কথাও মনে আসিয়াছিল।

মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রপ্রসাদ মিত্র বি, এল্,

তাঁহার পিতার পুস্তকালয়ের অনেকগুলি গ্রন্থ ঢাকা রামমোহন লাইব্রেরীতে প্রদান করিয়াছেন। ঐ পুস্তকগুলি দেখিলেই মিত্র মহাশয়ের জ্ঞানানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যও তাঁহার চেষ্টা ছিল। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাঙ্গলা রচনা প্রকাশ করিতেন। পুস্তক পাঠে তাঁহার অনেক সময় কাটিয়া যাইত। কেবল যে একটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন তাহা নহে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসমূলক নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রেও তাঁহার বেশ অভিজ্ঞতা ছিল, যাহার জন্য অনেক তর্কচূড়ামণি, তর্কপঞ্চানন, বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিত তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। বিলাতে কোন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে জানিলেই যে তাহা আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন এবং আনাইতেন তাঁহার হিসাবের পুস্তকে তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। শেষ জীবনে যখন রোগ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তখনও যে পারসী, ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক ক্রয় করিতেছেন স্মৃতি পুস্তকে তাহাও দেখা যাইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

পারিবারিক জীবন।

মানব জীবনের বাহিরের ঘটনা সকল প্রকৃত জীবন নহে। জীবন-চরিতে কালের এবং ঘটনার নির্দ্দেশ করিয়া আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিবার পদ্ধতি আছে। কিন্তু বাস্তবিক সময় এবং ঘটনা লইয়াই মানবজীবন নহে। ভগবান যীশু কয়বৎসরই বা জীবিত ছিলেন, কয়দিনই বা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন—তাঁহার জীবিত কালে তিন বৎসরের অধিক হইবে না তাঁহার নাম ও ধর্ম্মের কথা তাঁহার স্বদেশবাসীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। কালের হিসাবে ঘটনার হিসাবে সে জীবনের কত কাহিনীই বা বক্তব্য আছে? কিন্তু তিনি মাত্র তিন বৎসর যে কথা বলিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন আজ দুই হাজার বৎসর ধরিয়া সে কথার শেষ হইল না। জগতবাসী এখনও তাহা বিস্মৃত হইল না, অর্দ্ধজগৎ আজও তাহা অন্তরের অন্তরে জপ করিতেছে। কোটী কোটী নরনারী খ্রীষ্টের জীবনের প্রভাবে আজও জীবনপথে অপূর্ব্ব আলোক পাত দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছে—সে জীবনের উৎস কোথায় ছিল—তাহা কয়জন দেখিয়াছে! মানবের প্রকৃত জীবন অতি অল্পব্যক্তির নিকট সুব্যক্ত হয়। প্রকৃত জীবন মানবাত্মার বিকাশের ইতিহাস, প্রকৃত জীবনের আলোক গৃহের নির্জ্জন কক্ষেই প্রকাশিত হয়।

"দূর হতে দেখে যারা দেখে তারা ধূমরাশি।
আলোক দেখিবে যদি দেখগো নিকটে আসি॥"

এ কথা কি মিথ্যা! দূর হতে ধূমই দেখা যায়,—অগ্নির উত্তাপ নিকটে আসিয়া অনুভব করিতে হয়। দূর হইতে আমরা নাম শুনি, বড় বড় কার্য্য দেখি, মহদনুষ্ঠানের সংবাদ পাই, কিন্তু নিশ্চয়ই সমুদায় সাধু কার্য্যের মূল অতি নিগূঢ় স্থানে প্রোথিত থাকে। মহৎ জীবনের

মহত্ত্ব অপরের মুখের সাধুবাদে নয়, লোক সকলের জয়ধ্বনিতে নয়, সভাসমিতির করতালিধ্বনিতে নয়। সে মহত্ত্বের বীজ নরচক্ষুর অন্তরালেই অঙ্কুরিত হইয়াছে নিশ্চয়। নদী যখন প্রবাহিণী হইয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে, যখন শত শত তরণী, অর্ণবযান বক্ষে করিয়া, শত শত প্রাণীকে শীতল করিয়া সাগর সঙ্গমে নৃত্য করিয়া ছুটিতে থাকে, তখন কে না তাহা দেখে, কে না তাহার নাম কীর্ত্তন করে? পুণ্যতোয়া ভাগিরথী যে চলিয়াছেন,—কি কল্লোল তাঁহার! উচ্চ বীচিরবে কি মধুর সঙ্গীত করিয়া তিনি চলিয়াছেন! কি জনসঙ্গম তাঁহার তীরে! কত ধনে জনে পরিপূর্ণ পোত সকল তাঁহার বক্ষ বাহিয়া চলিয়াছে। ভাগিরথীর জয়ধ্বনি শুনিতেছ নরলোকে, কিন্তু দেখেছ কি সেই উৎস? যেখানে হিমাচলের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সেই নির্ম্মল বারিধারা ক্ষীণ রজতরেখার ন্যায় উৎসারিত হইয়াছিল; আজ দেখিতেছ, মহৎ জীবনের মহান্ কার্য্য, কে সন্ধান রাখিয়াছ, কাহার সঙ্গলাভে, কাহার সহানুভূতিতে, কাহার উৎসাহে, কোন্ চক্ষের আলোকে সে সকল মহৎ ভাবের বিকাশ হইয়াছে? সূর্য্যের আলোক ব্যতীত যেমন পুষ্পের বিকাশ হয় না, প্রেমের আলোক ব্যতীত কাহার জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়? আমরা কার্য্যই দেখি, সময়ের এবং ঘটনার তালিকাই করি, জীবনের উৎস কোথায় তাহা একবারও অন্বেষণ করি না। মানব জীবনের প্রকৃত বিকাশ দেখিবার স্থান গৃহপরিবার। যাও সেখানে গিয়া অন্বেষণ কর, জিজ্ঞাসা কর তাঁহার জননীকে, পত্নীকে, সন্তানগণকে, তাঁহার ভৃত্যগণকে, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণকে, শ্রবণ কর তাঁহারা কি সাক্ষ্য দিতেছেন। যদি এরূপ পরীক্ষায় তোমার মহাপুরুষ উত্তীর্ণ হন, তবেই তিনি যথার্থ মহাপুরুষ! এমন লোককে আমরা প্রণাম করি—এমন লোকই সকলের প্রণম্য—এমন মহাত্মার মহান্ নাম সার্থক! আমরা ব্রজসুন্দরকে এই কষ্টি প্রস্তরে কসিয়া দেখির কিরূপ সে জীবনের উজ্জ্বলতা! দেখি গৃহে এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন কি না?

প্রথম চিত্র—জননী কাশীশ্বরী।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে—ব্রজসুন্দর তাঁহার মাতার দ্বিতীয় সন্তান! সূতিকা গৃহে তিনি মাসীর ক্রোড়ে যাইতে যাইতে মাতৃক্রোড়ে রহিয়া গেলেন। প্রথমপুত্র তারাপ্রসাদের মৃত্যুর পর ব্রজসুন্দরই জননীর একমাত্র আশা ভরসার স্থল হইলেন। বড় হইয়া ব্রজসুন্দর যখন জননীকে ধনে জনে মানে বিভূষিত করিয়াছিলেন তখন জননী অনেক সময় স্নেহ গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতেন "মার কথা শুনিয়া আমি যদি বিরজুকে দিদিকে দিতাম তাহা হইলে আজ আমার কি দশাই না হইত ?" "তারাপ্রসাদ ত আমাকে ফেলিয়া গেল, ছোটটী ত তেমন হইল না," "বির্‌জু একাই আমার সকল দিক্ রক্ষা করিল। বির্‌জুকে দিয়া ফেলিলে আমি যে ভিখারিণী সেই ভিখারিণীই থাকিতাম।"

বাস্তবিক ব্রজসুন্দরের জননীর ন্যায় বুদ্ধিমতী ও কর্ত্তব্যপরায়ণা রমণী সচরাচর দেখা যায় না। তিনি যখন বিধবা হন তখনও তাঁহার পুত্রগণ সুলতান প্রতাপ পরগণার চারি আনি অংশে অংশীদার। তিনি স্বভাবতঃই অতি অভিমানিনী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন, কিন্তু বিধবা হইয়া যখন দেখিলেন, ভগিনীর শরণাপন্ন না হইলে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের শিক্ষালাভ হইবে না, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় কাশীশ্বরী আত্মমর্য্যাদা লাঘব হইবে বলিয়া সে সুবিধা পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার ন্যায় অল্প-বয়স্কা, অশিক্ষিতা রমণীর পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে। জ্ঞাতিগণের হস্তে সম্পত্তি পড়িয়া রহিল, তখন সেই অসহায়া বিধবা রমণীকে কেহই তাঁহার প্রাপ্য অধিকার দিতে অগ্রসর হয় নাই। তিনি বাস্তবিক নিঃসম্বল অবস্থায় ভগ্নী গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর পরজীবনে জননীর এই আত্মবিসর্জ্জন স্মরণ করিয়া মাতার প্রতি কতই না কৃতজ্ঞ হইতেন, মাতাকে কতই না সাধুবাদ করিতেন। মায়ের জন্যই যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন উন্নত হইয়াছিল তাহা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিতেন। ব্রজসুন্দর আপনাকে দুঃখিনী বিধবার ধন বলিয়া চিরদিন মনে করিতেন। যে ব্যক্তি পিতামাতার প্রতি এমন কি অন্ততঃ

একজনের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধাবান থাকে তাহার জীবন উন্নত না হইয়া যায় না। শ্রদ্ধা ভক্তি অতি অপূর্ব্ব বস্তু, বিশেষতঃ মাতৃভক্তি যে হৃদয়ে থাকে সে জীবন অতি উন্নত পর্য্যায় ভুক্ত হয়। মহাবীর আলেকজণ্ডারের মাতৃভক্তির কথা কে না শুনিয়াছে, জগদ্‌বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ান কম মাতৃভক্ত ছিলেন না—অপরের কথা কি আমাদের দেশের বিদ্যাসাগরের ন্যায় মাতৃভক্তের কথা কেহ কি শুনিয়াছে? মাতৃভক্তের জীবনের অপূর্ব্ব পরিণতির বিষয় যখন স্মরণ করি তখন মনে হয় যে বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ যেন মাতৃভক্তের শিরে বর্ষিত হইয়া থাকে, ব্রজসুন্দরের জীবনেও এ সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমাদের ন্যায় গুরুভক্তি প্রধান দেশেও তাঁহার ন্যায় মাতৃভক্ত দুর্লভ। অধিক আর কি যখন তাঁহার জীবনের চিত্রখানি অনুধ্যান করি, তখন মনে হয় তিনি ভগবানের পূজার পরই আজীবন জননী দেবীর পূজা করিয়াই গিয়াছেন। জননীর জন্য ব্রজসুন্দর কি না করিতে পারিতেন, জননীর জন্যই বিদ্যাশিক্ষার প্রবল বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া অল্প বয়সে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে এমন কোন বাধাই ছিল না যাহা তাঁহার নিকট দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার মাতৃভক্তি সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কত গল্প সাধারণ লোকের মুখে মুখে শ্রুত হওয়া যায়। জননীকে অদেয় তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি নিজ দেহের রক্ত দিয়া জননীর চরণ ধৌত করিয়া দিতে পারিতেন, কেবল ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিতে কখন পারেন নাই। ঐ সংসারে একমাত্র ধর্ম্মকেই তিনি দুর্লভ সামগ্রী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মাতৃভক্তির সূত্র ধরিয়া ভগবান সেই মাতৃভক্তের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন। মাতৃভক্তির অমৃত রসে সেই হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই মধুময় ছিল। এমন কোমল পবিত্র সরল হৃদয়ে বিধাতা যে বিরাজ করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? এরূপ হৃদয়েই ভগবান বিরাজ করিয়া থাকেন। এক মাতৃভক্তি হইতে ব্রজসুন্দরের জীবনে ধর্ম্ম এবং অন্যান্য সদ্‌গুণরাশি আসিয়া আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি জীবনে যে পর সেবা, যে দেশহিত

ব্রতের অতুলনীয় সাহস, যে ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার অঙ্কুর নিজ জননীদেবীর নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাতার চরিত্রের প্রভাব সন্তানের হৃদয়ে যে কতদূর বিস্তৃত হইতে পারে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। ব্রজসুন্দরের জননী কেবল ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী ছিলেন না, তাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী স্বাধীনতাপ্রিয় মহিলা বাঙ্গালীর ঘরে নিতান্তই বিরল। তাঁহার হৃদয়ের তেজ, বাহিরে অনেক সময় তাঁহাকে প্রখরা ও কর্কশভাষিনী বলিয়া প্রতীয়মান করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু হৃদয়ের এই আশ্চর্য্য বল তাঁহার পুত্রের চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাবলম্বনশীল সুদৃঢ়চেতা পুরুষ করিয়া তুলিয়াছিল। এমন জননীর সন্তানের দুর্ব্বলচিত্ত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কাশীশ্বরীর তুলনা এক সিংহবাহিনী, দানবমর্দ্দিনী দশভূজাই হইতে পারেন। কাশীশ্বরীর যোগ্য সন্তান ব্রজসুন্দর, স্বল্পাকৃতি ও সুকুমার রূপের আধার ছিলেন বটে কিন্তু কর্ত্তব্যসাধনে, দুঃখ নির্য্যাতন বহনে, আত্মনিগ্রহে, পরোপকারব্রতে সে হৃদয় পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল হইয়া থাকিত। কাশীশ্বরীর হৃদয়ের বল কিরূপ ছিল, কি অসাধারণ আত্মসংবরণের ক্ষমতা তাঁহার ছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

ব্রজসুন্দরের জননী বিধবা হইয়া যখন দুই পুত্র লইয়া বানিয়াজুড়ীতে ভগ্নীর বাটীতে ছিলেন তখন একদিন এই ঘটনাটী ঘটে। একদিন বালক ব্রজ, বালস্বভাববশতঃ বাহির বাটীর বৈঠকখানার ঘরের পার্শ্বে একটী ঘর বন্ধ করিরা ভিতরে বসিয়াছিলেন। সে ঘরে অপরাপর লোকের জিনিষপত্র ও বস্ত্রাদি ছিল। সকলে স্নান করিয়া আসিয়া বস্ত্রের জন্য দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। বালক কিছুতেই উত্তর দেয় না, দ্বারও খোলে না। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির চোটে সেখানে ক্ষুদ্র জনতা হইল। তখন দীননাথ ঘোষ স্বয়ং আসিয়া বজ্রনিনাদে বালককে দ্বার খুলিতে আদেশ করিলেন। বড়দাদার গলা শুনিবামাত্র দ্বার উন্মুক্ত হইল। দীননাথ ক্রুদ্ধ হইয়া সবলে বালককে এমন এক ধাক্কা

দিলেন যে ব্রজসুন্দর ছিট্‌কাইয়া সিঁড়িতে পড়িল এবং মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল, মস্তক কাটিয়া প্রবল ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল, সকলে ছুটিয়া আসিল, কেহ কেহ এ কথাও বলিতে ছাড়িল না "আহা হা, একমুষ্টি অন্নের জন্য বিধবার ধন গেল।" চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। জননী তখন বিধবাদিগের রন্ধন গৃহে ক্ষীর প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট সংবাদ গেল, তিনি অবিচলিত ভাবে ক্ষীরে কাটি দিতে লাগিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না, কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন না, নীরবে আপন কার্য্যে রত রহিলেন, গোপনে দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন, কেহ দেখিল না। যে কাশীশ্বরী অপরের বিপদে সর্ব্বাগ্রে দৌড়িয়া যাইতেন, যাঁহার মত শুশ্রূষাকারিণী কেহ কখন দেখে নাই, আজ তিনি নিজ পুত্রের জীবন সঙ্কটের দিনে নীরব নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। ঐ যে কে বলিয়া উঠিয়াছিল "এক মুষ্টি অন্নের জন্য বিধবার ধন গেল।" ঐ যে দীননাথ লজ্জায় দুঃখে ম্রিয়মান, ঐ যে দিদি হাহাকার করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রজর মুখের উপর পড়িয়া আছেন। কাশীশ্বরীর উন্নত হৃদয়ের আদেশ এই যে ভগ্নী এবং ভগ্নীপুত্র যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন, উৎকণ্ঠা দেখাইয়া তাঁহাদের লজ্জা এবং দুঃখের বৃদ্ধি করা নীচতা ও লঘুতা! কাজেই ব্রজসুন্দরের জননী ধীর স্থিরভাবে অন্যান্য দিবসের ন্যায় কর্ত্তাদিগের আহারের স্থানে যেমন তত্ত্বাবধান করিতেন, সম্মুখে বসিয়া যেমন গল্প করিতেন, সবই করিলেন; দৈনিক কোন কর্ম্মেরই ব্যতিক্রম হইল না। এমন কি আত্মীয় স্বজন, বিধবাদিগের, দাসদাসীগণের, সকলের আহারের তত্ত্বাবধান করিয়া, সকলকে আহার করাইয়া সমুদায় কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া, আস্তে আস্তে পুত্রের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দিদির হাত হইতে পাখা লইয়া পুত্রকে বাতাস করিতে লাগিলেন এবং দিদিকে স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রজসুন্দরের জ্ঞান হইয়াছিল, জননী ধীরে ধীরে তাঁহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন।

পারিবারিক জীবন—প্রথম চিত্র।

সকলেই তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইল। পাছে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলে দিদি অধিকতর ব্যথিত হন তাই তাঁর এত আত্মসংবরণ! এমন হৃদয়ের বল কে কবে দেখিয়াছে?

এই গেল কাশীশ্বরীর আত্মসংবরণ শক্তির দৃষ্টান্ত। ভয় বিপদ কালে তাঁহার সাহসও অসাধারণ ছিল। ব্রজসুন্দর যখন শ্রীহট্টে সার্ভে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন তখন একদিন গুজব উঠিল ফুলবেড়িয়ার চৌধুরীরা তাঁহার বাড়ী লুট করিতে আসিতেছে। এই সংবাদে ত্রস্ত হইয়া সকলে কিংকর্ত্তব্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হইল। ব্রজসুন্দরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস সর্দ্দার লাঠিয়ালদিগকে লাঠি সোঁটা, ঢাল তরবার, বর্ষা প্রভৃতি দিয়া সজ্জিত করিতে লাগিলেন। বাটীর ছাতের উপর ভারে ভারে ইষ্টক জড় করিতে লাগিলেন। বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে কোথায় প্রেরণ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কেহ গৃহকার্য্যে মন দিতেছে না দেখিয়া জননী ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন। সকলকে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে বলিলেন। অবশেষে বিড়াল তাড়াইবার এক লাঠি হাতে লইয়া আস্ফালন করিতে করিতে পথে বাহির হইয়া বলিতে লাগিলেন "দেখি কোন্ ব্যাটা আমি থাকিতে আমার বাড়ী লুট করে" এবং এই বলিতে বলিতে একেবারে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কোনও লুণ্ঠনকারীর দেখা পাইলেন না। তখন তিনি অকথ্য ভাষায় দুর্গাদাসকে গালি দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ফুলবেড়িয়ার চৌধুরীগণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কাশীশ্বরীর নিকট উক্ত অমূলক সংবাদের জন্য বিস্তর ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য যে চৌধুরীগণ কাশীশ্বরীর এরূপ সাহসের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক জমিদার অপর জমিদারের বাড়ী লুট করিতে আসিতেছে ইহা কেহ অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিবেন না। পূর্ব্ববঙ্গের তখন যে অবস্থা ছিল তাহাতে এ প্রকার ঘটনা বড় বিস্ময়কর ছিল না।

কাশীশ্বরীর দানশীলতার বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। মুক্তহস্তে দান করা তাঁহার একপ্রকার স্বভাব সিদ্ধ ছিল। কাহারও কোন বিষয়ে অভাব দেখিলে কিম্বা শ্রবণ করিলে তাহা দূর না করা পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। যদি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিতে না পারিতেন, তবে তাহা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। পরের দুঃখ দূর করিতে তাঁহার কি প্রকার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আগ্রহ ছিল সে বিষয়ে এখনও গ্রামবাসী-দিগের নিকট অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। রোগে, শোকে, বিপদে তিনি যেমন গ্রামবাসীদিগের প্রধান সহায় ছিলেন এখন আর সেইরূপ কে আছে? নিজের বৃহৎ পরিবারের তত্ত্বাবধান করিয়াও গ্রাম গ্রামান্তরের লোকের তত্ত্ব লইতেন। তাঁহার দানশীলতার নানা গল্প এখনও কাহিনীর মত শোনা যায়। রোগের সময় তাঁহার গৃহেই রোগীর পথ্য মিলিত, শীতের সময় তাঁহার গৃহ হইতেই শীতার্ত্তের শীত নিবারণের উপায় হইত। গ্রামের কোন লোক পীড়িত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট সংবাদ যাইত। তিনি অমনি রোগীর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইতেন এবং ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া নিজ গৃহ হইতেই তাহা যোগাইতেন। ব্রজসুন্দর জননীর এই কার্য্যের সাহায্যের জন্য ঢাকা হইতে প্রচুর পরিমাণে সাগুদানা, মিছরি, মসুরীর ডাল প্রেরণ করিতেন। সেকালে মসুরীর যূষ রোগীর এক প্রধান পথ্য ছিল। মসুরীর ডাল তখন আবার গ্রামে একেবারে দুষ্প্রাপ্য ছিল। কত প্রকার টোট্‌কা ঔষধ তিনি নিজেই জানিতেন, রোগীর মুখরোচক কত প্রকার আচার তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। যখন যাহার যাহা প্রয়োজন হইত সে ছুটিয়া কাশীশ্বরীর নিকট উপস্থিত হইত। রোগী রোগমুক্ত হইলে তাঁহার প্রস্তুত মুখরোচক আচারে ও তাঁহার হস্তের ব্যঞ্জনে ক্রমে বললাভ করিত। তিনি মাতার ন্যায় স্নেহের সহিত রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন। কাহারও মৃত্যু হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে খবর

দেওয়া হইত। যত রাত্রিই হউক না কেন তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইতেন ও সৎকারের যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতেন। কোনও দ্রব্যের অভাব হইলে কিম্বা আবশ্যক হইলে নিজের গৃহ হইতে সমুদায় সরবরাহ করিতেন। দরিদ্রদিগের শবদাহের জন্য কাষ্ঠের অভাব হইলে নিজ গৃহ হইতে সমুদায় কাষ্ঠ যোগাইতেন, নচেৎ কাষ্ঠের জন্য বৃক্ষ প্রদান করিতেন। সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। শোকার্ত্ত পরিবারের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন ও যতদিন পর্য্যন্ত না তাহারা কথঞ্চিৎ শান্ত হইত ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের আহারাদির ভার নিজেই গ্রহণ করিতেন। কাশীশ্বরীর দয়া দাক্ষিণ্যের কোথায়ই বা সীমা নির্দ্দেশ করিব। তিনি যেন গ্রামের মূর্ত্তিমতী করুণাময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। অভুক্তকে খাওয়াইয়া শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়াই তিনি নিরস্ত হইতেন না। গ্রামবাসীদিগের পরস্পরের সহিত কুটুম্বিতা রক্ষার সাহায্য করা পর্য্যন্ত তাঁহার পরোপকার ব্রতের অন্তর্ভূত ছিল। কাহারও গৃহে অসময়ে আত্মীয় স্বজন কিম্বা অতিথি সমাগত হইলে তাঁহার গৃহে তাহারা ছুটিয়া আসিত। সে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সদাই পরিপূর্ণ; অমনি কাশীশ্বরী তাহাদের আতিথ্যের উপযোগী খাদ্য সামগ্রী যোগাইতেন। কাশীশ্বরীর কার্য্যকুশলতার গুণে তাঁহার ভাণ্ডার সর্ব্বদাই নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যে পূর্ণ থাকিত। আশ্রিতা বিধবাও তাঁহার বধূমাতাগণ ক্ষীর, ছানা ও নারিকেল দিয়া কতপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেন। বঙ্গের সে দিন আর নাই, এখন ক্ষীর ছানা রাজভোগ্য হইয়াছে, কিছুদিন পরে হয়ত এসকল কথা উপকথার মধ্যে পরিগণিত হইবে। তখনকার দিনের অতিথি সেবা আর বঙ্গে নাই, তেমনভাবে আর কেহ কাহারও গৃহে অতিথি হয় না। সেকালে দেশে তো আর রেলগাড়ী, ষ্টীমার ছিল না; লোকে জলপথে বা পদব্রজেই ভ্রমণ করিত, কাজেই লোককে বাধ্য হইয়া অপরের আতিথ্যগ্রহণ করিতে হইত; গৃহস্থের গৃহে অতিথিও বিশেষভাবে

সমাদৃত হইত। কাশীশ্বরী অতি যত্নে, অতি নিষ্ঠার সহিত অতিথি সেবা করিতেন। প্রতিদিন গৃহে দুই চারি জন অতিথি তো থাকিতই ইহা ভিন্ন ব্রহ্মপুত্রে স্নান এবং অন্যান্য তিথি উপলক্ষ্যে শত শত লোক তাঁহার গৃহে অতিথি হইত। তিনি এমন যত্ন, এমন প্রেম ও নিষ্ঠার সহিত এবং এমন পরিপাটীরূপে তাহাদিগের সেবা করিতেন যে লোকে ধন্য ধন্য করিত।

কাশীশ্বরীর সহৃদয়তার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা ও বিশালতা নির্ণয় করা যায় না। গ্রামের পিতৃমাতৃহীনা বালিকা কিম্বা যুবতীগণের মধ্যে যাহাদের শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিবার সুযোগ ঘটিত না অথবা যাহাদের কোনও প্রকার তত্ত্ব লইবার কেহ ছিল না, সেই সকল বালিকা ও যুবতীদিগকে তিনি পূজার সময় ও অন্যান্য ক্রিয়া কর্ম্মের সময় আপন গৃহে আনিতেন এবং কন্যা নির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন। কন্যা শ্বশুরালয় হইতে কয়েকদিনের জন্য পিত্রালয়ে আসিয়া যেরূপ মনের আনন্দে দিন কাটায় তাহারাও কিছুদিন সেই প্রকার মনের আনন্দে বাস করিয়া পুনরায় শ্বশুরালয়ে গমন করিত। যাইবার সময় কাশীশ্বরী তাহাদিগকে যথাবিহিত নববস্ত্র ও নৌকাভাড়া দিয়া প্রেরণ করিতেন। ইহাতে তিনি ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কোনরূপ বিচার করিতেন না—সকলকেই সমভাবে স্মরণ করিতেন। আমরা পাশ্চাত্য জগতে কতপ্রকার নরসেবার বৃত্তান্ত পাঠ করি—কিন্তু একাধারে এমন মূর্ত্তিমতী সেবা কেহ কি দেখিয়াছে—দরিদ্রকে অন্নদান, বস্ত্রদান, পীড়িতের সেবা এবং পথ্যের বিধান—মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, অতিথির সেবা, পিতৃমাতৃহীন বালিকার মাতার স্থান পূর্ণ করা, লোকের লৌকিকতা কুটুম্বিতার সহায়তা করা, একটী মাত্র স্ত্রীলোকের শক্তি সামর্থ্যের আয়ত্বাধীন ছিল, ভাবিলে বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া যাই। এমন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক বঙ্গদেশে ছিলেন। হায় বর্ত্তমান শিক্ষা এবং সভ্যতা কি নূতন শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছে! আর কি কাশীশ্বরীর ন্যায় রমণী দুঃখী বাঙ্গালীর

গৃহে অবতীর্ণ হইবেন ? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হয়, আর সে দিন আসিবে না—আর এমন চিত্র দেখিব না।

ব্রজসুন্দর এরূপ মাতার উপযুক্ত পুত্রই ছিলেন। তিনি জননীর দানশীলতা এবং লোকসেবা ব্রত দেখিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেন; বলিতেন "মার পুণ্যফলেই আমার উপর ভগবানের এত দয়া, মা যে দানব্রত করেন তাহাতে ভগবান যে আমায় এত ঢালিয়া দিবেন তাতে আর বিচিত্র কি ?" আর বাস্তবিক ব্রজসুন্দরের জননী এমন কার্য্যকুশলা ও আদর্শ গৃহিণী ছিলেন এবং প্রজাদিগের দ্বারা এমন প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ দ্রব্য ও ফলশস্য উৎপাদন করাইতেন, যে তাঁহার দ্রব্য উৎপাদন, সংগ্রহ এবং রক্ষণের গুণে খরচের অনুরূপ ব্যয়বাহুল্য মনে হইত না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্রজসুন্দরকে কার্য্যোপলক্ষে ঢাকা হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক গ্রামে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। যে স্থানে যে দ্রব্যটী সুলভ দেখিতেন তাহাই ক্রয় করিয়া নৌকায় বোঝাই করিয়া জননীকে প্রেরণ করিতেন এবং জননীর আদেশানুযায়ী ফর্দ্দ দেখিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও গ্রামে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য ঢাকা হইতে প্রেরণ করিতেন; জননী তাহার দ্বারা গ্রামবাসী ও স্থানীয় দরিদ্র প্রজাগণের অভাব মোচন করিতেন।

কাশীশ্বরীর ভাণ্ডারের বন্দোবস্তও অতি চমৎকার ছিল, তিনি ৪। ৫ বৎসরের আহার্য্য পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বিপুল পরিবারের আহার্য্য সংগৃহীত করিয়া রাখিবার জন্য প্রকাণ্ড ভাণ্ডার গৃহ ছিল। তাহা যেন অক্ষয় ভাণ্ডার বলিয়া মনে হইত। তাঁহার ভাণ্ডার গৃহের বিপুল আয়োজন, বন্দোবস্ত, শ্রেণীবিভাগ এবং পরিচ্ছন্নতা এক দর্শনীয় বস্তু ছিল। তিনি যথাযোগ্য স্থানে পরিপাটিরূপে সকল দ্রব্য রক্ষা করিতেন। বধূগণ, আশ্রিতা, এবং আত্মীয় কুটুম্বদ্বারা প্রত্যহ নিয়মিতরূপে নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য এমন যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া ভাণ্ডারে রাখিতেন যে একসময়ে বহু অতিথি

উপস্থিত হইলেও তাঁহাদিগের জলযোগের কোনরূপ অসুবিধা হইত না। অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য দ্রব্যও এমন যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন, এবং তাহাদ্বারাএমন পরিপাটিরূপে কার্য্য করিতেন যে লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। অতিথি দিগের দাঁত খুঁটিবার খড়িকা গুলি পর্য্যন্ত সুন্দর করিয়া কাটাইতেন এবং সুন্দর রূপে সজ্জিত থাকিত। ক্ষীর ও দধি পরিবেশন করিবার জন্য তিনি কখনও চামচ অথবা হাতা ব্যবহার করিতে পান নাই। সেকালে চামচ হাতা কোথায় পাইবেন? নারিকেলের মালা পুষ্করিণীর পঙ্কের ভিতর কিছুদিন রাখিয়া পরে নিপুণ ব্যক্তির দ্বারা চাঁছিয়া পরিষ্কার করাইতেন। তখন সেগুলি প্রায় গয়ার পাথর বাটির মত সুন্দর হইত। তাহা দিয়াই নিত্যকার এবং ক্রিয়া কর্ম্মের ক্ষীর দধি পরিবেশন করিতেন। মৎস্য মাংসের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝিনুক ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করাইয়া রাখিতেন। তাঁহার গৃহে নিত্য বহু পরিমাণে মৎস্যের আমদানি হইত এবং তৎসঙ্গে বহু সংখ্যক বিড়ালও প্রতিপালিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গের এইসকল মৎস্যলোলুপ দুর্দ্দান্ত বিড়ালের কবল হইতে মৎস্য রক্ষা করিয়া আহার করিবার জন্য প্রায় প্রত্যেকের বাম হস্তের নিকট একগাছি লাঠি প্রদত্ত হইত। সেগুলি পর্য্যন্ত যথাস্থানে রক্ষিত হইত, একগাছিও হারাইত না। ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষ্যে লোকের বসিয়া আহার করিবার নিমিত্ত প্রায় একহাজার পীঁড়ি ছিল। প্রত্যক পীঁড়িতে নম্বর দেওয়া ছিল, তিনি অতি অল্প জায়গায় শৃঙ্খলার সহিত সেগুলিকে সাজাইয়া রাখাইতেন। কুলা, ডালা, ধামা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিনে গাবের রস দিয়া রং করাইতেন; তাহাতে সেগুলির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ীও হইত। ঠাকুরসেবার তৈজস পত্র এবং যে সকল অতিথি গৃহে আহার না করিয়া স্বপাকে আহার করিতেন তাহাদিগের জন্য সিধা বণ্টনের তৈজস পত্র এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখাইতেন যে লোকে তৃপ্ত না হইয়া পারিত না। তাঁহার ভাণ্ডারে কোন সামান্য দ্রব্যেরও অপচয় হইতে দিতেন না। সম্বৎসরের জন্য বহুসংখ্যক

গুড়ের জালা কেনা হইত, তাহা হইতে যথাসাধ্য গুড় চাঁছিয়া লওয়া হইত। যখন আর চাঁছিবার উপায় থাকিত না তখন সে গুলি ধুইয়া তাহাতে লবণ এবং লেবুর রস দিয়া ইতর শ্রেণীর লোকের জন্য সরবৎ প্রস্তুত করাইতেন। তাঁহার এক পয়সাও ব্যয় হইত না, অথচ লোকে পান করিয়া তৃপ্ত হইত। সকলেই জানেন নারিকেলের সন্দেশ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য নারিকেল কুরিলে তাহার মালায় অতি সামান্য পরিমাণে নারিকেল অবশিষ্ট থাকে। অনেক গৃহেই তাহা পরিত্যক্ত হয় কিন্তু কাশীশ্বরী সেগুলিকে নষ্ট হইতে দিতেন না। তিনি প্রথমে সেগুলিকে ঝিণুক দিয়া চাঁছাইতেন, পরে বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ গুড় মিশ্রিত করিয়া লাড়ু প্রস্তুত করাইতেন, ভৃত্যদিগের নিত্যকার জলখাবারের মুড়ি মুড়কির সঙ্গে তাহা প্রদত্ত হইত—তাহারা পরমানন্দে আহার করিত।

তিনি নিজে যেমন সুন্দরী ছিলেন তেমনি প্রত্যেক জিনিষই সুন্দর দেখিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য বোধ এমন প্রবল ছিল যে নিজের বাড়ীর তো কথাই ছিল না, সেখানে সিন্দুর পড়িলে সিন্দুর তোলা যাইত, বাগানে গাছের শুষ্ক ডাল, এমন কি কদলীর শুষ্ক বাসনাগুলি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পরিষ্কার করাইতেন, বাগানের গাছতলা পরিষ্কার রাখিতেন; পথ চলিতে চলিতে পথের খড় কুটা পরিষ্কার করিতে করিতে যাইতেন, পথে একটী কাঁটা পড়িয়া থাকিলে পাছে কাহার পায়ে লাগে তাই কাঁটাটী হাতে করিয়া অনেক দূরে ফেলিয়া আসিতেন। কেবল নিজের বাটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তিনি তৃপ্ত হইতেন না, গ্রামের সকলের বাটীই যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহাও করিতেন। গ্রামের বধূ ও গৃহিনীগণ তাঁহার সাড়া পাইলে, কিম্বা তাঁহাকে দূরে দেখিলে ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেন, কোনও বস্তু কোথায়ও অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া ফেলিতেন অথবা লুকাইয়া রাখিতেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই

কাহার না কাহার গৃহে তত্ত্বাবধান করিতে যাইতেন, সকলের সংবাদ লইতেন কত বধূকে উপদেশ দিতেন, কত গৃহিণীকে গৃহিণীপনা শিখাইতেন। যদি কাহাকেও তরি তরকারি কুটিবার সময় উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বিচার না করিয়া অথবা অপকৃষ্ট দ্রব্য রাখিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্য-গুলি অগ্রে কাটিতে দেখিতেন তবে তাহার আর নিস্তার ছিল না, তাঁহার নিকট ছুকথা শুনিতেই হইত।

তাঁহার সাক্ষাতে কাহারও অন্যায়ের ত্রিসীমায় যাইবার উপায় ছিল না। আত্মীয় স্বজন দাসদাসীর তো কথাই ছিল না, প্রজাগণ, জ্ঞাতিগণ এমন কি গ্রামবাসিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ে ত্রস্ত থাকিত।

পুত্রের আর্থিক উন্নতি ও পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জননীর সংসারও ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল। তখন সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া পূজা আহ্নিক সারিয়া তাঁহার আহার করিতে দিবা অবসান হইত। সকল কর্ম্মের এবং প্রত্যেকের আহারের তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া তাঁহার নিজের আহার করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যাইত। এমন কি ভৃত্যগণের আহার পর্য্যন্ত নিজে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতেন। তাঁহার ভৃত্যের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। ২১।২২ জন ভৃত্য যখন পংক্তি করিয়া আহার করিত তিনি সেইখানে দাঁড়াইতেন, কে কি পাইল, কে কি পাইল না, কাহার পাতে কম মাছ পড়িল, কাহাকে কি দিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় দেখিতেন। "কর্ত্তা ঠাকুরাণী" নিকটে না দাঁড়াইলে কাহারও আহার করিয়া তৃপ্তি হইত না। গৃহে প্রস্তুত উপাদেয় আহার সামগ্রী কিম্বা মিষ্ট দ্রব্য অথবা অসময়ে উৎপন্ন সামান্য ফল পর্য্যন্ত পুত্র পৌত্রী অতিথি অভ্যাগত হইতে সামান্য রাখালদিগকে পর্য্যন্ত সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিতেন এবং বলিতেন "দেবে কিঞ্চিৎ না করিবে বঞ্চিত।" বাস্তবিক ক্ষুদ্রতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। কোন প্রকার ক্ষুদ্রতা অপরের ভিতর দেখিলে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার ন্যায় উদার হৃদয়া রমণী সচরাচর দেখা যায় না।

পারিবারিক জীবন—প্রথম চিত্র।

ব্রজসুন্দর বড়ই জননীর গুণগ্রাহী ছিলেন, মাতার অশেষ সদ্‌গুণ দেখিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। কাশীশ্বরী যখন ভগ্নীগৃহে গৃহিণীপণা করিতেন তখন পাছে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায় এই ভয়ে সে কালের ধনী গৃহে অপর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও নিজ পুত্রদ্বয়কে অতি অল্প পরিমাণে উপাদেয় দ্রব্যাদি দিতেন। তিনিইতো দিদির গৃহের কর্ত্ত্রী ছিলেন, ক্ষুদ্র প্রকৃতি যেখানে আপনার সন্তানকে খাওয়াইয়া সুখী হয়, সেখানে পাছে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায় এই ভয়ে তিনি স্বীয় পুত্রদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পপরিমাণে আহার্য্য দিতেন। তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার মধ্যে মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর চক্ষে পড়িত, তখন তিনি কাশীশ্বরীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেন।

ব্রজসুন্দর যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন তখন কাশীশ্বরী ভগ্নীর নিকট কাশীতে বাস করিতেছিলেন। পুত্রের বিধর্ম্মী হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ভগ্নীপতি জয়নাথ ঘোষ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "কাশী আমরা কি বিরজুকে জানি না, সে কখনই খৃষ্টান হয় নাই, তুমি এত কাতর হইতেছ কেন, আমার খুব মনে হইতেছে সে কলিকাতার রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে ধর্ম্ম খৃষ্টান ধর্ম্ম নয়, সে ধর্ম্ম বেদান্ত ধর্ম্ম, তুমি কোনও ভাবনা করিও না।" এরূপ সান্ত্বনা লাভ করা তাঁহার পক্ষে স্বভাব সিদ্ধ ছিল, কারণ শোকে দুঃখে বিপদে কাতর হওয়া কাশীশ্বরীর প্রকৃতিগত ছিল না। কঠোর জীবন সংগ্রামে তিনি কখনও কাহারও সাক্ষাতে চক্ষের জল ফেলেন নাই। সেই জন্য তিনি এমন পরোপকারিণী হইয়াও যখন কোনও বিধবা কিম্বা কোনও অত্যাচারিত ব্যক্তি প্রবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইত, তিনি ব্রজসুন্দরের দ্বারা তাহাদিগকে যথা সাধ্য সাহায্য করিতেন বটে কিন্তু তাহাদিগের অনবরত ক্রন্দন সহ্য করিতে পারিতেন না। অনবরত ক্রন্দন করিতে দেখিলে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাকুক বরং বিরক্ত

হইয়া বলিতেন "নাও হয়েছে সারাদিন প্যান প্যান করিও না, তোমরাই প্যান প্যান করিয়া আমার বাড়ীতে অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবে দেখিতেছি।" ক্রন্দন না করিয়া সংযত ভাবে যে ব্যক্তি তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইত তাহার প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক ভগ্নীপতির ঐরূপ আশ্বাস বাক্যে তিনি কতক প্রকৃতিস্থ হইলেন। কাশীতেই জয়নাথ ঘোষের মৃত্যু হয়, তারপর তাঁহারা সকলে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কাশীশ্বরী জ্ঞাতিবর্গের গঞ্জনার ভয়ে দেশের বাড়ীতে না উঠিয়া একেবারে ঢাকায় আসিয়া পুত্রের বাসায় উঠিলেন। বুদ্ধিমতী নারী পুত্রের নিকট ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না। পুত্র আফিসে গেলে ভগ্নীপুত্র দীননাথের বাসায় গেলেন। দীননাথ আফিস হইতে আসিয়া মাসীমাকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "মাসীমা, তুমি সে কুলাঙ্গারের ঘরে থাকিও না, তুমি এইখানে আমার নিকট থাক, দুর্গাদাসকে আমি এত বারণ করিলাম, গাধা আমার কথা শুনিল না, দেখা যাইবে শেষে কি হয়? তোমাকেও বলিতেছি বিরজুর বাসায় তোমার কোন মতেই থাকা উচিত নয়।" কাশীশ্বরী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষোভের সহিত বলিলেন "দীনু লোকে আম খায়, না আম ফেলিয়া আটি খায়? আমি বিরজুকে ছাড়িয়া কি লইয়া, কাহাকে লইয়া সংসারে থাকিব? আমি বিরজুকে ছাড়িতে পারিব না, যা হয় হইবে।" দীননাথ মহা বিরক্ত হইলেন। কাশীশ্বরী পুত্রের বাসায় ফিরিয়া আসিয়া কেবল পুত্রের ব্যবহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বাসার সকলে বলিতে লাগিল "বাবুর জন্য আমাদের রাস্তায় বাহির হইবার যো নাই, সকলে বলে বাবু নাকি সমাজে গিয়া মদ্য মাংস খান, সকলে বলে ব্রজসুন্দর বাবুর জন্য ঢাকা সহরের গরু, বাছুর রহিল না।" জননী শুষ্ক মুখে এই সব নানা কাহিনী শুনিতেন। প্রতি বুধবার সমাজের দিন নিজের বিশ্বাসী লোককে পুত্রের অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পাছে কেহ মিথ্যা বলে সেই জন্য প্রতিবারে নূতন লোক প্রেরণ করিতেন। সকল দূতই আসিয়া

বলিতে লাগিল "মদ্যও নয় মাংসও নয়, বাবুরা চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকেন, গীতবাদ্য হয়, শাস্ত্র পাঠ হয়, কি সব বলেন।" এই সব শুনিয়া এবং পুত্রের ভক্তি প্রণোদিত ব্যাপার দেখিয়া মাতা কতক নিশ্চিন্ত হইলেন। যাহারা তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে এই সব মিথ্যা কথা রটনা করিয়াছে তাহাদিগের উপরই চটিয়া গেলেন। ক্রমে পুত্রের সহিত ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় গর্ব্বিতা প্রতাপান্বিতা রমণীর পক্ষে বিধর্ম্মী পুত্রের মাতা হইয়া সকলের নিকটে হেয় হইয়া থাকা, সকলের গঞ্জনা নীরবে সহ্য করা যে একান্ত কষ্টকর ব্যাপার হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি সর্ব্বদাই অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিতেন "বিরজু লোকে তোকে নিন্দা করে, আমি এ দুঃখ কোথায় রাখি? সকলে তোকে একঘ'রে করিল, ইহা আমি কি করে সহ্য করি?" পুত্র হাসিয়া বলিতেন "মা এর জন্য তুমি এত কষ্ট পাও কেন? ভেবে দেখ লোকের নিন্দা প্রশংসার কি কোনও মূল্য আছে? আজ যারা নিন্দা করিতেছে, কাল তারা প্রশংসা করিবে। আর লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ না খাইলেই বা দুঃখ কি? লোকে রোজ নিমন্ত্রণ করিবে না বৎসরের মধ্যে না হয় ২।৪ দিন, রোজ যদি ঘরে খাইতে পারি, নিমন্ত্রণের ২।৪ দিন না হয় ঘরেই খাইব।" এইরূপে ব্রজসুন্দর জননীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এ সকল কথায় তাঁহার অন্তরের দুঃখ দূর হইত না। ক্রমে তিনি পুত্রকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন, শত উত্যক্ত হইলেও ব্রজসুন্দরের মাতৃভক্তি একদিনের জন্য মন্দীভূত হয় নাই। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া জননী দেবীকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিতেন, গ্রামান্তরে যাইবার সময়ও জননীর পদধূলি মস্তকে না লইয়া গৃহত্যাগ করিতেন না। ব্রাহ্ম হওয়ার পর পুত্র প্রণাম করিতে গেলে মাতা সজোরে পদাঘাত করিয়া পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিতেন, ব্রজসুন্দর হাসিয়া অগ্রসর হইয়া আবার চরণে মস্তক রাখিতেন। ব্রজসুন্দর

যখন বাড়ীতে যাইতেন, তখন অনেক সময় বহির্ব্বাটীতে লোকজনে পরিবৃত হইয়া সকলের সহিত আলাপ করিতেন, এবং সকলের অভাব অভিযোগ শুনিতেন ; তখন এক এক দিন জননী ক্রুদ্ধ হইয়া সদ্যছিন্ন বৃক্ষশাখা হস্তে লইয়া গালি দিতে দিতে পুত্রকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেন। উপস্থিত লোকেরা শঙ্কিত এবং ত্রস্ত হইয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইত, ব্রজসুন্দর হাসিয়া মাকে মিষ্ট কথায় শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, তথাপি তাঁহার বিরক্তি বা ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না। পুত্রের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে কাশীশ্বরীর আক্রোশের মাত্রা পুত্র অপেক্ষা পুত্রবধূর উপরই অধিক প্রকাশ পাইত। বধূকে এজন্য কতই না পদাঘাত, কতই না লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছিল, চিরজীবন অসহ্য বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। যেমনি পুত্র তেমনি পুত্রবধূ তাঁহার সমুদয় অত্যাচার নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবানের পরই ব্রজসুন্দর আজীবন জননীর চরণপূজা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার এই মাতৃপূজার সহায় ছিলেন। তাঁহারা কি ভাবে এ মহাপূজা সাধন করিয়াছিলেন এবং কিরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উভয়ের জীবনের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্ম বিশ্বাস অন্তরায় না হইলে এমন কোন বাধা এ জগতে ছিল না যাহা তাঁহাদের জননীর প্রীতিসাধন ব্রতে বাধা জন্মাইতে সক্ষম হইত। জননী অতি নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতেন, অতি নিষ্ঠার সহিত বিগ্রহ সেবা, পূজা পার্ব্বন, ব্রতনিয়ম, তীর্থযাত্রাদি করিতেন। কাশীশ্বরী ঢাকা হইতে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়াছিলেন।

পুত্র অতি সন্তুষ্ট মনে সকল ব্যয় ভার বহন করিতেন, কখনও তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন নাই। মুক্ত হস্তে জননীকে অর্থ দিতে পারিলে তাঁহার সুখের সীমা থাকিত না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে মিত্রমজুমদারগণ অতি সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন বংশ, তাঁহাদিগের স্থাপিত গৃহদেবতাগণও অতি প্রাচীন। সেই সকল গৃহদেবতা, ও অন্যান্য দেবতাগণের পূজা পার্ব্বণে পূর্ব্বকালে বিপুল সমারোহ হইত। কাশীশ্বরী

পারিবারিক জীবন—প্রথম চিত্র।

দেবী পূর্ব্বের ন্যায় সমারোহে দেবসেবা করিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু শ্বশুরকুলের বিগ্রহসেবার সমারোহের কথঞ্চিৎ নিয়ম রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেন। উদারপ্রাণ ব্রজসুন্দর জননীর এই বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার বহনে কখন ইতস্ততঃ করেন নাই, বরং দরিদ্রদেশে প্রকারান্তরে ইহা দ্বারা লোকসেবাই সাধিত হয়, এই বিবেচনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। অনেকে মনে করেন যে মূর্ত্তিপূজার ব্যয় নির্ব্বাহের সাহায্য করিলে প্রকারান্তরে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কিন্তু ব্রজসুন্দর সে চক্ষে ধর্ম্মকে দর্শন করিতেন না। যাহাতে জননী অন্তরে তৃপ্তিলাভ করিতেন, তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইতেন না। দুর্গোৎসবের কয়দিনে এবং নবান্ন উপলক্ষে বিগ্রহদেব গোপীজনবল্লভের অন্নকোটী যাত্রা উপলক্ষে মহোৎসবে কয়েক সহস্র লোককে তিনি পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইতেন। নবান্ন এক অতি প্রেমের উৎসব ছিল—বৎসরের মধ্যে সেই একটী দিন কায়স্থের গৃহে গৃহদেবতা গোপীজনবল্লভকে নবান্নের ভোগ দেওয়া হইত। সেই দিন মিত্রমজুমদারদিগের গৃহপ্রাঙ্গনে কি প্রেমের হাট বসিয়া যাইত. জমিদার প্রজা, ইতর, ভদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী দরিদ্র সকলে জাত্যভিমান বিস্মৃত হইয়া একই প্রাঙ্গণে সারি দিয়া বসিয়া নূতন অন্ন সকলে মহানন্দে ভোজন করিতেন। বৎসরের আর ৩৬৪ দিন কাহার ভাগ্যে কিরূপ ঘটে তা কে জানে, কিন্তু এই একটী দিনে, এক অন্ন সকলে গ্রহণ করিত। সে দিন সেই প্রেমের হাটে অভুক্ত কেহ থাকিত না, প্রেমিক ব্রজসুন্দর এই প্রেমের ভোজ দিয়া আনন্দ পাইতেন, এই নবান্নভোজনের দৃশ্য তাঁহাকে পরমানন্দ দান করিত। কাশীশ্বরী এরূপ যোগ্যতার সহিত এই সকল মহাযজ্ঞ সমাধা করিতেন যে একদিনের জন্যও কোন বিশৃঙ্খলা কিম্বা অনাটন বা অপচয় হইত না। গৃহ-প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার হইত না।

পূজা পার্ব্বনে তাঁহার গৃহ অন্নসত্রের রূপ ধারণ করিত, দূরের গ্রামের প্রজাগণ ও গ্রামবাসিগণ নিমন্ত্রিত হইত, আহূত ও

রবাছতে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিত। পূজার সময় বিধবাদিগের ৩।৪ দিন আহার করিতে নাই, কাশীশ্বরী এই তিন চারি দিন নিজে অভুক্ত থাকিয়া যে রকম অক্লান্ত ভাবে সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন, সকল কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তাহা একজন বলিষ্ঠকায় যুবকেরও অসাধ্য ছিল। পূজার সময় তিনি প্রায় ৪০০৲ টাকার বস্ত্র বিতরণ করিতেন। শুভকার্য্যে সধবা ও কুমারীদিগকে বস্ত্র দেওয়াই আমাদের দেশের ব্যবস্থা ছিল। কাশীশ্বরীও সেই জন্য সধবা ও কুমারীদিগকে বস্ত্র দিতে ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু ব্রজসুন্দর বলিতেন "মা সধবা ও কুমারীদিগকে কাপড় দিবার লোক আছে, আপনি বিধবাদিগকে বস্ত্র দিন, যাহারা পতি-পুত্রহীনা, যাহাদের মুখের দিকে চাহিবার কেহ নাই তাহারাই ত দানের উপযুক্ত পাত্রী, পূজার সময় তাহারা একখানি নূতন কাপড় পাইলে কত সুখী হইবে।" জননী পুত্রের পরামর্শমত বিধবাদিগকেও বস্ত্র দিতেন। কুমারী পূজা শুধু দক্ষিণা দিয়া সারিতেন। ব্রজসুন্দরের কোমল হৃদয় ছাগ বলিতে নিতান্ত ব্যথিত হইত। তিনি জননীকে পূজার সময় বলি উঠাইয়া দিবার জন্য অনেক বলিতেন। কিন্তু কাশীশ্বরী এ কথার সমর্থন করিতে পারিতেন না, বলিতেন, "সে কি, শাক্ত গৃহে বলি না হলে কি ভগবতী প্রসন্ন হবেন" ? তখন ব্রজসুন্দর বলিতেন, "মা আমি কিন্তু তোমার বলির জন্য পাঁঠা কিনিতে টাকা দিব না"। আর বাস্তবিক হিসাব করিয়া পাঁঠা কিনিবার টাকাটী ফর্দ্দ হইতে বাদ দিতেন। যা'হোক কাশীশ্বরী যে কোন উপায়ে বলির ছাগের ব্যবস্থা করিতেন। তবে পুত্রের অনুরোধে মহিষ বলি উঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং ছাগের সংখ্যাও কমাইয়া আনিয়াছিলেন। পূজার সময় ব্রজসুন্দর কখন বাড়ী যাইতেন না, বন্ধু রামশঙ্কর সেন, কৃষ্ণচন্দ্র রায় কিম্বা অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে গমন করিতেন। বিজয়ার দিন সন্ধ্যাকালে বাটী আসিয়া জ্যোৎস্না-ধৌত রজনীতে আলিপনা রঞ্জিত প্রাঙ্গণে বিজয়ার ভোজ দেখিতেন ও সকলের সম্মিলন দেখিয়া কোলাকুলি প্রেমালিঙ্গন করিতেন।

কাশীশ্বরীর অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে চিত্তের উদারতা যথেষ্ট ছিল।

পারিবারিক জীবন—প্রথম চিত্র।

রামদয়াল সিংহ নামে একজন প্রজা ব্রজসুন্দরের খানসামা ছিল। রামদয়াল স্ত্রীর জন্য রূপার মল গড়াইয়া অতি সংগোপনে তাহার নিজ জননীর হাতে আনিয়া দিয়াছিল। এই সময়ে শিকদারবধূগণের পায়ে মল পরিবার অধিকার ছিল না, তাহারা আর সকল প্রকার অলঙ্কার পরিধান করিতে পারিত, কিন্তু পায়ে মল পরিতে পারিত না, মল পরিবার অধিকার কেবল উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের ছিল। পাছে মনিবেরা রুষ্ট হন, এই ভয়ে রামদয়ালের মা বধূর পায়ে মল পরাইতে সাহস করিল না। কিন্তু রামদয়ালের বৌয়ের এই মলের কথাটা গোপন রহিল না, কাশীশ্বরীর কাণে গেল। গ্রামের স্ত্রী মহলে এই ব্যাপার লইয়া বেশ একটা রহস্য ও বাকবিতণ্ডা চলিতে লাগিল। কাশীশ্বরী সকল বিষয়েই গ্রামের অধিনেত্রী ছিলেন, তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না। একদিন সকালে বেড়াইতে বেড়াইতে রামদয়ালের বাড়ীতে গিয়া তাহার মাকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমার রামদয়াল নাকি বৌএর জন্য মল আনিয়াছে আন ত দেখি কেমন মল ?" এই কথা শুনিয়াই বৃদ্ধার মুখ শুকাইয়া গেল—সসম্ভ্রমে মল আনিয়া কাশীশ্বরীর হাতে দিলেন; তিনি মল হাতে লইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন "বেশত মল, বৌকে ডাক, আমার সাক্ষাতে মল পরুক দেখি কেমন দেখায় ? সকলে একথা শুনিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় তাহাদের প্রাণ পূর্ণ হইল। বৌ আসিলে কাশীশ্বরী তাহার হাতে মল দিয়া পরিতে বলিলেন সে ভক্তিভরে গলবস্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেল, তিনি বলিলেন "আমাকে প্রণাম কর কেন আগে ঠাকুরের পা ছোঁয়াইয়া মল পর।" কাশীশ্বরীর এই উদার ব্যবহারে রামদয়ালের মা আকাশের চাঁদ যেন হাতে পাইল, কত যে আনন্দিত হইল তাহা বলা যায় না। কাশীশ্বরী ক্ষুদ্র মনা স্ত্রীলোক ছিলেন না, অপরের ন্যায্য অধিকার খর্ব্ব করিবার চেষ্টাও করিতেন না, সময়ের সঙ্কেত বুঝিতে তাঁর মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের বিলম্বও হয় নাই। তখন হইতে শূদ্র প্রজার গৃহিণীরাও

মল পরিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। ব্রজসুন্দর তাঁহার মাতার এই কার্য্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার ভিতর তাঁহার মাতার কতদূর উদারতা ও দূরদর্শিতা নিহিত ছিল তাহা তিনিই বুঝিয়াছিলেন। বাস্তবিক কাশীশ্বরীর ভিতর উচ্চ কুলজাত রমণীসুলভ অনেক সদ্‌গুণ ছিল। বাহ্যতঃ তিনি উদ্ধত, উগ্র, গর্ব্বিতা ও কটুভাষিণী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরটী অত্যন্ত কোমল ও পরদুঃখকাতর ছিল, তিনি মুখে কখন এসকল ভাব প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার পুত্র অতি প্রিয়ম্বদ ছিলেন,—বিনয় ভক্তিতে তাঁহার হৃদয়টী একেবারে বিনম্র ছিল। মাতা যেমন উদ্ধত ও গর্ব্বিতা, পুত্র তেমনি নম্র ও বিনীত ছিলেন। ব্রজসুন্দরের প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্মসম্মান পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিতে গিয়া, প্রতিকূল ঘটনার ভিতর পড়িয়া কাশীশ্বরীর প্রকৃতি এরূপ হইয়াছিল। আজীবন জননী এবং পুত্রের ভিতর গভীর প্রেমের যোগ ছিল। ব্রজসুন্দর বুঝিতেন তাঁহার জননীর ন্যায় রমণী নারীকুলে কিরূপ দুর্লভ আর ব্রজসুন্দর যে কি অমূল্য রত্ন তাহা জননী বিলক্ষণ অনুভব করিতেন। পুত্রের মাতৃভক্তির উপর তাঁহার এতদূর আস্থা ছিল, যে পুত্রের উপর আধিপত্য করিতে কখনই দ্বিধা করেন নাই। ব্রজসুন্দর সমুদয় দিবসের গুরুতর পরিশ্রমের পর জননীর সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তখন গৃহের বাহিরের লোকের সুখ দুঃখের কত প্রসঙ্গই হইত, মাতার সহিত কত বিষয়ের আলোচনা করিতেন, কত ভাল কথা, জ্ঞানের কথা তাঁহাকে শুনাইতেন, এমন কি স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা, বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা পর্য্যন্ত জননীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। জননীও এই সময়ে কত লোকের উপকার করিবার জন্য পুত্রকে অনুরোধ করিতেন। ব্রজসুন্দর অপরের হিত সাধন করিতে নিয়ত তৎপর ছিলেন, সুতরাং জননীর এই সকল অনুরোধ তিনি কখনও উপেক্ষা করিতেন না, বরং ঔৎসুক্যের সহিত তাহা পূর্ণ করিতেন পুত্রের গৌরবে কাশীশ্বরীর কত গৌরব, পুত্রের সহায়তায় কাশীশ্বরীর কি শক্তি, পুত্রের বদান্যতায় কাশীশ্বরীর কি অক্ষয়

পারিবারিক জীবন—দ্বিতীয় চিত্র।

ভাণ্ডার, পুত্রের ভক্তিতে কাশীশ্বরীর কি মহিমাই প্রতিভাত হইত! যেমন মাতা তেমনি পুত্র, এমন চিত্র এ সংসারে বড়ই দুর্লভ!

দ্বিতীয় চিত্র—পত্নী ব্রহ্মময়ী।

কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ব্রজসুন্দর ১৯ বৎসর বয়সে ঢাকা কমিশনারের অফিসে কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার প্রায় দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ২১ বৎসর বয়সে ব্রজসুন্দরের বিবাহ হয়। এই পরিণয় ব্যাপারেও ব্রজসুন্দরের গুণগ্রাহিনী শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিবাহের পূর্ব্বে নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিয়াছিল, তন্মধ্যে একটী কন্যা অত্যন্ত রূপবতী ছিল। কাশীশ্বরী নিজে সুন্দরী ছিলেন, সেই জন্য সেই সুন্দরী বালিকাটীকে পুত্রবধূ করিবার মনস্থ করিলেন। এদিকে ব্রজসুন্দর লোক পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে মেয়েটী সুন্দরী বটে কিন্তু প্রকৃতি বড় উগ্র। ব্রজসুন্দর মনে মনে স্থির করিলেন রূপের জন্য এমন মেয়েকে বিবাহ করিবেন না, সুতরাং নানাপ্রকারে জননীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে নির্গুণের রূপ সংসারে শান্তির পরিবর্ত্তে বিষম অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ বিবাহের কথা বার্ত্তা হইতেছে ইতি মধ্যে একদিন দীননাথ ঘোষের সহোদরা ব্রজসুন্দরের মাসতুত ভগিনী হরসুন্দরী বলিলেন "বিরজু দাদা, শুনিলাম তুমি নাকি সুন্দরী মেয়ে চাও না, লক্ষ্মী মেয়ে চাও। তাই যদি হয়, আমি তাহোলে যথার্থই একটী অতি লক্ষ্মী মেয়ের কথা জানি, মেয়েটী আমারই শ্বশুরকুলের জ্ঞাতির মেয়ে। মেয়েটীর রূপ নাই, তবে তার গুণের শেষ নাই, সেই মেয়েটীকে বিবাহ কর্‌বে কি? কর্‌লে নিশ্চয় তুমি সুখী হবে।" হরসুন্দরী আরও বলিলেন যে মেয়েটী সুন্দরী নয় বটে কিন্তু অঙ্গে যথেষ্ট লক্ষ্মীশ্রী আছে। মেয়েটীর গুণের কথা শুনিয়া ব্রজসুন্দর তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইনিই ব্রহ্মময়ী,

অগ্রপুরের জমিদার, স্বরূপচন্দ্র বসুর দুহিতা—ব্রজসুন্দরের মনোনীতা পত্নী। ব্রহ্মময়ীকে বিবাহ করিয়া ব্রজসুন্দর রূপের উপর গুণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিলেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় নব বধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিবার সময়ই ব্রহ্মময়ীর উপর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অপ্রসন্নদৃষ্টি পতিত হইল। তাঁহাদের বংশে কখনও কালো বৌ আসে নাই, তাঁর এত আদরের ব্রজসুন্দরের কালো বৌ হইল, এই দুঃখে তাঁহার হৃদয় ম্রিয়মাণ হইল। কিন্তু কি শুভক্ষণেই ব্রজসুন্দর এমন কালো বৌ ঘরে আনিয়াছিলেন। শাশুড়ী চিরদিন রূপের কথা বলিয়া বধূকে গঞ্জনা দিতেন, কিন্তু ব্রজসুন্দর অন্তরের অন্তরে বুঝিতেন কি রত্নই তিনি গৃহে আনিয়াছেন। বলিতে গেলে শাশুড়ীর এই অপ্রসন্নভাব ব্রহ্মময়ীকে আজীবন বহন করিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মময়ী দেখিতে সুন্দরী ছিলেন না বটে, কিন্তু বিশেষ অঙ্গসৌষ্টব-সম্পন্না রমণী ছিলেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার মুখশ্রীতে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য না দেখিলেও, দেশবাসী সকলেই তাঁহার শান্ত কোমল লক্ষ্মীশ্রীর প্রশংসা করিত। তিনি তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে ব্রজসুন্দর, আত্মীয় স্বজন ও প্রজাগণকে আজীবন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরের ডায়েরী পাঠে আমরা দেখিতে পাই ব্রহ্মময়ী ৩৪ বৎসর ব্যাপী সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্যও পতির কিম্বা বহুল আত্মীয় স্বজন পরিবৃত একান্নভুক্ত সংসারের কোনও ব্যক্তির, কোনরূপ কষ্টের কারণ উপস্থিত করেন নাই, বরং সকলকে সুখী করিবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ব্রজসুন্দর জননীর প্রকৃতি বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন শাশুড়ীর অধীনে ব্রহ্মময়ীকে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, সেই জন্য বালিকা পত্নীকে প্রথম পরিচয়ের দিনে একটী কঠিন প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধা করেন, তাহা এই—"আমার মা এবং ভাই শত কষ্টের কারণ উপস্থিত করিলেও আমাকে জানাইও না। ব্রহ্মময়ী শত কষ্টের ভিতর নীরবে আমরণ এই দুরূহ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া গিয়াছেন, কতদিন কত দুঃখ কষ্টে তাঁহার

পারিবারিক জীবন—দ্বিতীয় চিত্র।

হৃদয় ভেদ হইয়া গিয়াছে—কত অবিচার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছেন কিন্তু পতিকে বিন্দু বিসর্গ জানিতে দেন নাই। পতি পত্নীর মধ্যে গভীর প্রেমের যোগ থাকিলেও ব্রহ্মময়ী সংসারে সুখ শান্তির আস্বাদন লাভ করেন নাই; তাহার কারণ একান্নভুক্ত বৃহৎ পরিবার। আশ্রিত, কুটুম্ব, অতিথি অভ্যাগত, পরিবার, পরিজন, ভৃত্য প্রভৃতি লইয়া সেরূপ বৃহৎ পরিবার এখন রাজা মহারাজাদিগের ঘরেও দেখা যায় না। এরূপ বৃহৎ গোষ্ঠির প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া চলা, প্রত্যেকের সুখ সুবিধার জন্য নিজের সুখ সুবিধা বলি দেওয়া, বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। ব্রহ্মময়ী অক্লান্ত ভাবে উদয়াস্ত এই বৃহৎ পরিবারের সেবা করিতেন। তিনি গৃহকর্ম্মে এবং রন্ধনবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দিবানিশি সাংসারিক কর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিতেন, তাঁহার সন্তানদিগের পরিচর্য্যা করিবার কেহ ছিল না। শিশুসন্তানগণ একমুষ্টি অন্ন যথাসময়ে পাইত না। যাহাদের পিতার ধনে এত লোক প্রতিপালিত হইত, যাহাদের পিতার সংসারে অপর্য্যাপ্ত দ্রব্যসম্ভার, তাহাদের একখণ্ড মৎস্য বিড়ালে লইয়া গেলে, কাশীশ্বরী উপস্থিত না থাকিলে আর একখানি মৎস্য মিলিত না। সন্তানদিগের অযত্ন কষ্ট দেখিয়াও ব্রহ্মময়ী কোন কথা বলিতেন না। ব্রহ্মময়ী জানিতেন একটী বাক্য উচ্চারণ করিলে শত কূটার্থ বাহির হইবে, নানা কলহের উৎপত্তি হইবে, অতএব নির্ব্বাক্ থাকাই শ্রেয়ঃ। বুদ্ধিমতী ব্রহ্মময়ী নির্ব্বাক্ থাকিয়া সংসারে শান্তিরক্ষা করিতেন। মুখ ফুটিয়া একটী, দুঃখের কথাও স্বামীর নিকট বলেন নাই। বৃহৎ পরিবারের পরিচর্য্যায়, শাশুড়ীর তাড়নায়, তাঁহার দেহমন নিষ্পেষিত হইয়াছিল। তাঁহার পুঞ্জীকৃত দুঃখ কষ্ট সকল অব্যক্ত থাকিয়া তাঁহার দেহের সহিত চিতানলে ভস্মীভূত হইত যদি তাঁহার সুখ দুঃখের সঙ্গিনী কন্যাগণ না থাকিতেন। তাহা হইলে বোধ হয় এ সকল কাহিনী চিরদিনই প্রচ্ছন্ন থাকিত। সংসারে অপর সকলের তুলনায় ব্রহ্মময়ীর আহার-বিহারের,

বেশভূষার বিশেষ অভাবই ছিল। তাঁহার পতির অন্নে প্রতিপালিত ব্যক্তিরা যেরূপ সুখ ও স্বাধীনভাবে তাঁহার সংসারে বাস করিত তাঁহার তাহা ঘটিত না। সকলের কর্ম্মের বিরাম হইত, তাঁহাকে কিন্তু সংসারের হাল ধরিয়াই থাকিতে হইত। অন্য কোন ক্ষুদ্রচেতা রমণী হইলে মনে করিত "আমার স্বামীর উপার্জ্জনে সকলের সুখ, আর আমিই দুঃখের বোঝা বহিয়া মরি?" ব্রহ্মময়ী একদিনের জন্যও তুচ্ছ সাংসারিক সুখের অভাবে ক্ষোভ করেন নাই। বেশভূষায় স্পৃহাহীনা, আহারে বিহারে অনাসক্তা ব্রহ্মময়ী, পদ্মপত্রের সলিলবিন্দুর ন্যায়, ব্রজসুন্দরের গৃহে কর্ত্তৃত্বপ্রিয়া, কটুভাষিণী শাশুড়ীর অধীনে গৃহিণীপনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন শারীরিক শ্রম করিলে উচ্চ-বংশীয় রমণীর মর্য্যাদা হানি হয় না। পতির গৃহে গৃহিণীই ত সকলের সুখ দুঃখ দেখিয়া চলিবেন, তিনিই ত অন্নদায়িনী, তিনিই ত সকলের কল্যাণরূপিণী জননী। যিনি দান করেন তিনিই গৃহিণী, যিনি সহ্য করেন তিনিই পূজনীয়া, ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। ব্রহ্মময়ীর সহিষ্ণুতার সীমা ছিল না। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বসহা নারী দুর্লভ বলিলেই হয়। অনেক দিনে, অনেক ঘটনায় তাঁহার সহিষ্ণুতা পৌরাণিক যুগের নারীকুলের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। জননীর প্রতি পরিবারস্থ অনেকের নির্য্যাতন দেখিয়া অনেক সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতাকে বলিয়া দিবেন বলিয়া জননীকে ভয় দেখাইতেন। তখন ব্রহ্মময়ী সকাতরে সজল নয়নে কন্যার হাঁত দুটী ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেন "আমার মাথা খাও, তোমার বাবাকে কিছু বলিও না, জল কাটিলে দুভাগ করা যায় না, তোমার ঠাকুর মা প্রভৃতি যাহাই করুন তাঁরা আপনার জন! আপনার জন শত অত্যাচার করিলেও পর হয় না, যাহা হইবার হইয়াছে, সহ্য কর, সহ্য কর।" এমন কথা কয়জন বলিতে পারেন? কখনও বা কন্যাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিতেন "মা এত রাগ কর কেন? তোমার বাপের জন্যই ত এত বড় সংসার, তোমার বাবার আশ্রিত সকলেই, আমরা সহ্য করিব না ত কে সহ্য

করিবে?" কন্যার বিদ্রোহিতায় কখনও কখনও বিরক্ত হইয়া বলিতেন "তোর জন্য দেখ্‌ছি সংসারে আর শান্তি রহিল না, তুই সব নষ্ট করিলি।"

ব্রজসুন্দর সকল বিষয়ে মাতার ইচ্ছাই পালন করিতেন। মাতাই সংসারের গৃহিণী ছিলেন, তাঁহারই সমুদায় কর্ত্তৃত্ব, পত্নী কেবল তাঁহার সেবাব্রতের এবং মাতার ইচ্ছাপালন কার্য্যের সহকারিণী ছিলেন। ব্রহ্মময়ীর প্রতি ব্রজসুন্দরের গভীর শ্রদ্ধা ছিল; ব্রহ্মময়ী তাহা বুঝিতেন বলিয়াই সংসারিক সুখ ভোগের জন্য লালায়িত হইতেন না। ব্রজসুন্দর কত সময় জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বলিতেন "তোমরা লেখা পড়া শিখিয়াছ বলিয়া মনে করিও না যে তোমার মার মত সুবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা তোমাদের আছে; যাঁরা আপনাদের পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদেরও তোমার মার নিকট অনেক শিখিবার আছে, মার কথা কখনও অবহেলা করিও না।" ব্রহ্মময়ী যেন ব্রজসুন্দরের গৃহের শান্তিময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। জননীর তর্জ্জন গর্জ্জনে বাটী নিনাদিত হইত, সকলে থরহরি কম্পান্বিত হইত, আর ব্রহ্মময়ীর হাতেই কাজ, রসনা নীরব। দুটী কথা যখন বলিতেন, তাহাও মৃদু এবং মধুর। ব্রহ্মময়ীর জন্যই সংসারে আশ্চর্য্যরূপে শান্তি রক্ষিত হইত, তাঁহারই জন্য ব্রজসুন্দর পরিবারে সর্ব্ববিষয়ে সমদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। নিজকন্যা ও দুর্গাদাসের কন্যাদিগকে সমভাবে পালন করিয়াছিলেন, সমভাবে বিবাহ দিয়া ছিলেন। এইরূপে তাঁহাকে ১৩টী বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছিল। দুর্গাদাসের স্ত্রী-কন্যাদিগকে অতিক্রম করিয়া অলঙ্কারতো দূরের কথা সমগ্র জীবনে সামান্য একখানি বস্ত্রও নিজের স্ত্রী কন্যাকে অধিক দেন নাই। ব্রহ্মময়ী এবং দুর্গাদাস উভয়ের জন্যই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। স্বোপার্জ্জিত বিষয় সম্পত্তির দ্বারা ভ্রাতার আজীবনের সংস্থানও করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্গাদাস জীবনে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই

এবং উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন না বলিয়া জননীর স্নেহ তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর প্রতি অধিক প্রকাশ পাইত। দুর্গাদাসের পত্নী সুন্দরী ছিলেন, শাশুড়ীর ভালবাসার ইহাও এক কারণ। তিনি জ্যেষ্ঠা বধূকে গঞ্জনা দিতে কখনও ছাড়েন নাই বটে, কিন্তু ব্রহ্মময়ী জীবন ব্যাপিনী সেবা-পরায়নতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা দ্বারা শাশুড়ীর হৃদয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শাশুড়ীর জ্যেষ্ঠা বধূর বুদ্ধি বিবেচনার উপর বড়ই আস্থা ছিল। কোন বিষয়ে কর্ত্তব্য নিরূপণে সংশয় হইলে তিনি গোপনে জ্যেষ্ঠা বধূর নিকট সৎপরামর্শের জন্য উপস্থিত হইতেন; ব্রহ্মময়ী দুটী কথায় ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে যাহা বলিতেন শাশুড়ী তাহাই মানিয়া লইতেন। ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর পর শাশুড়ী তাঁহার শ্মশানে ও ঠাকুর ঘরের দ্বারে বসিয়া আকুল হইয়া বড়বধূর নাম ধরিয়া কাঁদিতেন। কাশীশ্বরী পরিণামে বুঝিয়াছিলেন তাঁর বধূর মত বৌ সহজে কেহ পায় না। জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর এজ্ঞান জন্মিয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মময়ী জীবিতাবস্থায় শাশুড়ীর মুখে সাধুবাক্য শুনিয়া যাইতে পারেন নাই। কাশীশ্বরীকে শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠপুত্র ও পুত্র বধূকে হারাইয়া অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁর এত প্রচণ্ড প্রতাপ কে সহ্য করিবে? মাতৃভক্ত ব্রজসুন্দর মাতার হস্তের প্রহারও আশীর্ব্বাদ বলিয়া মস্তক পাতিয়া লইতেন। সেই ব্রজসুন্দর যখন জননীকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন, তখনও শোক দুঃখে ভগ্নহৃদয়া কাশীশ্বরী জ্যেষ্ঠাবধূকে ভুলিতে পারেন নহে। ব্রহ্মময়ীর জন্য তখনও কাঁদিতেন। ব্রজসুন্দরের প্রতাপান্বিতা জননীর জীবনের এই পরিণাম হইবে কে বা তাহা ভাবিয়াছিল?

যে সময়ে ব্রজসুন্দর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সে সময়ে ব্রহ্মময়ী পিত্রালয়ে সূতিকাগৃহে। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গী সবে ভূমিষ্টা হইয়া ছিলেন। সূতিকা গৃহেই সংবাদ পাইলেন পতি খৃষ্টান হইয়াছেন। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহ বা নিন্দা করিল, ঘৃণা করিল, কেহ বা আক্ষেপ করিল, কেহ বা সান্ত্বনা দান করিল। সহিষ্ণুতার

পারিবারিক জীবন—দ্বিতীয় চিত্র।

প্রতিমূর্ত্তি ব্রহ্মময়ী নীরবে সব শুনিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কেবল পতির নিন্দায় মর্ম্মাহত হইয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে পতি খৃষ্টান হন নাই, এক ঈশ্বরের উপাসক হইয়াছেন। ব্রজসুন্দর পূর্ব্বেই তাঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন সুতরাং ব্রহ্মময়ী যাহা শুনিলেন তাহা তাঁহার নিকট সহজ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বাহিরের লোকে তাহা বুঝিল না, তাহারা নানা প্রকার অর্থ করিতে লাগিল। ব্রহ্মময়ীর মাতা ধনমণি চৌধুরাণীকে সকলেই খৃষ্টান জামাতার নিকট কন্যাকে প্রেরণ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ধনমণি চৌধুরাণী বুদ্ধিমতি স্ত্রীলোকের ন্যায় উত্তর করিলেন "জামাইএর হাতে যখন মেয়েকে দিয়াছি তখন জামাই যা হইবেন মেয়েকেও তাই হইতে হইবে, জামাই যদি খৃষ্টান হন মেয়েও খৃষ্টান হইবে, মেয়ের উপর আমার আর হাত কি?"

যৌবনকালেই ব্রজসুন্দর স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সুতরাং বিবাহের পর ব্রহ্মময়ীকে লেখা পড়া শিক্ষা দিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করেন। গভীর রাত্রে অতি গোপনে তিনি ব্রহ্মময়ীকে লেখা পড়া শিখাইতেন। সকলে নিদ্রিত হইলে ব্রহ্মময়ী অতি সন্তর্পনে পুস্তকখানি বাহির করিয়া পাঠ করিতেন। পাছে শাশুড়ী ঘুণাক্ষরে তাঁহার লেখা পড়া শিক্ষার কথা জানিতে পারেন, এই ভয়ে শশঙ্কিত থাকিতেন। ব্রজসুন্দর কার্য্যোপলক্ষে অনেক সময় বিদেশেই থাকিতেন, তাহাতে শিক্ষার ব্যাঘাত হইত। আবার দেখিতে দেখিতে সন্তান সন্ততিও অনেকগুলি হইয়া পড়িল, ও সাংসারিক কার্য্যেও সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইত, সুতরাং ব্রহ্মময়ী বিশেষ কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই।

ব্রজসুন্দরের প্রথম সন্তান, পুত্র সারদাপ্রসাদ। সে দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছিল। দেড় বৎসর বয়সে সে মারা যায়। ব্রজসুন্দরের অন্তরঙ্গ বন্ধু রায় রামশঙ্কর সেন বহুদিন পর্য্যন্ত সারদা-প্রসাদের নাম করিয়া আক্ষেপ করিতেন। বলিতেন "অনেক ছেলে

দেখিয়াছি, ব্রজসুন্দরের সারদার মত ছেলে দেখি নাই, অমন ছেলে কি বাঁচে?" সারদার পর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গীর জন্ম হয়। তাহার পর বিন্দুবাসিনী, বামাসুন্দরী, উমাসুন্দরী, জগন্মোহিনী, ভুবনমোহিনী, বিদ্যুৎলতা ও প্রিয়ম্বদা নামে উপর্য্যুপরি সাতটী কন্যা হওয়াতে শাশুড়ী অত্যন্ত শোকাকুলা হন। একটি করিয়া কন্যা হইত আর ব্রজসুন্দরের জননী ঠাকুরের দ্বারে মাথা খুঁড়িতেন এবং কাঁদিতেন। কন্যাপ্রসবিনী বলিয়া চিরকাল বধূকে গঞ্জনা দিতেন। অষ্টম কন্যা প্রিয়ম্বদা যখন ভূমিষ্ঠা হন, তখন ব্রজসুন্দরের জননী আশা করিয়াছিলেন ৮টি কন্যার পর এবার পুত্র হইবে। কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে সূতিকাগৃহে পাঠাইলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে কি করিতে হইবে সব বলিয়া দিলেন, এবং নিজে সমুদায় আয়োজন করিয়া বাহিরে বসিয়া রহিলেন। সেই কন্যাই ভূমিষ্ঠ হইল, সূতিকা গৃহে সকলে নীরব। ছোট বৌ বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা এই বাড়ী খুব চিনিয়া লইয়াছ, তোমা-দের আর কোথায়ও জন্মাতে ইচ্ছা হয় না, কেমন?" ব্রজসুন্দরের জননীর বুক ধড়াস করিয়া উঠিল, বুঝিলেন নূতন অতিথিটীও তাঁহার স্বজাতীয়া, তাঁহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। আবার কন্যা! কি দুঃখ! কি পরিতাপ! ব্রহ্মময়ীর দুঃখের কথা আর বক্তব্য নয়। দুর্গাদাসের পত্নীর ঐরূপ উক্তির একটু তাৎপর্য্য ছিল। উপর্য্যুপরি এতগুলি কন্যা হওয়া সত্ত্বেও ব্রজসুন্দরের কোনও রূপ দুঃখ ছিল না। তিনি কন্যাদিগকে কিছুমাত্র অনাদর করিতেন না। তাঁহার নিকট ইহা-দিগের আদরের সীমা ছিল না। এক একটী কন্যার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ পাইলেই ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। পাছে জননী কন্যাদের কোনও রূপ অনাদর করেন, এই আশঙ্কায় তিনি জননীকে বারম্বার বলিতেন, "মা, ইহারা তো আমার সন্তান, তুমি ইহাদিগকে অনাদর করিও না, ইহারা বড় ভাগ্যবতী, সঙ্গে করিয়া আমার সৌভাগ্য আনে। এক একটী কন্যা হয়, আর আমার বেতন বৃদ্ধি হয়।" জননী নীরব হইয়া থাকিতেন। উপর্য্যুপরি এইরূপ আটটী কন্যার পর

পারিবারিক জীবন—দ্বিতীয় চিত্র।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লায় অবস্থান কালে, সত্যসুন্দর নামে ব্রজসুন্দরের একটি অতি সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পিতামহী, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজনের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। ব্রজসুন্দর ব্রাহ্মমতে তাহার অন্নপ্রাশন করিলেন। দেশে আসিলে জননী হিন্দুমতে আবার তাহার অন্নপ্রাশনের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু শিশুর জ্বর হওয়াতে সমুদায় আয়োজন, অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া গেল। তথাপি পিতামহী পৌত্রের কল্যাণার্থ বিস্তর দান ধ্যান আমোদ আহ্লাদ করিলেন। এবার শাশুড়ীর নিকট জ্যেষ্ঠা বধূর আদরের সীমা রহিল না। তিনি জীবনে কখনও শাশুড়ীর নিকট এরূপ আদৃতা হন নাই। ইহার পরে সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা জ্ঞানদা জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় ব্রজসুন্দর ২৪ পরগণায় বদলি হন, সেখানে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সাড়ে তিন বৎসর বয়সে কলেরা রোগে সত্যসুন্দরের মৃত্যু হয়। সত্যসুন্দরের মৃত্যুতে ব্রহ্মময়ী অন্নজল ত্যাগ করিয়া দেহপাত করিতে কৃতসংকল্পা হইয়াছিলেন। দেশে গিয়া শাশুড়ীকে আর মুখ দেখাইতে পারিবেন না এই কথাই বারম্বার বলিতেন। অনেক কষ্টে, অনেক পরিচর্য্যায় তাঁহার জীবন রক্ষিত হয়। যাহাহউক দেহমনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কলিকাতার অপর তীরবর্ত্তী শিবপুরে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র প্রসাদ ভূমিষ্ঠ হন। জ্যোতি অতি দুর্ব্বল এবং ক্ষুদ্রকায় হইয়াছিল। সত্যসুন্দরকে হারাইয়া আর কেহ জ্যোতিকে লইয়া আনন্দ করিতে সাহসী হইল না। জ্যোতিকে লইয়া ব্রহ্মময়ী দেশে গেলেন শাশুড়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পৌত্রকে গৃহে তুলিলেন। সুন্দর নধরকান্তি সত্যসুন্দরকে হারাইয়া ক্ষুদ্রকায় অপরিপুষ্টদেহ শ্যামবর্ণ জ্যোতিকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ প্রবোধ মানিল না। বলিলেন "তেমন ছেলে বাঁচিল না এটুকু কি আর বাঁচিবে?" জ্যোতিকে লইয়া পিতামহী কোন আনন্দই আর করিলেন না। সুখের বিষয় ব্রজসুন্দরের এই পুত্রটিই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুস্থ শরীরে

বিষয় কার্য্য করিতেছেন। সত্যসুন্দরের শোকে ব্রহ্মময়ীর দেহ মন দুই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দেশে আসিয়া দুই বৎসর পরেই তিনি দারুণ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্তা হইলেন। এক বৎসর শয্যায় থাকিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২৫এ মাঘ, ১২৭৯ শালে দিবা এক ঘটিকার সময় ঢাকা নগরীতে পতি ও পুত্র কন্যাগণকে পশ্চাতে রাখিয়া এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া শান্তিদাতার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেন।

মিত্র মহাশয় পত্নীর মৃত্যু দিনে ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—

"25th Magh 1279, Corresponding to 6th February 1873, Thursday 5 minutes past one P. M. was the time when my most beloved wife Brahmomoyee breathed her last at my Dacca house. At 12 A. M. of the 24th Magh *i. e.* previous night it was observed that the most important medicine arsenic was proving quite ineffectual. I came to know that she would not live. She was in the same state in her full senses till one o'clock P. M. 25th Magh 1279. In the morning of the day she told Dr. Pareshnath, "তুমি আমার জন্য এত করিলে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না"। She talked with me on different topics. She requested me strongly to look after her mother. Her mother and all her daughters were sitting round her till 1 o'clock without taking any food and she made me sit by her from morning till her last breath. All this while she was staring at me as a truly virtuous and a very devoted wife. I asked her several times whether she recognised me. She answered me by signs that she did. Ram Charan Chatterjee who served under me for a very long time, went to my basha to see her and was called by her and she told him by signs that she was going

to leave this world, holding her arms up and requested him to take care of me.

অনুবাদ :—২৫শে মাঘ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার দিবা বেলা ১টা ৫ মিনিটের সময় আমার প্রিয়তমা পত্নী ব্রহ্মময়ী আমার ঢাকা ভবনে দেহত্যাগ করিলেন। ২৪ শে মাঘ রাত্রি বারটার সময় অর্থাৎ গতকল্য রাত্রিতে দেখা গেল আর্সেনিকের মত বড় ঔষধেও কোনও উপকার হইতেছে না। তখন জানিতে পারিলাম যে তিনি আর বাঁচিবেন না। ২৫শে মাঘ বেলা ১টা পর্য্যন্ত তিনি এই অবস্থাতেই সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ছিলেন। প্রাতে তিনি পরেশ ডাক্তারকে বলিলেন "তুমি আমার জন্য এত করিলে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না"। আমার সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে কথা হইল। তাঁহার মায়ের যত্ন করিবার নিমিত্ত আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। তাঁহার জননী ও কন্যাগণ চতুঃপার্শ্বে অনাহারে বেলা একটা পর্য্যন্ত বসিয়াছিলেন। আমাকে তিনি প্রাতঃকাল হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নীজের কাছে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি আমার দিকে যথার্থ সতী সাধ্বী স্ত্রীর মতই বারম্বার চাহিতেছিলেন। তিনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন কি না একথা আমি তাঁকাকে অনেক বার জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। তিনি ইঙ্গিতে হাঁ বলিতেছিলেন। রাম চরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি আমার অধীনে বহু কাল কাজ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন যে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, এবং আমার যাহাতে যত্ন হয় তাহা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই প্রকারে সতী সাধ্বী ব্রহ্মময়ী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মময়ীর জ্ঞান উজ্জ্বল ছিল।

ব্রহ্মময়ীর অন্তিম বিদায় :—ব্রহ্মময়ী অতি সজ্ঞানে শান্তমনে ইহ

জগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কন্যাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন, পতি আসিয়া সম্মুখে বসিলেন। পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যাকে তাঁহার নিকট আনিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন "ওদের আমাকে একটু দেখাইয়া বেড়াইতে পাঠাইয়া দেও, আমার মৃত্যু যেন ওরা দেখে না"। তাহারা নিকটে আসিলে আশীর্ব্বাদ করিলেন, পুত্রের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "তোমাকে দিয়া যেন আমার নাম থাকে"। তিনি সকলের নিকট যথাযোগ্য ভাবে বিদায় লইলেন। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দুগ্ধ গরম করাইয়া পুত্র ও কন্যাদিগকে খাওয়াইলেন ও বলিলেন "আমি থাকিতে থাকিতে তোমাদের খাওয়াইয়া যাই, পরেতো আর খাওয়া হবে না"। পতিকে দেখিবার জন্য জ্যেষ্ঠা কন্যাকে অনুরোধ করিলেন। নিজ জননীকে দেখিবার জন্য পতিকে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন "সকলেইতো তোমার আপনার, তাঁদের দেখিবার জন্য আমি তোমায় আর কি অনুরোধ করিব, আমার কেবল এক জন এ জগতে রহিলেন, তিনি আমার দুঃখিনী মা, তুমি তাঁহাকে দেখো।" বিশ্বাসী পুরাতন প্রজা ও ভৃত্য হরি সিং প্রভৃতি দিগকে ডাকিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন "মাতঙ্গী বড় রাগী, যদি তোমাদের উপর রাগ করে, আমার খাতিরে তাহার উপর রাগ করিও না।" কন্যাগণের আকুল ক্রন্দন দেখিয়া বলিলেন, "ইহার পরে কাঁদিবার ঢের সময় পাইবে, এখন কাঁদিয়া আমাকে চঞ্চল করিও না।" মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্রজসুন্দর সকাতরে পত্নীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন "দেখ, আমাকে ক্ষমা করিয়া যাও। আমার মায়ের জন্য তুমি অনেক কষ্ট পাইয়াছ আর আমিও তোমাকে আমার অবস্থানুযায়ী রাখিতে পারি নাই।" ব্রহ্মময়ী বলিলেন "তুমি আমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছ যে আমি তোমায় ক্ষমা করিব? জন্ম জন্মান্তরেও যেন তোমাকে পাই, শাশুড়ী ননদে অমন করিয়াই থাকে। তিনি যেমন কষ্ট দিয়াছেন তেমনিতো ভালও বাসিয়াছেন।" তাঁহার মুখে এমন সময়ে কষ্টের লক্ষণ দেখিয়া ব্রজসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন "কষ্ট হইতেছে কি?" ব্রহ্মময়ী উত্তর করিলেন "বিনা কষ্টে কি

ব্রজসুন্দরের তেতুলঝোড়ার বাটীর অংশবিশেষ

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

যাওয়া যায়"? একটু পরে ব্রজসুন্দর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার প্রাণে কি এখন ভয় হইতেছে?" ব্রহ্মময়ী উত্তর করিলেন "না আমার একটুও ভয় হইতেছে না। আমি জীবনে এমন কিছু করি নাই যে জন্য মরিতে ভয় পাইব।" এইরূপ শান্ত সমাহিত ভাবে ব্রহ্মময়ী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর পরে তাঁহার মৃতদেহ নূতন পর্য্যঙ্কে নববধূর বেশে সুসজ্জিত অবস্থায় শায়িত করিয়া সৎকার করিবার জন্য তেতুলঝোড়ার বাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

ব্রহ্মময়ীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস ঃ—ব্রহ্মময়ী অতি নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী ছিলেন। যদিও ব্রজসুন্দর প্রথম জীবনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মময়ী তাঁহার সহিত যোগদান করেন নাই। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। তিনি স্বামীর সহিত যোগ না দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বামীর ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য শাশুড়ীর নিকটে যে প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত, যোগ দিলে না জানি তাহার মাত্রা আর কতগুণ বৃদ্ধি পাইত। তিনি অতি নিষ্ঠা পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিতেন, এ বিষয়ে তাঁহার স্বামী কখন অন্তরায় উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি স্বইচ্ছায় পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতেন, আর দেব দেবীর পূজা করিতেন না। অতি স্বাভাবিক ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বাস্তবিক এই সুধীরা, বিনীতা, সেবাপরায়ণা, ধৈর্য্যশীলা রমণী জীবনে অশোভন কোন কার্য্যই করেন নাই। আপনাকে হারাইয়া এমন করিয়া সংসার অতি অল্প লোকেই করিতে পারিয়াছেন। ব্রজসুন্দর নব পরিণীতা ভার্য্যাকে এই কঠিন প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধা করিয়াছিলেন যে আমার মা ও ভ্রাতা শত কষ্টের কারণ উপস্থিত করিলেও আমায় জানাইও না। বলিতে গেলে এই প্রতিজ্ঞাটী পালন করিবার জন্যই ব্রহ্মময়ী প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। প্রথম পক্ষাঘাত রোগে প্রায়

সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মময়ী গ্রামে যান। সেখানে এক দিন এক আত্মীয়া তাঁহার নামে এক মিথ্যা অভিযোগ করেন। বাস্তবিক সেই ঘটনার মূলে কোন সত্যই ছিল না। কিন্তু এই কথা শুনিয়া তাঁহার আর এক আত্মীয় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া ছুটিয়া আসেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গী "কি আমি থাকিতে আমার মায়ের উপর এত অত্যাচার" বলিয়া মাকে আগলাইয়া দাঁড়ান। ব্রহ্মময়ীর সমুদায় দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, পুনরায় পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এই যে আবার পড়িলেন আর উঠিলেন না। মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে সকল দুঃখের শান্তি পাইলেন। এই ঘটনা দেশের বাড়ীতে হইয়াছিল। ব্রজসুন্দর কিছুই জানিতে পারেন নাই। পাছে জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতাকে বলিয়া দেন এই জন্য তাঁহাকে কাতর বচনে অনুরোধ করিয়াছিলেন "দেখ সাবধান একথা যেন ঘুণাক্ষরে তোমার বাবার কাণে না উঠে। যা হইবার হইয়াছে তাঁহাকে বলিলে আমার রোগের তো আর শান্তি হবে না।" বাস্তবিক এমন আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা কি সহজে দেখা যায়! ব্রজসুন্দরের বিবাহের কতিপয় বৎসর পরে কাশীশ্বরী পুত্রকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে উপার্জ্জিত অর্থ পত্নীর হাতে দিতে পারিবে না। সুতরাং সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে পতি বিস্তর উপার্জ্জন করিলেও ব্রহ্মময়ী একদিনের জন্যও স্বামীর উপার্জ্জিত ধন স্পর্শ করেন নাই। সেজন্য ব্রহ্মময়ী একদিনও ক্ষোভ প্রকাশ বা অভিমান করেন নাই, বরং পাছে স্বামী প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হন, এই ভয়ে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতেন। কত সময়ে এমন ঘটিয়াছে যে কন্যা মাতঙ্গী ভুল ক্রমে যেখানে সেখানে অর্থ রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। ব্রহ্মময়ী আসিয়া দেখেন টাকা পড়িয়া আছে। অর্থ স্পর্শ করিবেন না সুতরাং তুলিয়া রাখিতে পারিতেন না। পাছে কেহ লইয়া যায় এই আশঙ্কায় কন্যার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। পুত্রকে যখন পত্নীর হস্তে উপার্জ্জিত অর্থ দিতে পারিবে না বলিয়া কাশীশ্বরী প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন, তখন তিনিও এত দূর মনে করেন

পারিবারিক জীবন—দ্বিতীয় চিত্র।

নাই যে ব্রহ্মময়ী স্বামীর অর্থ স্পর্শও করিবেন না। তাঁহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে পুত্রের উপার্জ্জিত ধন বধূর হস্তে পড়িলে তাহার হৃদয়ে গর্ব্ব হইবে। কিন্তু ব্রহ্মময়ী স্বামীর উপার্জ্জিত ধন ভ্রমেও স্পর্শ করিতেন না, ইহাতে যে তাঁহার অন্তরে নারীজনোচিত অভিমান প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কাইত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি যে প্রকারান্তরে পত্নীর নিকট গুরুতর অপরাধী হইয়াছেন ব্রজসুন্দর তাহা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন, এবং এই কারণে পত্নীর সামান্য ইচ্ছাটীও পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। বেশ ভূষায় অনাসক্তা, সাংসারিক ভোগ সুখে স্পৃহাহীনা, ব্রহ্মময়ীর নিজের জন্য বিশেষ কোন ইচ্ছাই ছিল না। প্রত্যেক মাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের তালিকা স্বামীর খাদাঞ্চী মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইত।

মিত্র মহাশয়ের হিসাবের বহিতে সর্ব্বদাই এইরূপ দানের অনেক উল্লেখ লেখা দেখা যায়।

ব্রহ্মময়ী যখনই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিতেন, পরিবার পরিজন, প্রতিবাসী জ্ঞাতি ও নিকটবর্ত্তী প্রজাগণের জন্য সামান্য সামান্য অথচ অন্তরের সদ্ভাবের চিহ্ন স্বরূপ নানাবিধ উপহার দ্রব্য আনিতেন। তিনি অপরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে সহ্য করিতে পারিতেন না, স্বামীকে অনুরোধ করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য সর্ব্বদাই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। বাস্তবিক ধৈর্য্যে, অন্তরের মহত্বে, এবং পবিত্রতায় ব্রহ্মময়ী বঙ্গরমণীর আদর্শ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ নারীচরিত্র এক প্রকার দুর্লভ দর্শন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল যে, সংসারে যে অপরের সুখ বৃদ্ধি করে, তাহারই অধিক গৌরব। আর আমরা শিখিতেছি যে সংসারে অধিক মাত্রায় ভোগসুখ আয়ত্ত করিতে পারে সেই বড়। ব্রহ্মময়ী প্রকৃতভাবে নারী জীবনের মহত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর কোমল প্রকৃতি,

পরদুঃখকাতর হৃদয়, দরিদ্র এবং বিধবাদিগের সাহায্যের জন্য ও পরহিতব্রতে যথার্থই তাঁহাকে পতির উপযুক্ত পত্নী করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রহ্মময়ীর সাহচর্য্য লাভ না করিলে ব্রজসুন্দর এমন করিয়া পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এমন পত্নীকে হারাইয়া ব্রজসুন্দরকে অধিক দিন জীবিত থাকিতে হয় নাই। ব্রজসুন্দরের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল পত্নীর সমাধির উপর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটী মঠ স্থাপন করেন; সেই জন্য ইষ্টকাদিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে জননী কাশীশ্বরী বিরোধী হইলেন। ব্রজসুন্দরকে নির্ম্মমভাবে বলিলেন "কি, আমি বৃদ্ধ মা কবে যাই তার ঠিক নাই, আমার জন্য মঠ না করিয়া স্ত্রীর জন্য মঠ করিতে লজ্জা হয় না ?" ব্রজসুন্দর নম্রভাবে বলিলেন "আচ্ছা মা, তোমার জন্য মঠ আগে করিয়া পরে এই মঠ করিব।" জননী উদ্ধত ভাবে উত্তর করিলেন "তোর ভিটায় আমার দেহ রাখিব না, আমার শ্বশুরের ভিটায় মঠ করিতে হইবে।" ব্রজসুন্দর তাহাতেই সম্মত হইলেন। কর্ণপাড়ায় জননীর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য ইষ্টকাদি প্রেরণ করিতে করিতে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হইল। আর কেবা কাশীশ্বরীর মঠ করে ? ব্রজসুন্দরের প্রাণের বাসনা পূর্ণ হইল না, ব্রহ্মময়ীর স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করিতে পারিলেন না। বহুকাল পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গী ব্রহ্মময়ীর শ্মশানের উপর একটি ক্ষুদ্র মঠ নির্ম্মাণ করিয়া পিতৃদেবের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। সেখানে চতুঃস্পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকে শিবচতুর্দ্দশীর দিনে একটী মেলা করেন। এই মেলায় দুই তিন দিবস ধরিয়া সংকীর্ত্তন ও ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এইরূপে সাধ্বী ব্রহ্মময়ীর পবিত্র স্মৃতি অদ্যাবধি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে জাগ্রত রহিয়াছে।

তৃতীয় চিত্র—কন্যা মাতঙ্গী।

স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের দৈনন্দিন লিপিতে দেখিতেছেন :—

My second child (a daughter) Matangi or Soudamini was born on the 23rd of Agrahain 1253.
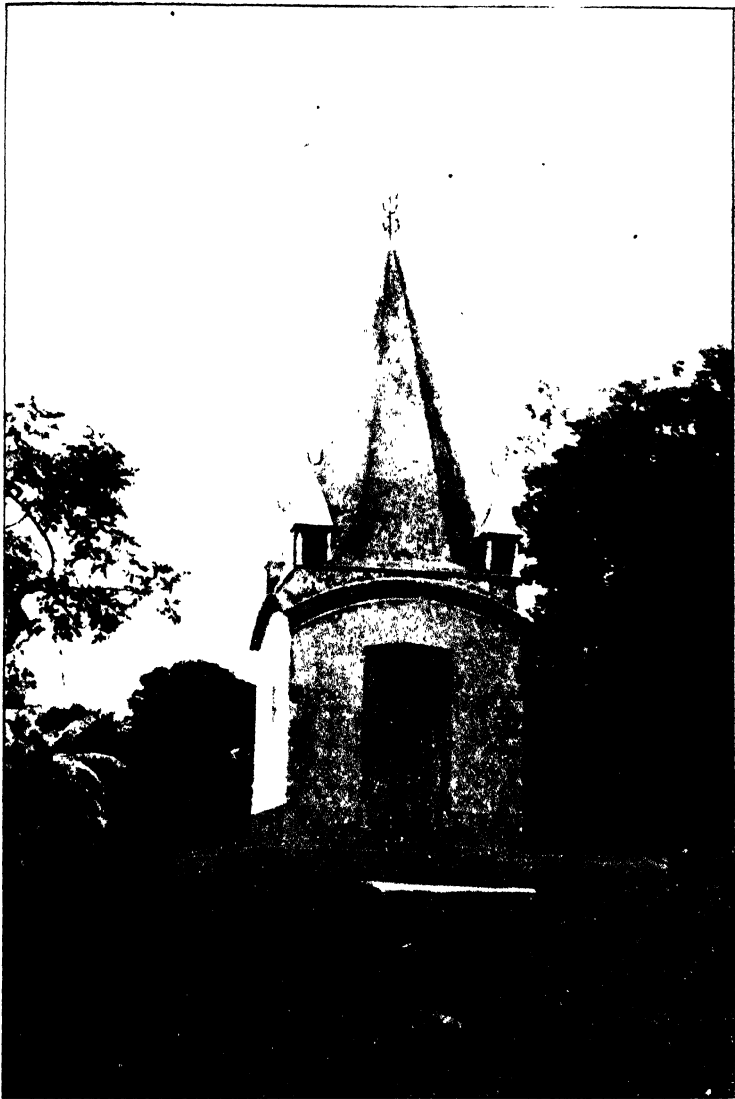
ব্রহ্মময়ীর শ্মশান মন্দির।

পারিবারিক জীবন—তৃতীয় চিত্র।

আমার দ্বিতীয় সন্তান (কন্যা) মাতঙ্গী বা সৌদামিণী ২৩এ অগ্রহায়ণ ১২৫৩ সালে জন্ম গ্রহণ করে। এবং সেই দিনই লেখা আছে :—

Dacca Brahmo Somaj was first established on the 23rd of Agrahayan 1253 B. S. at my basha at Kumartooly, the house of Golam Mistry of Tanti Bazar.

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ ২৩এ অগ্রহায়ণ ১২৫৩ সালে আমার কুমারটুলীর বাসায় (তাঁতি বাজারের গোলাম মিস্ত্রীর বাটী) প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

আশ্চর্য্য যোগাযোগে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গী এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ এক দিনে, এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে দিন স্বর্গীয় মিত্র মহাশয় ঢাকার কুমারটুলীর বাসা বাড়ীতে, বন্ধু চতুষ্টয়ের সহিত মিলিত হইয়া, গম্ভীরভাবে ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সুদূর পদ্মাতীরে, শ্বশুরালয়ে, শ্রীবাড়ী গ্রামে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গী ভূমিষ্ঠা হইয়াছিলেন। বন্ধু যাদব চন্দ্র বসু (হুগলীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট) কন্যার জন্ম সংবাদ শুনিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া বলিয়াছিলেন, "এই কন্যা সত্য ধর্ম্ম প্রচারের দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহার নাম সত্যবতী রহিল।" পিতামহী মাতঙ্গী নাম রাখিলেন। সুতরাং পিতৃদত্ত সৌদামিনী এবং পিতৃবন্ধুদত্ত বড় গৌরবের নাম সত্যবতী লোপ পাইল। পিতামহী সকল কন্যাগণেরই নাম রাখিয়াছিলেন।

জননী কাশীশ্বরী এবং পত্নী ব্রহ্মময়ীর জীবন যেমন ব্রজসুন্দরের জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল, জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গীও সেইরূপ পিতার জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রথম পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে প্রথমা কন্যা বলিয়া মাতঙ্গী পিতামাতা, পিতামহী ও আত্মীয় স্বজন সকলেরই অতি আদরের পাত্রী ছিলেন। পিতামহী মাতঙ্গীকে এক দণ্ড চক্ষের অন্তরাল

করিতেন না। প্রকৃতপক্ষে এই কন্যার বাল্যকাল ঠাকুরমার ক্রোড়েই অতিবাহিত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই মাতঙ্গী তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। নিত্য পিতামহীর সাহচর্য্যে থাকিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে মাতঙ্গী পিতামহীর প্রকৃতিসম্পন্না হইয়া উঠিয়াছিলেন। মাতার সহিষ্ণুতা, শান্তভাব ও মৃদু প্রকৃতি তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইবার সুযোগ পায় নাই। মাতঙ্গী আজন্ম ব্রজসুন্দরের অতি আদরের কন্যা ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃগৃহে ইঁহার যে আদর ও প্রভাব ছিল তাহা কচিৎ কন্যার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। এই এক বিষয়ে মাতঙ্গী বড়ই সৌভাগ্যবতী ছিলেন। পিতার আদরে ইঁহার চরিত্রের এমন অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল, যে আর সকল ভগ্নীই ইঁহার অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ইঁহার এরূপ উজ্জ্বল মূর্ত্তি ছিল ও এমন প্রফুল্ল সদানন্দ ভাব ছিল, যে পিতা আদর করিয়া "হাস্যময়ী মা আমার" বলিয়া ডাকিতেন।

মাতঙ্গীর শৈশব শিক্ষা—মাতঙ্গী যখন নিতান্ত বালিকা তখন হইতেই গৃহে শিক্ষক রাখিয়া ব্রজসুন্দর কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাতঙ্গী অতি উত্তমরূপে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার শিক্ষা মন্দ হয় নাই। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজসুন্দর কন্যার ধর্ম্ম শিক্ষারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যখন তিনি গৃহে উপস্থিত থাকিতেন তখন যত্ন পূর্ব্বক কন্যাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। যখন দূরে থাকিতেন—তখন গৃহশিক্ষকের প্রতি এই আদেশ ছিল যে নিয়মিত পাঠ্য পুস্তকের সহিত মাতঙ্গীকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ড পড়াইতে হইবে। ইংরাজি ভাষা না জানিলেও তখনকার দিনের তুলনায় মাতঙ্গী উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে তিনিই পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম শিক্ষিতা রমণী। বিগত পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার ঘোর যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তখনকার দিনে স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিবে শুনিলে লোকের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত। নারীর পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা করার ন্যায় এমন

অশোভন কার্য্য আর ছিল না। মাতঙ্গী লেখা পড়া শিখিতেছে এই সংবাদে চারিদিকে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "শুনেছ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, ব্রজসুন্দর মিত্রের কন্যা নাকি পণ্ডিতের নিকট লেখা পড়া শিখ্‌ছে; কি অসম্ভব কথা, স্ত্রীলোকে আবার পড়া শুনা করে!" যারা নিতান্ত পাড়া গেঁয়ে অশিক্ষিত তাহারা মেয়ের শিক্ষা যে কি ব্যাপার ধারণাই করিতে পারিল না। দলে দলে লোক মাতঙ্গীকে দেখিতে আসিত। হয়ত বা লেখা পড়া শিখে চেহারাটারও কিছু পরিবর্ত্তন হয়ে থাক্‌বে, ইতর লোকেরা মনে মনে তাহাই ভাবিত। মাতঙ্গী এক দ্রষ্টব্য বস্তু হইয়া উঠিলেন। কাশীশ্বরী নিয়ত এই লোকের জনতায়, নানা কথা বার্ত্তায় একেবারে চটিয়া যাইতেন। অবশেষে এক দিন ব্রজসুন্দর বাবুর বন্ধুদ্বয় বাবু রাম শঙ্কর সেন ও দীনবন্ধু মৌলিক মাতঙ্গীকে পরীক্ষা করিবার জন্য তেঁতুল ঝোড়ার বাটীতে আসিলেন। সে সময়ে বর্ষাকাল, তাঁহারা বজরা করিয়া আসিয়াছিলেন। আসিবা মাত্র চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে বাবুর মেয়েকে পরীক্ষা করিবার জন্য ডেপুটী বাবুরা আসিয়াছেন। মুখে মুখে চারিদিকে এ অশ্রুতপূর্ব্ব সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল। নদীর তীর লোকে লোকারণ্য, সকলে বিস্ফারিত নেত্রে বাবুদের গতি বিধি দেখিতে লাগিল। ক্রমে ব্রজসুন্দর বাবুর বহির্বাটী ও অন্দর মহলে মহা জনতা, মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। মাতঙ্গী বহির্বাটীতে পরীক্ষা দিতে গেলেন। গৃহ শিক্ষক প্রেমচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, রামজয় চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজসুন্দর বাবুর বন্ধুদ্বয় পরীক্ষা করিতে বসিলেন। ক্ষুদ্র বালিকা মাতঙ্গী শত শত নেত্রের নিস্পন্দ দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হইয়া পরীক্ষা দিতে লাগিলেন। সকলেরই উৎকণ্ঠা "আজ না জানি কি ব্যাপার ঘটে! সৃষ্টিই বুঝি উল্‌টিয়া যায়।" মাতঙ্গী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণা হইলেন। ব্রজসুন্দর বাবুর বন্ধুদ্বয় অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা এতটা সুফল আশা করেন নাই।

তাঁহাদেরও স্ত্রী শিক্ষার এই নূতন অভিজ্ঞতা। রামশঙ্কর বাবু ও দীন বন্ধু বাবু মাতঙ্গীকে পল্ ভার্জ্জিনিয়া, সুশীলার উপাখ্যান, এলিজাবেথ্, ধর্ম্মতত্ত্ব, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রভৃতি তখনকার দিনে যতকিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল (তা কয় খানিই বা ছিল) সব উপহার দিলেন। সকলের আনন্দ আর ধরে না। ব্রজসুন্দর বাবু কন্যার কৃতকার্য্যতায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহাকে একটী আকবরী মোহর পুরস্কার দিলেন। সাধারণ লোকেরা, কি হইল, কি বলিল কিছুই বুঝিল না, বালিকা অনেক পুস্তক ও মোহর উপহার পাইল ইহাই দেখিল। মাতঙ্গীর অবয়বেরও কোন পরিবর্ত্তন হইল না, পৃথিবীও কাঁপিয়া উঠিল না। মাতঙ্গী এত উপহার পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দৌড়িয়া প্রথমেই ঠাকুরমার নিকটে গেলেন। পিতামহী লোকের জনতা দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই গরম হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি মাতঙ্গীর দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। বালিকা কত আশা করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল যে ঠাকুরমা এই সব উপহার দেখিলে কত খুসী হইবেন। খুসী হওয়া দূরে থাক, তিনি রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আর কি এইবার চাকরি করতে যাও।" বালিকার সমুদায় আনন্দ উৎসাহ নিমেষে স্তব্ধ হইয়া গেল, ভগ্নহৃদয়ে অতি বিমর্ষভাবে শান্তিময়ী মার নিকট সান্ত্বনার জন্য উপস্থিত হইলেন। জননী নির্জ্জনে কন্যাকে আদর করিলেন, বালিকার মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল। ব্রজসুন্দর এই দিনটীকে বিশেষ স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেইদিন স্বগ্রামের এবং চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামবাসী ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি লোকের অনুরাগ ও দৃষ্টি আকৃষ্ট করা তাঁর উদ্দেশ্য; সেই জন্যই তেঁতুলঝোড়ার বাটিতে এত সমারোহে কন্যার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল।

মাতঙ্গীর বিবাহ—এই প্রকারে মাতঙ্গী গৃহে অতি যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল। ব্রজসুন্দর কন্যার বিবাহের নামও মুখে উচ্চারণ

পারিবারিক জীবন—তৃতীয় চিত্র।

করেন না। জননী মাতঙ্গীর বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেই বলেন "জ্ঞান যার হয় নাই তার আবার বিবাহ কি? জ্ঞান হোক্ তখন বিবাহ।" কাশীশ্বরী দেখিলেন মাতঙ্গীর জ্ঞানলাভ হইতে অনেক বিলম্ব। ততদিন অপেক্ষা করিলে ত আর হিন্দু সমাজে বাস করা সম্ভব হইবে না; কাজেই পুত্রের অজ্ঞাতসারে, তিনি যখন শ্রীহট্টে ছিলেন, তখন পৌত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। খল্‌সী নিবাসী চন্দ্রনাথ বসুর পুত্র কৈলাসচন্দ্র বসুর সহিত মাতঙ্গীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর ব্রজসুন্দর বৈবাহিকের হাত ধরিয়া বলিলেন "আপনি আমার কন্যাটি লইলেন, আপনার পুত্রটীকে আমায় দিতে হইবে।" ব্রজসুন্দর ভাবিয়াছিলেন জামাতাকে নিজের মনোমত শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিয়া লইবেন। জামাতাকে ঢাকার বাসায় আনিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া কুমিল্লায় চলিয়া গেলেন, গ্রামস্থ বাটীতে জননীকে বলিয়া গেলেন "আদর করিয়া জামাইকে কখন বাড়ী আনিও না, তার এখন বিদ্যাশিক্ষার সময়, সে একমনে লেখা পড়া করিবে।" কয়েক মাস পরেই জামাতা ঢাকায় জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া নিজের বাটী গিয়া সেখানেই মারা গেলেন। জামাতার মৃত্যু সংবাদ কেহ আর সাহস করিয়া ব্রজসুন্দরকে দিল না। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় আসিয়া দেখেন, জামাতা বাসায় নাই। বাটীর লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈলাসকে দেখ্‌ছি না কেন, সে কোথায় গিয়াছে?" সকলে তাহার মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়া বলিল "বাটী গিয়াছিল আর আসে নাই।" ইহাতে তিনি জামাতার উপর মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বিশ্রামান্তে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। প্রথমেই বাল্যবন্ধু মৌলবী আবদুল আলির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আলি সাহেব নানা কথা বার্ত্তার পর বলিলেন "তোমার এত আদরের মাতঙ্গীর আল্লা কি দশাই করিলেন।" কৈলাস যে কেন বাড়ী গিয়া আর আসে নাই তখন

তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। অকস্মাৎ এই নিদারুণ সংবাদ বজ্রের ন্যায় তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। "আমার বালিকা কন্যা বিধবা হইল" এই চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইতে না হইতেই ব্রজসুন্দর অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। মৌলবী সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার অনেক পরিচর্য্যা করিলেন। বন্ধুর জ্ঞানলাভ হইলে আলি সাহেব নিজে পাল্‌কী ধরিয়া তাঁহাকে অতি যত্নে গৃহে রাখিয়া গেলেন। অতি আদরের কন্যার বৈধব্য দুঃখ পিতার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। জীবনে তিনি অনেক দুঃখ শোক সহ্য করিয়াছিলেন। প্রিয়তমা পত্নী ব্রহ্মময়ী, প্রাণাধিক পুত্র সত্যসুন্দরের শোক তাঁহার হৃদয়ে বিষম আঘাত দিয়াছিল, কিন্তু সে সকল শোকেও তিনি এরূপ বিচলিত হন নাই। মাতঙ্গীর দুঃখে ব্রজসুন্দর একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি জীবনান্তেও এ শোক সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

মাতঙ্গীকে পুনর্বিবাহ দানের চেষ্টা—মাতঙ্গী বিধবা হইবার পূর্ব্ব হইতেই ব্রজসুন্দর দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার নিজেরই বালিকাকন্যা যখন বিধবা হইল তখন তিনি তাহার পুনর্বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? তিনি ত আর মুখের সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, ভীরু কাপুরুষও ছিলেন না, সুতরাং লোক নিন্দার ভয়ে তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি উদ্যোগী হইয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত শেখেরনগর নিবাসী কালীকুমার গুহের সহিত বিধবা কন্যার বিবাহ স্থির করিলেন। এই বিবাহে তাঁহার বন্ধু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় (ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা) বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এ জন্য ভগবান বাবুকেও অনেক অর্থব্যয়, সমাজিক নিগ্রহ ও লোকনিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কালীকুমার গুহ অতি উৎসাহী ও সচ্চরিত্র যুবক ছিলেন। তিনি সমাজের উৎপীড়ন উপেক্ষা করিয়া, নির্ভিক হৃদয়ে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হন। তখনকার দিনে বিধবা বিবাহ পূর্ব্ববঙ্গে অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা ছিল। এই বিবাহের সংবাদে চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়া হুলস্থুল

পারিবারিক জীবন—তৃতীয় চিত্র।

পড়িয়া গেল। বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তক উৎসাহী যুবকদিগের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা রহিল না। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত স্বয়ং এই বিবাহে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যথাযোগ্য সমারোহের সহিত এই বিবাহটী সুসম্পন্ন করিবার জন্য সংস্কার প্রিয় বন্ধুগণ বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজসুন্দরের ইচ্ছা ছিল, জননীকে কিছু না জানাইয়া বিবাহ ক্রিয়া সমাধা করেন, কিন্তু পত্নী ব্রহ্মময়ী তাহাতে বাধা দেন। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন "মাকে না জানাইয়া তোমার কখনও এ কাজ করা উচিত নয়।" ব্রজসুন্দর দোলায়মান চিত্ত হইয়া বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে জননীর নিকট পত্র লিখিলেন। তাহাতে একথা বলিলেন "আমি জানি এই বিবাহ দিলে সকলে আমায় ত্যাগ করিবে কিন্তু মাতঙ্গীর জন্য আমি সকলকেই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।" এই পত্র পাইয়া কাশীশ্বরীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিবার পাত্রী নন্; তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন "যেমন করিয়াই হোক এবিবাহ বন্ধ করিতেই হইবে।" অমনি বিদ্যুৎবেগে ঢাকায় উপস্থিত হইয়া দীননাথ ঘোষের সহিত পরামর্শ করিয়া চুপি চুপি মাতঙ্গীকে লইয়া পলায়নের ব্যবস্থা করিলেন। দীননাথ ঘোষ সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কাশীশ্বরী করিলেন কি? পুত্রের বাসায় আসিয়া সকল আক্রোশ পুত্রবধূর উপর ঝাড়িলেন, সজোরে তাঁহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "সর্ব্বনাশী তোর কোন ক্ষমতা নাই, তুই যত নষ্টের মূল।" ব্রহ্মময়ীর মুখে কথা নাই—নীরবে পিঠ পাতিয়া কত পদাঘাতই গ্রহণ করিলেন। কাশীশ্বরীর সংকল্প স্থির, পুত্রের সঙ্গে কোন বাক্‌বিতণ্ডাই করিলেন না। পরদিন অতি প্রত্যূষে কাশীশ্বরী নাত্নীর হাতটী ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন—"মাতঙ্গী, শীঘ্র আমার সঙ্গে চুপি চুপি আয়।" মাতঙ্গী ঘুমাইতেছিল, ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল। পিতামহী মাতঙ্গীকে লইয়া গাড়ীতে বসিলে গাড়ী দ্রুতবেগে নলগোলার ঘাটে গিয়া

উপস্থিত হইল। এদিকে ব্রজসুন্দর নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন কে তাঁহার মাতঙ্গীকে চুরি করিয়া পালাইতেছে। তিনিব্যস্ত সমস্ত জাগিয়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ আমার মাতঙ্গী কোথায়?" মাতঙ্গীর ডাক পড়িল—কোথায় মাতঙ্গী? সকলে দেখিল মাতঙ্গীও নাই মাও নাই। তখন আর ব্রজসুন্দরের বুঝিতে বাকি রহিল না যে জননী মাতঙ্গীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তিনি নগ্নপদে একবস্ত্রে উন্মত্তের ন্যায় রাজপথে ছুটিলেন। বাসার যত লোক সব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। তাঁহাদিগকে ছুটিতে দেখিয়া রাস্তার লোক কিছু না বুঝিয়াই ছুটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ব্রজসুন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিস্তর লোক দৌড়িতে লাগিল। ব্রজসুন্দর দৌড়িতে দৌড়িতে নলগোলার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রজসুন্দর যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই দেখিলেন—জননী ও দীননাথ ঘোষ মাতঙ্গীকে লইয়া নৌকায় বসিয়া আছেন। নৌকা ছাড়ো ছাড়ো; কাশীশ্বরী মাতঙ্গীর জন্য কিছু খাবার আনিতে দিয়াছিলেন তাহারই জন্য উৎসুক মনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্রজসুন্দর নৌকা ছাড়ে নাই দেখিয়া একেবারে দৌড়িয়া নৌকায় উঠিতে গেলেন। বিপুলকায় দীননাথ ঘোষ নৌকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিলেন। ব্রজসুন্দরের আজ দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই, দীননাথ ঘোষকে ঠেলিয়া নৌকায় উঠিতে গেলেন। দীননাথ ঘোষ সজোরে এক ধাক্কা দিয়া ব্রজসুন্দরকে নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। মাতঙ্গী বলিলেন "হরি সিং তোমরা কি করিতেছ? উমাচরণ সিং ধর ধর বাবাকে ধর।' তখন সকলে দৌড়িয়া আসিয়া ব্রজসুন্দরকে জল হইতে তুলিল। ব্রজসুন্দর নৌকায় উঠিয়া ক্রোধে, দুঃখে অধীর হইয়া দীননাথ ঘোষের দিকে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন "চোর! আমার মেয়েকে চুরি করিয়া পালাইতেছ।" দীননাথ ঘোষের মুখের দিকে তাকাইয়া যিনি কখনও কথা বলেন নাই, তিনি আজ সেই চিরসম্মানিত বড়দাদাকে চোর বলিয়া বসিলেন। দীননাথ ঘোষ বজ্র নিনাদে বলিয়া উঠিলেন "পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিস, আর বাকি রাখিলি কি?"

পারিবারিক জীবন—তৃতীয় চিত্র।

ব্রজসুন্দর আর কিছু বলিলেন না, নীরবে দাঁড়াইয়া দীননাথের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিতে লাগিলেন। এদিকে নদীতীর লোকে লোকারণ্য, সকলে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিতে লাগিল। ক্রমে ইঁহাদের চৈতন্য হইল, দীননাথের বাসা নিকটে ছিল, সকলে নৌকা হইতে উঠিয়া সেখানে গেলেন। সেখানে গিয়া মনের সাধ মিটাইয়া দীননাথ ঘোষ ব্রজসুন্দরকে গালি দিতে লাগিলেন। ব্রজসুন্দরের সহিষ্ণুতার সীমা ছিল না, তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া সকলই সহ্য করিলেন। বাহির বাড়ীতে এই সকল গোলোযোগ চলিতেছে, ইত্যবসরে কাশীশ্বরী বাড়ীর ভিতরে এক বাতাবিলেবুর গাছে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে গেলেন। মাতঙ্গী অদূরে বসিয়াছিলেন, তিনি একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া দেখেন, ঠাকুরমা গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছেন। বালিকা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন সকলে দৌড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া এই বিষম ব্যাপার দেখিলেন। ব্রজসুন্দর দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া রাখিলেন, অন্যান্য সকলে গলার দড়ি কাটিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নামাইলেন। আবার দীননাথের ক্রোধ পঞ্চমে উঠিল, তিনি এবার ব্রজ-সুন্দরকে "মাতৃহন্তা নরাধম পাষণ্ড" বলিয়া সম্মানিত করিতে লাগিলেন। ব্রজসুন্দর আর করেন কি, জননীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। দীননাথের বাসায় কোন স্ত্রীলোক ছিল না, সুতরাং কাশীশ্বরীকে ব্রজসুন্দরের বাটীতে আনা হইল। পূর্ব্বদিন ব্রহ্মময়ী কন্যার বিবাহের জন্য শাশুড়ীর নিকট হইতে কত পদাঘাত আশীর্ব্বাদী পাইয়াছিলেন, এখন তিনিই আবার শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। গৃহে আসিয়া কাশীশ্বরী পুত্রের হাত ধরিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলেন যে আর তিনি কন্যার বিবাহ দিবেন না। কন্যার বিবাহ দিলে তিনি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিবেন এ কথাও বলিলেন। কন্যার বিবাহের জন্য ব্রজসুন্দর সকলকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এখন জননীর প্রাণ রক্ষার জন্য কন্যাকে বিবাহ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা

করিতে বাধ্য হইলেন। মাতৃভক্ত ব্রজসুন্দর জননীর আত্মহত্যার কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিবার সময় এই টুকু বাঁচাইয়া বলিয়াছিলেন যে "আচ্ছা আমি আর চেষ্টা করিয়া বিবাহ দিব না।" অর্থাৎ অপরে দিলে বা কন্যা নিজে করিলে বাধা দিবেন না। বিবাহ ত হইল না। এত আয়োজন, বরের আগমন সকলই বৃথা হইল। "কাল রাম রাজা হইবেন আর আজ রাম বনে গেলেন" তাই হইল। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সাধারণ লোকে গীতও রচনা করিয়াছিল। তেজস্বী যুবক কালীকুমার গুহের ধিক্কারের পরিবর্ত্তে লোকের টিট্‌কারী ও বিদ্রূপ মস্তক পাতিয়া লইতে হইল! কথায় বলে জাতও গেল, পেটও ভরিল না। বরপক্ষের মনস্তাপ এবং অবমাননার একশেষ হইল। লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে ব্রজসুন্দরের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি কি বলিবেন? বলিবার কি আছে? কিন্তু বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে যথেষ্ঠ তিরস্কার করিলেন। ব্রজসুন্দর আপাকে নিতান্ত অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রজসুন্দরের লাঞ্ছনার এখানেই শেষ হইল না। "ঢাকাপ্রকাশে" প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে ঈশ্বরচন্দ্র বসু প্রভৃতি সকলে আক্রমণ করিলেন। অতিরিক্ত মাতৃভক্তি ব্রজসুন্দরকে এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল বটে কিন্তু তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। জননী আত্মহত্যা করিবার উপক্রম না করিলে, লোকনিন্দার ভয়ে কখনই তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। জননী যে এতটা করিবেন তা তিনি কখনও ভাবেন নাই। মাতার ক্রোধ, গালিবর্ষণে ও পদাঘাতেই পর্য্যবসিত হইবে এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। মাতঙ্গীকে বিবাহ দিতে না পারিয়া তিনি ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। জননীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি আর নিজে মাতঙ্গীর বিবাহের চেষ্টা করিতে পারেন নাই, কিন্তু মনে মনে বড়ই ইচ্ছা ছিল মাতঙ্গীর বিবাহ হয়, সেইজন্য অনেক সময় জামাতা কেদারনাথ রায়, ও শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশকে বলিতেন "আমি তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, তোমরা মাতঙ্গীর বিবাহ দেও।"

পারিবারিক জীবন—তৃতীয় চিত্র।

মাতঙ্গীর কার্য্যকারিণী শক্তি ও চরিত্রের বিকাশ—কন্যার পুনর্বিবাহ দানে ভগ্নমনোরথ হইয়া ব্রজসুন্দর ভাবিলেন মাতঙ্গীর সাংসারিক সুখের দ্বারে তো চিরদিনের মত কাঁটা পড়িল, এখন ইহাকে সুশিক্ষা দিয়া যাহাতে ইহার হৃদয় উন্নত হয় এবং জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে ও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অন্যমনস্ক থাকে সেই চেষ্টা করাই শ্রেয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রমে ক্রমে কন্যার হস্তে সংসারের সমুদায় ভার দিতে লাগিলেন। গ্রামের বাটীতে যেমন কাশীশ্বরী, কর্ম্মস্থলে সেইরূপ মাতঙ্গী গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিলেন। ব্রজসুন্দর কন্যার হস্তে সংসারের কর্তৃত্ব দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না, যাহাতে কন্যা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অবসর পাইলেই কন্যার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সামাজিক বিষয়ে আলাপ করিতেন। ইংরাজি পুস্তক হইতে নানা ভাল কথা পড়িয়া শুনাইতেন। ব্রজসুন্দর কন্যার চিন্তাশক্তি এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জমিদারী আইন আদালত সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় কন্যাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। বন্ধুদিগের আলাপে, আফিস আদালতের দৈনন্দিন কর্ম্মে, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা থাকিলেই সে সম্বন্ধে কন্যার সহিত আলাপ করিতেন। এইরূপ চেষ্টার অতি সুফল মাতঙ্গীর জীবনে ফলিয়াছিল। (১) তিনি অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও বাহিরের জগতের অনেক সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। (২) তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান অতিরিক্ত মাত্রায় বিকশিত হইয়াছিল। (৩) পিতার মৃত্যুর পর সংসারের এবং জমিদারীর অনেক গুরুতর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর মাতঙ্গীর মতামতের উপর এতদূর আস্থা রাখিতেন এবং এরূপ সমাদর দেখাইতেন যে মাতঙ্গীর ব্যক্তিত্বজ্ঞান বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে এখানে সেখানে বিষয়াদি কিনিতে দেখিলে বন্ধুগণ বলিতেন, "তুমি করিতেছ

কি, তোমার কি উপযুক্ত ছেলে আছে যে বিষয় দেখিবে ?” ব্রজসুন্দর বলিতেন “কেন আমার মেয়েই আমার সব দেখিবে।” সময় সময় কত গুরুতর বিষয় লইয়া পিতাপুত্রীতে পরামর্শ হইত। মাতঙ্গী সর্ব্বদাই স্বাধীনভাবে সর্ব্ববিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কত সময় পিতা মহর্ষির এবং কন্যা কেশবচন্দ্রের মতের সমর্থন করিতেন।

মানব হৃদয় অতি বিচিত্র বস্তু, পুষ্প যেমন সূর্য্যের আলোক না পাইলে প্রস্ফুটিত হয় না, তেমনি অনাদর ও অবজ্ঞা মানব চিত্তকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় না। যেখানেই সহানুভূতি এবং প্রেম সেখানেই মানব হৃদয়ের অপূর্ব্ব বিকাশ। ব্রজসুন্দর অতি আশ্চর্য্য ভাবে মাতঙ্গীর চরিত্র বিকাশের সহায়তা করিয়াছিলেন। পুত্র হইতে জনক জননী যত না সাহায্য লাভ করেন এই কন্যা হইতে ব্রজসুন্দর ততোধিক সুফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক মাতঙ্গী পুত্রের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন।

মাতঙ্গীর বুদ্ধিমত্তা ও সেবা পরায়ণতা——পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ব্রহ্মময়ী কখন পতির উপার্জ্জিত ধন স্পর্শ করিতেন না; সুতরাং সাংসারিক ব্যয়ের জন্য অন্তঃপুরে যে অর্থের প্রয়োজন হইত তাহা মাতঙ্গীর হস্তেই গচ্ছিত থাকিত। ব্রজসুন্দর হিসাব করিয়া সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ টাকা মাতঙ্গীর হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন “যদি ইহার অধিক খরচ হয় তুমি নিজে তাহা দিবে, যদি কিছু বাঁচাইতে পার তাহা তোমার।” যদি কখনও কিছু উদ্বৃত্ত হইত তাহা দিয়া মাতঙ্গী ভগ্নী-গণকে নানাদ্রব্য ক্রয় করিয়া দিতেন, কখনও নিজে গ্রহণ করিতেন না। ব্রজসুন্দরের কার্য্য স্থলেও সংসারটী বড় ক্ষুদ্র ছিল না, কাজেই বিশেষ কিছু বাঁচিত না। স্বজন, কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী উমেদার, বাড়ীর এবং জমীদারীর কর্ম্মচারীবর্গ, স্কুলের ছাত্র, বন্ধু, বিধবা, অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তিগণে বাড়ী সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত। এক মাতঙ্গীই এই পরিবারের কর্ণধার ছিলেন। ব্রহ্মময়ী তাঁহাকে সর্ব্বদাই সৎপরামর্শ দিতেন এবং তাঁহার যতদূর সাধ্য সাহায্য করিতেন। মাতঙ্গী অর্থব্যয় করিতেন, দাসদাসিগণকে নিয়োগ করিতেন, শাসন করিতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা

পারিবারিক জীবন—তৃতীয় চিত্র।

ভগিনিগণের শাসন ও পালনের ভারও তাঁহার উপর ছিল। পরিবারস্থ সকলের অভাব অভিযোগ, সুখ সুবিধা সবই মাতঙ্গীকে দেখিতে হইত। চিকিৎসক নিয়োগ, চিকিৎসক পরিবর্ত্তন, পথ্যাপথ্যের বিধান, সমস্তই মাতঙ্গীর উপর নির্ভর করিত। পিতা গুরুতর বিষয়েও কন্যার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সাংসারিক বিষয় চিন্তা করিবার অবসরই তাঁহার ছিল না। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সদর বাটীতে লোক সমাগম হইতে আরম্ভ করিত।

তিনি পারিবারিক উপাসনার পরেই যে সদরে গিয়া বসিতেন, আর আফিসের বেলা না হইলে লোকারণ্য ভেদ করিয়া স্নানাহার করিতে পারিতেন না। এক এক দিন এমন হইত যে আহার করিয়া বহির্বাটীতে গেলে তিনি লোকপাশ ছিন্ন করিতে পারিবেন না মনে করিয়া পশ্চাৎ দিকের দ্বার দিয়া আফিসে গমন করিতেন। ব্রহ্মময়ী এবং মাতঙ্গী ব্রজসুন্দরকে সংসার সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মাতঙ্গী বাল্যকাল হইতেই পিতামাতার, বিশেষতঃ মাতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ব্রহ্মময়ী কন্যাপ্রসবিনী ছিলেন বলিয়া বহু সংখ্যক দাসদাসী সত্ত্বেও শাশুড়ী কাহাকেও তাঁহার কিম্বা তাঁহার সন্তানদিগের কোন কাজ কর্ম্ম করিতে দিতেন না। প্রথম জীবনে মাতঙ্গীই ভগ্নিগণের পরিচর্য্যা ও তত্ত্বাবধান বিষয়ে জননীর একমাত্র সহায় ছিলেন। কনিষ্ঠভ্রাতা ও ভগ্নীদিগের পক্ষে মাতঙ্গী ক্রমে জননীর স্থান পূর্ণ করিয়া ছিলেন। পিতামহী সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেন যে ব্রজসুন্দরের স্ত্রী এবং পুত্র কন্যাগণ তেঁতুলঝোড়ার বাড়ীতে থাকেন। কিন্তু মাতঙ্গী ঠাকুরমাকে বলিতেন "আমরা গ্রামে কি লইয়া থাকিব? আপনি তো কতকগুলি দাসদাসী লইয়া সংসার করেন, আমরা ঢাকায় থাকিয়া বাবার যত্ন করি।" দেশের জ্ঞাতিগণের এবং প্রজাবর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব, অভিযোগ ও প্রার্থনা সমস্তই মাতঙ্গী পূর্ণ করিতেন। গুরুতর কোন

বিষয় হইলেই ব্রজসুন্দরের কর্ণে উঠিত। ইহার বুদ্ধি বিবেচনার উপর পিতার এতাদৃশ আস্থা জন্মিয়াছিল যে কন্যাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনও গুরুতর সাংসারিক কিম্বা বৈষয়িক কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিতেন না। কেহ তাঁহার নিকট কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত করিলে তিনি হঠাৎ তাহার কোনও উত্তর না দিয়া সর্ব্বদাই বলিতেন "আচ্ছা আমার মাতঙ্গীকে আগে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিব।" পর দিন কন্যার মতামত লইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। সকলেই জানিত যে মাতঙ্গীর মতামতের উপর আর আপিল নাই। এইরূপ করাতে ব্রজসুন্দরের অনেক সময় বেশ সুবিধা হইত। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে লোকে এখন যেরূপ সভ্য ও আত্মমর্য্যাদাশীল হইয়াছে তখন সেরূপ ছিল না। লোকে অপরের উপর অনেক উপদ্রব করিত এবং অনেক সময় অনেক অন্যায় অনুরোধ করিয়া ব্রজসুন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিত। মাতঙ্গী তাঁহাকে এই অবস্থা হইতে সময় সময় রক্ষা করিতেন। ব্রজসুন্দর স্বভাবতঃ কোমল হৃদয় ছিলেন, তাহার উপর তাঁহার অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা ছিল। লোকে তাঁহার উপর অন্যায় দাবিদাওয়া করিলে তিনি কিছুই বলিতে পারিতেন না। কিন্তু মাতঙ্গীর চক্ষুলজ্জা ছিল না, তিনি তেজস্বিনী নির্ভিক রমণী ছিলেন, সুতরাং "না" বলিতে তিনি কখন ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাতে ব্রজসুন্দর অনেক অপ্রীতিকর কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইতেন।

তরুণ বয়সেই মাতঙ্গীর বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরুপণের শক্তি অতি আশ্চর্য্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মাতঙ্গী বাল্যকাল হইতেই ভগ্নিগণ ও জননীর সেবা করিতেন। আশৈশব তিনি পল্লীগ্রামবাসি ছিলেন, সুতরাং গ্রামস্থ সকল লোকের উপরই তাঁহার সহানুভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি কাহার ঘরে কিসের অভাব তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতেন এবং সেই অভাব দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এই জন্য গ্রামের সকল লোকই বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।

পারিবারিক জীবন—তৃতীয় চিত্র।

বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার এই সেবা পরায়ণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে ছিল। নিজের পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী এবং পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের সেবাত করিতেনই, এমন কি পিতৃবন্ধুগৃহে, অন্যান্য আত্মীয় পরিবারে ও প্রজাগণের গৃহে গমন করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিতেন ও প্রয়োজন হইলে অনেক সময় নিজেই রোগীর সেবা করিতেন। যাহার সেবা করিবার কেহ থাকিত না, এমন কত লোকের মলমূত্র যে স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়াছেন তাহার গণনা হয় না। তাঁহার যেমন অনেক আত্মীয় স্বজন ছিলেন, তেমনি ভগ্নীও অনেকগুলি ছিল, তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দিনে মাতঙ্গী সর্ব্বদাই পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। যেখানে রোগশোক, মাতঙ্গী সেইখানেই সেবা শুশ্রূষা এবং সান্ত্বনার জন্য উপস্থিত হইতেন। এরূপ সেবাব্রতে দীক্ষিতা নারী সংসারে অতি বিরল।

যে সময়কার কথা বলা হইতেছে সে সময়ে দেশে একটীও শিক্ষিতা ধাত্রী ছিল না। শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাবে প্রসূতিদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইত। তাঁহার খুড়তুত ভগ্নী আসন্নপ্রসবা হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন। এই উপলক্ষে তিনি ঐ ভগ্নীপতি ময়মনসিংহের ডাক্তার বাবু বরদাদাস বসু মহাশয়ের নিকট ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করেন। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি ভগ্নিগণের ও পরিবারস্থ অপরাপর মহিলাগণের এবং পিতৃবন্ধুপরিবারের প্রধান আশ্রয় স্থল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধাত্রীবিদ্যাতে তিনি এমন পারদর্শী হইয়াছিলেন যে প্রসবের সময় মহিলাগণ তাঁহাকে পাইলে আর কোন ভয় করিতেন না। শঙ্কটকালে তিনি দরিদ্রতম প্রজার গৃহেও গমন করিয়া উপদেশ দান ও আবশ্যক হইলে যথাবিহিত কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। নিরক্ষর অজ্ঞ প্রজাগণ তাঁহার কথা একজন ডাক্তার সাহেবের কথার মত মান্য করিত।

মাতা ব্রহ্মময়ী দারুণ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসর

কাল শয্যাগত ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী শুশ্রূষা দ্বারা মাতঙ্গী সেবাপরায়ণতা ও মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশ্য অপরাপর ভগ্নী এবং আত্মীয়গণ সেবা কার্য্যে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরের সকল জামাতাই জননীর সেবার জন্য স্ব স্ব পত্নীকে দীর্ঘকাল পিত্রালয়ে রাখিয়াছিলেন। ব্রহ্মময়ী কন্যাগণের সেবায় স্নেহাপ্লুতহৃদয়ে বলিতেন "এই মেয়েদের জন্য আমি কত লাঞ্ছনাই না পাইয়াছি, এখন এই মেয়েরা না থাকিলে আমার কি গতিই হইত।" ব্রহ্মময়ীর পীড়াতে ব্রজসুন্দর যেমন অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তেমনি শুশ্রূষারও চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরের অবস্থার মত লোক দূরে থাকুক, অনেক ধনী লোকও পত্নীর জন্য এরূপ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ঢাকার বিখ্যাত কালী কবিরাজ ও সাভারের গুরুচরণ কবিরাজ প্রাণপণে ব্রহ্মময়ীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সে চিকিৎসা প্রণালী কি উৎকট, কি শ্রমসাধ্য. কি ব্যয়-সাধ্যই ছিল। এখনকার কবিরাজী চিকিৎসার সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। ব্রহ্মময়ীকে কত অসহ্য যন্ত্রণাই না দেওয়া হইয়াছিল। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ব্রহ্মময়ী শান্তভাবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতেন। ব্রহ্মময়ীর জন্য ঢাকা হইতে প্রত্যহ গ্রামে গমন করিয়া মাঠেচরা গরুর সদ্যত্যক্ত গোময় সংগ্রহ করিয়া ঢাকায় আনয়ন করা হইত। এইরূপ রাশিকৃত গোময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়িতে ফুটাইয়া ব্রহ্মময়ীর খাট সমান লম্বা বাক্সে ঢালিয়া, তাহার উপর বেতের ক্যাম্প-খাটে কোনও বিছানা না দিয়া ব্রহ্মময়ীকে শয়ন করাইয়া ভাপ্‌রা দেওয়া হইত। কখন বা রাশি রাশি মাসকলাই ঐরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার ভাপ্‌রা দিবার বন্দোবস্ত হইত। ঔষধযুক্ত ঘৃতে হাঁসের মাংস ভাজিয়া সর্ব্বাঙ্গে সেক দেওয়া হইত। তৈল, ঔষধ, মালিস অনুপানের তো কথাই ছিল না। ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর ৩৫। ৩৬ বৎসর পরে আমরা গুরুচরণ কবিরাজের পুত্রের নিকট শুনিয়াছি যে ব্রজসুন্দর বাবুর পত্নীর চিকিৎসার সময় তাঁহারা শেষ মহামাস তৈল প্রস্তুত করিয়াছিলেন তৎপরে আর করা হয় নাই।

পারিবারিক জীবন—তৃতীয় চিত্র।

অবশ্য ব্রজসুন্দর বাবু ইহার কিছুই জানিতেন না। তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মময়ীর গৃহের তাপ সর্ব্বদা সমান ভাবে রক্ষিত হইত। প্রত্যহ নূতন তুলার নূতন শয্যা প্রস্তুত করিয়া রোগীকে শয়ন করান হইত। প্রত্যহ ধোপাবাড়ীর পরিষ্কার বস্ত্র রোগীর গৃহে ব্যবহৃত হইত। বিলাত হইতে হাওয়ার বিছানাও আনয়ন করা হইয়াছিল। ব্রজসুন্দর আহারে বিহারে চিরদিনই সাত্বিকভাবাপন্ন ছিলেন। আহারের জন্য কখনও ছাগ হত্যা করিতে দেন নাই; কিন্তু ব্রহ্মময়ীর জন্য এক বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন একটী করিয়া ছাগ হনন করা হইত। ব্রজসুন্দর পত্নীর জন্য এ যন্ত্রণাও সহ্য করিতেন। ব্রহ্মময়ীকে ছাগমাংসের সুরুয়া দেওয়া হইত। সে সময় ঢাকায় কাটা মাংস বিক্রয় হইত না। ব্রজসুন্দর স্ত্রীর সেবার যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা হয় না। ইহাতেই তাঁহার পত্নীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। পাছে ব্রহ্মময়ীর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই জন্য পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার বাড়ীর নিকট রাত্রিতে কাহাকেও উচ্চে কথা বলিতে বা গান করিতে দিত না। ব্রজসুন্দর বাবু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু মাতঙ্গী একবর্ষকাল মাতার সেবার বিপুল আয়োজন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যে যাহাই করুক মাতঙ্গীকে সব করাইয়া লইতে হইত। বলিতে গেলে মাতার পীড়ার সময় এক বৎসর কাল তিনি ও ভগ্নিগণ শয্যায় অঙ্গ দেন নাই বা নিশ্চিন্ত মনে একদিন আহার করেন নাই। এইরূপ অসাধ্য চিকিৎসা ও সেবার ফলে ব্রহ্মময়ী ক্রমে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং বাম হস্তের একটী অঙ্গুলিতে ছাড়া পক্ষাঘাতের কোন চিহ্নই আর ছিল না। তিনি স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে পারিতেন। পরে দেশে গিয়া কোন পারিবারিক ঘটনায় দারুণ মনঃকষ্ট পাইয়া আবার পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। আবার যে পড়িলেন আর শত চেষ্টায়ও উঠিলেন না। শেষে কবিরাজী চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাক্তার

পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। ব্রহ্মময়ী মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বলিয়াছিলেন "মা তোমায় আমি বেশী কি বল্‌ব, আমার বলিবার অপেক্ষা তুমি রাখ নাই, আমার জীবদ্দশায় তুমিই তো ইহাদের মায়ের মত যত্ন করিয়াছ, তুমিই ইহাদের মা হইয়া রহিলে, কর্ত্তা রহিলেন, কর্ত্তাকে দেখিও, তিনি যেন আমার অভাব বুঝিতে না পারেন।" মাতঙ্গী হৃদয় ঢালিয়া জননীর শেষ অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

মাতঙ্গীর হৃদয়ের বিশালতা—ব্রজসুন্দরের জননী, ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পুত্রকে দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে মাতঙ্গীর উদারতা অতীব প্রশংসনীয়। পিতা কোন কার্য্যই মাতঙ্গীর পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ব্রজসুন্দর যখন দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন তাহার পূর্ব্বে মাতঙ্গীকে এ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি উত্তর করিলেন "আপনি যদি ইচ্ছা করেন স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিতে পারেন, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" পিতার বিবাহের সময় এবং পরে বিমাতার প্রতি তিনি এমন ব্যবহার করিয়াছিলেন যে বিমাতা তাঁহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন। পরিবারের অপর সকলের ন্যায় বিমাতার ভারও নিজ স্কন্ধে লইলেন। বিমাতাকে, লেখাপড়া শিখাইতে বসিয়া গেলেন। বিবাহের পরই ব্রজসুন্দর ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নববিবাহিতা পত্নীর সহিত সংশ্রব রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া উঠিলেন; তখনও স্পষ্টবাদিনী কন্যা বিমাতার পক্ষ হইয়া পিতাকে অনুযোগ দিতে কুণ্ঠিতা হইলেন না। পরদুঃখকাতরা, মমতাময়ী মাতঙ্গীর হৃদয় বিমাতার অবস্থা ভাবিয়া বড়ই ব্যথিত হইত। পিতার মৃত্যু সময়ে বিমাতার প্রতি তিনি যে প্রকার উদারতা দেখাইয়াছিলেন তাহা ব্রজসুন্দরের কন্যারই উপযুক্ত হইয়াছিল। যে ব্রজসুন্দর বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুকালে যাহাতে তাঁহাদের পত্নীরা স্বামীর মৃত্যুর পর কপর্দ্দকবিহীন হইয়া আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ

পারিবারিক জীবন—তৃতীয় চিত্র।

হইয়া না পড়েন সেই জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই ব্রজসুন্দরই তাঁহার পীড়া যখন দ্রুতবেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন নিজের স্ত্রীর কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। নবপরিণীতা পত্নীর প্রতি পিতার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইতেছে দেখিয়া মাতঙ্গী বিমাতার ও ভ্রাতার স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পিতার দ্বারা তাড়াতাড়ি একখানি উইল করাইয়া লইলেন। এই উইলে পরিবারস্থ সকলের, এমন কি ব্রজসুন্দরের বৃদ্ধ পরাণ শিকদারের পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু স্বার্থজ্ঞানশূন্যা মাতঙ্গী বালবিধবা হইলেও নিজের জন্য কোনও সংস্থান করাইয়া লইলেন না। উইল করিবার সময় জনৈক আত্মীয় মাতঙ্গীর কথা উত্থাপন করিতে যাইতেছিলেন। মাতঙ্গী তাঁহাকে ভ্রুকুটি করিয়া নিবারণ করিলেন, পাছে পিতা মনে করেন নিজের স্বার্থের জন্য মাতঙ্গী উইল করাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্রজসুন্দর মাতঙ্গীকে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাসকে উইলের অছি নিযুক্ত করিয়া যান। পিতার মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরে দুঃখিনী বিমাতার অবস্থায় কাতর হইয়া মাতঙ্গী তাঁহাকে পুনর্ব্বিবাহ দেন। তাহার পূর্ব্বেই দুর্গামোহন দাস মহাশয় নিজ বিমাতার বিবাহ দিয়া কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তাহা মাতঙ্গী দেখিয়াছিলেন। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, লোকনিন্দার ভয়ে মাতঙ্গী সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। মাতঙ্গী লোকের নিন্দার ভয় করিয়া চলিতে কখন শিক্ষা করেন নাই। মাতঙ্গীর সকল কার্য্যই অসাধারণ রকমের ছিল।

মাতঙ্গীর জীবনের কঠিন পরীক্ষা—পিতার মৃত্যুর পরই মাতঙ্গীর জীবনে চারিদিক হইতে কঠিন পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজসুন্দরের মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে কন্যা প্রিয়ম্বদার বিবাহ হয়। সেইজন্য ৩।৪ হাজার টাকা বাজার দেনা তিনি পরিশোধ করিতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর মাতঙ্গী নগদ টাকা কিছুই দেখিতে পাইলেন না, উপরন্তু ৩।৪ হাজার টাকার ঋণ দেখিলেন। এই ঋণের

জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। ব্যাঙ্কের সেয়ারে কিম্বা কোম্পানীর কাগজে যে কয়েক হাজার নগদ মুদ্রা ছিল ঋণ শোধের জন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। নাবালক পুত্র দেখিয়া দোকানদারগণ ভীত হইতে লাগিল। মাতঙ্গী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন "তোমরা ভীত হইও না, আমি থাকিতে পিতার ঋণ কখনও অদেয় রাখিব না, ঘর বাড়ী আসবাব বিক্রয় করিয়াও ঋণশোধ করিব।" তিনি অচিরে গৃহের সমুদায় তৈজস পত্রের তালিকা করিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় যাহা কিছু, তাহা রাখিয়া সমুদায় আসবাব বিক্রয় করিয়া পিতাকে ঋণ মুক্ত করিলেন। আবার সেই সময় ব্রজসুন্দর বিষয় সম্বন্ধীয় কয়েকটী মোকদ্দমা আদালতে রুজু করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারও নিস্পত্তি হয় নাই। অনাথা বিধবাদের সম্পত্তি কেহ ক্রয় করিতে চাহিত না। ব্রজসুন্দর তাঁহাদের অনুরোধে বিষয় ক্রয় করিতেন কিন্তু কোনমতেই দখল পাইতেন না, সেইজন্য অনেক সময় তাঁহাকে আদালতের আশ্রয় লইতে হইত। মৃত্যুর সময় যে সকল মোকদ্দমা চলিতে ছিল তাহার জন্য মাতঙ্গীকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কেবল তাহাই নয়, ব্রজসুন্দরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণ নিজ নিজ ভূমির সীমা অতিক্রম করিয়া ব্রজসুন্দরের নাবালক পুত্রের জমি দখল করিতে লাগিলেন। ব্রজসুন্দরের দ্বারা উপকৃত এবং তাঁহার আশ্রিত লোকও এই প্রকার দুষ্কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মহালের নায়েব গোমস্থাগণও সুযোগ বুঝিয়া আপনাপন স্বার্থ দেখিতে লাগিল। স্থানে স্থানে প্রজা বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

এই সকল গোলোযোগের উপর পারিবারিক গোলযোগ আরম্ভ হইল। মাতঙ্গী ছোট ভাই ও বোনকে ঢাকাতে রাখিয়া শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু পিতৃব্য ইহাতে ঘোর বিরোধী হইলেন। তিনি ব্রজসুন্দরের পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যাকে গ্রাম্য বাটীতে রাখিতে চাহিলেন। মাতঙ্গী কুসংসর্গে এবং ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে ভ্রাতা ভগ্নিকে কিছুতেই রাখিতে চাহিলেন না। পিতার মৃত্যুর

পারিবারিক জীবন—তৃতীয় চিত্র।

পর এমন বিপদজালে জড়িত হইয়াও মাতঙ্গীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অধিক সময় লাগিল না। যখন দেখিলেন পিতৃব্যের সহিত বিবাদ মিটিবার নয়, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীকে কলিকাতায় ভগ্নিপতি কেদারনাথ রায়ের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে তাহাদিগকে ভগ্নীর নিকট রাখিয়া ভ্রাতার বিষয় রক্ষা এবং সুবন্দোবস্তের জন্য পুনরায় দেশে ফিরিয়া গেলেন। এই সময় তাঁহাকে যেরূপ কঠিন শ্রম এবং কঠিন কার্য্য সকল করিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ দিকে মোকদ্দমার তদ্বির, বিদ্রোহী মহালে গমন করিয়া প্রজাদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন এবং জমিদারীর খাজনা উস্থুল, বিশ্বাসঘাতক নায়েব কর্ম্মচারীদিগকে দমন এবং পিতৃব্যের হস্ত হইতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব নিজহস্তে গ্রহণ, প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। তিনি এ সময়ে একজন নির্ভীক বিচক্ষণ রাজনৈতিকের ন্যায় কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একজন পুরুষের পক্ষেও যাহা দুঃসাধ্য, মাতঙ্গী হৃদয়ের তেজে সে সকল কার্য্যও অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পিতা বর্ত্তমানে যে কন্যার পালকীর অগ্র পশ্চাতে দ্বারবান ছুটিত, তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই কন্যাকে একাকী অসহায় অবস্থায় অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টি মাথায় লইয়া সামান্য ডুলি আরোহণে কার্য্যোপলক্ষে বহুদুর গমন করিতে হইত। সঙ্গের লোকজন কত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। জমিদারী রক্ষার্থ কখনও বা সামান্য ক্ষুদ্র তরণীতে পদ্মার ন্যায় ভীষণ নদী পার হইতে হইত।

ব্রজসুন্দর পারিবারিক উপাসনাকালে কন্যাগণকে সর্ব্বদাই ক্ষমা গুণের উপদেশ দিতেন। মাতঙ্গী জীবনে পিতার এই উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ভ্রাতার বিষয় উদ্ধার করিবার সময় এরূপ শ্রুত হওয়া যায় কোনও আত্মীয়া বিষ প্রয়োগে তাঁহার জীবন সংহার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মাতঙ্গী শুনিলেন তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে, বাঁচিবার আশা নাই। তখন তাঁহাকে

নিজের নিকট আনিয়া অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়া রোগমুক্ত করেন। কাহার কিছু প্রতিবাদ করিবার সময় মাতঙ্গী কঠিন কথা শুনাইতেন বটে, কিন্তু এজীবনে কখন কাহারও সহিত শত্রুতা করেন নাই।

পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভগ্নীকে প্রতিপালন করা এবং সুশিক্ষা দেওয়া মাতঙ্গীর জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পরিণত বয়সে, জীবনের কর্ত্তব্য সকল সুসম্পন্ন করিয়া বীরতাড়া নিবাসী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার মজুমদারের সহিত পরিণীতা হন। তখন ভ্রাতাভগ্নিদিগকে প্রতিপালন করিতে করিতে তাঁহার দেহের শক্তি হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি আজীবন সেবাব্রতে জীবন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। জীবনের অপরাহ্ন কালে ভাবিলেন, সমুদায় ঝঞ্ঝাবাতের পর গুরুতর কর্ত্তব্য সকল যথাবিহিত পালন করিয়া ধার্ম্মিক পতির সহবাসে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি শান্তিতে অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু বিধাতা ঘটাইলেন অন্যরূপ। আবার মাতৃহীন শিশু সন্তানদিগের মাতার অভাব পূর্ণ করিতে ডাক পড়িল। ভগ্নী প্রিয়ম্বদা দুইটি শিশুপুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। ভগ্নদেহ লইয়া মাতঙ্গী প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। জীবনের এই শেষ কর্ত্তব্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার পতি পরলোক গমন করিলেন। প্রিয়ম্বদার কন্যা প্রাণাধিকা সুনীতিকে বিবাহ দিলেন। সেও বিবাহের পরেই মাসীকে—মাসী কেন মাতার অধিক মাসীমাতাকে, ছাড়িয়া পরলোক গমন করিল। আজীবনের সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বর্ষিয়সী মাতঙ্গী এখন কর্ম্মশ্রান্ত দেহে ভগ্নহৃদয়ে জীবনের তীরে আসিয়া বসিয়া আছেন। ব্রজসুন্দরের অতি আদরের কন্যা মাতঙ্গী আত্মপর জ্ঞানশূন্যা, মূর্ত্তিমতী সেবারূপিণী তাহাতে আর সংশয় নাই।

বন্ধুবান্ধব।

মানব চরিত্রের উপাদান এবং উপকরণ অনেক। ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র বা প্রকৃতির মূলে জনকজননীর প্রকৃতি এবং বংশের প্রভাব সর্ব্বপ্রধান তাহাতে আর সংশয় নাই। ব্রজসুন্দর যে বংশে জন্মগ্রহণ

পারিবারিক জীবন—চতুর্থ চিত্র।

করিয়াছিলেন, তাঁহা অতি প্রাচীন এবং সম্মানিত বংশ। প্রচণ্ডপ্রতাপ, ধন ঐশ্বর্য্য, দানশীলতা, দেবসেবার বিপুল সমারোহ এই বংশের বাহ্যিক লক্ষণ। ইঁহারা শাক্ত ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে মদ্য ও মাংসের বিশেষ প্রচলন ছিল। কথিত আছে অন্নপ্রাসনের সময় শিশুমুখে মদ্য দিয়া ইঁহারা অন্নপ্রাসন সার্থক করিতেন। মিত্র মজুমদারদিগের মধ্যে অনেকেই সুরাপায়ী এবং ভোগসুখাসক্ত ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এই রাজসিক ভাবাপন্ন মিত্র পরিবারে, ব্রজসুন্দরের ন্যায় সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন, শান্ত সুশীল, বিনয়ী কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, চিন্তা করিলে মনে হয় তিনি বোধ হয় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্থলই ছিলেন। তাঁহার একজন প্রবীণ জ্ঞাতি ৺রামকুমার মিত্র মজুমদার অনেক সময় বলিতেন যে "লোকে কি এত ভাল হয়? নিশ্চয় ব্রজসুন্দর কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা।" বাস্তবিক কাশীশ্বরীর গর্ভে এবং মিত্র মজুমদারদিগের বংশে এই প্রেমিক, দয়ালু, বিনয়ী ব্রজসুন্দর, কি করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন? মাংসাহার যাঁহাদিগের কুলক্রমাগত বিধি ছিল, তাঁহাদিগের বংশজাত ব্রজসুন্দর জীবহিংসার নাম শ্রবণ করিতে পারিতেন না। দুর্গোৎসবের সময় জননীকে বারংবার ছাগবলি উঠাইয়া দিতে বলিতেন। প্রচণ্ড ক্রোধনপ্রকৃতি কাশীশ্বরীর পুত্র সহিষ্ণুতার অবতার ব্রজসুন্দর শত উত্যক্ত হইলেও তাঁহার শান্তভাব অক্ষুণ্ণ থাকিত। পত্নী ব্রহ্মময়ী ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। ব্রজসুন্দর অবিশ্রান্ত দুরন্ত শ্রম করিয়াও যে প্রকৃতির মাধুর্য্য হারান নাই, তাহা গৃহে ব্রহ্মময়ীর স্নিগ্ধস্বভাবে এবং বাহিরে বন্ধুবান্ধবদিগের ভালবাসায়। এঁমন প্রেমিক সুহৃৎবৎসল লোক সচরাচর দেখা যায় না। কার্য্যোপলক্ষে যখন যেখানে গিয়াছেন, গুণী-জ্ঞানী-ব্যক্তি দেখিলেই চুম্বকের ন্যায় তাঁহাকে আকৃষ্ট করিরা চিরযোগ স্থাপন করিয়া লইয়াছেন এবং আজীবন বন্ধুর কল্যাণ কামনায় তাঁহার সুখদুঃখের অংশ বহন করিয়াছেন।

বন্ধুবান্ধবদিগের বিপদে ব্রজসুন্দর আপনাকে বিপন্ন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ভালবাসার ভিতর একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি আপনার স্বার্থ বাঁচাইয়া অবসর মত অপরের সহিত বন্ধুতা করিতে জানিতেন না। এবং বন্ধুতা করিবার সময়, জাতি, সম্প্রদায় পদমর্য্যাদা ইত্যাদি কিছুই বিচার করিতেন না। মনের মত মানুষ যেখানে দেখিতেন তাহাকেই আপনার করিয়া লইতেন, এবং যাহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন, আর তাহাকে ত্যাগ করিতেন না, তাহার জন্য কষ্ট অসুবিধা সকলই প্রসন্নচিত্তে বহন করিতেন। তাঁহার বন্ধুত্বের মূলে এই বিশেষত্বটুকু স্মরণ করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে হইবে। বন্ধুবান্ধবগণ ব্রজসুন্দরের জীবনের প্রধান অংশ পূর্ণ করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর যথার্থই সদ্‌গুণের উপাসক ছিলেন। কি ব্রাহ্ম, কি হিন্দু সন্ন্যাসী, কি মুসলমান ফকির যাহার ভিতর কোন বিশেষ সদ্‌গুণ দেখিতেন, তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে ভালবাসিতেন। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, আরমেনিয়ান সকল সম্প্রদায় হইতেই বন্ধু বাছিয়া লইয়াছেন। আর সে বন্ধুতা মুখের বন্ধুতা ছিল না, বন্ধুদিগের সহিত তাঁহার হৃদয়ের কি গভীর যোগ ছিল! তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, ধর্ম্মবন্ধুদিগের প্রতি অনুরাগশীল হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, সুতরাং ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্তকে যে তিনি গভীর প্রেমের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইঁহাদিগের সকল ভার কত বৎসর ধরিয়া পরমানন্দে বহন করিয়াছেন। ইঁহাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র ছিলেন। খৃষ্টিয়ধর্ম্মপ্রচারক বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, পাদ্‌রী এলেন ও এরাটুন্‌ সাহেব পর্য্যন্ত ধর্ম্মমতের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া ব্রজসুন্দরের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন ব্রজসুন্দরের গৃহে সার্ব্বজনীন প্রেমের কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রেমিক ব্রজসুন্দরকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সে দৃশ্য কখনই বিস্মৃত হইবেন না। ব্রজসুন্দরের বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে, তারকার

পারিবারিক জীবন—চতুর্থ চিত্র।

মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় আমরা তাঁহাকে চিনিয়া লই। বন্ধুগণ ব্রজসুন্দরের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অংশ পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় না দিলে তাঁহার জীবনের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমরা সকলের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহার বিবরণ এ স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রহ্মসঙ্গীতের এক স্থানে আছে :—

নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি ;
রয়েছ তুমি একথা কবে জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম বলিব সব কাজে।

বাস্তবিক বলিতে কি ব্রজসুন্দরের জীবনে এই অমৃতময়ী সঙ্গীতের বাণী যেন সার্থকতা লাভ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে—সে প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই। ব্রজসুন্দর জীবন ব্যাপিয়া তাহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। জীবনের বহু পথ দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, যে পথ দিয়া যখন গিয়াছেন সকলকে তুষিয়া গিয়াছেন। অপরের জন্য কিছু করিতে পারিলে বা অপরের প্রতি প্রেম এবং সহানুভূতি প্রকাশের সুযোগ লাভ করিলে তিনি কখনই তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার বন্ধুত্ব এমন অকৃত্রিম ছিল যে আজি কালকার দিনে তাহা উপকথার মত শুনাইবে। ব্রজসুন্দরের গৃহে কোন বন্ধুর সমাগম হইলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। বন্ধুর সঙ্গসুখে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার মুখে শুনিয়াছি যে বাবার কোন বন্ধু আসিয়াছেন শুনিলে তাঁহারা প্রমাদ গণিতেন যে বাবার আর আহার নিদ্রার অবসর থাকিবে না— ব্রজসুন্দরের পত্নী এবং কন্যাগণ নানাবিধ আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করিতে বসিতেন প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইয়া যত্ন করিয়াও ব্রজসুন্দর যেন তৃপ্ত

হইতেন না। তখন রেল ষ্টীমার না থাকায় বন্ধু ও অতিথিদিগের উপস্থিতির সময় নিরূপিত ছিল না। এইজন্য তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা উত্তম উত্তম কই মাগুর মাছ সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত।

ব্রজসুন্দর আজীবন অতি যত্নপূর্ব্বক দৈনিক হিসাব রাখিতেন, সেইগুলি আজিও আছে। এই দৈনিক জমাখরচের খাতাগুলি বাস্তবিক এক দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহা পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার দানশীলতা এবং আতিথেয়তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হই। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দেখিতেছি দাতব্যের তালিকা। গৃহে কোন বন্ধু সমাগম হইলেই আতিথ্যের বিপুল আয়োজন। বাস্তবিক নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসক যেমন লোকের স্বাস্থ্য নির্ণয় করেন ব্রজসুন্দরের এই বান্ধান জমা খরচের খাতাগুলি দেখিলে তেমনি তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব এবং শক্তি নির্ণীত হইয়া যায়। একি আশ্চর্য্য জীবনের কাহিনী! আমরা সেই খাতা হইতে দুই এক দিনের জমা খরচের হিসাব যথাস্থানে দিব। পাঠক দেখিবেন ব্রজসুন্দর দানে কিরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন।

স্বর্গীয় রামশঙ্কর সেন ঃ—ব্রজসুন্দরের সমসাময়িক এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের মধ্যে স্বর্গীয় রামশঙ্কর সেনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জীবনের প্রথমাবস্থা হইতে ব্রজসুন্দর ইহাঁকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে যুগে সহোদর ভ্রাতার সহিত একত্রে সম্পত্তি রাখিতে লোকে ভয় করে সেই যুগেই ব্রজসুন্দর রাম শঙ্কর সেন মহাশয়ের সহিত একত্রে জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। যাঁহাকে আপনার মনে করিতেন তাঁহার সহিত ব্রজসুন্দর কোন ভেদ রাখিতেন না। পরস্পরের প্রতি কতটা বিশ্বাস ও নির্ভর থাকিলে মানুষ ইহা করিতে পারে তাহা অনুমান সাপেক্ষ। তাঁহাদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া কখনও কোন অশান্তির কারণ উপস্থিত হয় নাই। তাহার কারণ তাঁহারা কখনও বিষয় সম্পর্কে পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। নিম্ন লিখিত পত্র খানি পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

পারিবারিক জীবন—চতুর্থ চিত্র।

21 st. May, 1875.

My dear Brajasundar

The bearer of this is Sarfaraj Khan of Narullapur. He says he holds a talook under us ; and as we have giving others of his standing their rights, I would extend the same favour to him in case you have no objection to such a proceeding. I therefore request that in case you agree Sarfaraj Khan may be restored to his rights. He says the original goes by the name of his grand father Hadayat Khan.

Your &c.
(Sd) Ramsanker Sen.

রামশঙ্কর সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ সেন ব্রজসুন্দরের সহাধ্যায়ী ছিলেন। এই উভয় ভ্রাতার সহিতই ব্রজসুন্দরের অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে যাহারা আধুনিক জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারে ব্রজসুন্দরের সহায় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাবু রামশঙ্কর সেন এক জন। ব্রজসুন্দর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে, বন্ধু রামশঙ্কর সেন ২।৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৮।৪৯ খৃষ্টাব্দে তাহাতে যোগদান করেন। ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় বেউথা গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি ঢাকা কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।

রাজ কার্য্যোপলক্ষে যখন যে স্থানে গমন করিতেন সেই স্থানেই জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইতেন। রামশঙ্কর বাবু সম্বন্ধে জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। "সুবিখ্যাত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন যখন কিশোর গঞ্জের (ময়মনসিংহ জেলায়) সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন তখন সেই মহকুমা অল্পদিন মাত্র খোলা হইয়াছে। রাস্তাঘাট, অফিস, হাট, সমাজ, সভ্যতা, আদব কায়দা, সকলই রামশঙ্কর বাবুকে

নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে ও সকলকে শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। উপযুক্ত হস্তেই উপযুক্ত বিষয়ের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি ধীর স্থির ও প্রশান্তভাবে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার তীব্র শাসনে এলাকার যত দুর্দ্দান্ত লোক সন্ত্রাশিত থাকিত অথচ তাঁহার সদ্ব্যবহারে ও সদবিষয়ে উৎসাহ দেখিয়া শিক্ষিত ভদ্র সন্তানেরা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট যাইতেন। আফিস আদালত হইতে পারসী ভাষা উঠিয়া গিয়া বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল লেখা পড়া হইত তাহা শুদ্ধরূপে লেখা তখনকার লোকের অভ্যাস ছিল না। হ্রস্ব, দীর্ঘ, ষত্ব, ণত্ব বোধ ছিল না। বাবু রামশঙ্কর কোন স্থলে ব্যঙ্গ করিয়া, কোথায় বা উপদেশ দিয়া সকলকে শুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে শিখাইতেন। যাহারা কখন কোন স্কুলে পড়ে নাই তাহারাও তাঁহার নিকট কোনও কাগজ লিখিয়া উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে শুদ্ধরূপে লেখা হইয়াছে কি না তাহা অপর কাহাকেও দেখাইয়া লইত। একেবারে "গুরু দাষ" "চোরামণী" তক্রবাগিষ "চক্কবত্রি" লিখিয়া তাঁহারা নিকটে উপস্থিত করিতে সাহস করিত না। সে সময়ে কেহ মোক্তারী পদের প্রার্থী হইলে তাহাকে কোন বহুদর্শী প্রাচীন মোক্তারের অধীনে কিছু দিন থাকিতে হইত। নিতান্ত বোকা কেহ উপস্থিত হইলে রামশঙ্কর বাবু ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। শেষোক্তরূপ একটী লোক একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার বিদ্যাবত্তা তিনি অনুমানে বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "মৃত্যুঞ্জয় কেমন করিয়া লিখিবে বল দেখি, তবেই তোমারে মোক্তারিতে পাশ করিয়া দিব।" কিন্তু বেচারি তাহা পারিল না, তাহার নানারূপ প্রয়াস দেখিয়া কাছারিতে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

রামশঙ্কর সেনের পরিবারের সহিত ব্রজসুন্দরের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রামশঙ্কর বাবুর গৃহে কাহারও পীড়া হইলে কিম্বা কোন কন্যা প্রসূতি হইলে ব্রজসুন্দর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গীকে সেবা শুশ্রূষার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। ব্রজসুন্দর বাবুর

পারিবারিক জীবন—চতুর্থ চিত্র।

মৃত্যুরপর ও রামশঙ্কর বাবু মধ্যে মধ্যে ব্রজসুন্দরের শিশু পুত্র ও কন্যাকে কলিকাতায় নিজ গৃহে লইয়া যাইতেন।

অভয়কুমার দত্ত ঃ—জৈনসারের স্বর্গীয় অভয়কুমার দত্ত মহাশয় ব্রজসুন্দরের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এই অভয়কুমার দত্ত বাল্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত এম, এ, তাঁহার পিতা সম্বন্ধে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন "প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আদবেই আস্থা ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মকেই জগতের ভাবী ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং স্বীয় পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে অত্যান্ত ব্যস্ত ছিলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দিগের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল এবং তিনি সর্ব্বদাই ভক্ত মুখে ব্রহ্মনাম শুনিতে ভাল বাসিতেন। মাতা ঠাকুরাণী প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের একান্ত পক্ষ পাতিণী ছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই অত্যান্ত দুঃখিত থাকিতেন, কিন্তু জননীর স্বাধীনতায় কখনই হস্তক্ষেপ করেন নাই। স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় পিতৃদেবের এক জন পরম সুহৃদ ছিলেন।" অভয়কুমার দত্ত আজীবন দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সেবায় তিনি চিরকাল ব্রজ-সুন্দরের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট চিরঋণী। নানা প্রতিবন্ধকতা বশতঃ অভয়কুমার স্বীয় পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিযুক্ত আছেন।

অভয়কুমার দত্তের মৃত্যু দিনে ব্রজসুন্দর নিজ ডায়েরীতে লিখিতেছেন ঃ—

"My dear friend Babu Abhoy Kumar Dutta.

Judge of the small cause court, Dacca, breathed his last at Dacca on the 10th September 1870, Saturday at 6. P. M. He was attacked with carbuncle and suffered for about three months. He was suffering from diabetes for a long time. He was a rare man, a rare judge and a rare fiend. He was my school friend. He was an inhabitant of Joinsor, Bikrompur, where he opened an English school, a vernacular school, a dispensary and a post office.

বাবু অভয়কুমার দত্তের মৃত্যু সময়ের একটী বড় করুণ ঘটনা আছে। অভয়কুমারের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ব্রজসুন্দর বলিয়া কহিয়া উইল করাইয়া লইলেন। উইল করা হইলে তাঁহার পত্নীকে তথায় ডাকিয়া দিয়া সকলে গৃহের বাহিরে গমন করিলেন। অভয়-কুমারের পত্নী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র অভয়কুমার বলিলেন "আমার চেয়ে শেষে টাকাটাই বেশী হইল ?" এই কথা বলিতে না বলিতে সহসা তাঁহার জীবন দীপ নিবিয়া গেল। অভয়কুমারের স্ত্রী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন তখন সকলে দৌড়িয়া গৃহে আসিয়া দেখেন অভয়কুমার আর নাই।

দীননাথ সেন:—ব্রজসুন্দরের বন্ধুবর্গের মধ্যে বায়ড়া নিবাসী দীননাথ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বস্তুতঃ যে দল পূর্ব্ববঙ্গকে গড়িয়া তুলিয়াছে দীননাথ সেই দলের একজন প্রধান ব্যক্তি। ব্রজসুন্দরকে মধ্য বিন্দু করিয়া যে কয় জন পূর্ব্ববঙ্গকে গঠন করিয়াছেন যাঁহারা অর্থ সামর্থ্যের কিছু মাত্র কৃপণতা না করিয়া দেশবাসীর প্রাণে স্বদেশ-প্রীতি জাগ্রত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, দীননাথ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। দীননাথ ব্রজসুন্দর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োকনিষ্ঠ হইলেও ইহাদের ভিতর অতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের হিত সাধনার্থে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ঢাকার প্রায় প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে ইঁহার হস্ত দেখিতে

পাওয়া যায়। ব্রজসুন্দর ঢাকার ছাত্রদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য যে এক গুপ্ত সভা করিয়াছিলেন, বাবু দীননাথ সেন তাহাতেও উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। দীননাথ সেন বিস্তর পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন ও ব্রজসুন্দর বাবু তাহার আংশিক ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। দীননাথ সেনের সহিত ব্রজসুন্দর বাবুর দীর্ঘকাল ব্যাপী যোগ দিল। ব্রাহ্মসমাজের এবং জনহিতকর সমুদায় কার্য্যে দীননাথ সেন ব্রজসুন্দরের প্রধান সহায় ছিলেন।

অমৃতলাল গুপ্ত ঃ—অমৃতলাল গুপ্তকে ব্রজসুন্দর অতিশয় ভালবাসিতেন। অমৃতবাবু প্রথমে কুমিল্লা স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, পরে ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পদে উন্নীত হন। ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইহাঁর অনুরাগ অতি গভীর ছিল। অমৃত বাবুর প্রতি ব্রজসুন্দরের আকর্ষণের ইহাই প্রধান কারণ। প্রার্থনা শীলতা ইহাঁর জীবনের একটী বিশেষ লক্ষণ ছিল। ব্রজসুন্দরের প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ইনি তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত সকলের নিকট সুপরিচিত।

"দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন
উত্তরিতে ভবনদী করে'ছ কি আয়োজন।"

এই সঙ্গীতটী রাজা রামমোহন রায়ের নামে চলিত ছিল কিন্তু বাস্তবিক এটী অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়ের রচিত। এই অমৃতলাল গুপ্তের প্রতি ব্রজসুন্দরের এমনি আকর্ষণ ছিল যে তিনি আগমন করিলে ব্রজসুন্দরের আহার নিদ্রার কথা কিছু মনে থাকিত না। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গী যখন বালিকা তখন তিনি পিতাকে অনেকক্ষণ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতেন "অমৃত বাবুর গা দিয়া অমৃত টস্ টস্ করে পড়ে, বাবা তাই খান? অমৃত বাবু এলে বাবার আর কিছু মনে থাকে না।"

দীনবন্ধু মৌলিক ঃ—দীনবন্ধু মৌলিক ধামরাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে স্বগ্রামে হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। দীনবন্ধু প্রথমে ডেপুটী ইনেস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পাইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। ব্রজসুন্দর প্রথমে ঢাকাতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, পরে সেই মুদ্রাযন্ত্রের ভার দীনবন্ধু মৌলিক, ভগবানচন্দ্র বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, গোবিন্দ প্রসাদ রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের উপর পতিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ইনি সর্ব্বদাই ব্রজসুন্দরের অনুগামী ছিলেন। ইঁহার মত স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবাদী লোক সে কালেও বিরল ছিল। ইনি স্বগ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ভগবানচন্দ্র বসু ঃ—ইঁহার জন্ম স্থান মালখানগর, কিন্তু ইনি জনসাধারণের নিকট ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ভগবানচন্দ্র বসু বলিয়া পরিচিত ছিলেন কারণ ইনি বহুদিন ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যে ইনি আজীবন ব্রজসুন্দরের সহায়তা করিয়াছেন। যথার্থই ভগবানচন্দ্র বসু ব্রজসুন্দরের ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। উভয়ের ভিতর গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল। উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই পত্র ব্যবহার চলিত। অদ্যাবধি ব্রজসুন্দরের সংরক্ষিত পত্রাদির মধ্যে তাঁহার লিখিত চিঠি পত্র আছে। তাহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় উভয়ের ভিতর কি গভীর প্রেমের যোগ ছিল। ভগবানচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র বাবু সত্যানন্দ বসু মহাশয়ও অনেকেরই নিকট সুপরিচিত।

ভগবানচন্দ্র বসু (দ্বিতীয়) ঃ—ইনি স্বনামধন্য ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসুর পিতা এবং রাড়িখাল নিবাসী ছিলেন। ব্রজসুন্দরের ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে ইহার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। ব্রজসুন্দর যখন বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দানের জন্য উদ্যোগী ছিলেন, তখন ইনি

বিশেষ চেষ্টা করিয়া নিজের আত্মীয়ের সহিত ব্রজসুন্দরের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। এই জন্য ইঁহাকে কিছু অর্থ ব্যয়ও করিতে হইয়াছিল। ব্রজসুন্দর কন্যার বিবাহ দিতে না পারায় ভগবান বাবু অত্যন্ত দুঃখিত হন। তখন হইতে ইঁহাদের বন্ধুতায় আঘাত লাগিল, আর পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্টতা ছিল না। ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় দেশ মধ্যে জ্ঞানধর্ম্ম প্রচারের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রকন্যাগণ এক্ষণে আমাদের বঙ্গীয় সমাজের ভূষণ হইয়া আছেন। কুলপাবন পুত্র যাঁহার বংশধর তাঁহার অধিক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ :—বান্ধব সম্পাদক পূর্ব্ব বঙ্গের বিখ্যাত বাগ্মী ও লেখক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষের নাম কে না শুনিয়াছেন। ইনি ব্রজসুন্দরের বয়ঃ কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার নিতান্ত প্রীতির পাত্র ছিলেন। ইনি জীবনের প্রথমভাগে সমাজ সংস্কার ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে যে প্রকার উৎসাহ ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রজসুন্দর সহজেই যে তাঁহার প্রতি অতি মাত্রায় আকৃষ্ট হইবেন ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্ববঙ্গে ব্রজসুন্দর ও ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করিয়া যাঁহাদিগের প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইঁহার রচিত সঙ্গীত এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছিল। বলা বাহুল্য তাঁহার পূর্ব্বে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়গণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য অনেক মধুর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। নারী-জাতির উন্নতিকল্পে ইনি পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ চেষ্টা ও উৎসাহ দেখাইয়া-ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে সেই সময়ে সেরূপ ভাবে নারীজাতির শিক্ষার জন্য কেহ কোন চেষ্টা করেন নাই। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গ যে পথ প্রদর্শক সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রণীত "নারী-জাতিবিষয়ক প্রস্তাব" তখনকার দিনে বঙ্গ সাহিত্যে কি অপূর্ব্ব বস্তু

ছিল। পূর্ব্ববঙ্গ যে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল তাহা এই সকল ব্যক্তির প্রাণগত চেষ্টায়। তাঁহারা যে কার্য্যকে অগ্রসর করাইয়া ও যাহাকে গতিশীল করিয়া নিজেরা পরে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সে আরব্ধ কার্য্য তাঁহাদের সহিত ফিরিয়া আসে নাই। সে শক্তি নিবারণ করে কাহারও সাধ্য নাই। বিধাতার রাজ্যের নিয়ম এই, তাঁর কার্য্যের সঙ্কেত এই। কালীপ্রসন্ন ঘোষ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে গমন করিলেন। স্ত্রীশিক্ষার রথ আপন পথে চলিতে লাগিল—আজিও চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়ঃ—যে সকল যুবক ব্রজসুন্দরের উন্নত চরিত্র ও ধর্ম্ম বিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, বঙ্গচন্দ্র রায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নাম তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা বয়সে ব্রজসুন্দরের পুত্র তুল্য হইলেও তিনি ইঁহাদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাসে এবং চরিত্রের মাধুর্য্যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বলিতে গেলে ইহাদের সমসাময়িক ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যেই ইঁহাদের হস্ত বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন এবং ইঁহাদের অনুষ্ঠিত সর্ব্ববিধ কার্য্যে ব্রজসুন্দর উৎসাহ এবং পরামর্শ দাতা ছিলেন। এই সকল উৎসাহী নবীন যুবকদিগকে ব্রজসুন্দর অন্তরের সহিত প্রীতি করিতেন। ব্রজসুন্দর তখন প্রাচীন। বঙ্গবাবু প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয় দলের মধ্যে যোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গবাবুকে ব্রজসুন্দর অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বঙ্গবাবুর জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ ও ভক্তিপ্রবণতা দেখিয়া ব্রজসুন্দর ইঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। "বঙ্গ" বলিতে তাঁহার স্বাভাবিক মিষ্টস্বর যেন আরও মিষ্ট হইয়া পড়িত। কাহার মুখে বঙ্গবাবুর সুখ্যাতি শুনিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত

না। বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকার প্রথম প্রচারক, তৎপরে বঙ্গচন্দ্রই এই ক্ষেত্রে তাঁহার পদানুসরণ করেন।

বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়:—তদানীন্তন ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। কাশীকান্ত বাবু তখন ঢাকায় হিন্দু সমাজের নেতা এবং ব্রজসুন্দর ও ব্রজসুন্দর-প্রমুখ ব্রাহ্মদলের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নবকান্ত বাবুকে ব্রাহ্মসমাজে আসিতে যে কি প্রকার স্বার্থ ত্যাগ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা আজকালকার দিনে কল্পনা করা যায় না। ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র হইয়া ইনি ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য দারিদ্র এবং ঘোরতর পরীক্ষার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন পিতার সম্পত্তি হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন ও তাঁহাকে আজীবন দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, তথাপি নবকান্ত মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাৎপদ বা বিচলিত হইলেন না। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অতুল স্বার্থ ত্যাগ এবং জলন্ত উৎসাহ তখনকার দিনে ঢাকার যুবকদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার গৃহ দরিদ্র ছাত্র, অসহায়া বিধবা, আশ্রয়হীনা স্ত্রী, কুলীন কুমারীগণের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। এক সময় ব্রজসুন্দর ব্রাহ্মসমাজের সকল ভারই বহন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তেজস্বী যুবক নবকান্ত ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নবকান্ত বাবু গল্প করিবার সময় বলিতেন বাল্যকালে যেদিন স্কুল হইতে আসিয়া শুনিতাম বৈঠক খানায় ব্রজসুন্দর বাবু আসিয়াছেন সে দিন আর কিছুই মনে থাকিত না, পাঠ্য পুস্তক যথা স্থানে রাখিবার সময় হইত না, আহারের কথা মনে থাকিত না, আমরা ছুটিয়া বৈঠকখানায় গিয়া ব্রজসুন্দর বাবুর সহিত বাবার যে সকল ধর্ম্মালোচনা হইত তাহাই তন্ময় হইয়া শুনিতাম। নবকান্ত বাবুর পিতা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, তাঁহার সহিত ব্রজসুন্দর বাবুর তর্ক বিতর্ক হইত নবকান্ত বাবু তাহাই আগ্রহের সহিত শুনিতেন।

বঙ্গচন্দ্র রায় ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় বিশ্বাসী, বিনয়ী, ত্যাগশীল, তেজস্বী, উৎসাহী যুবক সকল সমাজেরই অলঙ্কার। তাঁহারা যখন ব্রাহ্মসমাজের জন্য জীবন ঢালিয়া দিয়াছিলেন তখন ব্রাহ্মসমাজের কি শুভযুগ দেখা দিয়াছিল। ব্রজসুন্দর ইহাদিগের তেজঃদীপ্ত মুখ দেখিয়া কত আশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, ইহারাও ব্রজসুন্দরকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন।

বাবু চাঁদ মোহন মৈত্রঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় চাঁদ মোহন মৈত্রের সহিত মিত্র মহাশয়ের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। স্বর্গীয় মৈত্র মহাশয় কর্ম্মোপলক্ষে ফরিদপুরে বাস করিতেন। হেরম্ব বাবু মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার নিকট গল্প করিয়াছেন, "পিতা যখন দিবা শেষে গৃহে ফিরিতেন তখন তাঁহার পকেটে খেলনা বা খাবার কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য হাত দিয়া সব জিনিষ বাহির করিতাম। তখন প্রায়ই বাবার পকেটে সযত্নে রক্ষিত ব্রজসুন্দর বাবুর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাইতাম না।" মৈত্র মহাশয় তখন ইহাই জানিতেন, যে ব্রজসুন্দর বাবুর চিঠিগুলি তাঁহার পিতার অতি যত্নের বস্তু ছিল।

ব্রজসুন্দর বাল্যকালে মুসলমান মৌলবীদিগের নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবনে এমন কি বার্দ্ধক্যেও তিনি মৌলবী-দিগের নিকট পারস্য ভাষা শিখিতেন। তাঁহার দৈনিক জমাখরচের খাতায় ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কোথায়ও দেখা যায় পারস্য পুস্তক ক্রয় করিতেছেন, কোথায়ও দেখা যায় মৌলবীর বেতন দিতেছেন। ইংরাজি স্কুলে ব্রজসুন্দর অনেক মুসলমান বালকের সহিত পাঠ করিতেন, বাল্যের সমপাঠিদিগের সহিত এবং পরে কার্য্যোপলক্ষ্যে অনেক মুসলমানের সহিত তাঁহার আজীবনের বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুসলমান বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঢাকার ভূতপূর্ব্ব নবাব আবদুল গণি, নয়াবাড়ীর জমিদার মৌলবী আবদুল আলি, বায়েস্তাবাদের জমিদার ও ছোট আদালতের জজ সৈয়দ

আবেদুল্লা, পাগলার জমিদার সাবের খাঁ, আবদুল আজিজ্ প্রভৃতি বিখ্যাত মুসলমানগণ তাঁহার চির সুহৃদ ছিলেন। ইহাঁদিগের অনেকেই তাঁহার বিদ্যালয়ের বন্ধু এবং বিদ্যালয়ের এই বন্ধুত্ব তাঁহার জীবনে চিরস্থায়ী হইয়াছিল। মৌলবি আবদুল আলি, এবং নবাব আবদুল গণি প্রভৃতির সহিত তাঁহার এমন ঘনিষ্ঠতা এবং অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল যে সেরূপ সৌহার্দ্দ সমধর্ম্মীর সহিতও হয় কি না সন্দেহ। বাল্যের বন্ধুতা এরূপ ভাবে চিরস্থায়ী হইতে প্রায় দেখা যায় না। নবাব আবদুল গণি তাঁহার বৈষয়িক ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কার্য্যে অনেক সময় ব্রজসুন্দরের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ব্রজসুন্দরের অনুরোধে নবাব আবদুল গণি স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়কে প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই প্রসন্নবাবুর কার্য্যকালেই নবাব-পরিবারের বিশেষ সমৃদ্ধির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রসন্নবাবু ব্রজসুন্দরের অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুকালে এই প্রসন্নবাবুকেই তাঁহার উইলের অছিদ্বয়ের পরামর্শদাতারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আবদুল গণি বড় সদাশয় ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। উপযুক্ত পাত্রে মুক্তহস্তে দান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দ্বারা কত যে সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ঢাকার কত উন্নতি তাঁহার দ্বারা সাধিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মৌলবী আবদুল আলি ;—নয়াবাড়ীর প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার মৌলবী আবদুল আলিও ব্রজসুন্দরের বাল্যবন্ধু ছিলেন। পাঠক ইহাঁর নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছেন। ইহাঁরই গৃহে ব্রজসুন্দর জামাতার মৃত্যু সংবাদ প্রথমে পাইয়াছিলেন। আবদুল আলি পূর্ব্ববঙ্গে একজন বড় সদাশয় কিন্তু দাঙ্গাবাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সে সময়ে লোকে বলিত :—

"দেবতার মধ্যে শ্মশানকালী
মানুষের মধ্যে আবদুল আলি।"

ডুষ্টের দমনে আবদুল আলির মত আর দ্বিতীয় ছিল না। তখনও পূর্ব্ববঙ্গে জমিদারগণ ডুষ্টের দমন নিজহস্তে করিতেন, পরস্পর দাঙ্গাহাঙ্গামাও করিতেন। এখনকার মত শান্তির রাজ্য তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমরা ব্রজসুন্দর বাবুর কন্যার নিকট শুনিয়াছি তাঁহাদের গ্রামের প্রান্তে দাঁড়াইয়া দূরে নীলকুঠিস্থ ওয়াইজ (Wise) সাহেবের দল ও মৌলবী আবদুল আলির দল পরস্পর লড়াই করিয়া পলায়ন করিতেছে দেখিতেন। তখন তাঁহারা নিতান্ত শিশু, সভয়ে হাতী, ঘোড়া, লাটিয়াল, লোকলস্কর, পলায়ন করিতেছে দেখিতেন। ঢাকার মৌলবী বাজার ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার বাসবভবনও অতি বিস্তৃত ছিল। ইনি একদিকে যেমন দুর্দ্দান্ত দাঙ্গাবাজ অপরদিকে সদাশয় ও দয়ালু বলিয়াও ইহাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। সকলেই তাঁহাকে "পাগলা মৌলবী সাহেব" বলিত। ইঁহার সম্বন্ধে ঢাকায় অনেক গল্প প্রচলিত ছিল।

প্রথম গল্প—আলি সাহেব একবার জমিদারী দেখিতে গিয়াছিলেন। একদিন অতি ভোরে অশ্বারোহণে এক কৃষকের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। দেখিতে পাইলেন, কৃষকের বালকবালিকাগণ রৌদ্রে বসিয়া মাটীর সানকিতে করিয়া হোল্‌দে হোল্‌দে চিনার ভাত খাইতেছে। মৌলবী সাহেবের মনে হইল ইহারা পোলাও খাইতেছে। তিনি মনে মনে ভারি চটিয়া গেলেন "কি প্রজারা পোলাও খায় আর আমায় খাজনা দেবার বেলা টাকা জোটে না?" সন্দেহ দূর করিবার জন্য সম্মুখে গিয়া সেই হোল্‌দে ভাত একটু তুলিয়া মুখে দিলেন। মুখে দিয়াই তাঁহার চক্ষুস্থির হইল, "ছি! ছি! এই কি পোলাও, এ যে অখাদ্য।" অমনি 'থু' 'থু' করিয়া কদর্য্য ভাত মুখ হইতে ফেলিয়া দিলেন। এক মুহূর্ত্তে রাগের পরিবর্ত্তে তাঁর হৃদয়ে প্রজাদিগের প্রতি মহা অনুকম্পা উপস্থিত হইল। "আহা আমার প্রজারা এত কষ্টে থাকে।" এবং সেই দিন হইতে নিজ জমিদারীর মধ্যে এই প্রচার করিয়া দিলেন যে চিনার ক্ষেতের উপর কোন খাজনা আদায় করা হইবে না।

পারিবারিক জীবন—চতুর্থ চিত্র।

দ্বিতীয় গল্প তাঁহার জ্ঞাতিগণের সহিত প্রিভি কৌন্সিলে মোকদ্দমা চলিতেছিল, তখন একদিন বিলাত হইতে তারে খবর আসিল যে তিনি মোকদ্দমায় হারিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈঠকখানায় একা বসিয়া আছেন, কাহারও নিকটে যাইতে সাহস হইতেছিল না। মৌলবী সাহেব গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন, হঠাৎ কি মনে হইল, ঘড়িটী টিক্ টিক্ শব্দ করিতেছিল, ঘড়ির শব্দও তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন "তুই আবার টিক্ টিক্ করছিস কেন? বলিয়াই ৫০০।৬০০ টাকা মূল্যের ঘড়ির কলটী মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন "এখন টিক্ টিক্ করা বন্ধ হল ত?" এই প্রকার মানুষকে যে লোকে পাগল বলিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ব্রজসুন্দরের প্রতি ইহাঁর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। দুই বন্ধু পরস্পরকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। ব্রজসুন্দরের পুরাতন কাগজ পত্রে ও হিসাবের খাতায় সর্ব্বদাই ইঁহার নামের উল্লেখ আছে দেখা যায়।

এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় এক দিন ব্রজসুন্দর মৌলবী সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। কথা বার্ত্তার পর যেই বাড়ী আসিবার জন্য উঠিয়াছেন অমনি মৌলবী সাহেব কি মনে করিয়া বলিলেন "তুমি এখানে একটু দাঁড়াও ত, আমি এখনই আস্‌ছি"। ব্রজসুন্দর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, ব্যাপারখানা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে দেখেন মৌলবী সাহেব পর্দ্দার অন্তরাল হইতে স্ত্রীর হাতখানি বাহির করিয়া ব্রজসুন্দরকে নিকটে ডাকিয়া তাঁর হাতে স্ত্রীর হাত সঁপিয়া দিলেন। বলিলেন "আমার অবর্ত্তমানে আমার স্ত্রীর ভার তোমার উপর রহিল।" আবদুল আলি তখন জ্ঞাতিগণের সহিত মোকদ্দমায় অত্যন্ত জড়িত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই মৌলবী সাহেবের মৃত্যু হয়। তখন

ব্রজসুন্দরের শেষ অনুরোধ পালন করিবার দিন আসিল। ব্রজসুন্দর প্রাণপণে বন্ধুর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বন্ধুপত্নী আমীরুন্নেছা খাতুন তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। তাঁহার সমুদায় বিষয় কর্ম্ম ব্রজসুন্দর দেখিতেন, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিতেন, তাঁহার মোকদ্দমার তদ্বির করিতেন। ব্রজসুন্দরের মৃত্যুর পর এই মুসলমান রমণী ব্রজসুন্দরের কন্যার নিকট কত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইলে লোকে যেরূপ শোকার্ত্ত হয়, ইনিও ব্রজসুন্দরের মৃত্যুতে তদ্রূপ হইয়াছিলেন।

ব্রজসুন্দরের বন্ধুবান্ধবদিগের সংখ্যা করিয়া উঠা কঠিন। তিনি বন্ধু নির্ব্বাচন করিবার সময় কোন দিনও জাতি সম্প্রদায়, ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ প্রভেদ করিয়া চলেন নাই। বরং দরিদ্র বন্ধুদিগের প্রতি অধিকতর সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। ইহাও দেখা গিয়াছে যে ধনীবন্ধু ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় অতি বিনয়ের সহিত হাত দুটী জোড় করিয়া তাঁহার পুত্রের বিবাহের সময় একবার জয়দেবপুরের জঙ্গলে তাঁহার পদধূলি দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাকে ব্রজসুন্দর যে ভাবে গ্রহণ করিতেছেন, পরক্ষণেই বাল্যের সহপাঠি জীর্ণশীর্ণ মলিন বেশধারী দরিদ্র নবলাল শীলকে ততোধিক আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছেন। ব্রজসুন্দরের বৈঠকখানা এক আশ্চর্য্য স্থান ছিল। সেখানে দিবানিশি জনসমাগম হইত। নবলাল শীলও প্রতিদিন ব্রজসুন্দরের আফিস হইতে আগমনের পূর্ব্ব হইতে বৈঠকখানার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে তামাক জোগাইতে জোগাইতে বৈঠকখানার চাকরেরা পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত। ব্রজসুন্দরের কিন্তু এক দিনও বিরক্তি দেখা যায় নাই। নবলালকে প্রতিদিনই প্রসন্নমুখে অভ্যর্থনা করিতেন। নবলালের ঘরে শান্তি ছিল না। নিজের স্বাস্থ্য ছিল না অর্থও ছিল না, ছিলেন কেবল দুই পত্নী। তাহাদের অত্যাচারে নবলালের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বেচারার শান্তির স্থান যেন একমাত্র ব্রজসুন্দরের

পারিবারিক জীবন—চতুর্থ চিত্র।

বৈঠকখানার কোণটী ছিল। ব্রজসুন্দর নানা লোকের সহিত কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা এত ব্যস্ত থাকিতেন যে তাঁর সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলিবারও সময় পাইতেন না। নবলাল আলাপেরও প্রত্যাশী ছিলেন না। ব্রজসুন্দরের শান্ত মধুর মুখশ্রী ও সাদর অভ্যর্থনায় তাঁহার তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল হইত। ব্রজসুন্দর অনেক সময় তাঁহাকে অর্থ সাহায্যও করিতেন। ব্রজসুন্দরের জমাখরচের খাতায় আজও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বন্ধুদিগকে ব্রজসুন্দর যে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা আর বর্ণনীয় নয়। যখন গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, হয়ত চতুর্দ্দিকে আমলাগণ কাগজপত্র হস্তে দণ্ডায়মান, মস্তক উত্তোলন করিবার অবসর নাই, যেই শুনিতেন তাঁহার কোন বন্ধু পীড়িত হইয়াছেন, অমনি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। নিজে উঠিতে না পারিলেও অবস্থা জানিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ করিতেন। অবকাশ পাইলে প্রথমেই বন্ধুকে দেখিতে যাইতেন। যেখানে ব্রজসুন্দরের পদার্পণ হইত সেখানে চিকিৎসা সেবার কোন ক্রুটী হইত না। বিদেশস্থ কোন বন্ধুর পীড়ার সংবাদ শুনিলে ক্রমাগত টেলিগ্রাফ করিতেন। তাঁর জমাখরচের খাতা উল্‌টাইয়া অতীত প্রাণের এই সব স্পন্দন যেন এখনও অনুভব করা যায়। যেন পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ব্রজসুন্দরের দুঃখ কাতর হৃদয় সাড়া দিয়া উঠিতেছে। সেই ক্ষীণ দেহে কি বিধাতা এত শক্তি দিয়াছিলেন? দুরন্ত শ্রম করিয়াও অসংখ্য বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের দুঃখের বোঝা, কর্ম্মের বোঝা, কর্ত্তব্যের বোঝা বহন করিয়া গিয়াছেন। সে হৃদয়ের বিস্তার এবং গভীরতা কতদূর ছিল জানি না।

ব্রজসুন্দর যে কোথা হইতে কাজ খুঁজিয়া বাহির করিতেন তাহা বলা যায় না। বন্ধুদিগের পীড়ার সময় সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াই নিরস্ত হইবার ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। যদি দেখিতেন বন্ধুর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই তবে ভাল উইল করাইয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্র

সকলের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন এবং বন্ধুর মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য অগ্রসর হইতেন। ব্রজসুন্দরের দৃষ্টি যে কতদূর যাইত তাহা বলা যায় না। সে কালে কোন গৃহে কাহার মৃত্যু হইলে বড়ই চোরের উপদ্রব হইত। ব্রজসুন্দর তাই বন্ধুবান্ধবদিগের মৃত্যু হইলেই তাঁহাদের কোন বস্তু যাহাতে কেহ অপহরণ না করে সেই জন্য আপনার লোক দিয়া বাড়ী পাহারা দিতেন। বিদেশী বন্ধু দিগের জন্য তিনি আরও ব্যস্ত হইতেন, তাঁহাদের সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। আস্‌বাবপত্র বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের হস্তে নগদ টাকা দিতেন। অনেক সময় এই সব আসবাবের ক্রেতা মিলিত না। তখন ব্রজসুন্দর অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য দিয়া সেগুলি আপনি লইতেন। এইরূপে অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে ব্রজসুন্দরের গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার পরিবার পরিজন বিরক্ত হইতেন। পত্নী ব্রহ্মময়ী অনেক সময় হাসিয়া বলিতেন "টাকাত কিছু দিতেই হবে কাজেই এই সব জঞ্জালে বাড়ী ভর্ত্তি করা হচ্চে।" ভদ্রলোকে যে দান লইতে পারে না ব্রজসুন্দর তাহা জানিতেন। "আমিই কিনিলাম" বলিয়া টাকা দিলে লইতে কাহারও আপত্তি হইবে না। ব্রজসুন্দর কি ভাবে কার্য্য করিতেন তাহা পত্নী ব্রহ্মময়ীই বুঝিতেন। তাঁহার ইংরাজ বন্ধুগণেরও বিপদাপদের সময় ব্রজসুন্দর প্রাণপণে সাহায্য করিতেন।

মৌলবী আবদুলআলী, সৈয়দ আবেদুল্লা, অভয়কুমার দত্ত প্রভৃতি তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গের বন্ধুদিগের কথা ছাড়িয়া দিই। ইঁহাদিগের সহিত তাঁহার আজীবনের সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে ইহাঁরা স্বদেশী। কিন্তু তাঁহার পশ্চিম বঙ্গের লোকদিগের প্রতি যে হৃদ্যতা ছিল সেই সম্বন্ধে দুই একটী উদাহরণ দিতেছি :—

ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হস্পিটলের নিকটে ব্রজসুন্দরের যখন বাসা বাড়ী ছিল, বলিতে গেলে তখন তাঁহার চাকুরির প্রথমাবস্থা। তখন বাবু হরনাথ মিত্র নামে কোন্নগরের একজন হিন্দু ভদ্রলোক ঐ হাঁস-পাতালের ডাক্তার ছিলেন। হরনাথ বাবু কবে ঢাকা হইতে চলিয়া

আসেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ব্রজসুন্দরের স্মৃতি পুস্তকে হরনাথ বাবুর মৃত্যু দিনটী সযত্নে লেখা আছে। সুধু কি স্মৃতি পুস্তকে লেখা! সে লেখাটী যে তাঁহার হৃদয়েই লেখা ছিল তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের ব্যবহারে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কবে হরনাথ বাবুর মৃত্যু হয়, তার কত দিন পরে কত দেশ ঘুরিয়া কত পরিবর্ত্তন, কত উন্নতির পরেও জীবনের অপরাহ্ন কালে যখন তিনি ২৪ পরগণায় বদলী হইয়াছিলেন, তখনও এই হরনাথ মিত্রের কথা ভোলেন নাই। তাঁর জমা খরচের খাতায় দেখিতেছি হরনাথ বাবুর পুত্র পূর্ণ চন্দ্রের কাজের জন্য ব্রজসুন্দরের কি আগ্রহ। তাঁহার যাতায়াতের ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ১০৲ টাকা দিয়া, অনুরোধ পত্র দিয়া পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! জমা খরচের খাতার পত্রে পত্রে এই পরিবারের সহিত আত্মীয়তার নিদর্শন। কখন তাঁহাদিগকে ঢাকাই বস্ত্র পাঠাইতেছেন, কখন অন্য কিছু উপহার দিতেছেন। ২১।২২ বৎসরের জমাখরচের খাতাগুলি ব্রজসুন্দরের বদান্যতার, হৃদ্যতার সাক্ষী হইয়া আজও রহিয়াছে। ব্রজসুন্দরের সমুদায় জীবনের কাহিনীই এই—কাহাকেও কোন দিন বিস্মৃত হন নাই। হৃদয়ের প্রেম এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিবার যখনই সুবিধা পাইয়াছেন তাহা শত প্রকারে প্রকাশ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন।

কুমিল্লায় বাসকালে বারাকপুর মনিরামপুর নিবাসী বাবু শ্যামচাঁদ বন্দোপাধ্যায় নামে এক জন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত ব্রজসুন্দরের আত্মীয়তা হয়। শ্যামচাঁদ বাবুর মাতা, দ্বিতীয় পক্ষের অল্প বয়স্কা পত্নী ও প্রথম পক্ষের এক কন্যা সঙ্গে ছিলেন। ব্রজসুন্দর কুমিল্লায় থাকিতে থাকিতেই শ্যাম বাবুর মৃত্যু হয়। রেল ষ্টীমার বর্জ্জিত স্থানে, স্বদেশ হইতে বহুদূরে নির্ব্বান্ধব অবস্থায় তাঁহার পরিবার বর্গ কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। চিকিৎসা, সৎকার

এবং অন্যান্য বাহ্য কর্ত্তব্য সমস্তই ব্রজসুন্দর করিলেন। শ্যাম বাবুর বালিকা পত্নীর জন্য ব্রজসুন্দরের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি শ্যাম বাবুকে দিয়া তাঁহার বিধবা স্ত্রীর জন্য একখানি উইল করাইয়া ছিলেন বটে কিন্তু মনে মনে বুঝিয়া ছিলেন যে শ্যাম বাবুর আত্মীয় স্বজন এই অল্প বয়স্কা বিধবাকে বঞ্চিত করিবেই। কুমিল্লায় শ্যাম বাবুর গাড়ী ঘোড়া এবং অন্যান্য জিনিস পত্র যাহা ছিল বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা দিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিয়া শ্যাম বাবুর মাতার বিশেষ আপত্তি সত্বেও তাঁহার পত্নীর হাতে তাহা দিলেন। ইহাতে শ্যাম বাবুর মাতা ব্রজসুন্দরের উপর এতদূর বিরক্ত হন যে তাঁহার সমুদায় উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে "তুমি নির্বংশ হও" বলিয়া অভিসম্পাৎ দেন। নিজের বিশ্বস্ত লোক দ্বারা শ্যাম বাবুর পরিবার পরিজনকে দেশে প্রেরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার জমাখরচের খাতায় দেখিতেছি—

শ্যাম বাবুর দ্রব্যাদি নিলামে খরিদ

সেজ—১টা
আলনা—১টা
জলচৌকি—১টা
বাগানে জল দেবার ঝাঁঝরি—১টা
ছোটতক্তা—১খান
বড় তক্তা—১খান
সামদান—১টা
বেতের চৌকি—১খান
কেতাব ছোট ছোট—২খানা

মোট ২৫৲

আবার অন্যত্র রহিয়াছে "শ্যাম বাবুর স্ত্রী মনিরামপুরে যাওয়া কালীন নৌকায় মৎসের গন্ধ দূর করিবার ধূনা" খরিদ চারি আনা।

পারিবারিক জীবন—চতুর্থ চিত্র।

"হরি সিংহ শ্যাম বাবুর পরিবার লইয়া মনিরামপুর বারাকপুর গমন করে তাহার যাতায়াতের রেল খরচ ও আইসার রাহা খরচ ৫৲" ইত্যাদি শ্যাম বাবুর পরিবারের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরচের তালিকা বিস্তর রহিয়াছে। এই সকল পাঠ করিবার সময় সেই পুরাতন চিত্র সকল যেন নয়নের সমক্ষে উপস্থিত হয়। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্রজসুন্দরের দৃষ্টি যাইত। পরে দেখা যায় "শ্যাম বাবুর মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিবারগণ কুমিল্লা হইতে হরি সিংহের সহিত বাড়ী রওনা হইলে পরে তাঁহাদিগের সহিত যাওয়ার জন্য বঙ্কু সিংকে পাঠান হয়। সে তাঁহাদিগকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে, তাহার খরচ ২।০" হরিসিং নিজ অধিকারের প্রজা এবং অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য। তথাপি একলা তাহার সহিত শ্যাম বাবুর পরিবারগণকে প্রেরণ করিয়া ব্রজসুন্দর যে নিশ্চিন্ত হয়েন নাই ইহাতেই তাহার প্রমাণ হইতেছে।

শ্যামবাবুর মৃত্যু সময়ে আর একটী ঘটনা ঘটে যাহাতে ব্রজসুন্দরের চরিত্রের তেজস্বীতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্যামবাবুর মৃত্যুর পর যখন তাঁহার মাতা পত্নী ও কন্যা শোকে আকুল হইয়া হাহাকার করিতেছেন, সেই সময় শোক কোলাহলের মধ্যে বাহিরের অনেক লোক বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রজসুন্দর দেখিলেন একজন পদস্থ দুশ্চরিত্র লোক শ্যাম বাবুর অল্প বয়স্কা সুন্দরী পত্নীকে মাটি হইতে ধরিয়া তুলিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়াই ব্রজসুন্দর ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়া সেই পদস্থ নির্ল্লজ্জ ব্যক্তিকে তিরস্কার করিয়া অন্তঃপুর হইতে দূর করিয়া দিলেন এবং অন্যান্য মহিলাদিগকে শ্যামবাবুর স্ত্রীর নিকট আসিতে সুযোগ দিলেন। শ্যাম বাবুর পরিবারের বিপদে ব্রজসুন্দর বাস্তবিক নিজেই যেন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কর্ম্মী লোক যেমন হস্তপদ গুটাইয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না তেমনি হৃদয়বান লোক কখনও পরদুঃখে উদাসীন হইয়া থাকিতে পারে না। এই সকল লোককে কেহ অপরের দুঃখভার বহন কার্য্য হইতে

অব্যাহতি দিতে পারে না। সুতরাং ব্রজসুন্দর আজন্ম একদিনও অবসর পান নাই। অবসর তাঁহাকে কে দিবে? তিনি বন্ধুও খুঁজিয়া বাহির করিতেন, কার্য্যও খুঁজিয়া বাহির করিতেন। তাঁহার স্মৃতি পুস্তকে, দৈনন্দিন জমা খরচের খাতায় পত্রে পত্রে বন্ধুদিগের নামোল্লেখ দেখি। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেশের কত ধনী, নির্ধন, জমিদার, প্রজার সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। রাজকার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে গ্রামে গ্রামে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গেও কার্য্য করিয়াছেন। কি পূর্ব্ববঙ্গে কি পশ্চিমবঙ্গে ব্রজসুন্দরের অনেক বন্ধুই ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রভৃতির কথা পরে উল্লেখ করা যাইবে। পুরাতন চিঠিপত্র, খাতাপত্র ও ডায়েরী হইতে পশ্চিমবঙ্গের বন্ধুবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, নবগোপাল মিত্র, কাশীশ্বর মিত্র, অযোধ্যানাথ পাকড়াসী, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, দিগম্বর মিত্র, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, নরোত্তম মল্লিক, কালিকাদাস দত্ত, যাদবচন্দ্র বসু, যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তারক নাথ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র বসু, শিবচন্দ্র দেব, শ্যামচাঁদ ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, যোগেশচন্দ্র মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মহেন্দ্রলাল সরকার, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি।

ব্রজসুন্দর স্বভাবতঃ অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অতি সুমিষ্ট ছিল, মুখে সর্ব্বদাই মৃদুহাসি লাগিয়া থাকিত। ব্রজসুন্দরের রসবোধও যথেষ্ট ছিল। যখন বন্ধুগোষ্ঠির সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন তখন মধ্যে মধ্যে তাঁর অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনিতে সমুদায় বাটী প্রতিধ্বনিত হইত, সুদূর অন্দরমহল

পর্য্যন্ত সে হাসির শব্দ পৌঁছিত। সংসারে অতি অল্প লোককেই এরূপ প্রাণ ভরিয়া হাসিতে দেখা যায়। গাম্ভীর্য্যের সহিত রসবোধের এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষ গুণ ছিল, এজন্যও লোকে মুগ্ধ হইত।

যখন ব্রজসুন্দর প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন ঢাকার লোকে তাঁহাকে দেশের পরম শত্রু বিবেচনা করিয়া কত নির্য্যাতন করিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এমন দিনও ব্রজসুন্দরের জীবনে আসিয়াছিল, যখন তাঁহার প্রতি সম্মান দেখানই সেকালের ধনী জমিদারগণের একটী বিশেষ গৌরবের কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রজসুন্দরের অবস্থানকালে যখনই কোনও রাজা ধনী জমিদার ঢাকায় আসিয়াছেন, তখনই বন্ধুবর্গসমন্বিত ব্রজসুন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান সকলের এক অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রজসুন্দরকে আপ্যায়িত করিতে পারিলে যেন সকলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। ব্রজসুন্দরও মধ্যে মধ্যে সপারিষদে এই সকল ধনীর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন। একবার এই প্রকার এক নিমন্ত্রণে বড়ই রহস্যের ব্যাপার ঘটে।

একবার ময়মনসিংহের জমিদার সম্ভবতঃ বাবু বৈকুণ্ঠকিশোর আচার্য্য, কোন কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় আগমন করেন। তিনি সবান্ধবে ব্রজসুন্দরকে প্রীতিভোজনে আপ্যায়িত করিবেন বলিয়া আয়োজন করিলেন। ব্রজসুন্দর সবান্ধবে নিমন্ত্রিত হইয়া যথাসময়ে জমিদারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই দলে পার্ব্বতীচরণ রায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দীননাথ সেন, চন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। সকলে নির্দ্দিষ্ট সময় জমিদার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখেন, বৈঠকখানা দিব্য সুসজ্জিত, গায়কবাদকদল তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য উপস্থিত, ভৃত্যগণ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান, কিন্তু তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য কেহ উপস্থিত নাই। গৃহস্বামীরও দর্শন নাই। সকলে বৈঠকখানায় বসিয়া গৃহস্বামীর

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিয়া সময় কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। গৃহস্বামীর তবু দর্শন নাই। ওদিকে বাড়ীর ভিতর হইতে রন্ধনশালার বিপুল আয়োজনের একটা সোরগোল, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি, কর্ম্মকারকদের ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি, সমুদায় কর্ণে আসিতেছে। ক্রমে রাতও বাড়িয়া চলিল। কাহারও নিদ্রা আসিতে লাগিল, কাহারও ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল। আহারের জন্য ডাকও নাই, গৃহস্বামীরও দেখা নাই। ব্রজসুন্দর রাত্রে বিস্তর কার্য্য করিতেন, তাঁহার সময় নষ্ট হইতেছে, এদিকে ক্ষুধাবোধও করিতেছেন, এবং গৃহস্বামীকে না দেখিয়া মনে মনে ভারি বিরক্তও হইয়াছেন। ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করেন "কৈ হে তোমাদের বাবু কোথায়?" তারা কেবলই বলে "আজ্ঞে কর্ত্তা এই আস্‌তেছেন।" ক্রমে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল। ব্রজসুন্দর দীননাথ সেনকে বলিতে লাগিলেন—"দীনু এরা কেমন লোক হে, এমন নিমন্ত্রণ ত কখন দেখি নাই এবং উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন কিন্তু দীন বাবু তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া বসাইতে লাগিলেন। এমন সময় জমিদার মহাশয় স্বয়ং জোড়হস্তে আসিয়া তাঁহাদের আহারের স্থানে যাইবার জন্য অনুরাধ করিলেন, এবং নানা বিনয় বচন ও শিষ্টাচারে আপ্যায়িত করিলেন। সকলে আহারে বসিয়া দেখিলেন, জমিদার মহাশয় বিপুল আয়োজন করিয়াছেন, কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। গৃহস্বামী এই সব তদ্বির করিতেই ব্যস্ত ছিলেন, মিষ্টালাপের আর অবসর পান নাই। এতক্ষণে সকলে গৃহস্বামীর অদর্শনের কারণ বুঝিলেন। সুখাদ্য পাইয়া সকলেই পরিতুষ্ট, সকলে পরমানন্দে আহার করিতে লাগিলেন, এমন কি গম্ভীরস্বভাব ব্রজসুন্দরও মধ্যে মধ্যে "আহা বড় চমৎকার", "বড় মিষ্টি", "বাঃ খাসা" ইত্যাদি বলিতেছেন। আহার সমাপ্তপ্রায়, তখন ব্রজসুন্দর একটু হাসিয়া গৃহস্বামীকে শুনাইয়া দীননাথ সেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন "দীনু, দেখ্‌ছ, লোকটী মন্দ নয় হে।" সে কথাটী বলিবার তাৎপর্য্য কি

পারিবারিক জীবন—চতুর্থ চিত্র।

তাহা সকলেই বুঝিলেন এবং অট্টহাস্যে গৃহ নিনাদিত করিয়া সকলে এই বাক্যের সায় দিলেন। গৃহস্বামীও তাহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বিপুল আয়োজনটার মর্য্যাদা রক্ষা হইল ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল।

দরিদ্র প্রজা ও দীন দুঃখীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার ঃ—প্রেমিক ব্রজসুন্দরের প্রেম কেবল পারিবারিক সম্বন্ধে ও বন্ধুপ্রীতিতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার মধুর প্রেমের পরিচয় তাঁহার প্রজা ও ভৃত্যবর্গ সকলেই পাইয়াছে। তাঁহার প্রজারা দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত আর বলিত "আমরা রামরাজ্যে বাস করি।" তা বলিবেই বা না কেন? অপরাপর জমিদারীতে প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সকল উপায়ে অর্থ সংগৃহীত হইত তাহা ব্রজসুন্দরের জমিদারীতে হইতে পারিত না। তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে দুষ্কৃতির জরিমানা স্বরূপ বাজে জমা কখন গ্রহণ করেন নাই। জমিদারের পারিবারিক ক্রিয়া-কর্ম্মে প্রজার নিকট যে মাথট আদায় করা হয়, তাহাও ব্রজসুন্দরের নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার প্রজা অপরাধ করিলে তিনি ডাকিয়া মিষ্ট কথায় তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিতেন। প্রজারা যেন তাঁহার সন্তান। তাহাদিগকে পিতার ন্যায় সদুপদেশ দিতেন। তিনি প্রজাদিগের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী ছিলেন। তাহাদিগের পারিবারিক সুখ দুঃখের সংবাদ লইতেন। রাজকৃষ্ণ চঙ্গ নামে নমঃশূদ্র জাতীয় তাঁহার এক প্রজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। তিনি যখন শুনিলেন তাহার ৪।৫ বৎসরের বালিকা বিধবা হইয়াছে তখন নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাহাকে, কন্যাকে পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য কত বুঝাইতে লাগিলেন—"আমি জানি, রাজকৃষ্ণ, তোমাদের ভিতর বিধবা বিবাহের চলন ছিল, তুমি মেয়ের বিবাহ দাও, তোমার কোন পাপ হইবে না।" রাজকৃষ্ণ খেদ করিয়া বলিল "কর্ত্তা আপনিতো ভাল কথাই বলিতেছেন, আমারও ইচ্ছা করে মেয়ের বিবাহ দি, কিন্তু কে আমার

বিধবা মেয়েকে বিয়ে করবে?" ব্রজসুন্দর একথার জোর বুঝিলেন। তখন বলিলেন "আহা তবে মেয়েটার উপায় করে দিয়ে যেও যেন একমুঠি ভাতের কষ্ট না পায়।" কোন প্রজা যদি বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে ভোগ দখল দিতেছে না শুনিতেন তখনই তাহাকে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বিধবার ন্যায্য অধিকার দিতে বাধ্য করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই গুরুতর রাজ কার্য্য ও বন্ধুদিগের নানা কর্ম্ম করিয়াও ব্রজসুন্দর দরিদ্রদিগের ভাবনা ভাবিবার অবসর পাইতেন। তাঁহার দৈনিক জমা খরচের খাতার মধ্যে ইহাদেরও উল্লেখ সর্ব্বদাই দেখা যায়। কোন প্রজার হাত পা বাঁকা এক পুত্র জন্মিয়াছে, তাঁহাকে দেখাইতে আনিয়াছে, অমনি তাহার পুত্রকে ১০৲ দশ টাকা দিলেন। হিসাবের খাতায় দেখিতেছি "হোসেনের হাত পা বাঁকা নবজাত পুত্র ১০৲। হয়ত কোনও প্রজা পুত্র লইয়া দেখা করিতে আসিয়াছে, পুত্রটীর হস্তে ২৲১টী টাকা দিতেছেন, কাহারও বৃদ্ধা মাতা কি ভগ্নীর জন্য বস্ত্র কিম্বা শীতবস্ত্র দিতেছেন; এই ভাবের কত অসংখ্য উল্লেখ দেখিতেছি।

ভরত নামে ব্রজসুন্দরের এক নমঃশূদ্র প্রজা ছিল। তাহার স্ত্রী পাগল হইয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইত; কোন্ জাতির ভাত খাইত তাহার ঠিক ছিল না। কাজেই ভরতের গৃহে ঐ বধূর স্থান ছিল না। জননী কাশীশ্বরী তাহাকে নিজের বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। তৎপরে ব্রজসুন্দর দেশে গেলে বলিলেন "ভরতের বৌকে নমঃশূদ্ররা ঘরে নেয় না, বউটার কি গতি হইবে?" এই কথা শুনিয়া ব্রজসুন্দর নমঃশূদ্র প্রজাদিগকে ডাকিয়া ভরতের স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে বলেন। অনেকে অনেক আপত্তি করিতে লাগিল, সকলের আপত্তি খণ্ডন করিয়া ভরতের পিতাকে বলিলেন "বৌ ঘরে লইয়া যাও।" তাঁহার এ কথায় আর কেহ কোনও আপত্তি করিতে পারিল না, বৌকে ঘরে লইয়া গেল। বৌ ক্রমে ভাল হইল, সুখে সংসার করিতে লাগিল। অনেকেরই তো প্রজা আছে, কে ঐ সব প্রজাদের পারিবারিক গোল মিটাইতে যায়। ব্রজসুন্দর কত অসংখ্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও ক্ষুদ্র

নগণ্য প্রজাদের কাজে কত মন দিতেন, সে রকম এখন আর কে করে? তিনি দুটো দিনের জন্য বাটীতে জননীর নিকটে গিয়া এই রকম নানা কার্য্য করিয়া বিশ্রাম পাইতেন না।

এই পাগল বধূর ঘটনা উপলক্ষে ব্রজসুন্দরের চরিত্রের আর একটা দিক উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ববঙ্গে সেকালে গাঁজা অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য প্রচলনের জন্যই হউক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক উন্মাদ গ্রস্ত ব্যক্তির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত। ব্রজসুন্দরকে কার্য্য উপলক্ষে সর্ব্বদা নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত। তিনি প্রায়ই নদী তীরে, হাটখোলায়, পুরাতন দেবমন্দিরে, বৃক্ষ কোটরে এইরূপ লোক দেখিতে পাইতেন। আত্মীয় স্বজন তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে, কোমল প্রাণ ব্রজসুন্দর তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন না, সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহারা স্নান আহার, মস্তকের তৈল নিয়ম মত পাইতেছে কি না অনুসন্ধান করিয়া ভৃত্যদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। তাহারা বিরক্ত হইয়া তাঁহার অসাক্ষাতে বলাবলি করিত "বাবুর কি? রাজ্যের পাগল কুড়াইয়া বেড়াইবেন, খাটিয়া মর এখন চাকরেরা।" অনেক সময় দেখা যাইত নিজে কাজ করিতেছেন, নিকটে ২।১ জন পাগল বসাইয়া রাখিয়াছেন। নিকটে রাখিয়া কয়েকদিন পরিচর্য্যা করিয়া পরে ঢাকায় আনিয়া পাগলা গারদে দিতেন। তিনি কখনও বা পাগলা গারদের চার্জে থাকিতেন কখনও পরিদর্শক থাকিতেন ও সর্ব্বদাই ইহাদিগের তত্ত্ব লইতেন। আরোগ্য হইলে চিঠি দিয়া খালাস করাইয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। আমরা শ্রদ্ধেয় বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকটও শুনিয়াছি ব্রজসুন্দরের পাগলদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়া ছিল, তিনি সর্ব্বদাই ব্রজসুন্দরের নিকট পাগল দেখিতেন।

ভৃত্যবর্গ :—৬২ বৎসর পূর্ব্বের ব্রজসুন্দরের কর্ম্ম জীবনের ২২।২৩ বৎসরের ধারাবাহিক জমা খরচের খাতা অতি সুন্দর ও অবিকৃত

অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ভৃত্যগণের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা অতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের অনেক প্রজা পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের ভৃত্য ছিল, তদ্ব্যতীত পশ্চিমের কোন হিন্দুস্থানী দ্বারবান একবার তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আর বরখাস্ত হইত না। তাহারা আমৃত্যু তাঁহারই ভৃত্য থাকিয়া গিয়াছে। হিসাবের খাতায় দেখি কোন ভৃত্যের পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে অর্থ সাহায্য করিতেছেন বা তাহাদের আত্মীয়বর্গের পীড়ার চিকিৎসার জন্য অর্থ দিতেছেন, অথবা তাহাদের বৃদ্ধা মাতা বা আত্মীয়কে শীতবস্ত্র দিতেছেন। কাহাকেও বা উত্তম কার্য্যের জন্য পুরষ্কার দিতেছেন। উইলেও ভৃত্যগণের কথা বিস্মৃত হন নাই। বৃদ্ধ শিকদারের মাসহারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হিসাবের খাতায় একে একে অনেক ভৃত্যের নামে "তামাম শোধ" বলিয়া বরখাস্ত করা হইতেছে। ভৃত্যগণ হায় হায় করিতে করিতে শোকে আকুল হইয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বিদায় লইয়াছিল। বর্ত্তমান কালের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ পূর্ব্বে ছিল না। এ সম্বন্ধে ব্রজসুন্দর সেকালের লোকই ছিলেন। ভৃত্যের সহিত ও তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল। তাহা না হইলে আর এই প্রকারে ভৃত্যের মৃত্যুদিন ডায়েরীতে উল্লেখ করিয়াছেন ?—

My faithful servant Wooma Charan Singha of my village, who was in my employ from the year 1845, died of fever on 23rd July 1863 at his home. He was attacked with fever at Chandpur.

ভৃত্যগণকে ব্রজসুন্দর পরিবার ভুক্ত বলিয়াই মনে করিতেন। কার্য্যে অক্ষম পুরাতন শীকদার দিগকে নিয়ম মত মাসহারা দিতেন। গৌরমোহন শীকদার বৃদ্ধ হইয়া কার্য্যে অক্ষম হইয়াছে তাহাকে দিতেছেন ২৫৲ টাকা, মাতৃশ্রাদ্ধে দিতেছেন ৫০৲ টাকা। রোগে, বিবাহে, গৃহ নির্ম্মাণে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্মে যে ৪০৲।৫০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন এরূপও জমা খরচের বহীতে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্য হই! এইরূপ কত উদাহরণ দিব।

পারিবারিক জীবন—চতুর্থ চিত্র।

পশু পক্ষীর প্রতি দয়া :— ব্রজসুন্দরের স্বাভাবিক কোমল প্রকৃতি পশু পক্ষীর কষ্ট দেখিলেও ব্যথিত হইত। জননী পূজার সময় ছাগ বলি দিতেন বলিয়া তিনি কখনও পূজার সময় দেশের বাটিতে থাকিতেন না। গ্রামের বালকেরা কত পাখী ধরে, পাখীর ছানা পাড়ে, পাখী পোষে, ব্রজসুন্দর কোন দিনও তাহা করেন নাই। পাখীর শাবক লইলে পক্ষীমাতা যে আর্ত্তনাদ করিবে তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, অতএব তাঁহার পাখীর ছানা পোষা কখন হয় নাই। ব্রজসুন্দরের প্রকৃতিতে জীবে দয়া বড়ই প্রবল ছিল। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পশু পক্ষীদের প্রতি তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। একবার তিনি ছুটীর সময় তেঁতুল ঝোড়ার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। জননী কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময় তাঁর এক শিশুকন্যা আসিয়া আধ আধ ভাষায় তাঁহাকে বারম্বার কি বলিতে লাগিল। ব্রজসুন্দর জননীর সহিত কথায় নিমগ্ন, বালিকার কথায় কাণ দিতেছেন না কিন্তু সে কিছুতেই থামিতেছে না, আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় ক্রমাগত বলিতেছে "বাবা কুকুর জলে ভিজে গেল, ঐ অনেক দূর ভেসে গেল, বাবা কুকুর জলে ভিজে গেল।" বারম্বার কন্যার মুখে এই এক কথা শুনিয়া তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল ?" কন্যা ঐ এক কথাই বলিল। ব্রজসুন্দর তাহার অসংলগ্ন আধ আধ ভাষা কিছুই বুঝিলেন না, তখন জননীকে বলিলেন "মা শোনত জগ কি বলে ?" কাশীশ্বরী শুনিয়া বলিলেন "ও কিছু নয়, সেই যে পরাণ একটা কুকুর মারিয়াছিল সেই কথা। সে কত দিনের কথা হইল সেই কথা এতদিনে বলিতেছে।" ব্রজসুন্দর কুকুর মারার কথা শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "এঁ্যা কুকুর মারা কি।" জননী বিভ্রাট গণিলেন, পুত্রকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু ব্রজসুন্দর ছাড়িবার পাত্র নহেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জননীর নিকট আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাপারটী বুঝিলেন যে পরাণ শীকদার

একটা কুকুর মারিয়া খালের জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, স্রোতে কুকুর ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর গিয়াছিল। বাস্তবিক ব্রজসুন্দরের বাড়ীতে অনবরত অতিরিক্ত লোক সমাগমে আহারের লোভে এত কুকুর আসিয়া জমিত যে তাহাদের জন্য লোকের বসবাস করা দুরূহ হইয়া উঠিত। সেই জন্যই পরাণ শীকদার কুকুর মারিয়াছিল। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া জননীর সহিত মিষ্টালাপ ঘুচিয়া গেল, বলিলেন "এই জন্যই তো আমার মেয়েদের এখানে রাখিতে চাই না, এখানে যত নিষ্ঠুরতা শিখে।" তখনি পরাণদা পরাণদা বলিয়া ডাক পড়িল। পরাণ শীকদার আসিলে তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তোমার এই কাজের জন্য তোমাকে ৪৲ টাকা জরিমানা করিলাম।" পরাণ শীকদারের জরিমানার কথা শুনিয়া কাশীশ্বরী এবং বৃদ্ধাগণ চমৎকৃত হইলেন। পরাণ শীকদারের জরিমানা! এমন অশ্রুতপূর্ব্ব কথাত কেহ শোনে নাই। পাঠক পাঠিকাগণ এই সামান্য ঘটনায় সে কালের সামাজিক অবস্থার এক চিত্র দেখিতে পাইবেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহা অতীতের কাহিনী হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পরাণ শীকদার ব্রজসুন্দরের গৃহে যে সে ভৃত্য ছিল না। তাহারা পুরুষানুক্রমে ব্রজসুন্দরের পরিবারে শীকদারের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে, সকল ভৃত্য এবং শীকদারগণের উপর ছিল। পরাণ ব্রজসুন্দরকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল তাই তিনি তাহাকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতেন। কন্যাগণ পরাণকে "জ্যেঠা" বলিয়া ডাকিত। কন্যাদের যত উপদ্রব আবদার এই জ্যেঠার উপর চলিত। এই শীকদারদিগের প্রভু-পরিবারের উপর এমন কর্ত্তৃত্ব ছিল যে স্বয়ং কাশীশ্বরীও ইহাদিগকে সমীহ করিয়া চলিতেন। কাশীশ্বরী যখন বধূরূপে মিত্র পরিবারে আসিয়াছিলেন তখন ত শীকদার পরিবারই তাঁহাকে আদর করিয়া ঘরে তুলিয়াছিল। কাশীশ্বরীর আগমনের বহু পূর্ব্বে তাহারা মিত্রদিগের আশ্রিত সুতরাং কাশীশ্বরী কোন্ মুখে তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবেন? নচেৎ কাশীশ্বরী কম পাত্রী

ছিলেন না, কত প্রজাকে তিনি উৎক্ষেত করিয়া, মিত্র-মজুমদারদিগের ভিটা ছাড়া করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি পরাণ শীকদারের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন। এ স্থলে শীকদার পরিবারের কর্ত্তৃত্বের একটা নিদর্শন দিতেছি। ব্রজসুন্দর বিদেশে পরিবার লইয়া যান ইহা কাশীশ্বরী মোটেই পসন্দ করিতেন না। পুত্রকে কিছু বলিতেন না বটে কিন্তু বধূকে যৎপরোনাস্তি গঞ্জনা দিতে ছাড়িতেন না। ব্রজসুন্দর পরিবার পরিজনদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ঢাকা হইতে নৌকা প্রেরণ করিলে একেবারে জ্বলিয়া উঠিতেন। কাশীশ্বরীর প্রচণ্ড ক্রোধ দেখিয়া ভয়ে কোন আত্মীয়স্বজন আর ব্রহ্মময়ীর যাত্রার কথা মুখে আনিতে সাহস করিত না। নৌকা দিনের পর দিন ঘাটে বাঁধা থাকিত, ভাড়া বাড়িয়া যাইত। মাঝি মাল্লারা সিধা লইয়া সুখে আহার করিয়া দিন কাটাইত। এইরূপ কিছুদিন চলিলে, ক্রমে লোকজন অসহিষ্ণু হইয়া পড়িত অথচ কাশীশ্বরীর নিকট কোন কথা উত্থাপন করিতে কাহারও সাহস হইত না। তখন পরাণ শীকদারের মা ও দিদি আসিয়া সমুদায় আয়োজন করিয়া ব্রহ্মময়ীকে নৌকায় উঠাইয়া দিতেন। তখন কাশীশ্বরী একেবারে নীরব, চাহিয়া চাহিয়া শীকদার গৃহিণীদের উদ্যোগ কাজ কর্ম্ম দেখিতেন, আর একটী আপত্তিজনক বাক্য তাঁহার মুখদিয়া বাহির হইত না। যাত্রার কিছু পূর্ব্বে বধূর প্রণাম লইবেন না বলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেন। শাশুড়ীকে উদ্দেশে প্রণাম করাইয়া পরাণের মা ও দিদি ব্রহ্মময়ীর হাত ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া দিয়া আসিতেন। সেকালের প্রভু-ভৃত্যের এমন মধুর সম্পর্ক এখন উপকথার মত শুনাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বাংলা দেশের সেদিন আর নাই। একটা সামান্য কুকুরের জন্য এহেন পরাণ দাদার জরিমানার কথা শুনিয়া সকলের মস্তকে যেন সহসা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন অসম্ভব কথাত কেহ শোনে নাই। ব্রজসুন্দরের জীবনে এই তাঁহার প্রথম এবং শেষ ভৃত্যকে জরিমানা করা।

ব্রজসুন্দরের কন্যাগণ পরাণ দাদার প্রাণ ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মাদুর বিছাইয়া পরাণদা সকলকে রূপকথা শুনাইত। কেহ তাহার কোলে, কেহ পিঠে, কেহ হাত ধরিয়া, কেহ একটী আঙ্গুল ধরিয়া, কেহ কিছু ধরিবার না পাইলে পরাণের সুমিষ্ট অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তন্ময় হইয়া রূপকথা শুনিত। পূর্ব্বলিখিত ঘটনার পর ব্রজসুন্দরের অপরাধিনী শিশু কন্যাটীও অন্যান্য দিনের মত জ্যেঠার মুখের অমৃতসিক্ত গল্প শুনিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। তখন পরাণ কৃত্রিম অভিমান দেখাইয়া বলিল "আমি আর সকলকে গল্প বলিব, জগকে কখনও বলিব না। যা আমার জীবনে কখন হয় নাই তা ঐ মেয়ের জন্য আমার হ'ল, ও মেয়েকে আমি আর ভালবাসিব না।" শাস্তিটা জগর মাথায় আসিয়া অবশেষে পড়িল, কেবল পরাণ দাদার নয়!

অনেক দিনের অনেক ঘটনায় তাঁহার ইতর প্রাণীর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন দেখা যায়। একদিন ঢাকার বাড়ীতে ব্রজসুন্দর তাঁহার নির্জ্জন গৃহে বসিয়া নিবিষ্ট মনে কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন এমন সময়ে সহসা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার আকুল ক্রন্দন তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। ব্যাপার খানা কি হইল দেখিবার জন্য ছাদে আসিয়া দেখেন শিশু কন্যা ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছে, পুত্র জ্যোতি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, ভৃত্য গোকুল সিংহ এক বাঁশ লইয়া বেল গাছে একটা কাকের বাসা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছে আর ব্রহ্মাণ্ডের কাক আসিয়া "কাকা" ধ্বনি করিয়া উড়িয়া উড়িয়া ছাতের চারিদিকে বসিয়া মহা কলরব করিতেছে। ব্যাপার খানা কি হইয়াছে ব্রজসুন্দরের বুঝিতে বাকি রহিল না। শিশুকন্যাকে কোলে তুলিয়া গোকুল সিংহকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি বুড়ো হইয়া মরিতে চলিলে এই টুকু মেয়ের প্রাণে যে মায়া আছে তাহাও তোমার নাই, কোন ধর্ম্মজ্ঞানও নাই।" গোকুল সিংহ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আজ্ঞা খোকাবাবু বাসা ভাঙ্গিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, কাকের ছানা হইয়াছে এই পথ দিয়া কাহারও চলিবার যো নাই—অমনি তাহার মাথায় ঠোকরায়, তাই

খোকাবাবু বাসা ভাঙ্গিতে বলিয়াছেন।" এই ঘটনা এখানেই শেষ হইল না। ক্ষণেক পরে কন্যা মাতঙ্গীর বহির্বাটীতে ডাক পড়িল, তিনি গিয়া দেখেন পিতা একাকী চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন—মুখে গভীর বিষাদের ছায়া। কন্যাকে আগত দেখিয়া বিষাদক্লিষ্ট স্বরে ঘটনাটী বলিলেন। মাতঙ্গী, বালকের কাজ বলিয়া কথাটী উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ব্রজসুন্দরের মুখের অন্ধকার তবু ঘুচিল না।

ব্রজসুন্দরের সদয় হৃদয়ের আর কত নিদর্শন দিব? শেষ জীবনের কতিপয় বৎসর যখন ঢাকাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন তখন দেখা যাইত প্রতি বৎসর একই সময়ে তাঁহার আর্ম্মাণিটোলার বাটীর একটী নির্দ্দিষ্ট দুরারোহ স্থানে মৌমাছি চাক নির্ম্মাণ করিত। সেরূপ বৃহদাকার চাক সচরাচর দেখা যায় না। বাটীর ভৃত্যবর্গ এবং বহির্বাটীর অপরাপর লোকের নিতান্তই ইচ্ছা হইত যে মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু সংগ্রহ করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে ব্রজসুন্দরের কঠিন আদেশ ছিল যে "কেহ মৌচাক ভাঙ্গিতে পারিবে না।" ইহাতে সকলেই তাঁহার উপর মনে মনে বিরক্ত হইত। প্রতিবৎসর এইরূপ হইত; মৌমাছি চাক ত্যাগ করিয়া গেলে সকলে যথাসাধ্য মোম সংগ্রহ করিত।

পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, কাহাকেও তিনি উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিতেন না। হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে তাহাদিগের জন্য একটু ভালবাসা সঞ্চিত থকিত। তাঁহার ডায়েরীর একস্থানে আছে—

"The old cow of my late wife, purchased at Comillah and who was the mother of 11 bachas, died this day at 4 P. M. at my village house, to the regret of myself and my children.

ব্রজসুন্দরের জীবনের নিভৃত নিগূঢ় সৌন্দর্য্য দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। এই স্থানেই তবে তাঁহার আভ্যন্তরীণ জীবন চিত্রের উপর যবনিকা পাত হইল।

পারিবারিক জীবনের কষ্টি প্রস্তরে ব্রজসুন্দরের জীবন কষিয়া দেখিলাম—এ জীবনের কি উজ্জ্বলতা ছিল, এ জীবন উৎকর্ষতায় যে সর্ব্বাগ্রগণ্য! এ জীবনের উপাদান যে নির্ম্মল স্বর্ণ! কাশীশ্বরীর পুত্র ব্রজসুন্দরের ন্যায় মাতৃভক্ত, বিদ্যাসাগরের বঙ্গদেশেও বিরল। জননীকে প্রণাম করিবার সময় তিনি সর্ব্বদাই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" বলিতেন। কেবল কি মুখেই ইহা বলিতেন? বিন্দু বিন্দু করিয়া দেহের রক্ত দিয়া প্রমাণ করিয়া ছিলেন জননীর আসন সর্ব্বোপরি। তৎপরে পত্নী ব্রহ্মময়ীকে মাতৃপূজার সহকারিণীরূপে পাইয়া তিনি যে তাঁহাকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহাকে নিন্দা করিব? স্ত্রীকে সুখী করিতে পারেন নাই বলিয়া অনুযোগ দিব? ব্রজসুন্দর জননীর সুখের জন্য আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত, তাঁহার পত্নীর ব্রতও তাহাই, ব্রজসুন্দর তাহা জানিতেন। এ যে কি গভীর যোগ যিনি প্রকৃতভাবে দেখিবেন তিনিই বুঝিবেন, আর বুঝিয়াছিলেন ব্রহ্মময়ী। এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতাও সংসারে বিরল—ব্রজসুন্দরের চরিত্রের প্রভাবে কি দৃষ্টান্তই কন্যা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে দিকে দেখি, যে ভাবে দেখি ব্রজসুন্দরের জীবনের চিত্র অনিন্দ্য। সকল বিভাগে, সকল দিক দিয়া আলোকপাত করিয়া দেখিলেও, ব্রজসুন্দরকে অনেক বিষয়ে আদর্শ চরিত্র বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রজসুন্দরের জীবনে যে ভুল ভ্রান্তি কখন হয় নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারে না, পাঠকও তাহা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আদর্শ চরিত্রের যে সকল প্রধান উপকরণ তাহার একটীরও ব্রজসুন্দরের জীবনে অভাব দেখিতে পাই নাই। মস্তিষ্ক এবং হৃদয় এই দুইটী মনুষ্যত্বের প্রধান উপকরণ। কেহ বা মস্তিষ্কের প্রাধান্য স্বীকার করিবেন, কেহ বা হৃদয়ের। আমরা বলি যে জীবনে এই উভয় বৃত্তির সামঞ্জস্য আছে তাহাই আদর্শ চরিত্র, কিন্তু তথাপি যদি একতরের প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হয়, তবে বলিতে হইবে যে হৃদয়ের স্থান সর্ব্বাগ্রে, হৃদয়বান্ ব্যক্তি আমাদের নমস্য! ব্রজসুন্দরকে যদিও বিধাতা

পারিবারিক জীবন—চতুর্থ চিত্র।

উভয় পদার্থই প্রচুর পরিমাণে দিয়াছিলেন কিন্তু এই হৃদয় পদার্থটী কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় দিয়াছিলেন, হৃদয় তাঁহাকে অনেক দুরূহ কর্ম্মসাধন করাইয়াছিল, অনেক কণ্টকময় পথ দিয়া লইয়া গিয়াছিল। ব্রজসুন্দরের জীবনের কাহিনী পাঠ করিবার সময় এই কথাটী আমাদের বারম্বার স্মরণ করিতে হইবে। যার হৃদয় যত সুন্দর তার পারিবারিক জীবনের মাধুর্য্য তত অধিক; সুতরাং পুত্ররূপে, পতিরূপে, পিতারূপে, বন্ধুরূপে, প্রভুরূপে ব্রজসুন্দরের আচরণ অনিন্দ্য এবং মাধুর্য্যপূর্ণ। তিনি নানাবিধ সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, অনেক জনহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এ সকল কার্য্যের মূলেও তাঁহার এই অনুপম হৃদয়! সহৃদয় ব্যক্তি যে সকল দুরূহ কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিতে পারেন, একজন বুদ্ধিজীবী সুচতুর ব্যক্তি, হৃদয়ের অল্পতা থাকিলে অনেক সদুপায় চিন্তা করিয়াও তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না। কোন কার্য্য কি উপায়ে করা কর্ত্তব্য এবং যুক্তিযুক্ত এই সার বিচার করিতে করিতেই অমূল্য সময় চলিয়া যায়, এবং কার্য্যও হয় না; অনেক অনুষ্ঠানের পর যদি বা সূচনা হয়, কিন্তু সুসম্পন্ন আর হয় না। হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণ মানবজাতির পরম বন্ধু। জননীর সুপুত্র ব্রজসুন্দর বঙ্গমাতারও সুপুত্র ছিলেন। তাঁহার উদার বিশ্বপ্রেমিক হৃদয় গৃহের সীমা অতিক্রম করিয়া সমাজের বিস্তৃতক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের সামান্য ভৃত্য হইয়া ব্রজসুন্দর যে সকল জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে শত শত—শত কেন, সহস্র বঙ্গবাসীর সে সুবিধা এবং সুযোগ ঘটে—তাই বা কেন বলি, ব্রজসুন্দরের সমসাময়িক সহাধ্যায়ী অনেকে তাঁর ন্যায় অর্থ, মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিয়াও এমন নরসেবার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই। হেতু আর কিছুই নয়, এমন হৃদয়বৃত্তি সংসারে সুলভ নহে। আরও বিস্ময়েব কারণ এই যে ব্রজসুন্দর কেবল সমাজসংস্কারক ছিলেন না। রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহাকে নিয়ত দুরন্ত শ্রম করিতে হইত। তথাপি হৃদয়ের বলেই

তিনি এমন আশ্চর্য্য ভাবে নরসেবা করিয়া গিয়াছেন। নদী সাগরসঙ্গমে যাইবার সময় যেমন দুকূল ভাসাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহকে শস্যশালিনী করে অথচ গতি তার সম্মুখে, সেইপ্রকার ব্রজসুন্দর ছিলেন গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য, রাজকার্য্যে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকিতে হইত, নিয়তই শ্রম করিতে হইত, রাজকার্য্যোপলক্ষে যখন যেখানে যাইতেন পরের দুঃখ দূর করা, অপরের হিতসাধন করা, এই তাঁহার ব্রত ছিল। তাঁহাকে রাজকার্য্যের জন্য এরূপ দুরন্ত শ্রম করিতে না হইলে, না জানি তিনি আরও কত জনহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। দেহমনের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিতে পাইলে, তাঁহার নাম হয়ত আজ সংস্কারকদিগের শীর্ষে শোভা পাইত। মহাত্মা বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ বাসরে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে বোধ হয় এক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে বাদ দিলে, বিদ্যাসাগর এ দেশের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে ব্রজসুন্দরের ন্যায় এমন আদর্শ চরিত্র পুরুষ, এমন কর্ম্মবীর আমরা আর দ্বিতীয় দেখি না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কর্ম্মজীবন।

ইতিপূর্ব্বে ব্রজসুন্দরের আভ্যন্তরীণ জীবনের কয়েকটী রেখা চিত্র পাঠকদিগের নিকট ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার কর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। লোকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যে কর্ম্ম করে, সে কর্ম্ম অত্যন্ত শ্রমসাধ্য হইলেও তাহাতে অধিক গৌরব নাই। ব্রজসুন্দর যে ১০৲ টাকা বেতনের কেরাণীর কার্য্য হইতে ৭০০৲ টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কলেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহার কর্ম্মজীবনের একমাত্র গৌরব বলিয়া ঘোষণা করিব? অবশ্য এই প্রকার উন্নতি নিশ্চয়ই শ্রমশীলতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে এরূপ উন্নতি কখন সম্ভবপর হয় না। সংসারে এরূপ উন্নতি বিরল হইলেও এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। ব্রজসুন্দর কেবল রাজকার্য্যে নিষ্ঠা দেখাইয়া যান নাই। যে সকল কার্য্যের জন্য কেহ তাঁহাকে নিযুক্ত করে নাই, যাহার জন্য কেহ তাঁহাকে সাধুবাদ বা পুরস্কার দেয় নাই, অধিকন্তু যাহার জন্য তাঁহাকে কষ্টার্জ্জিত ধন ও সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে এবং লোকের গঞ্জনা মস্তক পাতিয়া বহন করিতে হইয়াছে, এমন কত কর্ম্ম তিনি আজীবন করিয়া গিয়াছেন। ব্রজসুন্দর অদ্ভুত কর্ম্মী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রজসুন্দর জীবনে কি ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে হইলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি আপনাকে চিরদিন ভগবানের দাস বলিয়া বিবেচনা করিতেন। গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য ছিলেন সুতরাং রাজকার্য্য নিষ্ঠার সহিত করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু বিধাতার নির্দ্দেশ বুঝিয়া তিনি যে আরও অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত নিরন্তর শ্রম করিয়াও ব্রজসুন্দর একদিনের জন্য ক্লান্ত বা

ম্রিয়মান হন নাই। ব্রজসুন্দর যথার্থই কর্ম্মব্রত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মই তাঁহাকে কর্ম্ম দিয়াছিল। তিনি কর্ম্মকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের যথার্থ সমন্বয় দেখা গিয়াছিল। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের এই সমন্বয়ই প্রকৃত ধার্ম্মিকের বিশেষত্ব। ব্রজসুন্দর ধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় কর্ম্ম করিতেন সেইজন্য তাঁহার নিকট কর্ম্ম এত সরস হইয়াছিল, কর্ম্মের কঠোরতা চলিয়া গিয়াছিল এবং কর্ম্ম হইতে ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান অপসারিত হইয়াছিল।

ব্রজসুন্দরের কর্ম্মজীবন আলোচনা করিলে আমরা সেকালের বাঙ্গালীর কর্ম্ম জীবনের কিঞ্চিৎ আভাষ পাই। বাঙ্গালীর পক্ষে সেই এক দিন আর এখন এক দিন। সেকালে এ দেশীয়গণ হাজার বড়ই হউন আর শিক্ষিতই হউন, কেহ সেরেস্তাদারের পদের উপরে উঠিতে পারিতেন না। এমন কি রাজা রামমোহন রায় ঐ পদের উপরে উঠিতে পারেন নাই। আর এখন বাঙ্গালী ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর!

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ বাঙ্গালীর পক্ষে একটী বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই সনে রাজা রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন বলিয়াও যেমন স্মরণীয়, তেমনি এই বৎসর এ দেশীয়গণ একটী বিশেষ অধিকার পাইয়াছিলেন বলিয়াও স্মরণীয়। এই সনে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময় পার্লেমেণ্ট মহাসভা ভারত শাসনের উন্নতি বিধানের জন্য এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। রাজা রামমোহন রায়ই ইহার পরামর্শদাতা ছিলেন। এই আইনের ৮৭ ধারাতে লিখিত হইয়াছিল :—

And be it enacted that no native of the said territories, nor any natural born subject of His Majesty resident therein, shall, by reason only of his religion, place of birth, decent, colour or any of them be disabled from holding any place, office or appointment under the said company.

কর্ম্ম জীবন।

এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর নিযুক্ত হইবার দ্বার উন্মুক্ত হইল। সুখের বিষয় এদেশীয়দিগকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল তাঁহারা তাহার অপব্যবহার করেন নাই বরং এ সকল পদকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পরেই যে ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল তাহা নহে। কোম্পানী অতি মন্থর গতিতে এই আইন অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা দেখা যায়।

কর্ম্মজীবনের আরম্ভঃ—১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ব্রজসুন্দর কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ঢাকায় কমিশনারের অফিসে কেরানীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। যে বয়সে লোকে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া থাকে তিনি সেই বয়সে জননীর জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতৃভক্ত ব্রজসুন্দর ইহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই, কর্ত্তব্য জ্ঞানের নিকট জীবনের উচ্চাভিলাষ বিসর্জ্জন দিলেন। এরূপ সামান্য ভাবে যে জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার বিশালতায় ও সার্থকতায় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ধন্য হইয়াছিল। "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়" এই মহাবাক্যের সার্থকতা মহৎজীবনে কতবার অনুভব করিয়াছি। ব্রজসুন্দরের অপূর্ব্ব কর্ম্মময় জীবনের বিচিত্র বিকাশ এবং উন্নতিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

কমিশনার সাহেবের অফিসে নিযুক্ত হইয়া ব্রজসুন্দরকে কমিশনারের সহিত পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক জেলায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। এই ভ্রমণ তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে রাজকার্য্য পরিচালনের পক্ষে অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছিল। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি চিরদিনই অতি প্রবল ছিল। সময় ও সুযোগ পাইলেই তিনি কিছু না কিছু শিখিয়া লইতেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন।

১৮৪৫ সনে তিনি আবকারী কমিশনারের অধীনে পেস্কারের কর্ম্ম

গ্রহণ করেন। মিঃ এ, এফ, ডনেলী তখন ঢাকার আবকারী কমিশনার ছিলেন। এই কর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি ঢাকার ডনেলী সাহেব এবং ময়মনসিংহের হোয়াইট সাহেবের নিকট হইতে যে চিঠি পান তাহা প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে অতীতযুগের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়।

From
The Abkari Commisioner
Dacca Division.

To
Babu Briojo Sunder Mitter.

Dacca, 8th February, 1845.

Sir.

I understand from Dr. Wise that you have been educated at the Dacca College, and should you wish for employment in this department, I request you will apply to any of the first class superintendents of the districts of Dacca, Backergunj, Faridpur, Pabna, Mymensing, Bograh, Rajshahee, Maldah, Dinajpur, or Rungpur stating the office for which you wish to become a candidate and whether you can give a cash deposit * * * * *

I have etc
A. F. Donelly.
Abkari Commisioner.

From
The Abkari Superintendent
Mymensing.

To
Babu Brojosunder Mitter

Mymensing, 5th March, 1845.

Sir,

As mohureers are shortly to be appointed in the different divisions of this Superintendency I request

to know whether you wish to offer yourself as a candidate for any of these appointments. * *
* * * * * * * * * *
Should you conduct yourself in this capacity to my satisfaction you could look forward to fill some of the higher situations either as a Sheristadar or Darogah for I will give every encouragement to active and trustworthy officers.

I have &c.
C. White
Abkari Superintendent.

বলা বাহুল্য যে ব্রজসুন্দর ময়মনসিংহের কাজের জন্য আবেদন না করিয়া ঢাকার কাজের জন্যই আবেদন করিয়াছিলেন।

এই ডনেলী সাহেবের অধীনে অতি অল্প দিন কার্য্য করার পরই ব্রজসুন্দর তাঁহার বিশেষ প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি ডনেলী সাহেবের এই প্রগাঢ় প্রীতিসূত্র অবলম্বন করিয়াই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি অনুকূল হইলেন। জহুরী যেমন প্রকৃত রত্ন চিনিতে পারেন তেমনই মহামতি ডনেলী এই স্বল্পদেহ গৌরকান্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ যুবা ব্রজসুন্দরের ভিতর প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইলেন। তিনি যুবা ব্রজসুন্দরকে দ্রুতগতিতে উন্নততর সোপানে আরোহণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ১০০৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় আসিষ্ট্যাণ্টের পদে উন্নীত হইলেন। এই পদে নিযুক্ত হইবার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারি ১৫০৲ টাকা বেতনে আব্‌কারী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। ইহার দেড় বৎসর পরে তাঁহার ২০০৲ টাকা বেতন হইল। ১৮৫১ সনে তিনি আবকারী ডেপুটি কালেক্টার নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়, বঙ্গদেশে থাকবস্তার জরিপের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ্ রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ, জমিদারী ও তালুক প্রভৃতির সীমা নির্দ্দেশ, কোন্ ব্যক্তি কোন্ ভূমিখণ্ডের অধিকারী, প্রত্যেক স্থানের মানচিত্র প্রণয়ন এবং ভূমির তারতম্যানুসারে রাজস্ব নির্ণয় প্রভৃতি সুকঠিন বিষয়ের মীমাংসার জন্য এই জরিপের কার্য্য আরম্ভ হয়। ব্রজসুন্দরের গুণগ্রামে এবং কার্য্যতৎপরতায় ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষগণ পূর্ব্ব হইতেই মুগ্ধ ছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অব্ রেভিনিউ তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের এই জরিপ কার্য্যের জন্য সার্ভে ডেপুটী কালেক্টর মনোনীত করেন। তাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সময় বোর্ড অব্ রেভিনিউ হইতে ঢাকা বিভাগের কমিশনার সাহেবের নিকট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর যে চিঠি আসে তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল :—

"You are requested to inform Babu Brojosunder Mitter that while transferring him to the Survey Department, the Board are aware that they are placing him altogether in a new field where he will have much to learn and in which he may perhaps be called on occasionally to undergo some personal inconveniences, but he may rest assured that the field is one in which a man of ability and trust cannot fail to attain distinction and consequent promotion. The Board confidently hope that he will not disappoint their expectation.

বাঙ্গালা :—"আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে আপনি বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রকে জানাইবেন যে রেভেনিউ বোর্ড সম্প্রতি তাঁহাকে সার্ভে বিভাগে বদলী করাতে ঐ কার্য্য তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া তাঁহাকে হয়ত অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে এবং হয়ত সময় সময় ব্যক্তিগত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি (ব্রজসুন্দর) নিশ্চয় জানিবেন এই কার্য্যে কার্য্যকুশল ও

বিশ্বস্ত ব্যক্তির পক্ষে সুনাম, যশ ও তজ্জনিত উন্নতি লাভ করা নিশ্চিত। ব্রজসুন্দর বাবুর দ্বারা সেরূপ কার্য্য হইবে বলিয়া বোর্ড আশা করেন। তাঁহাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে যে ভবিষ্যতে তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হইবে।"

সার জেমস্ রেনেল ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত :—১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব বাঙ্গালার নবাবদিগকে শাসনকার্য্য হইতে অবসৃত করেন। ১৭৬৬ সনে জেমস্ রেনেল সাহেব এই নূতন অধিকৃত অজ্ঞাত পূর্ব্ববঙ্গের জরীপ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক অজ্ঞাত প্রদেশ, সকলের নিকট সুজ্ঞাত করিয়া যান। রেনেলের মানচিত্র অতি অপূর্ব্ব পদার্থ। তিনি ১৭৬৬ সন হইতে ১৭৭৭ সন পর্য্যন্ত কার্য্য করেন, পরে স্বদেশে গমন করেন। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তিকথা এখনও লোকমুখে শ্রুত হওয়া যায়। ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। তাহার পর জমিদারগণের জমির পরিমাণ ও সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য একবার বঙ্গদেশের জমির মাপ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে প্রজারাই প্রকৃতপক্ষে জমির মালিক ছিল, জমিদারেরা কেবল খাজনা আদায় করিবার জন্য রাজস্বের একটা অংশ পাইতেন। জমির উপরে প্রজাদের সম্পূর্ণ সত্ব ছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থারী বন্দোবস্ত করিবার সময় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এক মহাভ্রম করিয়াছিলেন। প্রজাদের সত্ব একেবারে উপেক্ষা করিয়া জমিদারদিগকেই জমির প্রকৃত সত্বাধিকারী করিলেন। প্রজারা জমিদারের কৃপা ভিখারী হইয়া পড়িল। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে গবর্ণমেণ্ট স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রজা-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৪৯ সনে বেঙ্গল রেণ্ট এক্ট্ (Bengal Rent Act) নামে এক আইন পাস করিলেন। ইহাতে এই নির্দ্ধারিত হইল যে ১৭৯৩ সন হইতে যে জমির খাজনা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে তাহা আর বৃদ্ধি হইবে না। ২০ বৎসর ধরিয়া যে জমির খাজনা একভাবে স্থির রহিয়াছে তাহারও বৃদ্ধি হইবে না। আর ১২ বৎসর একাদিক্রমে

যদি কোনও প্রজা কোন জমি দখল করিয়া থাকে তবে সেই জমিতে তাহার দখলী সত্ব জন্মিবে। বিশেষ কারণ না ঘটিলে সে জমির জমা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। এই আইন বঙ্গীয় প্রজার পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রজার জমির পরিমাণ স্থির করা, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার মানচিত্র বা নক্সা প্রস্তুত করা এবং প্রত্যেক জমির তারতম্যানুসারে খাজনা নিরূপণ করা এই সার্ভের উদ্দেশ্য। ইহাতে জমিদারে জমিদারে, প্রজায় প্রজায় বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই সার্ভে কার্য্য অতি গুরুতর; সচ্চরিত্র কার্য্যকুশল ও সহৃদয় ব্যক্তি দ্বারা ভিন্ন কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। অনুপযুক্ত লোকের হাতে এই গুরুভার অর্পিত হইলে দরিদ্র প্রজার সর্ব্বনাশ হইবার আশঙ্কা মনে করিয়াই বোর্ড অব রেভেনিউ (Board of Revenue) অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক কর্ম্মচারী হইলেও বাবু ব্রজসুন্দরকেই মনোনীত করিলেন। ব্রজসুন্দর উৎকোচগ্রাহী হইলে এই কার্য্যে অতুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে এবং সমসময়ে কেহ কেহ এই কর্ম্মে থাকিয়া কিরূপ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। ধর্ম্মপরায়ণ ব্রজসুন্দর নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষা ঃ—এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে Compass, Theodolite, Trigonometry, Mensuration প্রভৃতি শিখিয়া লইতে হইয়াছিল। তখন এ সব বিষয় শিক্ষা দেওয়ার লোক পাওয়া দুর্ঘট ছিল। বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী নিবাসী বিখ্যাত চন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র সুপরিচিত বাবু উমাকান্ত ঘোষের নিকট তিনি প্রথমে এই সকল বিষয় শিক্ষা করেন। তিনি ১৮৫৪ সনের নভেম্বর মাসে প্রথমে এই সার্ভে কার্য্যে ময়মনসিংহ জেলায় প্রেরিত হন এবং নিম্নলিখিত স্থানে কার্য্য করেন ঃ—

১৮৫৪—৫৬ ময়মনসিংহে। ১৮৫৬—৫৯ বিক্রমপুর ও ঢাকায়।
১৮৫৯—৬২ শ্রীহট্টে। ১৮৬২—৬৮ ত্রিপুরায়।

কর্ম্মজীবন।

এই ত্রিপুরায় যখন কার্য্য করিতেন তখন অধিকাংশ সময়ই কুমিল্লায় হেড্-কোয়াটার করিয়া ত্রিপুরা, স্বাধীনত্রিপুরা, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জের কিয়দংশ এবং নিকটবর্ত্তী ঢাকা ও ফরিদপুরের কতক অংশের কার্য্য-নির্ব্বাহ করেন এবং ১৮৬৮ সনে ২৪ পরগণায় বদলী হন কিন্তু তাহার পর বৎসরই পুনরায় ঢাকায় গমন করিয়া ১৮৭৫ সন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন। তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সময় রেভেনিউ বোর্ড লিখিয়াছিলেন যে "তাঁহাকে ব্যক্তিগত অসুবিধা হয়ত ভোগ করিতে হইবে।" তাঁহাদের সে অনুমান অমূলক ছিল না।

পূর্ব্ববঙ্গের দুর্গমতা ঃ—তখন পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলই নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। রীতিমত রাস্তা ঘাট দূরে থাকুক অধিকাংশ স্থলেই ইহার নাম পর্য্যন্ত ছিল না। স্থল পথে কোন স্থানে যাতায়াত করা একান্ত অসাধ্য ছিল। দুর্দ্দান্ত দস্যুদল ও ভীষণ হিংস্র জন্তুর অতিশয় প্রাবল্য ছিল। নরপশুর হস্তে পথিকের ধন প্রাণ কিছুই রক্ষা পাইত না। বন্যবরাহ, বন্যহস্তীর জন্য কৃষকের সর্ব্বস্ব-ধন শস্যও রক্ষা পাইত না। শস্য রক্ষা করিতে গিয়া কত কৃষক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। বন্যহস্তী শস্য নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, তাহারা সময় সময় এমন ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিত যে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিত।

স্থলপথে ভ্রমণ যেমন একান্ত কষ্টকর ব্যাপার ছিল, নদীবহুল পূর্ব্ববঙ্গে জলপথে ভ্রমণ তত কষ্টকর না হইলেও কম বিপজ্জনক ছিল না। এখন বাষ্পীয়পোতে আরোহণ করিয়া আমরা হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে পূর্ব্ববঙ্গের যে সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদী অতিক্রম করি পূর্ব্বে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। মেঘনা, পদ্মা এবং সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের নদী সমূহ ঝটিকা ও বাতাবর্ত্তে উত্তালতরঙ্গসমাকুল হইয়া সকল প্রকার জলযান বিপন্ন করিত। সুদক্ষ নাবিকেরাও কোন রূপে নৌকা রক্ষা করিতে পারিত না। প্রতি বর্ষে আরোহী সমেত অসংখ্য

নৌকা নদীগর্ভে নিমগ্ন হইত। মেঘনায় যখন বান আসিত তখন সে সর্ব্বগ্রাসী জলোচ্ছ্বাস দেখিয়া আরোহীগণের কথা দূরে থাকুক, বিচক্ষণ নাবিক্‌গণও হতবুদ্ধি হইয়া যাইত। জলপথে অন্যরূপ বিপদও বিলক্ষণ ছিল। সার জেমস্ রেনেল সাহেব দ্বারা জলদস্যুগণের উপদ্রপ অনেক দমিত হইলেও তখনও তাহাদিগের কম প্রাদুর্ভাব ছিল না।

কর্ম্মস্থানের দুর্গমতা ও শঙ্কট ঃ—যখন জলপথের এবং স্থলপথের এইরূপ দুর্দ্দশা তখন ব্রজসুন্দরকে সার্ভে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে গিয়া তাঁহাকে কত সময় পদ্মা ও মেঘনায় কতবার জীবনশঙ্কটকারী ঝটিকাবর্ত্তে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি নানারূপ বিপদে পড়িয়াও ভগবানের কৃপায় সকল প্রকার বিপদ হইতেই আশ্চর্য্য উপায়ে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। স্থলপথের দুর্গমতার জন্য এক হস্তী ব্যতীত আর কোনও যানই ব্যবহার করিতে পান নাই। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ব্যবহারের জন্য দুইটী হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন। এখন গবর্ণমেণ্ট, কর্ম্মচারীগণের সুবিধার জন্য প্রতি ৮। ১০ মাইল অন্তর বাঙ্গলা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তখন এ সব কিছুই ছিল না। তাঁহাকে সহর হইতে শত শত মাইল দূরে থাকিতে হইত। তাঁহার নিজের জন্য আসবাব সহিত একটী অতি সুন্দর ও বৃহৎ তাম্বু ও অনুচরবর্গের জন্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাম্বু প্রদত্ত হইয়াছিল। এক স্থানের কার্য্য হইয়া গেলে অন্য স্থানে গমন করিবার সময় পথ ঘাট বিবর্জ্জিত দেশে এই সব স্থানান্তরিত করা অতিশয় কষ্টকর ছিল। যখন যে জমিদারের জমিদারী কিম্বা যে রাজার রাজ্যের ভিতর দিয়া গমন করিতেন, গবর্ণমেণ্টের পরওয়ানা অনুসারে তাঁহাকে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। গহনবনে অগ্রে হস্তী ও লোকজন প্রেরণ করিয়া রাস্তা প্রস্তুত করা হইত, পরে সার্ভে পার্টি অগ্রসর হইত। এই সার্ভে কার্য্যে ব্রজসুন্দরকে ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলার পার্ব্বত্য প্রদেশের গভীর জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে হইত। তিনি এমন কত স্থানে গিয়াছেন যেখানে পূর্ব্বে আর কোনও কর্ম্মচারী গমন করেন নাই।

কর্ম্মজীবন।

লেখিকার নিকট কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গীর লিখিত পত্র মধ্যে নিম্নলিখিত গল্পটী আছে ঃ—কত দেশের পল্লীগ্রামে ও কত অসভ্য গ্রামে বাবা গিয়াছিলেন। চাকর ও চাপরাসীগণ আসিয়া কত অদ্ভুত গল্প করিত। তখন শুনিয়া হাসিতাম কিন্তু সে সব কথা যে আবার কাজে লাগিবে তাহা তো আর জানিতাম না। বাবার খানসামা রামদয়ালের নিকট শুনিয়াছিলাম একবার এক অসভ্য গণ্ড গ্রামে বাবার তাম্বু ফেলা হইয়াছিল। তাহারা কখনও সাহেব দেখে নাই। তাম্বু দেখিয়া চাষারা ভয়ে অস্থির। লোকজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ইতান কিতা বাই?" চাপরাসীরা বলিল সাহেব আসিয়াছে। "মোরা সাহেব দেখতাম্ পার্তাম্ নি?" এক দিন চাষা ও রাখালগণ সাহেব দেখিবার জন্য তাম্বুর নিকটে আসিল। কেহ কেহ ভয়ে আসিতে চাহিতেছে না, অন্যে জোর করিয়া আনিতেছে। বাহিরে লোকের গোল শুনিয়া বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন কিসের গোল। উত্তর পাইলেন অনেক লোক সাহেব দেখিতে আসিয়াছে। বাবা বাহিরে আসিলেন। সকলে ঐ সব লোককে বলিল "এই সাহেব।" তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পরের মধ্যে বলিতে লাগিল "তুই কইচ সাহেবের চারডা পাও।" আর একজন বলিল "মুই কইচ না অমুকে কইছে।" এই বলিয়া তাহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গেল। ব্রজসুন্দর অট্টহাসি হাসিয়া গোল থামাইতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন সেখানে কোন খাবার জিনিষ পাওয়া যায় কি না? পাওয়া যায় না শুনিয়া সকলকে কিছু কিছু পয়সা দিতে বলিলেন।

এই সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সমূহের স্বাস্থ্য কিরূপ তাহা সেই সময়ের সার্ভে রিপোর্ট (Survey Report) দেখিলেই বুঝা যায়। তাহাতে দেখা যায় যে, কোন কোনও স্থানে শতাধিক লোকও পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। ময়মনসিংহের জঙ্গলাকীর্ণ সুসঙ্গ পরগণায়, চাঁদপুর, সেরপুর প্রভৃতি স্থানে সার্ভে করিতে গিয়া ব্রজসুন্দর

দারুণ জঙ্গলী জ্বরে ক্রমান্বয়ে আক্রান্ত হন। পরে চিকিৎসা দ্বারা পীড়া প্রশমিত হইলেও তাহাতেই অকালে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়।

জামালপুর প্রভৃতি স্থানে যখন সার্ভে করেন তখন ঢাকা হইতে প্রায় তিনশত মাইল দূরে গহন বনে নির্ব্বান্ধব অবস্থায় নিদারুণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। সেখানে দেশী কি বিদেশী কোন রকম চিকিৎসারই উপায় ছিল না। কেবল ভগবানের একান্ত কৃপায় সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

কখনও বা হস্তী পৃষ্ঠে অনাবৃত মস্তকে দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে শিলাবৃষ্টি সহ্য করিতে হইত, কখনও বা প্রখর রৌদ্র তাপে সমস্ত দিন দগ্ধ হইতে হইত। এইরূপে ১৪ বৎসর তাঁহাকে সার্ভে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। এই ১৪ বৎসরে তাঁহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

রাজকার্য্যে কঠিন শ্রম :—তাঁহাকে কিরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত তাহা তাঁহার ডায়েরীর নিম্ন উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

1st June 1868—Brought the Survey work of the second division to a close. The Bhooloa Survey Registers having been completed I sent all the records on the 1st of May to the Collector of Bhooloa by 12 carts in 17 chests in charge of Jagat Chandra Bhattacharjee &c.

রাজকার্য্যে প্রশংসা ও খ্যাতিলাভ :—সামান্য এক ভুলুয়াতেই এত কাগজ! যিনি ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্টের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বর্গমাইল সার্ভে করিয়াছিলেন, যাঁহাকে প্রত্যেক প্রজার অধিকারীত্ব, জমির তারতম্যানুসারে রাজস্ব ও মানচিত্রের সঠিকতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাঁহাকে কিরূপ গুরুতর, কিরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এইরূপ অমানুষিক পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর

স্থানে বাস, অসময়ে আহার প্রভৃতিতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেজন্য তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে উৎসাহ ও অসাধারণ শ্রমশীলতা কিছুমাত্র শিথিলতা প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি যে অতি যোগ্যতা ও প্রশংসার সহিত এই সার্ভে-বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ সে সময়কার বার্ষিক রেভিনিউ রিপোর্টে দৃষ্ট হয়। সার্ভে বিভাগে প্রবেশ করার তিন মাস পরে অর্থাৎ ১৮৫৪ সনের মার্চ্চ মাসের রিপোর্টে তাঁহার সম্বন্ধে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এই মন্তব্য প্রকাশ করেন ঃ—

"The Board have replaced Mr. D' Rozario by a young and promising officer Babu Brojo Sunder Mitter of the 5th class who has worked with great zeal and assiduity and whose salary Government has promised to raise on an opportunity offering. Seeing that this Deputy Collector now draws Rs 100 less than that assigned to his class, the Board strongly recommend that it be raised at once by the grant of a personal allowance."

তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৫ সনে তাঁহার সম্বন্ধে বার্ষিক রিপোর্টে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় ঃ—

He has conducted his work to my entire satisfaction having been employed in demarcating estates which were much interlaced. He is a very valuable officer being active and diligent in the performance of his duties. Both he and Babu Joy Chandra Majumdar deserve great praise and I would recommend their promotion when vacancies occur.

I have etc.
Henry Muspratt.

প্রতিবৎসরের রিপোর্টগুলিই পূর্ব্বোক্ত রিপোর্টের অনুরূপ। বাহুল্য ভয়ে আর অধিক সন্নিবিষ্ট করা হইল না। বার্ষিক রেভিনিউ রিপোর্টে ইহাও দৃষ্ট হয় যে তিনি কখন কখন Superintendent of Survey রূপেও কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার সার্কিটগুলি গুরুত্বে ও বিস্তারে অন্যান্য সার্কিট হইতে অধিক ছিল। কোথাও লেখা রহিয়াছে—

"Babu Brojo Sunder Mitter has a large outturn of work, the length of his chuck containing no less than 1000 Sq. miles." * * * * * * * * * *

"It is unnecessary for me to recommend this Deputy Collector for promotion as I see his name was placed in last year's list for promotion."

কোথাও লিখিত আছে, "The chuck demarcated by Babu Joy Chandra Majumdar is much smaller in extent than that of Babu Brojo Sunder Mitter." কখনও কখনও তাঁহাকে একাকী দুই সার্কিটের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। সচরাচর ইহা দেখা যায়, যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত কার্য্য করে তাহার মস্তকেই অধিক কার্য্য চাপান হয়। ব্রজসুন্দরের সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। যাঁহারা সার্ভে ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করিয়াছেন কিম্বা যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন পার্ব্বত্য প্রদেশে সার্ভে করা কিরূপ কঠিন কার্য্য। তাঁহাকে ময়মনসিংহ হইতে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিকাংশ স্থানই সার্ভে করিতে হইয়াছিল। সে সময় এ সব স্থান একেবারে দুর্গম ছিল। সার্ভে রিপোর্টে ইহাও দৃষ্ট হয় যে তখন দেশের লোকের মনের অবস্থাও এরূপ ছিল যে তাহারা সার্ভে কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা দূরে থাকুক অনেক স্থলে, বিশেষতঃ দেশীয় রাজগণ ও অসভ্য কুকিগণ, ইহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিত। গবর্ণমেণ্টের

কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্য মধ্যে সহজে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে কোন কোন দেশীয় রাজাও সম্মত ছিলেন না। যখন যেখানে কোনও গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত সেখানে তিনিই প্রেরিত হইতেন। এই সকল স্থলে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও কার্য্যতৎপরতা গুণে বিনা গোল-যোগে ও বিনা রক্তপাতে ব্রিটিস রাজ্যের ও দেশীয় রাজ্য সমূহের এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত মণিপুর রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। এই সময় ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যের মধ্যে 'সীমা' লইয়া বিবাদ চলিতে-ছিল। তাঁহার সমসাময়িক কোন কোনও সার্ভে পার্টির যে পার্ব্বত্য দেশে সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন হইয়াছিল ইহাও বার্ষিক রেভেনিউ রিপোর্টে দেখা যায়। এইরূপে ব্রজসুন্দর দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্যজাতির মধ্যে যেরূপ অকুতোভয়ে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়।

এই সময়কার বার্ষিক রেভেনিউ রিপোর্টে তাঁহার সম্বন্ধে লেখা আছে—

"Babu Brojo Sunder Mitter had an arduous task to perform in working up the mahalwaree measurements of a very difficult circuit and he accomplished this in a manner which reflects much credit on his usual industry and good management. In Board's last general report on the Land Revenue administration he was recommended for promotion, an advancement. which I think he well deserves."

তখন দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

ব্রজসুন্দর যখন Sylhetএ Superintendent of survey ছিলেন তখন একদিন গুজব উঠিল যে অসভ্য কুকিগণ ব্রজসুন্দরকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। এই গুজব প্রচার হইবামাত্র ব্রজসুন্দরের

গ্রামস্থ বাটী শোক কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ব্রজসুন্দরের সহিত তাঁহার গ্রামের বহু লোকও থাকবস্তার জরিপ কার্য্যে গমন করিয়াছিল। ব্রজসুন্দরের হত্যা বিবরণ শুনিয়া সেই সকল অনুচরবর্গের যেখানে যত আত্মীয় ছিল সকলেই মনে করিল যে বাবুকে যখন কুকিরা হত্যা করিয়াছে তখন কি আর কেহ ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে, সকলকেই হত্যা করিয়াছে, এই মনে করিয়া ভীষণ শোককোলাহল আরম্ভ করিল, কেই বা কাহার কথা শোনে? ব্রজসুন্দরের জ্ঞাতি রামকুমার মজুমদার ঢাকা হইতে তারে খবর দিয়া ব্রজসুন্দরের কুশলবার্ত্তা আনয়ন করিয়া তবে এ শোককোলাহলের শান্তি করিলেন।

রাজকার্য্য-ব্যপদেশে নরসেবা ঃ—তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই দেশের হিতকল্পে নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও, এই সময়েই আপামর সাধারণ লোকের নিকট তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রাজকার্য্যোপলক্ষে প্রায় প্রত্যেক প্রজার সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইয়া, তাঁহার যেমন অন্যের উপকারে আসিবার সুযোগ হইয়াছিল, জনসাধারণ এবং প্রজাগণও তেমনি তাঁহার চরিত্রের উপাদান বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিল। গ্রামে গ্রামে প্রজার গৃহে গৃহে তাঁহাকে গমন করিতে হইয়াছিল। রাজা জমিদার হইতে দরিদ্রতম কৃষক পর্য্যন্ত তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ন্যায়নিষ্ঠা, সূক্ষ্মবিচার ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির দোষগুণ বিচার করিয়া এমন যোগ্যতার সহিত রাজস্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন যে লোকে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল। কোন জমিতে কিরূপ শস্য হয়, কোন্ শস্য বপন করিলে কিরূপ লাভ হয়, নিজে পরীক্ষা করিয়া তবে রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন। সে পুস্তকখানি পর্য্যন্ত সার্ভে কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু সকলেই বিশেষতঃ গরিব প্রজা তাঁহার ন্যায়পরতা ও সূক্ষ্মবিচারে তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। অনাথা বিধবারা তাঁহাকে দেবতাস্বরূপ মনে

করিত। দরিদ্র চাষার বিধবা পত্নীর সামান্য একপাই অংশের জন্য কত না ব্যস্ত হইতেন। এই সার্ভে সম্বন্ধে তাঁহার গৃহে এখনও অনেক কাগজপত্র রহিয়াছে। তাঁহার সার্ভে মেমোর্যাণ্ডাম পুস্তকে এক স্থানে লেখা রহিয়াছে "Ambica Beoa, wife of Arjoon Paul, Jotedar of one pie of disputed land." পাছে রাজারাজড়া, জমিদারদিগের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তির কাগজপত্রের ভিড়ে এই দরিদ্র বিধবার কথা ভুলিয়া যান, সেইজন্য স্মৃতিপুস্তকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া নামটী লিখিয়া রাখিয়াছেন, একপাই অংশের অংশীদার তাহাও আবার disputed! এইরূপ কত নাম রহিয়াছে। যতদিন এই সার্ভে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ততদিন কত বিধবার সম্পত্তি যে আত্মীয় স্বজনের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গী কনিষ্ঠা ভগ্নীকে পিতৃস্মৃতি রূপে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাটী উল্লেখ করিতেছি ঃ—

"যখন বিক্রমপুরের মধ্যে পাথরঘাটা নামক স্থানে বাবা কয়েক দিনের জন্য তদারকে এসেছিলেন, বাড়ী থেকে বেশী দূর নয় বলে তখন আমাদের জন্য বজরা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা সেখানে কয়েক দিন ছিলাম। বাবা তাম্বুতে কাছারী করিতেন আমরা বজরায় থাকিতাম। একদিন দুপুরের পরে বজরায় শুইয়া আছি, শুনিলাম কে জল ঘাঁটিতেছে ও কাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে, "আহা মানুষ নয় গো দেবতা, দেবতা না হলে কি এমন হতে পারে? সোণার দোয়াত কলম হউক, আমার মাথায় যত চুল তত পরমায়ু হউক।" জানালা খুলিয়া দেখি একজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক, দুই পায়ে প্রকাণ্ড গোদ, হাত মুখ ধুইতেছে আর আশীর্ব্বাদ করিতেছে। বুঝিলাম সে বাবার রায় দেওয়ার পরে নদীতে হাত মুখ ধুইতে আসিয়াছে। পরে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী

আমাদের ঢাকার বাড়ীতেও আসিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ১৫০ টাকা বেতনে চাকুরী করিত ; তাহার মৃত্যুর পরে জ্ঞাতিগণ ইঁহাকে জমি জমায় দখল দিতেছিল না। অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া বাবা তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তিতে দখল দিয়াছিলেন। এইরূপ কত স্মৃতিই যে মনে রহিয়াছে।”

ব্রজসুন্দরের সম্মান ও প্রতিপত্তিঃ—অনাথা, বিধবা, ও দরিদ্র চাষার বন্ধু বলিতে লোকে ব্রজসুন্দরকেই বুঝিত। লোকে তাঁহাকে “দয়াল”বাবু বলিয়া ডাকিত। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে তাঁহার যশোভাতি এরূপ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে যখন তিনি একস্থানের তাম্বু উঠাইয়া অন্য গ্রামে স্থাপন করিতেন কিম্বা যখন তিনি তদারকে বাহির হইতেন তখন এই স্বল্পদেহ লোকটীকে দেখিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভাঙ্গিয়া পড়িত। তাঁহার হস্তীর অগ্রে কত লোক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত।

একবার ব্রজসুন্দর বিক্রমপুরের (সমগ্র বিক্রমপুর তিনি সার্ভে করিয়াছিলেন) অন্তর্গত কাওয়ালী বা কালীপাড়া গ্রাম অতিক্রম করিতেছিলেন। এই সংবাদে গ্রামের নরনারী যে যেখানে ছিল ছুটিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সমাগত নারীবৃন্দের মধ্যে অতিশয় অল্পবুদ্ধি এক স্ত্রীলোক ছিল। ব্রজসুন্দরকে দেখিয়া সকলে পল্লীতে ফিরিলে একজন এই স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিল “কেমন, তুই কি দেখিলি ?” স্ত্রীলোকটী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল “কেন ঘোড়ার উপর বিভূতি (ডেপুটী) দেখিলাম।” বেচারা পূর্ব্বে কখন হাতীও দেখে নাই ডেপুটী কথাটাও শোনে নাই। লোকে হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “ঘোড়াটী কেমন ?” সে বলিল “কেন, লম্বা মুখ নাড়িতেছে” এই বলিয়া নিজের হাতখানি নাকে দিয়া নাড়িতে লাগিল। হাস্যের রোলে পল্লী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অশিক্ষিত নরনারীগণ তাঁহার সম্বন্ধে অদ্ভুত সত্য মিথ্যা কত কথা রটনা করিত। কেহ কেহ বা তাঁহাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া মনে

করিত। ব্রজসুন্দরকে দেখিবার জন্য কুলবধূগণ পর্য্যন্ত ছুটিতেন, যে কোনও উপায়ে তাঁহাকে দেখিয়া লইতেন।

তাঁহার মৃত্যুর বহু পরে বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনীর এক রমণী তাঁহার এক কন্যার সহিত পরিচিতা হইয়া বলিয়াছিলেন "এমন অদ্ভুত সময়ে আমি আপনার পিতাকে দেখিয়াছিলাম যে তাহা বলিবার না। তাঁহার হাতী আমাদের বাহির বাটীর দীঘির ধার দিয়া যাইতেছিল, সঙ্গে লোকে লোকারণ্য ! গ্রামের সকলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিতেছে তখন আমি প্রসব বেদনায় একান্ত কাতর। আমার 'যা'য়েরা আমাকে ধরাধরি করিয়া বেড়ার ধারে আনিয়া তাঁহাকে দেখাইল।"

ব্রজসুন্দরের কি খ্যাতি ! প্রজা সাধারণের কি ভক্তিপ্রণোদিত সম্ভ্রম ! ইহার যথেষ্ট কারণও ছিল। তাঁহার কর্ম্ম জীবনের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব আন্তরিকতা ও একাগ্রতা ছিল ; চিরকাল এক নিয়মে কাজ করিয়া যাইতেন, তাহাতে কোনও ব্যতিক্রম হইত না।

প্রথমে সরকারী কর্ম্ম করিতেন, পরে সেখানে কোনও বিদ্যালয় আছে কি না তাহার অনুসন্ধান করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জনসাধারণকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে যেমন দেশ উন্নত হয় না, তেমনি পল্লীগ্রামকে বাদ দিয়া গোটাকতক সহরের অধিবাসী শিক্ষালাভ করিলেও দেশের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তিনিই তো পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম শিক্ষিতদলের অগ্রণী। তিনি কিন্তু এখনকার শিক্ষাভিমানি ব্যক্তিগণের ন্যায় পল্লীগ্রামকে উপেক্ষা করিতেন না। পল্লীবাসীর ক্ষুদ্র নগণ্য বিষয় লইয়া কালাতিপাত, তাহা লইয়া দলাদলী, মারামারি দেখিয়া ঘৃণা করা দূরে থাকুক, তাহাদের জন্য তাঁহার হৃদয় যে ব্যথিত হইত তাহা সমগ্র জীবন দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি মাতৃভূমিকে অন্য চক্ষে দর্শন করিতেন। পল্লীজীবন শিক্ষালাভ করিয়া যাহাতে ক্ষুদ্রতার উপরে উঠে তাহার জন্যই পল্লীগ্রামে স্কুল বিস্তার করিতে অর্থ ও দেহ মনের এত শক্তি নিয়োগ

করিতেন। ভগবান তাঁহাকে যেমন সুযোগ দিয়াছিলেন তিনিও তেমনি তাঁহার যতটুকু শক্তি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

অনুসন্ধান করিয়া বিদ্যালয় থাকিলে তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখিতে যাইতেন, ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন, শিক্ষকদিগকে উৎসাহিত করিতেন। বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য শিক্ষক ও স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে পরামর্শ দিতেন। যদি দেখিতেন বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে তবে গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়া সাহায্য প্রাপ্তি বা সাহায্য বৃদ্ধির উপায় করিতেন।

বিদ্যালয় না থাকিলে, গবর্ণমেণ্টের নিকট লেখালেখিতে অযথা সময় নষ্ট না করিয়া নিজে অর্থ সাহায্য করিতেন এবং স্থানীয় ভদ্রলোক-দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। পরে গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়া দিতেন। যত দিন পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের অবস্থা স্বচ্ছল না হইত, নিজে সাহায্য করিতেন। এই উপায়ে তিনি বহু লোকের কর্ম্মও জুটাইয়া দিতেন। তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রথমেই চেয়ার বেঞ্চ লাগিত না। পানগাঁ নামক স্থানের স্কুল তো গাছতলায় স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধিকাংশ স্কুলই এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইহার পর গ্রামের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন লোকের বাটীর নিকট ডোবা ডুবি জঙ্গল থাকিলে যে স্বাস্থ্যের হানি হয় বুঝাইয়া দিতেন। যাহাতে স্বাস্থ্যের উপকার হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিতেন। রাস্তা ঘাটের এবং হাট বাজারের অভাব গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারদিগকে জানাইতেন। গ্রামবাসীদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব কিরূপ, কত ঘর উচ্চ শ্রেণীর, কত ঘর নিম্ন শ্রেণীর লোক বাস করে ইত্যাদি নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেন। গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিত ধর্ম্ম শিক্ষা, সামাজিক দুর্নীতি, সুনীতি, কুসংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন। যেখানে আবশ্যক হইত

উপদেশ দিতেন। কেবল যে ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ করিতেন তাহা নহে, ছিন্ন মলিনবসন পরিহিত যে কোন দরিদ্রতম প্রজা যে কোনও বিষয়ে পরামর্শ বা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আসিত সকলকেই এমন সহাস্যবদনে ও অমায়িকতার সহিত গ্রহণ করিতেন এবং আশ্বাস দিতেন যে তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার এমনি ব্যবস্থা ছিল যে তাঁহার পট্টবাসের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক লস্কর থাকা সত্ত্বেও সকলেই সহজে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে পারিত। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনও বিষয়ই তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে যাইত না! যখন তদারকে বাহির হইতেন তখন যদি দেখিতেন যে কোনও লোক তাঁহাকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছে অথচ লোকজন ঠেলিয়া ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তিনি নিজেই তাহাকে নিকটে আহ্বান করিতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর কি গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন, কত লোকের সুখ দুঃখ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে, ইহার গুরুত্ব তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

এইরূপে গ্রামের সকলের সহিত তাঁহার একটা হৃদ্যতা জন্মিয়া যাইত। একটী গ্রামের সর্ব্ববিধ কল্যাণ চিন্তা ও কল্যাণ চেষ্টা করিবার পর যখন তিনি স্থানান্তরে গমন করিতেন, তখন স্বভাবতঃই গ্রামবাসীরা তাঁহার বিচ্ছেদে কাতর হইতেন। তিনি দূরে গেলেও তাঁহারা তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেন এবং বিপদে আপদে তাঁহাকেই হিতৈষী বন্ধু বলিয়া স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। এইরূপে নানা লোকের সংশ্রবে আসাতে, নানা ভাবে সকলের সহিত তাঁহার আদান প্রদান হইত। এইরূপে তাঁহাকে কর্ম্ম-জীবনে বহু পথ দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। এমন নরহিতৈষীকে কে না ভালবাসে?

ব্রজসুন্দরের পরে তো কত লোকই সার্ভে ডেপুটীকালেক্টর হইয়াছেন, লোকহিতকল্পে সকলের হস্তেই তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাও ন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু কয়জন তাঁহার ন্যায় পরদুঃখ কাতর ছিলেন? কয়জন

তাঁহার ন্যায় স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন? তাঁহার ন্যায় অপর কাহার নাম পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি গৃহে এরূপভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল? অসংখ্য গৃহে তাঁহাদের কাহাকেও এমন আত্মীয় বলিয়া লোকে গ্রহণ করে নাই। এ বিষয়ে ব্রজসুন্দরের মত সৌভাগ্য আর কাহারও হয় নাই। তিনি ধনী দরিদ্র অসংখ্য নরনারীর শ্রদ্ধা ও আশীর্ব্বাদ ভার বহন করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছিলেন।

কোমল হৃদয় ব্রজসুন্দর দরিদ্রদিগের বন্ধু ছিলেন বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তাঁহার দ্বারা সরকারী স্বার্থের কিছু হানি হইয়াছিল। দয়াপ্রবণ হৃদয় হইলেও এই সত্যনিষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী সরকারী স্বার্থের কোনরূপ বিরোধ ঘটিতে দেন নাই। ন্যায় ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ন্যায়পরতা পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যখন তাম্বু স্থাপন করিতেন তখন চাপরাসী প্রেরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে সংবাদ দিতেন যে প্রত্যেকের সরকারী কাজ শেষ না হইলে কেহ যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না আসে। সুতরাং জরিপের কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বে কেহই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইত না। এ বিষয়ে তাঁহার নিয়ম অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। জরিপ কার্য্যে যদি তিনি অতি অল্প পরিমাণেও সত্য ভ্রষ্ট হইতেন তাহা হইলে দেশীয় রাজ্য ও জমিদারপ্রধান পূর্ব্ববঙ্গ জরিপ করিয়া তিনি কুবেরের ধন রাখিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রকে আজ জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পরের চাকুরী করিতে হইত না।

তিনি বিবেক অনুযায়ী কাজ করিতেন, তাহাতে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে কখনও প্রজার স্বার্থ রক্ষিত হইত কখনও বা জমিদারের স্বার্থ রক্ষিত হইত; গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধেও তাহাই। এখন যেমন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই, তাঁহার সময়ে সেরূপ ছিল না। তাঁহার স্বাধীন নির্ভীক প্রকৃতির উপর উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের এমন একটা বিশ্বাস ছিল যে যখন তিনি বলিতেন যে "ইহাতে দরিদ্র প্রজার প্রতি

উচিত কার্য্য হইতেছে না অথবা যদি লিখিতেন যে প্রজার দাবী এতটা গ্রাহ্য করিলে জমিদারের বড়ই ক্ষতি হয়, কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাই মঞ্জুর করিতেন। তিনি যে অনেক সময় আইনের দোষ প্রদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিতেন তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ দেখিলে সহজেই অনুমান করা যায়ঃ—

In East Bengal, there is a large area of land called উঠ্‌তি পড়্‌তি To cultivate this kind of land, no ryot, for the most part, takes any pattah from the Zemindar or executes any kobulyat. He cultivates the land of his own accord and leaves it of his own accord. It is observed that the so called cultivator institutes summary cases against the landlord under Section 15 of Act XIV of 1859 if the latter lets out any part of the land to any other man. I think it was the intention of the legislature to enact that Section for cases between parties of adverse interests. It was acted up so for some years (vide ruling of the High Court)—W. R. Vol. II. Page 250. Ruling dated 29th April, 1868.

Had it been the intention of the legislature to apply it to landlord and tenant, it was quite unnecessary to enact at the same time clause 6, Section 23. Act X of 1859 which gives power to the ryot to sue to the Collecter within one year if the Zeminder dispossess him of any part of his land. In Vol. IX Page 513, it was ruled by a full bench of the High Court that the Section in question would apply to cases between ryots and Zemindars. This construction of Section 15 Act XIV of 1957 is contrary to the provisions of the latter part of Section

23 which distinctly provides that all suits under clause 6 should be cognizable by the Collector and instituted under the provisions of this Act and not in any other Court or by any other officer in any other manner.

This construction of the law has also put the relationship of the ryots with their landlord into the greatest confusion and it is creating the greatest injury possible to the Zemindars and ryots.

It is true that the Government will now see that such a section should never apply to such cases between landlord and ryot. If the section be kept as a law for the benefit of the ryot, there should be a compulsory rule that each ryot should take pattah (without which his holding should be by no means valid) for any piece of land which he may cultivate. There should also be a distinct provision made that in case a cultivator cultivates any land without a pattah from the Zemindar, he should be punished for criminal tresspass under the Indian Penal Code. If the above steps are taken all the disturbances created by such cases would be easily avoided. No ryot would try to take the land for which another man has obtained a pattah and no Zemindar would dare to grant pattah to any other man for land which he has already let out by pattah to one.

অন্য এক স্থানে দেখিতে পাই :—

It has already been brought to the notice of Government that almost all the ryots of this quarter have risen against the Zemindars and independent Talookdars are also the Shikmi Talookdars &c.

It is a fact that to pay off the Government revenue

of last kisti almost all the Zemindars and independent Talookdars were forced to borrow money as they did not receive rents from their ryots who have almost all combined not to pay rent to the landlord at a rate of not more than 5 annas per bigah. They gave out that His Excellency the Viceroy and Governor General, when here, gave that order.

To remove this impression from the minds of the ryots, proclamations have been issued by the Magistrate in the different parts of the district through the police officers but these have not as yet produced successful result.

Before the matter assumes a dreadful aspect it becomes a most important duty of Government to place the relationship between the landlord and the tenant on a satisfactory footing.

Is it not proper to give the landlords every facility to collect rent from their ryots? Their estates will be sold if they do not pay in their revenue before sunset of the kist day; but they are to refer to the civil courts for the rents due from the ryots. Such a civil suit is appealable up to the High Court. It should be observed how difficult it is for a landlord to maintain his estate if all the ryots of his only village (which appertains to his estate) combine together to withhold payment of the rent due from them. To sue a ryot for a rent of Rs 5 in the Munsiff's Court, would compel him to spend a sum not less than 15 or 20 rupees including diet expence, boat hire etc. which are not considered to be legal charges and if he is to sue for rents all his ryots at this rate, he is

entirely done for. It is also seen that the witnesses taken to the Munsiff's Court are often and often sent back without examination. This is perhaps done for no other reason than want of time on the part of the Munsiff but it falls heavily on the parties.

To remove the difficulties experienced in realizing the rent of the Khas Mohals, Government has come to the determination of reviving section 25 of Regulation VII of 1799, which was intended for the easy realization of rent from the ryots of Government Khas Mohals. If, in the same manner, section 15 of the Regulation be revised for the easy realization of rent by the landlords from their ryots it will place the relationship between both the parties on the most satisfactory footing. The section in question worked very well for a period of 60 years, as it was a very fair law. For vexation suits and abuses provision may be made for inflicting proper and very severe punishment on those who would institute them.

Regulation V of 1812 gave greater facility to the landlord for the realization of rent but it was very open to abuses and a little pamphlet called "*punjum* outrages" was published for repealing it by Baboo Abhoy Coomar Dutt, the late Small Cause Court Judge of Dacca, which I dare say, induced the then legislators to a great extent to repeal it.

DACCA,
25th February, 1875.

Brojo Sundar Mittra.

তাঁহার প্রতি প্রজাসাধারণ কি ভাব পোষণ করিতেন নিম্নলিখিত কবিতা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাট কবি দ্বারা থাকবস্তার জরিপ বর্ণনা।

দেবী বাক্‌বাদিণী বীণাপাণির বন্দিয়া চরণ।
থাকবস্তার জরিপের কথা করিব বর্ণন॥
কলিতে মান্য অতি ক্ষিতি পতি ইংরেজ বাহাদুর।
হুন্নরে কিন্নর মারে দর্প করে চুর॥
পূর্ব্বে রাজগণে ধনুর্ব্বাণে করিত সমর।
কলিতে ইংরেজ যুঝে করিয়া হুন্নর॥
বারুদ গোলা পরিপূর্ণ করি বন্দুক কামান।
প্রবেশিয়ে রণে বৈরীগণের হরে প্রাণ॥
বিলাতের রাজধানীতে মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়া।
দিল্লী আদি যাবতীয় মুল্লুক দখল কিয়া॥
দ্রাবিড় তৈলঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বেহার।
কাশ্মীর উড়িষ্যা অযোধ্যা মিথিলা নগর॥
মগধ কামেক্ষাবধি বিহারাদি বৰ্দ্ধমান ত্রিপুরা।
গয়া কাশী বারাণসী প্রয়াগ মথুরা॥
প্রজার বিচারের কর্ত্তা হলেন ভর্ত্তা গবর্ণর ঈশ্বর।
কলিতে করিল ভাল কলিকাতা সহর॥
কলিকাতা কলের কাম হরদম হচ্চে রাত্রি দিন।
হুন্নরে ইংরেজ মিলে লোকমান হাকিম॥
কলেতে কাটে সূতা, হয় প্রস্তুত কাপড় বোনে কলে।
বিন বাতাসে ধুম কলেতে জাহাজ চলে যায় জলে॥
উঠায় জল কিবা কল সহর ভাসে নিরন্তর।
এক বাতি জ্বালিয়া তায় আলো করে সহর॥

কলেতে লেখে পাতি বায়ু গতি তারে চলে যায়।
হর রোজ কলিকাতার তত্ত্ব বিলাত বৈসে পায়॥
কল্‌কা পর চলে রেলকা গাড়ী হেক্‌মত বোঝে।

*   *   *   *

আকাশ পর উড়ায়ে জাহাজ কল্‌কা তামাসা—।
পোনভরকে পান্‌সী উড়ায়ে কৈনা দিছা॥
কেত্তা কেত্তা রাজন্ পূর্ব্বে রাজত্ব করকে গিয়া।
ইংরেজী হুন্নরকে দিছা কিছুই না পায়া॥
তক্তপর বিলাতমে বৈঠে হুকুম দিয়া মহারাণী।
গবর্ণর বাহাদুর জিত্ লিয়ে হায় যেত্তা সব রাজধানী॥
কোন্ কোন্ তপকা কোন্ কোন্ মুল্লুক আমল হুয়া ভূম কেত্তা।
জমি জরিপ করনেকা হুকুম মাত ভিয়া কলিকাতা॥
হুকুম শুন্‌কে গবর্ণর বাহাদুর তৈয়ার কিয়া কোম্পাস্।
নূতন আইন জারি কিয়ে ভূম কার্ণো তাপাস॥
পহেলা আফিস সদর বোর্ড দোসরা কমিশনারি।
তেসরা আফিস সুপারিন্‌টেনডেণ্ট হিং বাঙ্গালাতে জারি॥
চাহাম এসিট্যাণ্ট পঞ্চম ডেপুটী কালেক্টর।
জমি জরিপ করনেকা হুকুম কর দিয়া গবর্ণর॥
এক এক ডেপুটী বাবুর অধীন তিন তিন জন পেস্কার।
এক এক পেস্কার অধীন আমীন দশ দশ জন—
এক এক আমীনকা পাছ মুহুরি নম্বরি পিয়াদা অগণন।
জমি জরিপ করনেকা ওয়াস্তে হুয়া আগুয়ান॥
জরিপকালীন খুঁটা কোম্পাস শিকল লেকে ধায়।
বায়ু কোন মে মারে খুঁটা বস্তী রাখ দে বাঁয়ে॥
বস্তীকা চৌতপ ঘোরকে থাকবস্তা বৈঠায়ে।
বিচ্‌মে যেত্তা নম্বর দেখ্‌কে টুকরা সব উঠায়ে॥

কর্ম্মজীবন।

এক এক মিরাসদারকা জমী কেত্তা কাঠা বিঘা।
কম্পাস দৃষ্টে বিয়ারিং মিলায়েকে জরিপ কর দেয় জায়গা॥
স্কেল কাঁটা কম্পাস পরকেল, আউর নিয়ে পেন্সিল।
আমীন সব মে থাকবস্তাকা নক্সা করলে মিল॥
ষ্টেসন, কম্পাস, দুরবীণ লেকে তেড়া বাবু আয়ে।
নিশান দেখ্‌কে থাকবস্তাকা ঝাণ্ডা গাড়কে জায়ে॥
থাকবস্তাকা যেত্তা জমিন জরিপ কিয়া আমীন।
পিছু ঝুককে সারভিয়ার সাহেব তৈল করলে জমিন॥
ষ্টেশিন পর কম্পাস বৈঠাকে দুরবীণ লাগায়ে আঁখ্‌মে।
হুয়া না হুয়া বেসি কমি জমি সমুজ লয়ে থাক মে॥

করতে জব্দ জমীন, যত আমিন শ্রীহট্ট জিলায়।
হুকুম নিয়া এলেন বাবু ব্রজসুন্দর রায়॥
ব্রহ্ম জ্ঞানে মন সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্মপদ ভাবনা।
ব্রহ্ম চিন্তা বিনা নাই অন্য উপাসনা॥
জিলা ঢাকার তাপে চাঁদ প্রতাপে উলাইলে ঘর।
মিত্র বংশে জন্ম বাবুর বিচারে গবর্ণর॥
আইন কানুন মত বিচার যত করেন প্রজার।
অবিচার অন্যায় কভু না হয় কাহার॥
মাতঙ্গ আরোহীয়া নিয়া নিজ আমলাগণ।
"বাহিরগঞ্জ" দিয়া বাবু করলেন কাছারী স্থাপন॥
জমি জব্দ কালে কোন স্থলে হলে কচায়ন।
বাবু সরেজমিনে গিয়া করেন আপত্তি ভঞ্জন॥

এই কবিতা সে সময়ে ভাট কবিগণ লোকের বৈঠকখানায় ও পূজার সময় গান করিত। আমরা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

মহাশয়ের নিকট শ্রুত হইয়াছি যে তাঁহারা বাল্যকালে পূজার সময় তাঁহাদের বাড়ীতে এই গীতটী ভাট কবিদের মুখে শ্রবণ করিতেন।

রাজকার্য্যের শেষাবস্থা :—তিনি ১৮৫৪ সনে সার্ভে কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন এবং ১৮৬৮ সনে এই সার্ভে পার্টীর দ্বিতীয় ডিভিসনের কার্য্য শেষ হইয়া যায়। ক্রমাগত ১৪ বৎসর একাদিক্রমে এই সার্ভে কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে, অমানুষিক শ্রমে এবং অনিয়মে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হয়। তিনি আশা করিয়াছিলেন এত বৎসর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প শ্রমসাধ্য সাধারণ বিভাগে নিয়োগ করিবেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রশংসা করা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্বন্ধে কোনও সুবিচার করেন নাই। দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে রেভেনিউ বোর্ড তাঁহাকে আসামে প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। Non-regulated আসাম প্রদেশ তখন জরিপ হইতেছিল "তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সার্ভে কার্য্যে প্রশংসা পাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে আসামে নিযুক্ত করা হউক" ইহাই বোর্ডের ইচ্ছা হইল।

রেভেনিউ বোর্ড তাঁহাকে তাঁহার ৪৮ বৎসর বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য সত্বেও আসামের ন্যায় জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে পুনরায় সার্ভে কার্য্যে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন জানিয়া তিনি নিতান্তই মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং ইহাকে কিরূপ ভীতির চক্ষে দেখিয়া ছিলেন তাহা পুরাতন কাগজপত্রে দেখা যায়। এই সব কাগজপত্র পড়িলে সেকালের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সুন্দর আভাষ পাওয়া যায়। তাঁহার হিতৈষী ইংরেজগণ তাঁহাকে সাধারণ বিভাগে আনয়ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত পত্র সকল হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

From

I. F. Browne Esq.

Superintendent of Surveys 2nd Divison.

To

The Secretary, Board of Revenue L. P.

Fort William.

Sir.

I have the honour to forward herewith a letter from Babu Brojo Sunder Mitter, Deputy Collector, in which he expresses a hope that it will not be deemed necessary to depute him to Assam.

Every thing that the Deputy Collector mentions with reference to his recent bad health I can fully corroborate and must add that he has become so experienced and careful an officer that it would, in my opinion, be a great pity to employ him in Assam, where demarcation is remarkably simple as compared with the intricate intermixture of property in Lower Bengal.

I have &c,

I. F. Browne.

ব্রজসুন্দর রেভিনিউ বোর্ডের জুনিয়ার সেক্রেটারী R. L. Mangles সাহেবকেও এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছিলেন। Mangles সাহেব তাহার নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন ঃ—

Revenue Board.

My dear Sir. Calcutta.

I fancy from your letter that you are under some apprehension of being ordering off to Assam. However you need not entertain any fears on that score.

The Board have already nominated an officer for the work, but in the event of his nomination being disapproved I want to know what has become of Babu Bonamali Singha, Mr. Browne's old Sheristadar, and whether he would like the appointment in case it were to be offered him.

Also I wish to know what sort of a man is the old Peskar, and whether he is fit for any such post. I only ask these questions to save time in the event—not a probable one—of the officer already nominated, not being able to join.

I was sorry to learn that you had not been well but I trust that you are now enjoying good health. My wife and children are still at Simla but I hope to be able to run up and see them for a few days during the Pujas. Going there and back I shall travell over more than 2500 miles and by going night and day I shall be able to do it in 8 days which is certainly wonderful travelling for India. Though my old Tiperah Sheristadar would sneer at it, and say it was nothing, for the old Hindu Kings used to fly—according to him. Remember me kindly to old acquaintances and believe me.

Yours Sincerely

R. L. Mangles.

ব্রজসুন্দরের ডায়েরীতে এ সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই—

"The Survey work of the Second Division being concluded and it having been settled by the Board and Government through the kindness of Mr. R. L. Mangles, Junior Secratary to the Board of Revenue, that I should go to the general line, Mr. H. C.

Richardson, Judge of Tiperah, was pleased to write to Mr. H. L. Damphier, Secretary to the Government of Bengal and to Lord Ullick Browne, Commissioner of Chittagong to keep me at Comillah. Mr. I. F. Browne, late Superintendent of Surveys, on his return to India from England in February last, spoke to Mr. Mangles much in my favour to keep me at Comillah in the General Department as mentioned in his last letter. Mr. J. D. Ward, Collector of Tiperah, at the instance of Mr. H. C. Richardson, expressed a wish to keep me here under him and wrote letters to the Commissioner about it.

Comilla, 8th May, 1868.

এইরূপে অনেক চেষ্টার পর তিনি সাধারণ বিভাগে আগমন করিলেন। ১৮৬৮ সনের ২২শে আগষ্ট তিনি ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া আলিপুরে আসেন। কিন্তু তাঁহার দুরদৃষ্ট ক্রমে পূর্ণ দুই মাসও সাধারণ বিভাগে থাকিতে পারেন নাই। এই সময়ে Hooglyর সার্ভে কার্য্যে বিশৃঙ্খলতার জন্য তাঁহাকে ১৮৬৮ সনের ১৯শে অক্টোবর সেখানে প্রেরণ করা হয়। ব্রজসুন্দর ইহাতে অতিশয় মনক্ষুণ্ণ হইলেও বিনাবাক্যব্যয়ে আবার সার্ভে বিভাগের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদুপলক্ষ্যে তাঁহাকে মেদিনীপুর, উলুবেড়ে প্রভৃতি নানাস্থানে আবার ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

সালিখায় তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্যসুন্দরের মৃত্যু :—এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে তাঁহার বাটীতে ভীষণ কলেরা রোগ দেখা দেয়। কন্যা, জামাতা, পাল্‌কীবেহারাগণ, ভৃত্যবর্গ অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময়ে ব্রজসুন্দরের এক মাত্র পুত্র সত্যসুন্দর এই রোগে মারা যায়।

ডায়েরী দেখিলে অনুমান করা যায় এই শোক যদিও তিনি অতি শান্ত সমাহিত ভাবে বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই শোকেই তাঁহার শরীর মন উভয়ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপরে সার্ভে বিভাগের দারুণ পরিশ্রম এবং দুর্নীতিপরায়ণ অপরিচিত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নির্ম্মম ব্যবহারে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের বিষয় শুনিয়া তাঁহার হিতৈষী ইংরাজ বন্ধুগণ যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কোন কোন পত্র নিম্নে দেওয়া গেল। এইরূপ কত পত্র রহিয়াছে।

Mr. Richardson, Judge of Bankura's letter.

Bankura, 25th March, 69.

My dear Brojosunder,

I am truly grieved to learn from your letter of the 15th March that you have sustained so severe a loss. I have only today received your letter. Mrs. Richardson and myself are distressd to hear the death of your boy. I can quite understand that it is a particularly bitter grief to you. You have however much to thank God for. I hope your wife is stronger and that the other members of your family are all well. I am so sorry I should have missed the chance of meeting you in Calcutta. I should much have liked to do so. But you will be assured by this letter of my sincere sympathy with you in your affliction. As regards yourself my advice would be to you to stay on your service the two years more and get the good service pension you well deserve. Though you may not be very heart—whole about your work at first, you will find yet I think the work a help to you, it will enable you to put off your sorrow from you for a while at any rate,

and it is always a help to feel that you are doing your duty. As regards the transfer from one branch to the other you can best judge what would suit you ; keep the busier employment I should say, whichever it may be. I shall hope to hear from you soon again. I have come here on my boy Herbert's account, the damp did not suit him and this is dry and I hope it will suit him better. I talk of going home next year. Mrs. Richardson desires to be kindly remembered to your wife and daughters.

Sincerely Yours
H. Richardson.

Jones Ward, Collector of Tiparah's letter.

Comilla, 18th June, 1868.

My dear Brojosunder,

We are very very sorry to hear of your sad loss. It must indeed be a great blow to you all losing your only son ; we must however submit with resignation to the Divine will. I have been dilatory in replying your letter which I hope you will excuse as I have not been at all well, my liver has been troublesome, and I applied for privilege leave which our chief will not grant, so I must * * and bear it. I think it will be a great pity your retiring just yet ; work is the only thing which will lessen the sting of your loss. I send you the paper which I hope will be of service. Mr. Davey wishes to go back to the survey ; you might exchange and we would be very glad to have you back. I have been obliged to close the school for want of funds, but we still keep on two mistresses to

teach the children in the zenana. People like this plan better; Miss * * and Miss * * join me in kind wishes to self and family and.

Believe me
Yours Sincerely
Jones Ward

Mrs. Browne's letter.

My dear sir.

Your letter to Mr. Browne has just come. I was very sorry indeed to hear the bad news it contained as I well-remembered the great joy the birth of your little son gave you. I hope you will tell your wife how sorry I am for the great grief but I know how hard I think it must be for a father and mother to lose their only boy; we must look forward to a happier world where there will be no more partings and where God will wipe away all tears. Mr. Browne has gone to Cutchery and he says he will think over and write to you in a day or two.

Yours sincerly
F. Browne.

Mr. Browne's letter.

Barisal,
19th March, 1869.

* * * * * * *

I have written to Mr. Dampier about you and hope my letter may do some good, but I am not sure, that it will, as secrataries do not like to be bothered. However if I were you I would try to see him and tell him how long and faithfully you have been hardworked in the survey and the claim you

have to a less harassing kind of life. I have also written to Mr. Jones and asked him to apply for you (if he has not fixed on any one) when you let him know that the Board have * * * in getting you transferred to the survey. It would be of no use for him to apply for you immediately, as it would make the Board all the more desirous to secure you.

In haste
Yours Sincerly
J. P. Browne.

ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—এইরূপে দেখা যায় অনেকে চেষ্টা করিয়া আবার তাঁহাকে সাধারণ বিভাগে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পুত্র শোকাতুর হইয়া শেষ জীবনটা ঢাকায় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার ডায়েরীতে এই সময়ে লেখা রহিয়াছে—"Transferred to Dacca through the kindness of Mr. R. L. Mangles. J. Secretary, Board of Revenue, as a Deputy Collector to superintend the completion of the Survey Records of Dacca and Sylhet as well as a Deputy Magistrate.

7th October, 1869.

তাঁহার ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা সফল হইল বটে কিন্তু তিনি সার্ভে বিভাগ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। বাস্তবিক গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি যেরূপ অবিচার করিয়াছিলেন, আর কাহারও উপর বোধ হয় সেরূপ্ করেন নাই। একাদিক্রমে এত বৎসর Survey বিভাগে বোধহয় আর কেহই থাকেন নাই।

সাধারণ বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগণ যেমন করণীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া Treasury, Jail, Lunatic asylum, Municipality, District Board, Excise প্রভৃতির ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন,

ব্রজসুন্দর তাহাও করিতে লাগিলেন, তদুপরি তাঁহাকে সার্ভে বিভাগের কাগজপত্রের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হইত। তিনি সকল কার্য্যেই এমন দায়িত্ব বোধ করিতেন যে তাহাতে তাঁহার পরিশ্রম অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া যাইত। নিজের কাজ ব্যতীত তাঁহাকে অন্যান্য Settlement officer দিগকেও সাহায্য করিতে হইত। "As a Settlement officer will you be kind enough to help me etc." "As an experienced Survey officer do you consider this fair etc." তাঁহার নিকট লিখিত নানা চিঠিপত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সময় সময় তাঁহাকে যে Districtএর চার্জেও থাকিতে হইত Messrs Meres ও Lyall সাহেবের চিঠিপত্রে তাহা দেখা যায়। ইহার পর তিনি ঢাকাতেই রহিলেন। তাঁহার বদলী হওয়ার পর তাঁহার হিতৈষী বান্ধব R. L. Mangles সাহেবও বোর্ড হইতে ঢাকার অস্থায়ী কমিশনার হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাতে যে ব্রজসুন্দর আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মৃতি পুস্তক দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, কারণ Mangles সাহেবের ঢাকায় আসার দিনটী পর্য্যন্ত তাহাতে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

Road Cess Act :—১৮৭৪ সনে Road Cess Act বিধিবদ্ধ হয়। ঢাকাতে তাঁহার দ্বারা ঐ আইন প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সাধারণ লোকের তাঁহার উপর যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল তাহাতে তাঁহার দ্বারা ঢাকায় ঐ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কোনও গোলযোগই হয় নাই। কিন্তু ময়মনসিংহে ঐ আইন প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হইয়াছিল। সেখানে এই উপলক্ষে প্রজাবিদ্রোহ ও নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল।

রেভিনিউ বোর্ড ব্রজসুন্দরকে অবিলম্বে ময়মনসিংহে প্রেরণ করার জন্য ঢাকার কমিশনার I. R. Cockerell সাহেবকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঢাকার কমিশনার তাহার প্রত্যুত্তরে

লিখিয়াছিলেন যে ঢাকার কাজ শেষ না হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাকে অন্যত্র প্রেরণ করিলে ঢাকার কার্য্যের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং বহু বিলম্ব হইবে, অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ পরে তাঁহাকে ময়মনসিংহে প্রেরণ করিতে পারেন। বোর্ড হইতে এই পত্রের নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর আইসে:—

In reply to your letter No. 642 R. dated 28th Ultimo, I am directed to inform you that under the circumstances represented by you the Member in charge approves of your proposal not to send Deputy Magistrate and Deputy Collector Babu Brojo Sunder Mitter to Mymensing till the 18th May next, but I am to request that he may not be detained a day longer than that date at Dacca.

I have &c.
J. G. (Illegible)
Offg. Secretary.

ইহা হইতে ব্রজসুন্দরের কার্য্যকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে Road Cess Act প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহাকে ১৮৭৪ সনের জুন মাসে ময়মনসিংহ গমন করিতে হইয়াছিল। ময়মনসিংহের কালেক্টর Mr. Reynolds তাঁহাকে "You are my Collegue" বলিয়া অত্যন্ত আদর যত্ন করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়া তিনি এমন যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে অল্পকালের মধ্যেই জমিদার, প্রজা ও গবর্ণমেণ্টের সকল প্রকার আপত্তি চলিয়া গেল। জমিদারবর্গ এবং প্রজা সাধারণ সকলেই তাঁহার কার্য্যের জন্য সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপর লোকের এমন একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তিনি যখন যে ভাবে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন প্রতিপক্ষগণ স্বীয় স্বার্থ রক্ষিত

হইয়াছে বলিয়া স্থিরিয়া লইতেন। ব্রজসুন্দরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার প্রতি লোকের এত বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি সহজে সমুদয় বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহার কার্য্য অনুমোদন করিতেন। কাজ যতই কেন অভিনব হউক না কেন, ব্রজসুন্দর অল্প আয়াসেই তাহা সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন।

ময়মনসিংহ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে মানিকগঞ্জের জয়মণ্টপ নামক স্থানে আবার বিষম প্রজাবিদ্রোহ হইয়াছিল, তখনও তিনি সেখানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে তৎকালীন বাঙ্গালীদিগের প্রাপ্য সর্ব্বোচ্চ সম্মান অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত করা হয়।

দিয়ারা সার্ভেকার্য্য ঃ—এই সময়ে 'দিয়ারা' সার্ভে সেটেলমেণ্টের জন্য একজন যোগ্য কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হওয়াতে রেভিনিউ বোর্ড পুনরায় তাঁহাকে মনোনীত করিয়া ঢাকার কমিশনারকে পত্র লিখেন। খরতর নদী প্রবাহে যখন পার্শ্ববর্ত্তী স্থল সমূহ নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যায়, কতিপয় বর্ষ পরে স্রোতের গতি অনুসারে দূরে কিম্বা নিকটে সেই নদীর গর্ভে কিম্বা অপর তীরে নূতন চর উৎপন্ন হয়। সেই ভূমিখণ্ডের কে প্রকৃত সত্ত্বাধিকারী তাহা নির্ণয় করাই এই 'দিয়ারা' বিভাগের কার্য্য। এই কার্য্যও সার্ভেকার্য্যের ন্যায় অতি গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ। সচ্চরিত্র ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তি দ্বারা ভিন্ন ইহা কখনও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্রজসুন্দরকে এই কার্য্যে মনোনীত করিয়া বোর্ড তাঁহাদের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু 'দিয়ারা' সার্ভেও কম পরিশ্রমের কার্য্য নহে, এইজন্য তাঁহার পরম হিতৈষী D. R. Lyall সাহেব তাঁহার এই ভগ্ন স্বাস্থ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া রেভিনিউ বোর্ডকে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন এবং বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়কে মনোনীত করিতে অনুরোধ করেন।

কর্ম্মজীবন।

"Though Babu Brojo Sunder Mitter is a very experienced Revenue officer of throughly independent character, one of the last of a very valuable class of public servants now fast dying out of the Service, he is, I fear, very near to the time when failing health will compel his taking pension. He has been most useful in carrying out the Road Cess assessments in Dacca and Mymensing."

কর্ম্মজীবনের শেষাবস্থা ঃ—ইহার পর ব্রজসুন্দরকে আর অধিকদিন কার্য্য করিতে হয় নাই। তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃই মন্দ হইতে লাগিল। তাঁহার বাঙ্গালী এবং ইংরেজ বন্ধুগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পেন্সন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু পেন্সন গ্রহণ করিলে তাঁহার বৃহৎ সংসারের ব্যয় কি প্রকারে নির্ব্বাহিত হইবে ইহা ভাবিয়া তিনি অবসর লইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও এবং অল্প বিস্তর ভূসম্পত্তি থাকা সত্বেও পরদুঃখকাতর মুক্তহস্ত ব্রজসুন্দর শেষ জীবনের জন্য বিশেষ কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই; কাজেই পীড়িত অবস্থায়ও অতিকষ্টে কার্য্য করিতে লাগিলেন। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে সল্পশ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন। ক্রমে শরীরের এমন অবস্থা হইল যে আর নিয়মমত কাছারীতে গমন করিতে পারিতেন না, বাটীতেই কাছারী করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন D. R. Lyall সাহেব নিজে ব্রজসুন্দরের নিকট আসিয়া বলিলেন "তুমি পেন্সন লও, আমি কথা দিতেছি তুমি সুস্থ হইলে তোমাকে পুনরায় কোন কার্য্যে গ্রহণ করিব।" ইহার পর অগত্যা ১৮৭৫ সনে ১৮ই নবেম্বর কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া পেন্সন গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন যাপন করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু

তাঁহার অদৃষ্টে পেন্‌সন্ ভোগ হয় নাই। পেন্সন গ্রহণের এক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজকার্য্য ব্যপদেশে ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুতা ঃ—ব্রজসুন্দরের সহিত ইংরাজ রাজপুরুষদিগের যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ কোন কোন স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ ডনেলী (Mr. Donelly), লর্ড ইউলিক ব্রাউন (Lord Ulick Brown), মিঃ ডেমপিয়ার (Mr. Dampeir), মিঃ মেন্‌গেল্‌স্ (Mr. Mangles), ডাক্তার সিম্‌সন্ (Dr. Simson), ডাক্তার গ্রীন্ (Dr. Green), মিষ্টার ব্রাউন্ (Mr. Browne), মিষ্টার জোন্‌স্ ওয়ার্ড (Mr. Jones Ward), ডাক্তার ওয়াইজ্‌দ্বয় (Drs. Wise), মিঃ ডি, আর, লায়েল্ (Mr. D. R. Lyall), মিঃ পিকক্ (Mr. Peacock), মিঃ রিচার্ডসন্ (Mr. Richardson), মিঃ এবারক্রোমবি (Mr. Abercrombe), মিঃ রাম্‌পিনি (Mr. Rampini), প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত রাজপুরুষদিগের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। রাজকার্য্যো-পলক্ষে তাঁহাকে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের সংশ্রবে আসিতে হইয়াছিল, তাঁহাদিগের অধিকাংশের সহিতই তাঁহার আজীবনের বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। ব্রজসুন্দরের চরিত্রে মনুষ্যত্ব ও সহৃদয়তার আশ্চর্য্য সমাবেশ ছিল, এই হেতু তিনি একদিকে যেমন শ্রদ্ধা, অপর দিকে তেমনি ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিতেন। সেকালে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত এদেশীয় লোকদিগের যে প্রকার সম্বন্ধ ছিল এখন তাহা একেবারেই নাই। এখন পরস্পরের ভিতর ঈর্ষ্যা ও অবিশ্বাসের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের নানা স্থানে অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজ কর্ম্মচারী থাকিতেন। তখন বাঙ্গালীদিগের প্রতি ইংরাজদের বর্ত্তমানভাব লক্ষিত হইত না। বর্ত্তমান সময়ে এদেশীয়দিগের সহিত নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বের সে প্রেমের যোগ, সে প্রকার বন্ধুতার আদান প্রদান এখন আর দেখা যায় না। তখনকার দিনে উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারীর

ও অধস্তন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর মধ্যে কিরূপ প্রীতির যোগ ছিল, নিম্ন-লিখিত ঘটনায় তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

একবার ব্রজসুন্দর প্রিভিলেজ্ ছুটী পাইয়া দেশে যাইবার সমুদায় আয়োজন করিয়াছেন, বজরা ঘাটে আসিয়াছে, যাত্রা করিলেই হয়, এমন সময় রিচার্ডসন সাহেবের পুত্র জর্জ আমাশয় রোগে মারা গেল। ব্রজসুন্দরের তখন দেশে যাওয়া স্থগিত হইল—তিনি শোকার্ত্ত রিচার্ডসন ও তাঁহার পত্নীকে ফেলিয়া কোন ক্রমেই যাইতে পারিলেন না। এমন হৃদয়বান যে ব্যক্তি, তাঁহার সহিত যে সহজেই অপরের বন্ধুতা জন্মিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কোথায় বা এখন সে সকল ইংরাজ-বন্ধু! এদেশের সহিত তাঁহাদিগের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে,—আর কোথায়ই বা এখন ব্রজসুন্দর! আজ আমরা দেখিতেছি তাঁহাদের পত্রাবলী! তাহার ভিতর কি আত্মীয়তা, কি সদ্ভাবের ছায়া! ইংরাজ-বন্ধুগণ দূরে গমন করিলে, কিম্বা স্বদেশে গমন করিলেও এ যোগ অক্ষুণ্ণ থাকিত। হয়ত বহুদিন পরস্পরের সংবাদ লওয়া হয় নাই, যেই কাহারও গৃহে পারিবারিক সুখ দুঃখের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তখনি পরস্পরকে স্মরণ করিয়াছেন! নিম্নলিখিত পত্রে তাহার নিদর্শন দেখিবেন।

My Dear Sir.

I have not heard from you for a long time and would much like to know how you are getting on.

A second son was born to us the other day and both my wife and he are very well, though the latter suffered at one time very severly from neuralgia. I suppose you are still at Dacca, so I address you there. My wife sends her regards to yourself and family.

Cuttack.

Yours Sincerly.
I. P. Browne.

ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের সহিতই যে কেবল ব্রজসুন্দরের বন্ধুতা ছিল তাহা নয়, তাঁহাদিগের কন্যা, পত্নীগণও অনেক সময় ব্রজসুন্দরের অন্তঃপুরে গমন করিতেন। তৎকালে হিন্দুসমাজে ইহা একদিকে যেমন আশঙ্কার বিষয় ছিল, অন্যদিকে ইহাকে বিশেষ সম্মানসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত। ইংরাজ কমিশনারদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার তেতুলঝোড়ার ভবনেও গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশীয় প্রথানুসারে মোহর দিয়া তাঁহার নবকুমারের মুখ দেখিতেন ও তাঁহাকে এবং তাঁহার কন্যাগণকে নানারূপ উপহার দ্রব্য প্রেরণ করিতেন। ব্রজসুন্দর এবং তাঁহার কন্যাগণও তাঁহাদিগকে নানা উপহার দিতেন। এইরূপ প্রীতির আদান প্রদানে তিনি চাকুরীর অধীনতা অনুভব করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবন চিরদিনই মধুময় ছিল এবং এই নিমিত্তই তাঁহার কর্ম্ম জীবন সতেজ, সরস ও কর্ম্মবহুল হইতে পারিয়াছিল। বাস্তবিক ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির যোগ না থাকিলে তাঁহার অধীনে কার্য্য করিলে যে কার্য্যের প্রাণ থাকে না এবং কর্ম্ম নিতান্ত বন্ধনস্বরূপ বলিয়া মনে হয় তাহা আমরা ব্রজসুন্দরের হুগলীতে কয়েক মাস কার্য্যকালে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার ঊর্দ্ধতন সাহেবটী অবিবাহিত ছিলেন এবং বাস্তবিক তাঁহার হৃদয় বস্তুটী একেবারে শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি পুত্রশোকাতুর ব্রজসুন্দরের উপর বড়ই নির্ম্মম ব্যবহার করিয়া ছিলেন। সহিষ্ণুতার অবতার ব্রজসুন্দরও আক্ষেপ করিয়া বলিতেন "আর পরের গোলামী করিতে পারি না।" এমন কি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

ইংরাজ মহলে ব্রজসুন্দরের এমন সুনাম প্রসারিত হইয়াছিল, যে অপরিচিত কিম্বা নামমাত্র পরিচিত ব্যক্তিগণও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী কিম্বা প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঢাকায় গমন করিলেই ব্রজসুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ঢাকায় এই দর্শনীয় ব্যক্তিকে কি ইউরোপীয় কি দেশীয় কেহই দর্শন না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। ভক্তিভাজন

কর্ম্মজীবন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়া থাকেন, যে তাঁহারা যৌবনকালে শুনিতেন যে "কেহ ঢাকায় গিয়াছেন অথচ ব্রজসুন্দর মিত্রকে দেখিয়া আসেন নাই তবে তাঁহার ঢাকায় গমনই বৃথা হইয়াছে"—এ কথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। বাস্তবিক তখনকার দিনে এরূপই ছিল।

রাজকার্য্য ব্যপদেশে স্বদেশবাসীর সেবা ঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঊর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট ব্রজসুন্দরের প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যাঁহাকে যে অনুরোধ করিতেন, তিনি তাহা রক্ষা করিতে সযত্ন হইতেন। ব্রজসুন্দর অত্যন্ত পরদুঃখকাতর ছিলেন। কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, নিতান্ত অসমর্থ না হইলে কখনই কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। সুতরাং স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ কোন বিপদে পড়িলেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। বিমুখ করা দূরে থাকুক, অপরের বিপদে তিনি চিরদিনই আপনাকে বিপদগ্রস্ত ভাবিতেন। তাঁহার পরোপকার কি কেবল মুখের কথা, না দুই ছত্রের একখানা বেগারে পত্র? ব্রজসুন্দর ত আজ সাক্ষ্য দিতে আসিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার পুরাতন পত্রগুলি এখনও সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। ব্রজসুন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সমুদায় অতিরিক্ত আসবাব বিক্রয় করিয়া ফেলেন এবং তাঁহার আফিসের আলমারিগুলি যখন চিঠিপত্র শূন্য করিয়া বিক্রয় করা হয় তখন সমুদায় বাড়ী, চিঠি আর কাগজপত্রময় হইয়া পড়িল। ঢাকার মুসলমানগণ আসিয়া, কুটিয়া কাগজ করিবে বলিয়া, গাড়ী গাড়ী পুরাতন চিঠি লইয়া যাইতেছে দেখিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহার কিঞ্চিৎমাত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ ৩৮।৩৯ বৎসরে তাহাও উই এবং ইন্দুরের কবলে গিয়াছে; বাকি আর আছে কি? যাহা বাকি আছে ব্রজসুন্দরের পক্ষে তাহা অতি সামান্য বটে কিন্তু অন্যের পক্ষে কম নহে। তাহার মধ্য হইতে দুই চারি খানি চিঠি নিম্নে দিতেছি। ইহাতে পাঠকবর্গ তাঁহার পরোপকারের নিদর্শন পাইবেন।

শ্রীচরণকমলেষু—

অপর এথাকার কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ও পেস্কার মহাশয়দ্বয় কোন এক কার্য্যের ত্রুটীতে সস্‌পেণ্ড হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ঘোষ মহাশয়কে যে অপরাধে সস্‌পেণ্ড হইবার জন্য এথাকার কালেক্টর কমিশনারের নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন, উল্লিখিত সেরেস্তাদার ও পেস্কার মহাশয়ও সেই অপরাধে অপরাধী। আমি বোধ করি মহাশয় এ বিষয় বিস্তারিতরূপ অবগত আছেন। পেস্কার শ্রীযুক্ত রামদয়াল গুপ্ত মহাশয় নিতান্ত নির্দ্দোষী মনুষ্য, অকারণ তাঁহাকে কালেক্টর সস্‌পেণ্ড করিয়াছেন। সহরস্থ সকল ভদ্রলোকই পেস্কারের জন্য দুঃখিত হইয়াছেন। পেস্কার মহাশয় এবং সহরস্থ অন্যান্য ভদ্রলোকগণ, মহাশয়ের নিকট আমাকে অনুরোধপত্র লিখিতে বলায় শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি যে যদি মহাশয় উল্লিখিত ভদ্রলোকদ্বয়ের কোন প্রকারে কোন উপকার করিতে পারেন তবে করিয়া এথাকার সমস্ত ভদ্রলোকদিগকে বাধিত করিবেন। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন বাবুকে আপনিই এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এমত এথাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সেবক
শ্রীবরদাকান্ত বসু।
ময়মনসিংহ।

মহামহিম মহিমার্ণবেষু—

আমার উপরে যে অকস্মাৎ একটা সমূহ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় মহাশয়ের অবিদিত না থাকা সম্ভব। শেষাবস্থায় অকারণে এবং নিষ্পাপে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতেছি। অপর ক্রমে যে দুই কৈফিয়ত দিয়াছি তাহা মহাশয়ের দৃষ্টার্থে পাঠাইলাম। দয়া প্রকাশে ক্ষণেককালের জন্য মহাশয়ের অমূল্য সময় নিক্ষেপে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আজ্ঞা হইবেক নিবেদন ইতি ২রা কার্ত্তিক।

ইতিপূর্ব্বে লেখকের অভাবে এই সমস্ত কাগজপত্র মহাশয়ের সমীপে পাঠাইতে পারি নাই।

নিবেদক
শ্রীদীননাথ শর্ম্মণঃ।

কর্ম্মজীবন।

Manicganj.
20th June, 1875.

My Dear Sir.

Something very urgent has called me to pray for your kind assistance. One Horo Mohon Gupta, a Vakeel of Moonshiganj Court has brought a suit against me claiming a piece of land of my talook * * * * * * * * * * I give you here the boundary of the land so claimed as put down in the plaint. Thakbust and Survey maps are required to be filed to show that the land in question is not belonging to Khash Mahal. Without your assistance I cannot get them. I do not know what will be the cost for them and how can I get them. I enclose herein a copy of the memo of the maps you had the kindness to supply me sometime back. I have filed chittas, dated above 12 years and some no less than 30 years. I shall write to Raj Chandra Mukherjee who has now the charge of my talook to appear before you when he comes to Dacca * * If you have got them please send me at your liesure. I hope you will excuse me for this trouble as it is for the interest of your dear and affectionate Shama Charan Ganguly. I am well with my family, hoping you are doing the same.

I remain, Sir,
Your most affly.
Shama Charan Ganguly.

Noakhally.
6th November, 1875.

My Dear Sir.

I am exceedingly sorry I do not hear anything from you. Perhaps you have heard about the case brought by Babu Rakhal Das Mookerjee against me, after my transfer to Noakhally. I told my cousin Kali Kishore Dey to go to you and to shew you all the correspondence connected with the case. I hope you will try your best to help me * * * * want justice and it will be a matter of great regret if I fail to find remedy. * * * *

I am, dear Sir,
Yours most obediently
Kali Nath Bose.

এইরূপে দেখা যায় লোকে বিপদে পড়িলেই তাঁহাকে স্মরণ করিত।

মাইজ পাড়ার জমিদার বাবু উমাকিশোর রায় স্কুল ইন্‌স্পেকটার ছিলেন। তিনি একবার স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া পথিমধ্যে কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া কুমিল্লায় ফিরিয়া আসেন। সহরস্থ সাহেবগণ তাঁহাকে সহরে উঠিতে দিতে অসম্মত হইলে অমনি ব্রজসুন্দর চিঠি লিখিলেন যে "উমাকিশোরকে যদি সহরে উঠাইতে না দেওয়া হয় তবে কি করিয়া তাঁহার চিকিৎসা হইতে পারে, কুমিল্লার নদীতো সহরের নিকটে নয়, নদী বহুদূর। উমাকিশোর সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, আর সম্ভ্রান্তই হউক অসম্ভ্রান্তই হউক এত দূর হইতে কি কলেরা রোগীর চিকিৎসা চলিতে পারে, ইহা অসম্ভব কথা।" সাহেবগণ আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। উমাকিশোর বাবুর পরিবার নিকটে ছিলেন না, ব্রজসুন্দর তাঁহাকে উঠাইয়া চিকিৎসা করাইলেন। তিনি প্রায় মৃতকল্প

হইয়াছিলেন, মুখ দিয়া আহার পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। চিকিৎসা ও সেবার গুণে উমাকিশোর বাবু আরোগ্য লাভ করিলেন।

ঢাকা রিভিউ পত্রিকায়ও দেখিতে পাই ঃ—

ধামরাই গ্রামের কৃষ্ণপ্রসাদ সেন নামক একটী ভদ্রলোক বালিয়াটীর বাবুদের কর্ম্মচারী ছিলেন। বাবুরা পাওনা টাকার জন্য তাঁহার নামে আদালতে নালিস করেন। ভদ্রলোকটী দেনা পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারিলেন না, সেজন্য তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে যাইতে হইল। ধামরাইর অনাথবন্ধু মৌলিক সেই সংবাদ শুনিয়া ব্রজসুন্দর বাবুর নিকট গেলেন এবং কহিলেন "আপনি এই বিপন্ন লোকটীকে বিপদ হইতে উদ্ধার না করিলে আর কেহই পারিবেন না।" ব্রজসুন্দর এই কথা শুনিয়া বালিয়াটীর বাবুদের ম্যানেজারের বাসায় গমন করিলেন। একজন সামান্য কর্ম্মচারীর জন্য তাঁহার মত সম্মানিত ব্যক্তিকে বাসায় আসিতে দেখিয়া ম্যানেজার বাবু বিস্মিত হইলেন। তিনি সেই ভদ্র-লোকটীকে খালাস করিলেন এবং দেনার দায় হইতে মুক্তি দিলেন। এইরূপ কত ঘটনা আছে তাহার ইয়ত্বা নাই।

লোকে যে কেবল বিপদে পড়িয়াই তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন তাহা নহে। লোকে নানা রকমে তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইতেন—ইহার মধ্যে চাকুরীর জন্যই অনেকে তাঁহার নিকট আসিতেন। এ সম্বন্ধে এখনও বহু পত্র রহিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি চাকুরীর জন্য সারা-জীবন লোকে তাঁহাকে উত্যক্ত করিত, কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার, যত দূর সাধ্য লোকের চাকুরী যোগাইতেন। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী উমেদারে তাঁহার বাটীর নিম্নতল পূর্ণ থাকিত। যত দিন পর্য্যন্ত তাহাদের কর্ম্ম জুটাইয়া দিতে না পারিতেন, ততদিন তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নিজে বহন করিতেন। হিসাবের খাতায় উল্লেখ দেখিতে পাই দরিদ্র কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী উমেদার তাঁহার বাসায় আসিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিতেছে এবং নিঃসম্বল পরিজন পরিবার বর্গের জন্য তাঁহার নিকট

হইতেই স্বাহায্য লইয়া দেশে প্রেরণ করিতেছে। স্থানান্তরে কিম্বা অধিক বেতনের কর্ম্ম হইলে অনেকেই তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন। স্থানীয় এবং অল্পবেতনের কর্ম্ম হইলে অনেকে আর ব্রজসুন্দরের বাটী পরিত্যাগ করিতেন না, রহিয়া যাইতেন ও উপার্জ্জিত মুদ্রা কয়টী দেশে পাঠাইতেন। তিনি নবাব সরকারে, লোকের জমিদারীতে এবং দেশ বিদেশের পদস্থ ইংরেজ বাঙ্গালী সকলের নিকটে এই সমস্ত লোকের কর্ম্ম জুটাইয়া দিতেন।

ইহার একটী নমুনা দেওয়া গেল ; চিঠিখানি নবাব আসানুল্লার।—

Ashan Manzil
Dacca.
The 2nd April, 1875.

My dear Sir.

Yours of the 1st Instant to hand. Yes, at the last moment, I was obliged to appoint another man in Parbatty Charan's place. This was unavoidable, but at the same time I promise to give Parbatty an appointment as soon as I am able to do so. I hope you will excuse me for this and also explain the whole circumstances to Parbatty and ask him to wait a little longer. In haste.

Yours
Ashanullah.

তিনি যে লোকদিগকে কেবল সাধারণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন তাহাও নয়। বোর্ডের মেম্বরদিগের কাহার কাহারও নিকট এবং উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের নিকট তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি ছিল যে তিনি অনেককে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদেও নিযুক্ত হইতে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি কিরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন তাহা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষগণ জানিতেন। কোন কাজে লোক নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে অনেকে তাঁহার নিকট

জিজ্ঞাসা করিতেন। আর, এল, মেন্‌গেল্‌স্ সাহেব ব্রজসুন্দরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে বলিয়া আর উদ্ধৃত করিলাম না। তাঁহার নির্ব্বাচনের উপর তাঁহাদিগের খুব আস্থা ছিল। তিনি বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পটুয়াখালী জলপ্লাবনে সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন, এবং হুগলীর বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিগকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে মিষ্টার আর, এল, মেন্‌গেল্‌স্ সাহেবকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া ছিলেন—

Mr. Browne's old Peskar Babu Bisseswar Banerjee who is still in the service, is a very able and excellent Survey officer. He knows all the details of the Survey and the Registery work very well and I can safely say that he would do credit to the service, if he be sent to Assam as a Survey Deputy Collector.

এখনকার দিনে লোকে অপরিচিত লোকের নিকটে সুপারিস চিঠি দিতে সম্মত হয়েন না। ব্রজসুন্দর চাকুরীর জন্য চারিদিক হইতে এত অনুরুদ্ধ হইতেন যে অপরিচিত সাহেব বাঙ্গালী সকলের নিকটেও চিঠি দিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সকলেই তাঁহার চিঠির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

পূর্ব্ব-বঙ্গের তখনকার দিনে অনেক উকিল ও ডাক্তার তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া উন্নতির সোপানে উঠিয়া ছিলেন ইহা অনেকেই জানেন।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই লোকের চাকুরী করিয়া দেওয়া ব্যতীত আরও অন্যান্য বিষয়েও তাঁহাকে খাটিতে হইত। কলিকাতা কিম্বা মফঃস্বলবাসী বন্ধুদিগের নানা ফরমাইস্ অনুসারে কাজ করিয়া দিতে হইত। জমা-খরচের বহীতে এবং চিঠি পত্রে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখা যায়। প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিভিন্ন হিসাব

ভিন্ন ভিন্ন নথী ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। পরের কাজ করিতে গেলে যেরূপ ব্যাপার হইয়া থাকে সেইরূপ নানা ঝঞ্ঝাটেও পড়িতে হইত। কাহারও দ্রব্য পছন্দ হইত না, কিম্বা অন্য কোন কারণ উপস্থিত হইত। এই উপলক্ষে নানা ব্যবসায়ী লোকের সহিত কারবার করিতে হইত ও নানা গোলযোগে পড়িতে হইত।

এই সব কাগজ পত্রের মধ্যে দেখিতে পাই, কলিকাতার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি পাইয়া তাঁহাদের সাহাজাদপুরে প্রায় ১০০০ মণ চূণ প্রেরণ করিতেছেন, চূণ পৌঁছিতে বিলম্ব হইতেছে, তাহার জন্য নানা তাগিদ, তৎপরে ভিজাচূণ লইয়া যাওয়ায় কর্ম্মচারীবর্গের ওজর আপত্তি, চূণের মহাজনদের ওজর আপত্তি, হিসাব নিকাশে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি পত্রে এক প্রকাণ্ড নথী হইয়া রহিয়াছে, আমাদের পড়িতে বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল এবং তাঁহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক হইলাম। এইরূপ কত লোকের রাশি রাশি হিসাব, কত বরাত পত্র রহিয়াছে।

আরও কত বিষয়ে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন রেল ষ্টীমার হওয়াতে আমরা যে কি স্বাধীন হইয়াছি, আমরা এখন তাহার মূল্য বুঝি না। তখন রেল ষ্টীমার ছিল না, লোকের কতই অসুবিধা ছিল। ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের দ্বার স্বরূপ। পূর্ব্ববঙ্গের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে তাঁহার মত অভিজ্ঞতা আর কাহারও ছিল না। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী প্রায় সকলকেই নানা স্থানে যাতায়াতের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইত। এমন কি বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্র লইয়া ব্রজসুন্দরের নিকট উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এই কার্য্যের জন্য যেমন তাঁহার গৃহে সময়ে অসময়ে বহু অতিথি সমাগম হইতেন তেমনি ইঁহাদিগের নানাস্থানে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করাও তাঁহার এক বিশেষ কাজ ছিল। ইহাতেও কম ঝঞ্ঝাট ছিল না। নানা হিসাব পত্র রাখিতে হইত। এই সূত্রে ঢাকার কোষ এবং বজরা নৌকার মাঝিগণ

তাঁহার নিকট যথেষ্ট কর্ম্ম পাইত বলিয়া তাঁহার নিতান্ত অনুগত ছিল। তাহাদের মধ্যে অতি বৃদ্ধ দুই একজন এখনও জীবিত আছে। এ সম্বন্ধে একখানি মাত্র পত্র দেওয়া হইল।

Cooch Behar.
The 4th September, 1875.

My dear Brojo Sundar.

I believe you must have received the letter I wrote to you about Mr. Beckett's boat. Yesterday I received by post a letter from Ram Sundar Manji (of the Kosh boat you sent for me) in which he asked for a further advance of Rs 40. I enclose notes for Rs 40 for him. Kindly see that he starts in time with the boat. Mr. Beckett intends to leave this place by the 18th October. Ram Sundar agreed to be here by the 27th September. It will do if he can come by the 29th or 30th. Mr. Beckett will have to go to Sylhet. Soon after the receipt of this please send for him and do the needful. It will take him 20 or 22 days to come, so that he must start as soon as you receive this note. I am doing well. Please excuse the trouble I give you. Out of the Rs 40 I send, please pay Rs 39 to the Maji and with the balance send a telegram to me, saying that the boat has started. Hoping you are well.

I remain
Yours ever affly.
Calica Das Dutt.

কার্য্যশৃঙ্খলা।—ব্রজসুন্দর যেমন অদ্ভুত পরিশ্রম করিতে পারিতেন তেমনি তাঁহার অদ্ভুত শৃঙ্খলা ছিল। এ গুণটী তিনি মাতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। সময় বিভাগ এবং কার্য্যের শৃঙ্খলার জন্য তিনি অল্প সময়ে বহুকাজ করিতে পারিতেন, এই হেতু জীবনে এত কাজ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। সে সময়কার লোকে বলিত ব্রজসুন্দর বাবুর মধ্যে তিনটী ধর্ম্মের লক্ষণ আছে। তিনি আহারে বিহারে হিন্দু, ধর্ম্মে ব্রাহ্ম, কাজকর্ম্মে (খৃষ্টান) সাহেব। বাস্তবিক তিনি বৈঠকখানার ফরাস বিছানা সহ্য করিতে পারিতেন না, তাঁহার বাড়ীতে দপ্তরখানা ব্যতীত নিজের জন্য তাকিয়া কিম্বা ফরাস বিছানা ছিল না। চিরজীবন থাকবস্তার কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় কাগজপত্র রাখা সম্বন্ধে তাঁহার অদ্ভুত শৃঙ্খলা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। নানা শ্রেণীর রাশি রাশি কাগজ এত পরিষ্কার রাখিতে পারিতেন যে দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্র প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র বাহির করা যাইত। নিজের জমিদারীর দলীল দস্তাবেজ এবং তৎসংক্রান্ত খরচপত্র এবং সাংসারিক জমাখরচের হিসাবপত্র কিরূপ যত্ন ও শৃঙ্খলার সহিত রাখাইতেন তাহার নিদর্শন আমরা আজিও দেখিয়া বিস্মিত হই। নিজের বিষয় ব্যতীত তাঁহাকে অনেকের বিষয় দেখিতে হইত, অনেককে পরামর্শ দিতে হইত। বন্ধুবর্গের মধ্যে মৌলবী আবদুল আলী প্রভৃতি কেহ কেহ তাঁহার উপর অনেক নির্ভর করিতেন। তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীবর্গ নানা জটিল বিষয় লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। এজমালী বিষয়, তাহার কাগজ পত্র, মোকদ্দমার তদ্বির, দেনা পাওনা ও খরচের হিসাব সব তাঁহাকেই রাখাইতে হইত। এতদ্ব্যতীত জীবনে অনেকগুলি বিধবার সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মোকদ্দমা রুজু করা, তাহার তদ্বির, তাহার খরচ পত্র, দেনা পাওনার হিসাব এবং প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখা সবই তাঁহাকে করিতে হইত। তিনি যে কেবল ভার প্রাপ্ত হইয়া কিম্বা অনুরুদ্ধ হইয়াই এই সব কাজ করিতেন তাহাও নহে। চক্ষের সম্মুখে কাজ পড়িলেই তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন।

কর্ম্মজীবন।

এ সম্বন্ধে একখানি মাত্র পত্র উদ্ধৃত করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। চিঠি খানি সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজা ব্রজসুন্দরকে লিখিয়াছেন :—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ শিবাজ্ঞাদোঃ—

আপনার মঙ্গল বাঞ্ছাতে অত্রানন্দ বিশেষ। বহুদিবস যাবৎ আপনার মঙ্গল সংবাদ জ্ঞাত নহি, ইহা অতীব চিন্তাকর বিষয় কারণ মানব চিত্তের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে সততই আত্মীয় ব্যক্তির মঙ্গল কামনা ও তদ্দর্শনে প্রমোদিত হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে সত্বর সেই মঙ্গল সংবাদামৃত পানে সফল মনোরথ হইতে পারি তাহার বিহিত করিয়া বাধিত করিবেন।

ঢাকাস্থ মোক্তারের পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে আপনার প্রযত্ন ও সহায়তায় আমরা জয়লাভ করিয়াছি। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ প্রকৃত আত্মীয় ব্যক্তি, সমক্ষে কি পরোক্ষে, সকল সময়েই হিতসাধনে বৃত থাকেন। আপনি এই বাক্যের যথার্থ উপমেয় কারণ আপনা হইতে অপরের উপকারে ব্যাপৃত হওয়া অল্প ব্যক্তি হইতেই ঘটিয়া থাকে। সময়ে সময়ে আমার মোক্তারকে এইরূপ উপদেশ দ্বারা কার্য্য করাইলে পরম উপকৃত হইব। * *

আমরা শারীরিক কুশলে আছি। সতত আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জানাইয়া পরিতোষ করিবেন।

১২৮২। আঃ
১৬ই শ্রাবণ। শ্রীরাজকৃষ্ণ সিংহ

সে সময়ে এখনকার মত এত ব্যাঙ্কের ছড়াছড়িও ছিল না এবং সাধারণ লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতেও ভয় পাইত। অনেকেই তাঁহার নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিত। সেই সব টাকার হিসাব রাখিতে হইত এবং তাঁহাদের আদেশ মত যে নানা স্থানে সেই সব টাকা প্রেরণ করিতেন

তাহার নিদর্শনগুলি এখনও রহিয়াছে। তাঁহার জমাখরচের বহীতে নানা লোকের নানা রকম বরাতগুলি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সে সব বরাতের জটিলতা দেখিয়া আমাদের পড়িতে বিরক্ত বোধ হয়। এত তহবিল, এত হিসাব পত্র, এত বরাত অনেকের নিকটে হিসাবে ভুল হওয়া অনিবার্য্য হইত। কিন্তু তাঁহার বহীতে এক পয়সার অবধি পরিষ্কার হিসাব রহিয়াছে। এই সকল কাগজ পত্র পৃথক্ পৃথক্ আলমারিতে ভিন্ন ভিন্ন তাকে কিম্বা খোপে টিকিট মারিয়া অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিতেন। গচ্ছিত টাকা এবং অন্যের ও নিজের মোকদ্দমা সম্বন্ধে নানা রকম খরচ পত্রের খুঁটি নাটি এমন পরিষ্কার করিয়া লেখাইতেন যে দৃষ্টি মাত্রেই বুঝিতে পারা যায়। কর্ম্মচারীদের দপ্তর খানার কাগজ পত্রও যাহাতে উপযুক্তরূপ পরিষ্কার থাকে তাহাও দেখিতেন। এখনও তাঁহার সুশৃঙ্খল কার্য্য প্রণালীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই সব খাতাপত্র আছে। পূর্ব্ব পুরুষদিগের আমলের অতি সামান্য, অতি পুরাতন কাগজ যাহার কোন মূল্য নাই তাহাও কত যত্নে রক্ষা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতেন। ব্রজসুন্দরের কাগজ পত্র সম্বন্ধে এত যত্ন ছিল যে জীবনে সামান্য একখানি কাগজও কখন হারান নাই। এখনও তাঁহার পুরাতন চিঠি পত্র যাহা আছে তাহার প্রত্যেকটীর উপর কোন্ তারিখে হস্তগত এবং কোন্ তারিখে প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহা লিখিত আছে।

রাত্রি জাগরণ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ :—দিনের বেলায় ব্রজসুন্দরের নিকট এত জনসমাগম হইত যে তাঁহাকে রাত্রি জাগরণ করিয়া সমুদায় কার্য্য শেষ করিতে হইত। দীনবন্ধু মৌলিক প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুগণ এই প্রকার অবিশ্রান্ত জনসমাগমে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কার্ড দ্বারা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিতেন কিন্তু ব্রজসুন্দর এই নিয়মের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন; তিনি বলিতেন "লোকে দেখা করিতে আসিবে, দুটা কথা কহিবে, কিম্বা কাহারও কিঞ্চিৎ উপকারে আসিব তাহার পথও বন্ধ করিয়া দিব, তাহা কখনই হইতে পারে না।" দ্বারদেশে

তাঁহার দ্বারবান বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিত, কাহাকেও গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিত না। বন্ধুরা বলিতেন তোমার ঐ সাক্ষীগোপাল দ্বারবান কি কাজ করে? ব্রজসুন্দর হাসিয়া বলিতেন "আগন্তুক এবং ভিখারী তাড়াইবার জন্য ওকে রাখি নাই।"

ব্রজসুন্দরের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিত, যে ইচ্ছা করিত অবাধে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। অনেকে তাঁহার উপর যথার্থই উপদ্রব করিত। তাঁহার বহুমূল্য সময় এবং দেহের শক্তি কতই বৃথা ব্যয় হইত, সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি রাত্রি জাগিয়া কাজ করিবার অভ্যাস করিয়াছিলেন। গভীর রজনীই তাঁহার গাঢ় পরিশ্রমের সময় ছিল। লোকজন বিদায় হইয়া গেলে, প্রথমে তিনি কিছু কাল পাঠ করিতেন, তৎপরে কর্ম্মচারিগণের তলব পড়িত এবং দিনের রাশিকৃত ডাক খুলিতেন। পোষ্টমাষ্টারের ন্যায় দেখিতে দেখিতে চিঠি সব বিভাগ করিয়া ফেলিতেন, নিজের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের চিঠি বামহস্তের নিকট রাখিতেন, অন্যান্য চিঠি পত্র যে যে কর্ম্মচারীকে দিতে হইবে দিতেন। ইহার পর কাজ করিতে বসিতেন। তাঁহার দেওয়ান কালীকমল ভদ্রের নিকট শুনিয়াছি যে ব্রজসুন্দরের একটী বিশেষ শক্তি দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইতেন, তাহা এই যে ব্রজসুন্দর নিজেও কাজ করিতেন আর ৩। ৪ জনকে কি কি লিখিতে হইবে বলিয়া যাইতেন। ব্রজসুন্দর প্রায় এই প্রকারে অর্দ্ধ-রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিতেন, তাঁহার রাত্রের আহার করিতে প্রায় ১টা বাজিত। সকলে আহারাদি শেষ করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকিত তখনও ব্রজসুন্দর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। অন্তঃপুরের চুল্লীতে জল ফুটিতে থাকিত। আহার করিবেন আদেশ পাইলেই দুটী চাউল তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইত। যে সকল কর্ম্মচারী যে দিন তাঁহার সহিত কাজ করিতেন তাহাদের অন্ন প্রায়ই জুটিত না কারণ অত রাত্রি পর্য্যন্ত বহির্বাটীর পাচক ও ভৃত্যবর্গ কেহই জাগিয়া থাকিত না এবং কর্ম্মচারীবর্গের জন্য পরিবেশিত অন্ন প্রায়ই

বিড়ালের ভাগ্যে যাইত। লোকের উপদ্রবে ব্রজসুন্দর এই নিয়মে কার্য্য করিতেন। পত্নী ব্রহ্মময়ী সময় সময় হাসিয়া বলিতেন "এ সংসারে আসিয়া আর কিছুই দেখিলাম না, কেবল লোকই দেখিলাম। ভোরে চক্ষু মেলিয়া লোক দেখি, রাত্রে যখন শুইতে যাই তখনও দেখিয়া যাই লোক।" "বিশ্রাম বিমুখ" এই উপাধি যদি কাহারও প্রতি সেকালে প্রয়োগ করিতে হইত তাহা হইলে সে ব্যক্তি ব্রজসুন্দর মিত্র।

নির্ভীকতা ও স্বাধীন চিত্ততা ঃ—ব্রজসুন্দর যেমন একদিকে বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন, অপর দিকে দৃঢ়তা ও স্বাধীনচিত্ততা তাঁহার চরিত্রের বিশেষগুণ ছিল। সাধারণ ভাবে দেখিলে তাঁহাকে মাতার চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত বলিয়া মনে হইত। কিন্তু স্থল বিশেষে তাঁহাকে মাতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। কোনও প্রকার অন্যায় দেখিলে তিনি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া কখনও থাকিতে পারিতেন না। এমন কি উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের কোন আদেশ, ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ না হইলে, ব্রজসুন্দর তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন করাইতেন। ঢাকা রিভিউ পত্রিকাতে আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। "Throughly independent character" বলিয়া উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী তাঁহার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহাতেই তাহা প্রকাশ পায়। তাঁহার উপরের কোনও রাজকর্ম্মচারী কোনও অবিচার করিলে তিনি উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে জানাইতেন, তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান করিতেন। তিনি এবং বাবু অভয়াকুমার দত্ত একবার শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কোন বিষয়ে উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে কিরূপ ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ও তাহাতে ঢাকার লোক কিরূপ স্তম্ভিত হইয়াছিল সে কথা এখনও কেহ কেহ বলেন। আমরা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক কিছু লিখিতে পারিলাম না। দুই একটী গল্প যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই দেওয়া গেল।

কর্ম্মজীবন।

আমরা দারজিলিংএর ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট ইহা শুনিয়াছি, বর্ত্তমান বাকল্যাণ্ড (Buckland) সাহেবের পিতা কিংবা পিতামহ যখন ঢাকার কমিশনর হইয়া যান তখন কোন কর্ম্মোপলক্ষে ব্রজসুন্দর একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। সাহেবের চাপরাসী সম্মুখস্থ একখানী নোটিসের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ব্রজসুন্দর পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে লেখা রহিয়াছে যে দেশীয় কোনও ভদ্রলোক সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তিনি আর দেখা করিলেন না, ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কেহ পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর ফিরিয়া আসাতে ঢাকায় বেশ হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার পর বাকল্যাণ্ড সাহেব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এই নোটিস প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা—ঢাকার কমিশনার কক্‌রেল্‌ (Cockrell) সাহেবের পত্নী ব্রজসুন্দরের কন্যাদিগকে ইংরাজী ও সেলাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার অন্তঃপুরে যাইতেন। কিছু দিন পরে তিনি নিজে সর্ব্বদা না গিয়া জেনানা মিশনের একজন মহিলার উপর সে ভার অর্পণ করেন এবং নিজে কেবল মাঝে মাঝে গিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। উক্ত মহিলাটী ইংরাজি শিক্ষা এবং সেলাই শিল্পের দিকে তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া, বাইবেল পড়াইবার দিকে অধিক মনোযোগ দিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রজসুন্দরের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পড়াইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ব্রজসুন্দর তখন ঢাকায় ছিলেন না, কর্ম্মোপলক্ষে ময়মনসিংহ গমন করিয়া ছিলেন। এই ঘটনাতে কক্‌রেল্‌ সাহেবের পত্নী আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করিলেন, কক্‌রেল্‌ সাহেবও বিশেষ বিরক্ত হইলেন। ঢাকার সাহেব মহলে ইহা লইয়া বেশ একটু আন্দোলন হইল এবং কমিশনার

ব্রজসুন্দরের উপর বিরক্ত হইয়াছেন ইহাও রাষ্ট্র হইয়া গেল। ব্রজসুন্দরের ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর অন্যান্য সাহেবগণ ব্রজসুন্দরকে ককরেল্ সাহেবের পত্নীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রজসুন্দর তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন কন্যার এই কার্য্যের জন্য তুমি দুঃখিত হইয়াছ অন্ততঃ একথা বলিয়া গোলমাল চুকাইয়া ফেল। ব্রজসুন্দর বলিলেন "আমার মেয়ে উচিত কাজই করিয়াছে ইহাতে আমি দুঃখিত হইয়াছি একথা কি করিয়া বলি।" তিনি কিছুই করিলেন না। ইহাতে ককরেল্ সাহেব বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তরে বদলী করিবার জন্য বোর্ডে লিখিলেন। বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের ইচ্ছানুসারে ককরেল্ সাহেবের অনুরোধ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

ব্রজসুন্দর কিরূপ নিষ্ঠার সহিত রাজকার্য্য করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। তাঁহার ন্যায় পরিশ্রমী ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি সংসারে বড় বিরল। আপনাকে বাঁচাইয়া তিনি একদিনও চলেন নাই বরং অতিরিক্ত শ্রম করিয়া আয়ু ক্ষয় করিয়াছেন। দেহ মনের শক্তির যে একটী সীমা আছে তাহা তিনি বিস্মৃত হইতেন। হৃদয় যতটা চায় দেহকে ততটা করিতেই হইবে এই তাঁর ধারণা ছিল। এ সম্বন্ধে কখন কোন বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করেন নাই সুতরাং তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনে যে এত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ব্রজসুন্দরের কর্ম্ম-জীবন আমরা এখানে শেষ করিতেছি।

সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা।

তিমিরাচ্ছন্ন দেশে মহাত্মা রাজা রামমোহন জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুলি তুলিয়া যখন আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন এবং আমরা যে অমৃতের পুত্র তাহা আবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তখনকার ভারতবর্ষ ও আজিকার ভারতবর্ষে কত প্রভেদ ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। গভীর সুষুপ্তির অবসানে তখন জাতীয় প্রাণ আবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং দিগে দিগে আপনার অস্তিত্বের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইংলণ্ডে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে বঙ্গের দুই অংশে দুইজন ধার্ম্মিক পুরুষ তাঁহার বাহিত পতাকা নবভাবে বহন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের একজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্য ব্যক্তি মহাত্মা ব্রজসুন্দর মিত্র। উভয়ে প্রায় একই সময়ে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন এবং দেশ ও পারিপার্শ্বিক নানাবিধ বৈষম্য সত্বেও উভয়ের মধ্যে ঐক্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ তাঁহারা পরে পরস্পরের বন্ধুও হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও প্রসারই স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের জীবনের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার নিকট বিবিধ ঋণে ঋণী কিন্তু ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদাতা পিতা রূপে গভীর শ্রদ্ধা দান না করিয়া কখনই থাকিতে পারেন না। বঙ্গদেশে সত্যধর্ম্মের অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে না হইতেই যিনি সেই অগ্নি প্রাণে ধারণ করিয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন, যে পূর্ব্ববঙ্গ-ব্রাহ্মসমাজের সহায়তায় আজ ব্রাহ্মসমাজ কত উজ্জ্বল রত্ন, কত সাধু মহাত্মাদিগকে নিজ অঙ্কে স্থান দিয়া সবল হইয়াছেন, সেই পূর্ব্ববঙ্গ-ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, সেই সকল সাধুসজ্জনদিগের ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক, প্রাতঃস্মর-

ণীয় ব্রজসুন্দর মিত্রকে পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য দেশসেবকগণ বিস্মৃত হইলেও ব্রাহ্মগণ কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন না। তাঁহার নাম ও জীবনের সহিত পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এমনি ভাবে বিজড়িত যে ব্রজসুন্দর মিত্রের নাম উল্লেখ না করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ আরম্ভই হইতে পারে না। Hunter সাহেব যে Statistical History of Bengal (Dacca District) লিখিয়াছেন তাহাতেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব।—ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে অবলম্বন করিয়াই যেমন পশ্চিমবঙ্গের অনেকের প্রতিভা ও আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিস্ফুরণ হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সাধু অঘোরনাথ ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ ব্যতীত পরলোক গত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরচন্দ্র বসু, দীননাথ সেন প্রভৃতির জীবনও পূর্ব্ববঙ্গ-ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রজসুন্দরের সংস্পর্শেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরী যে একদিন দ্বিতীয় নবদ্বীপের ন্যায় ভক্তি আন্দোলনে টলমল হইয়াছিল এবং সাহিত্যচর্চ্চার একটী প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এই কর্ম্মবীর ধর্ম্মপ্রাণ ব্রজসুন্দরের অপরাজিত চিত্তের আজীবন যত্ন ও চেষ্টার ফল। তাঁহার গৃহ পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় যাবতীয় শুভ অনুষ্ঠানের জন্মভূমি বলিলে বোধ হয় একটুও অত্যুক্তি হয় না।

ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন :—কি প্রকারে কোন্ সময়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার আস্থা শিথিল হইয়াছিল তাহার বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। ব্রজসুন্দরের প্রপিতামহ দেবীপ্রসাদ একজন সাধক ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ গোবিন্দপ্রসাদের চরিত্রেও গভীর ধর্ম্মভাব দেখা যায়। দৈবদুর্বিপাকে তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তিনি পৈত্রিক বিষয়ের আয় স্বয়ং সম্ভোগ না করিয়া পূর্ব্ববৎ সমারোহে দেবসেবায় ব্যয় করিতেন এবং পৈত্রিক আমলের সঞ্চিত

মোহর বিক্রয় করিয়া কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন। পিতা ভবানীপ্রসাদ যদিও অল্প বয়সেই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুত্র এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বামী বলিয়াই জানা যায়। জননী কাশীশ্বরী অতি নিষ্ঠাবতী ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। সুতরাং ব্রজসুন্দর যে ধর্ম্মপ্রাণ হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বাল্যকালে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে জন্মাবধি বিপুল সমারোহে দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনার ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া আসিয়াছেন। গৃহ-দেবতা গোপীজনবল্লভকে বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে গোপীজনবল্লভ মিত্র পরিবারের অতি প্রাচীন দেবতা, স্মরণাতীত কাল হইতে মিত্রদিগের গৃহে পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। ভক্তগণের বিপুল আয়োজনের পরমান্ন ভোগে, প্রজাগণের ও দেশবাসিগণের মানসিক হরির লুঠে এবং বৎসরে ২৭টী যাত্রোৎসবে গৃহদেবতার প্রাঙ্গণে নিত্য উৎসব লাগিয়াই থাকিত। এই গৃহদেবতার প্রতি তিনি শৈশবে এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে কোথাও গমন করিতে হইলে অগ্রে ইহাকে প্রণাম করিতেন এবং বিদেশ হইতে আসিলে সর্ব্বাগ্রে ইহাকে প্রণাম করিয়া পরে জননীকে প্রণাম করিতেন। গৃহদেবতার চরণামৃত অতি ভক্তিভরে পান করিতেন এবং পান করিবার সময় এতদূর সাবধান হইতেন যেন তাহার এক ফোঁটা ও তাঁহার পদ স্পর্শ না করে।

বাল্যকাল হইতেই ব্রজসুন্দরের হৃদয় অত্যন্ত ভক্তিপ্রবণ ছিল। তিনি বাল্যকালে রামায়ণ মহাভারত শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। শৈশবে লেখাপড়া শিখিবার জন্য ঢাকায় অবস্থানকালে ব্রজসুন্দর একদিন শুনিতে পাইলেন বানিয়াজুড়ীতে মহাভারতের কথকতা হইবে, অমনি ব্যাকুল হইয়া সেই কথকতা শুনিবার জন্য তিন দিনের রাস্তা হাঁটিয়া বানিয়াজুড়ী গমন করিলেন। একবার ঢাকায় বলরাম পোদ্দারের বাটীতে কলিকাতার এক ব্যক্তি রামায়ণ পাঠ করিয়াছিলেন। কলিকাতা

বাসীর সুমিষ্ট কণ্ঠে রামায়ণ শুনিবার জন্য প্রত্যহ রাত্রিতে অন্ধকারে নলগোলা হইতে বাঙ্গালাবাজার যাইতেন।

ব্রজসুন্দর সঙ্গীত শুনিতেও বড় ভালবাসিতেন। তিনি যে সুমিষ্ট ও ভাবপূর্ণ সঙ্গীত দ্বারা পরবর্ত্তীজীবনে সকলকে মুগ্ধ করিতে এবং তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বাল্যকালেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস লব কুশের ন্যায় পরস্পরের গলা ধরিয়া রামপ্রসাদী মাল্‌সী গাহিতেন, সকলে মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিত। মহিলাগণ পর্য্যন্ত গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া তাঁহার সঙ্গীত শুনিবার জন্য ছুটিতেন ও শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

কি প্রকারে কোন্ সময়ে তাঁহার হৃদয়ে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ-ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা জানা না গেলেও তাঁহার বাল্যজীবনে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা শ্রুত হওয়া যায়।

ব্রজসুন্দর যখন অল্পবয়স্ক বালক তখন দীননাথ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শীতলচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন পারিবারিক নিয়মানুসারে তাঁহাকে দীক্ষিত করিবার জন্য গুরু আগমন করিলে মন্ত্র দেওয়ার দিন স্থির হইল। পূর্ব্বদিন অতিরিক্ত ভোজনের ফলে গুরুদেবের বোধ হয় উদরপীড়া উপস্থিত হইয়াছিল। গুরু, পাকা শৌচাগারের নিয়ম না জানায় রাত্রিতে শৌচাগার নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। পরদিন এই বিষয় লইয়া বিষম গোলমাল উপস্থিত হইলে শীতলচন্দ্র বলিলেন যিনি "শৌচাগারের পথ পর্য্যন্ত জানেন না তিনি কি প্রকারে আমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেন?" তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, আর মন্ত্র গ্রহণ করা হইল না। এই ঘটনায় ঘোষ পরিবারে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু এই ঘটনার মধ্য দিয়াই ব্রজসুন্দরের হৃদয়ে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছিল কিনা তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে এই সূত্রে তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মুসলমানধর্ম্মের প্রভাব:—ব্রজসুন্দর পাঠ্যাবস্থায়ই একেশ্বরবাদ

সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলে । তিনি শৈশবেই মুসলমান মৌলবী-দিগের নিকট পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ আরবী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন কেননা তাঁহার পারসী পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে আরবী পুস্তকও দেখা যায়। তিনি মুসলমান বালকদিগের সহিত একত্রে ও একবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং অনেকের সহিত আজীবন বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মুসলমান প্রধান ঢাকা নগরীতে অবস্থানকালে "ঈশ্বর এক" এই কথা তিনি অনেকবার শুনিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া ব্রজসুন্দর প্রথমতঃ একেশ্বরবাদের দিকে আকৃষ্ট হন তাহার বিবরণ জানিবার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার "স্মৃতিপুস্তক" আছে বটে কিন্তু তাহাতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।

আমরা বয়োবৃদ্ধ নববিধান প্রচারক বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়কে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে "আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা একদিনও তাঁহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি নাই—আমাদের মনে কোন প্রশ্নই আসে নাই; আমরা তাঁহাকে স্বয়ংলব্ধ ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়াই মনে করিতাম।"

কলিকাতা বাস আনুমানিক অন্যতম কারণঃ—তবে এই বিষয়ে আমরা অনুমান করিতে পারি যে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় ছিলেন। তিনি যখন কলিকাতায় পদার্পণ করেন তাহার পূর্ব্বেই রামমোহন রায় ইংলণ্ডে পরলোক গমন করেন। রামমোহন রায় ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতায় যে ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিলাত যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সেই আন্দোলন প্রশমিত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য কলিকাতায় তখন এক তুমুল সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ব্রজসুন্দরের ন্যায় উৎসাহী এবং অনুসন্ধিৎসু যুবক যে কলিকাতায় আসিয়া কেবল গৃহকোণে বসিয়াই দিন কাটাইতেন ইহা

কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি যখন কলিকাতা পরিত্যাগ করেন ঠিক সেই সময়ে তাঁহার সমবয়স্ক অক্ষয়কুমার দত্ত (জন্ম ১৮২০) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (জন্ম ১৮২০) এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম ১৮১৭) প্রভৃতি কতিপয় যুবক তত্ববোধিনী সভা (১৮৩৮ সনে স্থাপিত) স্থাপন করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর তখন কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেও এই সকল বিষয় যে তাঁহার কর্ণে একেবারেই প্রবেশ করে নাই ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে তাঁহার কলিকাতা বাস কালে ইঁহাদের কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। পরে ইঁহাদের সকলের সহিতই তিনি প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু একথাও ঠিক যে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহার কলিকাতায় অসিবার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। যাহা হউক পরস্পরের জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে দেবেন্দ্রনাথ ২৬ বৎসর বয়সে ১৯ জন ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে (১২৫০ ৭ই পৌষ) প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ব্রজসুন্দরও ২৬ বৎসর বয়সে বন্ধু চতুষ্টয় লইয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে (১২৫৩. ২৩ অগ্রহায়ণ) ঢাকাতে প্রথম ব্রহ্মোপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ঃ—এই দিন ব্রজসুন্দর নিজ ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—

"Dacca Brahmo Somaj was first established on the 23rd of Agrahayan, 1253 B. S. at my *basha* at Kumartooly, and the persons who had chief hands in it were Babus Jadab Chandra Bose, Ram Kumar Bose, Bishambar Das and Chandra Kishore Majumdar (afterwords found to be a great * * *), Of course I also had something to do with it."

এইরূপে ১৮৪৬ সনের ২৩শে অগ্রহায়ণ তিনি কুমারটুলীর বাসায় বন্ধু চতুষ্টয়ের সহিত ভক্তিসহকারে ভগবানের কৃপা স্মরণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করেন। ঢাকাতে এখন যেখানে

মুনসেফি আদালত অবস্থিত তাহার পশ্চিম-দক্ষিণাংশে শাঁখারি বাজার প্রবেশের মুখে, রাস্তার উত্তর পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র দোতালা বাড়ীতে তখন ব্রজসুন্দরের বাসাবাটী ছিল। এই বাড়ীতেই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ প্রথম জন্মগ্রহণ করে। অতি সংগোপনে তখন যে ক্ষুদ্র অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা আজ সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। ২৩শে অগ্রহায়ণের পর সপ্তাহে অর্থাৎ ২৯শে অগ্রহায়ণ আর একবার এই বাটীতেই সমাজের কার্য্য হইয়াছিল কিন্তু ইহার পর আর হইতে পারে নাই। এই ২৯শে অগ্রহায়ণ ব্রজসুন্দর তাঁহার বন্ধুবর্গ ও সহরস্থ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্র পাইয়া বহুলোক সভা দেখিতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু এই ঘটনার পরেই তৎকালীন হিন্দুসমাজের নেতৃগণ এবং সহরের লোক ইহার এত বিরুদ্ধাচারণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে ইঁহারা আর প্রকাশ্যে উপাসনা কার্য্য করিতে পারিলেন না এবং উপাসনার জন্য নিয়মিত কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইতেও সাহসী হন নাই। কোন দিন যাদব বাবুর বাটীতে, কোন দিন ব্রজসুন্দরের বাটীতে কোনও দিন বা বাবু বিশ্বম্ভর দাসের বাটীতে সমাজের কার্য্য হইতে লাগিল। লোকে পূর্ব্বে জানিতে পারিলেই নানা উপায়ে ইঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিত। তখন ইহাদিগের বয়স ও অধিক ছিল না এবং পদমর্য্যাদাও সামান্য। বিপুল হিন্দুসমাজের পক্ষে ইঁহারা অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে" এ স্থলে কিছু ভ্রম করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই তখন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন না।

ত্রিপলীতে ব্রাহ্মসমাজ—এইরূপে ইঁহারা প্রকাশ্যে সভা আহ্বান করিতে সাহসী না হইয়া বারম্বার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রজসুন্দর এরূপভাবে আর অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রাণে যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন, প্রাণের ভয়ে কিম্বা নির্য্যাতনের ভয়ে আর তাহা লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। এইরূপে তিন মাস

গত হইলে তিনি বিপক্ষীয়দিগের অতর্কিত আক্রমণ হইতে সমবেত উপাসক বৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য অধিকতর নিরাপদ এবং দুরারোহ "ত্রিপলী" নামক বাটীতে সমাজের কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নবাবী আমলের "ত্রিপলী" যিনি দেখিয়াছেন তিনিই ব্রজসুন্দরের এই স্থান নির্ব্বাচন দেখিয়া প্রশংসা করিবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে প্রথম অনুষ্ঠান—প্রকাশ্যে উপাসনা করিতে বল লাভ করিবার জন্য ব্রজসুন্দর বন্ধুদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন যে এবার প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে; প্রাণের ভয়ে আর লুক্কায়িত ভাবে উপাসনা করা হইবে না। ইহাতে বাবু যাদবচন্দ্র বসু ব্যতীত আর সকলেরই মত হইল। ব্রজসুন্দর আর রজনীর অন্ধকারের আশ্রয় না লইয়া দিবা নয় ঘটিকার সময় প্রকাশ্যে বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মানুষ্ঠান।

প্রতিজ্ঞাটী এই:—বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অদ্যাবধি আমাদের কেহ ভবিষ্যতে কখনও ঈশ্বর বোধে প্রতিমা পূজা করিব না এবং এই বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব।

ব্রজসুন্দরের স্মৃতি পুস্তকে আছে—

It was on Sunday, the 7th March 1847 at 9 A. M., that I together with Babu Gobindo Chandra Bose of Rajibpur Barasat, Babu Ramkumar Bose of Malkhanagar, Dacca, and Babu Bissembhar Das of Banglabazar, Dacca, embraced the religion taught by the Vedanta by taking an oath to the effect that none of us shall from that day bow down before an idol god or worship it as the Supreme Being; but adore that Being only Who is the Creator of all, Preserver of all and Destroyer of all. Babu Jadob Chandra Bose of Hugly, Babu Brojo Nath Chatterjee of Halisahar,

and Babu Kirtynarain Sarma of Tiperah were present at the time.

Babu Raimohan Roy of Dalbazar did the same thing at his own house at 10 O'clock on the very day where Babus Brojonath Chatterjee and Gobinda Chandra Bose were present.

বঙ্গালা ঃ—

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ রবিবার দিবা ৯ ঘটিকার সময় আমি এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করি। বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু (রাজিবপুর বারাশত), বাবু রামকুমার বসু (মালখানগর ঢাকা), বাবু বিশ্বম্ভর দাস (বাঙ্গালাবাজার ঢাকা)। হুগলীর বাবু যাদবচন্দ্র বসু, হালিসহরের ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ত্রিপুরার কীর্ত্তিনারায়ণ শর্ম্মা, এই তিন ব্যক্তি তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই কার্য্য বাবু যাদবচন্দ্র বসুর বাটীতে হইয়াছিল। ঐ দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় ডালবাজারের বাবু রাইমোহন রায়ও তাঁহার নিজ বাটীতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু এবং বাবু ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমক্ষে উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। ইহার পর হইতে "ত্রিপলীতে" নির্ব্বিবাদে সমাজের কার্য্য হইতে লাগিল। বিশ্বাসী এবং মনোনীত ব্যক্তিদিগকে লইয়া কার্য্য হওয়ায় উপাসনার সময় আর বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইত না।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় ব্রজসুন্দরের পত্র—১৮৪৭ সনের শেষভাগে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ব্রজসুন্দর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

"বাক্য মনের অগোচর একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা এই ঘোর অন্ধকারাবৃত দেশে প্রচলনের নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের বিষয় উল্লেখ করিতে হইলেই শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বসু, রামকুকার বসু, গোবিন্দচন্দ্র বসু, বিশ্বম্ভর দাস প্রভৃতি মহাশয়গণকে অতি আহ্লাদের সহিত স্মরণ করিতে হয়। ১৭৩৮ শকের ২৩শে অগ্রহায়ণ এই সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমার বাটীতে যে বৈঠক হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মহাশয়গণ

অতি উৎসাহের সহিত উপস্থিত হইয়া প্রকাশ্যরূপে সভা স্থাপন বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। তাহার পর সপ্তাহে অর্থাৎ ২৯শে অগ্রহায়ণ পুনরায় আমার বাটীতে উক্ত উপাসনা সভা হয়। তাহাতে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি প্রফুল্লচিত্তে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য দর্শন করেন। ঐ দিবস এরূপ সমারোহ পূর্ব্বক সভা আরম্ভ হইয়াছিল যে নগরের যে সকল ব্যক্তি সভা দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা সমাজ গৃহে স্থানাভাব বশতঃ দণ্ডায়মান ছিলেন এবং কেহ বা দণ্ডায়মান হইবার স্থানও না পাইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই সমাজ স্থাপনের মূল অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় সমুদয় লোক অজ্ঞানতা বশতঃ যেরূপ নানা কুকর্ম্মে রত আছেন তাঁহারা জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্ম সাধন দ্বারা সদাচারী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়েন এবং ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিগণ এতদ্দেশের স্থানে স্থানে যেরূপ বিধর্ম্মের জাল বিস্তার করিয়াছেন তাহাতে কেহ জড়িত হইয়া না পড়েন।

অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে এই ঢাকা নগরীতে ধনী ও মানী বলিয়া যাঁহারা বিখ্যাত তাঁহারা অজ্ঞানতা বশতঃ সভার এই পরম মঙ্গল অভিপ্রায় অনুধাবন করিতে না পারিয়া সমাজের উন্নতিপক্ষে সাহায্য করা দূরে থাকুক বরং যে সকল ব্যক্তি সভা সন্দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রচারিত মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করিয়া সমাজের এই সকল পদস্থ বক্তিগণ কায়মনোবাক্যে এই সভার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, সভ্যগণ পিতামাতা আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক তাড়িত হইতে লাগিলেন এবং সমাজের নিকটে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে লাগিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভাধ্যক্ষকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে সভার এইরূপ দুরবস্থার সময় তাঁহারা ইহার উন্নতির জন্য সময়ে সময়ে নানা পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও বিশেষ ধন্যবাদ যে তিনি এতন্নগরে আগমন করিয়া এখানকার ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকদিগকে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সদভিপ্রায় এবং নানা প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দান করিয়া ছিলেন।

সুখের বিষয় সভ্যগণ নানা যন্ত্রণা, নানা অপমান সহ্য করিয়াও ক্লিষ্ট না হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। বিপক্ষগণের ভয়ে তাঁহারা কিছুকাল প্রকাশ্যে সভা আহ্বান করিতে অক্ষম হইয়া ছিলেন। বাবু যাদবচন্দ্র বসু ও অন্যান্যের গৃহে গোপনে সমাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকাল হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইত। এই সময়ে সভার পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য মহাশয় সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া সভ্যদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিলেন। ফলতঃ ব্রাহ্মগণের সদাচরণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে ক্রমেই বিপক্ষীয়দিগের আক্রোশের মাত্রা হ্রাস হইতে লাগিল এবং সভ্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

৩০শে ফাল্গুনের পর তাঁহারা পুনর্ব্বার প্রকাশ্যরূপে সভা আহ্বান করিতে সক্ষম হইলেন এবং ইহার প্রথম অবস্থায় প্রকাশ্যে সভা আহ্বান করিলে যেরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল তখন তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইল।

সভার এইরূপ উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া এই দুর্ভাগ্য ধর্ম্মজ্ঞান-বিহীন দেশের প্রতি মহামহিমান্বিত জগদীশ্বরের একান্ত অনুগ্রহ বলিতে হইবে।

চৈত্র মাসে সভার আরও উন্নতির লক্ষণ দৃষ্ট হইল। ব্রাহ্মগণ এবং সভ্যগণ ১লা চৈত্র হইতে নির্ভয়ে প্রকাশ্যরূপে সভা করিতে লাগিলেন। সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নূতন নিয়ম সকল সংস্থাপিত হইল এবং সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রায় সমুদয় সভ্য মাসিক দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সভাতে ব্রহ্মসঙ্গীত করিবার জন্য লোক নিযুক্ত হইল। সভার এইরূপ উত্তম অবস্থায় একজন আচার্য্যের অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাদৃশ উত্তম গুণজ্ঞ সদাচারী ব্রহ্মপরায়ণ শাস্ত্র বেত্তা এতদ্দেশে পাওয়া দুর্ঘট ছিল। এমত সময়ে তাঁহারা রামকুমার বেদপঞ্চানন নামে এক বেদবেত্তা পণ্ডিতকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকেই উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি ১লা চৈত্র নিযুক্ত হইয়া ২১শে

শ্রাবণ অবধি কার্য্য করেন। বেদপঞ্চানন দ্বারা যদিও বেদ উপনিষদ ইত্যাদি নানা গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতে লাগিল কিন্তু উপাচার্য্য বাহ্যে যেরূপ মত সভ্যগণকে দেখাইতেন তদ্রূপ তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার কতিপয় কর্ম্ম দ্বারা সকলে তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং সভার কার্য্যেও তাঁহার তাচ্ছিল্য দর্শনে কিছুদিন সকলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১লা ভাদ্র তাঁহাকে কার্য্য হইতে রহিত করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভাধ্যক্ষকে ব্রহ্মপরায়ণ এবং কায়মনোবাক্যে আগ্রহশীল একজন উপাচার্য্য প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করায় বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা ১লা কার্ত্তিক হইতে সভার কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতেছে। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার সময়ে যে সকল ব্যক্তি ইহার সভ্যগণের প্রতি ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন এখন কালবসে তাঁহাদিগের মধ্যেই কেহ কেহ অবিরোধী হইয়াছেন, কেহ কেহ বা সভ্যদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং কেহ কেহ সমাজ ভুক্ত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন ইহা হইতে আনন্দের বিষয় আর কি আছে।

"ত্রিপলী"তে দুই বৎসরের অধিক কাল সমাজের কার্য্য হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় যখন কলিকাতা নগরে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন তখন যেমন কলিকাতাস্থ হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, ঢাকাতেও এই সমাজ স্থাপনের পর পৌত্তলিক হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে এই যে কলিকাতার জনমণ্ডলী শিক্ষা বিষয়ে সমধিক অগ্রসর থাকায় তাঁহারা ঢাকার জনসাধারণের মত অজ্ঞ এবং কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানবিহীন ছিলেন না। ঢাকাবাসিগণ সমাজের অঙ্কুরিত অবস্থাতেই বিবিধ উপায়ে ইহাকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

তৎকালে হিন্দু সমাজের অগ্রণীদিগের মধ্যে বাবু রাজমোহন রায় (রোয়াইল) রামকিশোর রায়, দীননাথ ঘোষ (ব্রজসুন্দরের আত্মীয়)

বঙ্গচন্দ্র রায় (নাজির) মৃত্যুঞ্জয় মুন্সী, নন্দলাল মুন্সী, রামমণি বসু, রাধামাধব বসু, কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কালীকিঙ্কর রায় প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইহারা সমাজ সংস্থাপকদিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিতে ত্রুটী করেন নাই। ব্রজসুন্দর ও অন্যান্য সমাজসংস্থাপকদিগকে সমাজচ্যুত করিলেন। ব্রজসুন্দরের মাসতুত ভ্রাতা বাবু দীননাথ ঘোষ মহাশয়ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। বিখ্যাত বাবু রামলোচন ঘোষ এই সময়ে ঢাকায় থাকিতেন। তিনি সমাজ সংস্থাপকদিগের সহিত কোনরূপ যোগদান না করিলেও ইহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই। তাঁহার শ্যালক বাবু চন্দ্রকিশোর বসু সমাজ সংস্থাপক-দিগের সহিত যোগ দেওয়াতে তাঁহাকে বাসা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য হিন্দু সমাজের নেতাগণ বাবু রামলোচনকে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি অগ্রণীদিগের এই অন্যায় অনুরোধ রক্ষা না করায় তাঁহারা তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা নিজেরাই প্রকাশ্যে এই সকল সমাজসংস্পৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে নানা উপায়ে নির্য্যাতন ও অপমানিত করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা বাবু চন্দ্রকিশোর বসুকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

ব্রজসুন্দরের প্রতি অত্যাচার—ব্রজসুন্দরই দলের অগ্রণী সুতরাং ইঁহাদিগের আক্রোশ তাঁহার উপরই অধিক মাত্রায় পতিত হইল। তাঁহার সম্বন্ধে ইহারা নানা কু কথা রটনা করিতে লাগিলেন। তিনি রাস্তায় বাহির হইতে পারিতেন না, যখন আফিসে যাইতেন তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় এবং আফিসপ্রাঙ্গণে জনতা হইতে লাগিল। সকলে পরস্পরকে ডাকাডাকি করিয়া বলিত "ছাখ্ ছাখ্ খৃষ্টান ব্যাটা যায়।" তিনি খৃষ্টান (ব্রাহ্ম) হইয়া গোখাদক হইয়াছেন বলিয়া ঘৃণা দেখাইবার জন্য লোকেরা তাঁহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া থু থু ফেলিত। কাহারও গৃহে প্রবেশ করিলে হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হইত। ইহা তৎকালে একটী বিশেষ অপমানের বিষয় ছিল। রাত্রিতে কোথাও

যাওয়া তাঁহার পক্ষে একেবারেই নিরাপদ ছিল না। লোকে তাঁহাকে দেশের পরম শত্রু মনে করিত। তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিলে দেশের পক্ষে মঙ্গল মনে করিয়া তাঁহার পশ্চাতে গুণ্ডাও নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং এমন কি দুই তিনবার গুণ্ডার হস্তে প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সত্যের কি আশ্চর্য্য শক্তি ও ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ কেমন প্রসন্ন ও অবিচলিত চিত্তে এই সকল অপমান লাঞ্ছনা ও বিপদের মধ্যে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ত্রিপলীতে সমাজ উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে দৌরাত্ম্য ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। এই সময়েই তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বের প্রতি লোকের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রজসুন্দর সর্ব্বপ্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা প্রেমের সহিত বহন করিয়াছিলেন; এবং প্রেম দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অপ্রেমকেই পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হিন্দুসমাজে ইংরাজী সভ্যতার প্রতিঘাত --এই সময়ে বঙ্গদেশে এক শ্রেণীর সংস্কারক দলের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল ইঁহারা আহারাদি বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণেই ব্যস্ত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গেও এই শ্রেণীর লোকের অভাব হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সহিত কিম্বা উহার সম সাময়িক কালে ঢাকায় বাবু রামলোচন ঘোষ, রাধিকা-মোহন রায় প্রভৃতি এই প্রকার সংস্কারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রজসুন্দর একাকী এই প্রকার বহির্মুখীন সংস্কার স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার গতি ফিরাইয়া সংস্কার চেষ্টাকে দেশের প্রকৃত মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। এবং তিনি এ বিষয়ে বিশেষ সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় রাজপুরুষদিগেরও অবিদিত ছিল না। একদিকে তাঁহার কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় যেমন দ্রুতগতিতে তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল তেমনি তাঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষণায় এবং দেশের জন্য ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমদ্বারা তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে অসামান্য সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সুবিধা

ছিল বলিয়া তিনি সহজেই পরের উপকার করিতে পারিতেন এবং তাঁহার সৌজন্য, ধর্ম্মভাব ও পরোপকারিতায় তিনি ক্রমে লোকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার কার্য্য-কারিতা শক্তিও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং দেশের সেবায় আপনার প্রাণ মন ঢালিয়া দিতে সমর্থ হইলেন।

ত্রিপলীতে সমাজ উঠিয়া যাওয়ার কয়েক মাস পরে কলিকাতা নিবাসী প্রসিদ্ধ ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র আসিষ্টাণ্ট কমিশনার নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় গমন করেন। তিনি এবং ঢাকা কলেজের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ছাত্র এবং ব্রজসুন্দরের অতি নিকটতম বন্ধু বাবু রামশঙ্কর সেন সমাজে যোগদান করিয়া ইহাকে বলশালী করিলেন। সেকালে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ব্রাহ্মসমাজের দিকে সহানুভূতি দেখা যাইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দুই একটী করিয়া শিক্ষিত লোক ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া সমাজের পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন।

ব্রজসুন্দরের ঢাকাপরিত্যাগ ও ব্রাহ্মসমাজের অবসাদ—ইহার কিছুকাল পরেই ঢাকার আবকারী কমিশনারী উঠিয়া যায়। ব্রজসুন্দর, রামকুমার বসু প্রভৃতি আবকারী কমিশনারীতে কার্য্য করিতেন। কমিশনারী উঠিয়া যাওয়ার পর ব্রজসুন্দর আবকারী ডেপুটী কলেক্টার নিযুক্ত হন এবং তাহার কিছুকাল পরে সার্ভে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া ঢাকা নগর পরিত্যাগ করেন। বাবু রামলোচন ঘোষ সদর আমীন নিযুক্ত হইয়া কুমিল্লানগরে গমন করায় তাঁহার শ্যালক বাবু চন্দ্রকিশোর বসুকেও তাঁহার সহিত ঢাকা পরিত্যাগ করিতে হয়। ব্রজসুন্দর ঢাকা পরিত্যাগ করার পর হইতেই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং শুনা যায় ক্রমে উক্ত সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। ব্রজসুন্দরই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ ছিলেন। অনেকেই তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত বন্ধুতা সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি স্থানান্তর

গমন করায় আর সে প্রভাব রহিল না। যে কয় বৎসর ব্রজসুন্দর বাহিরে ছিলেন সে কয় বৎসর ঢাকা সমাজের পক্ষে বড়ই দুঃসময় গিয়াছে। তিনি যাঁহাদিগের উপর সমাজের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের ব্যবহারে লোকে ব্রাহ্মদিগের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজগৃহে সমাজের বিশেষ কায হইত না অধিকন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের গৃহকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতেন এবং এমন কি, শুনা যায়, তাঁহাদের কেহ কেহ সমাজগৃহে বসিয়া মদ্যপানাদিও করিতেন। এই সময়ের বিশেষ বিবরণ আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন—তাঁহার স্থানান্তর গমনের সহিত ঢাকা সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাইলে কিম্বা নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইলেও এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে কোনও কোনও স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহারা যখন তরুণবয়স্ক যুবক তখন শুনিতেন যে ঢাকায় ব্রজসুন্দর মিত্র নামে একজন ডেপুটী কালেক্টর আছেন, তিনি যখন যেখানে যান সেইখানেই একটী স্কুল ও একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন ও সঙ্গে সঙ্গে একটী ব্রাহ্মসমাজ লইয়া ভ্রমণ করেন। কথাটী কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিতভাবে শ্রুত হইলেও ইহার মধ্যে যে সত্য ছিল না তাহা নহে। ব্রজসুন্দর যে ধর্ম্ম নিজ জীবনে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাহা স্বদেশবাসীদিগকে দিবার জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাঁহার জীবনই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে! কর্ম্মোপলক্ষে তিনি যখন যেখানে যাইতেন শারীরিক মানসিক গুরুতর শ্রমসাধ্য রাজকার্য্যে অহর্নিশ ব্যস্ত থাকিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন।

যখন পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে আবদ্ধ ছিল এবং দুই চারি জন মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন সেই সময় ব্রজসুন্দরের জ্বলন্ত উৎসাহে

সুদূর শ্রীহট্টের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছিল এবং অনেক লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি মফঃস্বল ভ্রমণ কালে তাঁহার তাম্বুতে অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে এবং চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগকে লইয়া নিয়মমত ব্রহ্মোপাসনা করিতেন।

তিনি ঢাকা হইতে প্রথমতঃ ময়মনসিংহে গমন করেন, সেইজন্য ঢাকার পরেই ময়মনসিংহে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তথাকার বহু লোক উদারভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ জমিদারবর্গ যে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এখনও আছে। কারণ ব্রজসুন্দর থাকবস্তার জরিপকার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময়ে প্রত্যেক জমিদারকেই প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সংসর্গে আসিতে হইয়াছিল। কাহার কাহার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠযোগও জন্মিয়া গিয়াছিল। তাঁহার জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহের জমিদার-বর্গের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব কিরূপ বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর, সেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী, গোপীমোহন রায়, মুড়াপাড়ার জমিদার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার জমিদার কেশবচন্দ্র আচার্য্য প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদার গণের জীবন আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে। মুড়াপাড়ার জমিদার বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মই ছিলেন। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন ইতিহাসে তাঁহার নাম পরিচালকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগের দ্বারা ময়মনসিংহে বহু সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ জেলা তখন জ্ঞান ও সভ্যতা সম্বন্ধে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। এই জেলার জমিদারবর্গই তখন প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রসর ছিলেন। ইঁহারাই স্কুল, ব্রাহ্মসমাজ ও বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইতেন এবং সঙ্গীত, সাহিত্যচর্চ্চা এবং জনহিতকর সভা ও পত্রিকা প্রচার করিতেন। ব্রজসুন্দরের সহিত

এই সকল ব্যাপারের যোগ ছিল; তিনি অনেকের উৎসাহদাতা ছিলেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপকদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। যাঁহারা ময়মনসিংহ-ব্রাহ্মসমাজের পরিচালক হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ প্রথমজীবনে তাঁহার আরমানিটোলার ব্রাহ্মসমাজেই শিক্ষিত হইয়াছিলেন। "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস" প্রণেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ময়মনসিংহ-ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন সম্পর্কে ব্রজসুন্দরের নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ব্রজসুন্দরের জীবন ও চেষ্টা যে সেই ভূমি প্রস্তুত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায় হইয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ময়মনসিংহ-ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে যদিও স্থাপিত না হইয়া থাকে, তাঁহার প্রেরণা যে ইহাতে বিদ্যমান ছিল এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কোনও স্থানে ধর্ম্মসমাজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে যে সে স্থানে সেই ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয়, এ বিষয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। জমিদার প্রধান ময়মনসিংহে জমিদারগণ তাঁহার সংস্পর্শে অত্যন্ত উদারভাবাপন্ন হইয়াছিলেন ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ব্রজসুন্দরের ঢাকায় পুনরাগমনঃ—ঢাকায় ব্রজসুন্দরের পুনরাগমনের ঠিক সময় জানা যায় নাই। অনুমান ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ব্রজসুন্দর পুনরায় ঢাকায় আগমন করেন। নালগোলার বর্ত্তমান মিট্‌ফোর্ড হাঁসপাতালের ভূমিতে তাঁহার বাসাবাটী ছিল। সে বাটী এখন আর নাই। তাহা ভূমিসাৎ করিয়া হাঁসপাতালের প্রসার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তিনি ঢাকায় গমন করিয়া পুনরায় নবোৎসাহে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে পাইয়া এবং তাঁহার উৎসাহ উদ্যম দেখিয়া অনেকে আবার ব্রাহ্মসমাজে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সংস্কারক বা ব্রহ্মজ্ঞানীর বিরুদ্ধে সাধারণ হিন্দুগণের যে ভ্রান্ত মত বা বিদ্বেষ ভাব ছিল তাঁহার সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন জীবন দেখিয়া তাহা দূর হইতে লাগিল। সকলে তাঁহাকে এমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন যে

একদিকে যেমন অনেক কৃতবিদ্য উৎসাহী যুবক তাঁহার সহিত যোগ দিলেন তেমনি অনেক প্রাচীন তন্ত্রের লোক ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হইলেন। মানবের ক্ষুদ্রশক্তি ভগবানের করুণা স্পর্শে যেন এক অপূর্ব্ব প্রভাব লাভ করিল, ধনী দরিদ্র সকলেই ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সাজাপুরের জমিদার হৃদয়নাথ রায়ের পুত্র হরনাথ এবং রূপনাথ রায়ের পুত্র প্রিয়নাথ এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতা অতি প্রিয়দর্শন ছিলেন এবং মধুর সঙ্গীত করিতে পারিতেন, তাঁহারাই তখন সমাজের সঙ্গীতের কার্য্য করিতেন। কিন্তু দুই ভ্রাতাই কিছুকাল পরে দারুণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ায় ব্রজসুন্দরের মনস্তাপের সীমা রহিল না।

ব্রাহ্মসমাজ নলগোলায় থাকিতেই বিক্রমপুর নিবাসী হরচন্দ্র বসু, বর্ত্তমান অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষের শ্বশুর বাবু হারাণচন্দ্র সরকার, বাবু নন্দকুমার গুহ, মুড়া পাড়ার জমিদার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দপ্রসাদ রায়, দীননাথ সেন প্রভৃতি বহুলোক সমাজে আগমন করেন। ব্রজসুন্দরের ডায়েরী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এই সময়েও যে তিনি একাদি ক্রমে ঢাকায় অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নয়। ছয় মাস কাল ঢাকার সদরে এবং ছয় মাস মফঃস্বলে থাকিতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতি কালে যাহাতে সমাজের কার্য্যের কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। এই সময়ে ঈশ্বর কৃপায় বহু উৎসাহী লোক সমাজের কার্য্যে আগ্রহশীল হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় বাবু হারাণচন্দ্র সরকার অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য বিস্তর যত্ন করিতেন। হারাণ বাবু সম্পাদকের কার্য্য করিতেন এবং নন্দকুমার গুহ সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী এক জন সুবক্তা ছিলেন, তিনি উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন, হারাণ বাবুও সময় সময় করিতেন।

এই সময়ে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপের প্রতি লোকের বিশ্বাস যতই শিথিল হইতে লাগিল ততই ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকের মনে উদার ভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইতে লাগিল। ইং ১৮৫৬ সনে সুপ্রসিদ্ধ বাবু গুরুপ্রসাদ সেন এবং কতিপয় যুবক ব্রাহ্মসমাজে আগমন করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঢাকায় আগমনঃ—সম্ভবতঃ ১৮৫৯ সনে পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজসুন্দরের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ঢাকায় গমন করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং কোন্নগর নিবাসী পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ও গমন করিয়াছিলেন। মহর্ষি ঢাকায় ২।৩ দিবস অবস্থান করিয়া সমাজের কার্য্য পরিদর্শন ও উপদেশাদি প্রদান করেন। তিনি পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণিকে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য নিযুক্ত করিয়া যান এবং তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মাসিক ১৫৲ টাকা অর্থ সাহার্য্য করেন। আমরা ব্রজসুন্দরের জমা খরচের বহীতে দেখিতে পাই তিনিও মাসিক ১০।১৫ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন, এমন কি তিনি ঢাকা নগর পরিত্যাগ করিয়া গেলেও মধ্যে মধ্যে অর্থ প্রেরণ করিতেন। শিরোমণি মহাশয় বেশীদিন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপচার্য্য ছিলেন না। পরে বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাব চাঁদের প্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ঢাকা হইতে ফিরিবার পথে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে যে পত্র লিখেন তাহা এই—"*

আমি ঢাকায় আসিয়া তোমার পত্র পাইয়া হৃষ্ট হইলাম। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় এখানকার ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ স্বরূপ এবং অতি ভদ্র লোক। ব্রাহ্মসমাজে অনেকগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোক আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র শিরোমণিকে তথায় রাখিয়া আইলাম। শিরোমণি অতি উৎকৃষ্টরূপে উপাসনা প্রণালী পাঠ করিয়া থাকেন এবং

গত দিবসের সমাজেও তদ্রূপ পাঠ করিলেন। যদিও এখানকার সমাজ প্রতি বুধবারে হইয়া থাকে, তথাপি আমি সে পর্য্যন্ত এখানে থাকিলে প্রত্যাগমনের কাল বিলম্ব হয় এজন্য গত দিবসেই এক অতিরেক সমাজ হইয়াছিল। শিরোমণি মহাশয় দ্বারা উপাসনা কার্য্য সমাধা হইলে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বসু এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন সে বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছিল। তাঁহার মনে ঈশ্বরের প্রেমরূপ যে অগ্নি আছে তাহা তাঁহার মুখ হইতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। পূর্ব্ব হইতে হরচন্দ্রের স্বভাবও এখন অনেক ভাল হইয়াছে।

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাবক
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা সস্বগচ্ছতি।

কিন্তু তাঁহার পানদোষ এখনও সম্যকরূপে যায় নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় তাঁহার জন্য বিস্তর আক্ষেপ করিলেন।

আমি হরচন্দ্র বাবুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া তাঁহাকে পানদোষ হইতে আপনার স্বভাবকে নির্মুক্ত করিতে বলিলাম। ইহাতে তিনি আপনার দোষ স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে থাকিতে যত্নবান হইলেন। তাঁহার যদি পানদোষ যায় তবে তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে বিস্তর উপকার হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্রকে এবং হরচন্দ্র বাবুকে তোমার নমস্কার জানাইলাম। আমি এখানে রবিবারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সোমবারে এখানে ব্রাহ্মসমাজ হইল। অদ্য মঙ্গলবার ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে এই পত্র তোমাকে লিখিলাম। সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন যে প্রকারে আমাকে নির্ব্বিঘ্নে ঢাকায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কলিকাতায়ও সেই প্রকার পৌঁছাইয়া দিবেন এবং সংসার সমুদ্র হইতেও উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।”

ব্রজসুন্দরের আরমানী টোলার বাটী ক্রয়ঃ—মহর্ষির ঢাকা পরিত্যাগের কিছুকাল পরেই ১৮৫৯ সনে ব্রজসুন্দর আরমানী টোলায় একটী বৃহৎ বাটী ক্রয় করিলেন। ঢাকা প্রকাশে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা তাহার একাংশ ব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া ছিলেন। পূর্ব্ব-

বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান গৃহ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১২।১৩ বৎসর সমাজের কার্য্য এই বাটীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীহট্টবাস ঃ—১৮৬১ সনে ব্রজসুন্দর পুনরায় ঢাকা হইতে বদলী হইয়া শ্রীহট্টে গমন করেন। শ্রীহট্ট ঢাকা হইতে বহুদূর, রেল ষ্টীমার না থাকাতে যাতায়াতের বিষম অসুবিধা ছিল ও বহু সময় লাগিত। তাহাতে আবার তাঁহাকে সহর হইতে বহুদূরে থাকিতে হইত, সময় সময় সহরে যাইতেন মাত্র।

বিক্রমপুর ও ময়মনসিংহ হইতে যেমন সরকারী কার্য্য ব্যপদেশে সর্ব্বদা ঢাকায় গমনমাগমনের সুবিধা ছিল এ সময়ে তাহা রহিল না। এইরূপে ঢাকার সহিত তাঁহার যোগ ছিন্ন হইয়া গেল। পত্রাদি লিখিয়া বাবু অভয়াকুমার দত্ত ও দীননাথ সেন প্রভৃতি দ্বারা সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু তাঁহার স্থানান্তর গমনে আবার ঢাকা-ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ম্লান হইতে লাগিল। যেন কার্য্যের প্রাণ, সমাজের প্রাণ অন্তর্হিত হইল। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই ব্রজসুন্দরের উপস্থিতিতে ব্রাহ্মসমাজ জাগ্রত হইয়া উঠিত এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ম্লানভাবাপন্ন ও নির্জীব হইয়া যাইত।

ব্রহ্মবিদ্যালয় ঃ—ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের ম্লান অবস্থা ব্রজসুন্দর সুদূরে থাকিয়াও অনুভব করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর বুঝিয়াছিলেন যে বালক ও যুবকগণই দেশের আশা ভরসা। বালক ও যুবকদিগকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই। তিনি ইহাও অনুভব করিয়াছিলেন যে সাধারণ শিক্ষার সহিত নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার বন্দোবস্ত না হইলে প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুবকদের সংশ্রব হওয়াও সম্ভব নয়। ইহা মনে করিয়াই তিনি ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন্ সনে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া কঠিন। খুব সম্ভবতঃ ১৮৫৮ সনে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৬৩

সনে ইহাকে আরও উন্নত ও সুসংস্কৃত করা হয়। এই বিদ্যালয়ে তৎকালে বহু হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ব্রজসুন্দর এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইহার ব্যবহারার্থে তাঁহার আরমানি টোলাস্থ ভবনের নীচের সমুদয় ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং মাসিক ৩০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাঁদা দ্বারাও অনেক টাকা সংগৃহীত হইত। পরে ইহার সহিত আরও কেহ কেহ যুক্ত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য ব্রজসুন্দর গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি পুস্তকে এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—

"Babu Kasikanta Mukerjee Deputy Inspector of Schools, Dacca by his letter dated, Baradi the 5th May, 1863, intimates that the Government of Bengal have sanctioned Rs. 23 at my request for the Brahma Bidyalaya.

এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বিশেষ বিবরণ এই গ্রন্থের "শিক্ষা" অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে। ইহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় শুভযুগের নব উষা দেখা দেয়।

পুরাতন কাগজপত্রে উল্লিখিত কোনও কোনও স্থল দৃষ্টে স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে প্রথমে উপযুক্ত লোকের অভাবেই হউক কিম্বা অন্য কারণেই হউক ইহার কার্য্য ব্রজসুন্দরের ইচ্ছানুরূপ প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তাহাতেই ১৮৬২ সনে তিনি স্কুলের জন্য একজন শিক্ষক ও তত্বাবধায়ক এবং ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের জন্য একজন উপযুক্ত প্রচারক পাঠাইবার নিমিত্ত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে এক পত্র লিখেন। ব্রজসুন্দর তদানীন্তন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু দীননাথ সেনকেও এ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের নিকট পত্র লিখিতে এবং যাহাতে এইরূপ দুইজন উপযুক্ত সুশিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মকে কলিকাতা হইতে ঢাকায় আনয়ন করা হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কলিকাতা হইতে সাধু

অঘোরনাথ গুপ্ত এবং পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১৮৬৩ সনের প্রথম ভাগে ঢাকায় গমন করেন।

ইঁহাদের ঢাকায় গমন সম্বন্ধে ব্রজসুন্দরের ডায়েরাতে লেখা আছে—

"At my request Babu Keshub Chandra Sen Secretary Calcutta Brahmo Somaj sent Babu Aghore Nath Gupta, a staunch Brahmo, to take charge of the Dacca Brahmo School and Pandit Bejoy Kissen Gossain of Santipur, who is also a staunch Brahmo missionary to propagate Brahmoism in East Bengal. Both these gentlemen reached Dacca in the first week of Pous 1271, (1863). Babu Aghorenath took charge of the Brahmo School immediately and Bejoy Kissen came to Comilla on the 10th Pous with his companion Troilokyanath Sannyal and stopped with me till the 1st of Magh and on the night of that date the former started for Dacca. During the time Bejoy Kissen was at Comilla a meeting was held every day and on many occasions twice a day, when Bejoy Kissen gave long lectures on Brahmoism, which made great impressions on the minds of even men of old class about the futileness of Idol worship. His lectures proved a great success even in the Zenana mahals of several gentlemen. After Bejoy Kissen's return to Dacca, he persued the same course and did much good to the people of Dacca. When he delivered lectures there, the Dacca Brahmo Somaj Hall could not accommodate the audience many of whom had to stand outside.

বাঙ্গালা:—আমার পত্র দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কেশববাবু, অঘোরনাথ গুপ্ত এবং পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। অঘোরনাথ আসিবামাত্র ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে সঙ্গে যাইয়া ১০ই পৌষ কুমিল্লায় আগমন

করেন। কুমিল্লায় অবস্থান কালে বিজয়কৃষ্ণ প্রতিদিন একবার, কখন কখনও দিনে দুইবার ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার বক্তৃতা এমন হৃদয়গ্রাহী হইত যে প্রাচীন তন্ত্রের লোকেরা পর্য্যন্ত সাকার উপাসনার নিষ্ফলতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় অনেক মহিলাও বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছিলেন। ইহার পর বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় গমন করিয়া সেখানেও ঐরূপ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এত লোক সমাগম হইত যে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ হলে শ্রোতাদিগের স্থান সঙ্কুলন হইত না, অনেকে বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। ✓

সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত:—অঘোরনাথ ঢাকায় গমন করিয়াই ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদে তিনি মোটে ২।৩ বৎসর ছিলেন। যত দিন ছিলেন অতি দক্ষতার সহিত বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। অঘোরনাথের তেমন বক্তৃতা শক্তি ছিল না কিন্তু তথাপি ছাত্রগণের চরিত্র গঠন ও ধর্ম্মবিশ্বাসের উন্নতি সাধন বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই যত্নশীল ছিলেন। অঘোরনাথের চরিত্র প্রভাব যুবকদিগের মধ্যে এক নব-জাগরণের ভাব আনিয়া দিয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় এবং বাবু ভুবন মোহন সেন ইঁহারই প্রভাবে ধর্ম্মবিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টী তৎকালীন ছাত্রবৃন্দের উপর কিরূপ আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা ভাবিলেও অবাক হইতে হয়। ইহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন দেশের উজ্জ্বল রত্ন মধ্যে পরিগণিত। অঘোরনাথই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম প্রধানশিক্ষকের ভার গ্রহণ করেন। বাবু দীননাথ সেন এবং বাবু অনাথবন্ধু মল্লিক উহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। অঘোরনাথের কলিকাতা প্রত্যাগমনের পর বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় এবং বাবু জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। তৎপরে বাবু অনাথবন্ধু মল্লিক ইহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত

হন। মল্লিক মহাশয় তৎকালে একজন উৎসাহী কর্ম্মীছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায়ও অনেক যুবক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীঃ—বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক এবং বলিতে গেলে পূর্ব্ববঙ্গই তাঁহার প্রথম ও প্রধান প্রচার ক্ষেত্র। বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরের নির্দ্দেশমতে কুমিল্লা হইতে প্রথমে ঢাকায় গমন করিয়া বক্তৃতাদি প্রদানপূর্ব্বক সকলকে উৎসাহিত ও মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য সহরে গমন করিয়া এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই সময় হইতেই পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মধর্ম্মান্দোলনের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইয়া পড়িল।

অঘোরনাথও ঢাকায় অবস্থান কালে ব্রজসুন্দরের আনুকুল্যে স্কুলের অবকাশ সময়ে বিজয়কৃষ্ণের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে (কুমিল্লা, নওয়াখালি, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি) গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য এখনকার প্রচার যাত্রা ও তখনকার প্রচার যাত্রায় আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল। তখন দেশে রাস্তা ঘাট না থাকায় এবং ঐ সকল প্রদেশ গভীর জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় হস্তী আরোহণ ব্যতিরেকে যথা তথা গমনাগমন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। সাধারণ লোকের কোথাও যাইতে হইলে প্রাণটী হস্তে করিয়া যাইতে হইত। কিন্তু ইঁহারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া, নানা বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া এবং শারীরিক বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সমূহের ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতেন এবং নরনারীর দ্বারে দ্বারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এইরূপে দুই তিন বার পথিমধ্যে হিংস্র জন্তুর হস্তে তাঁহাদের প্রাণ যাইতে যাইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তাঁহাদের প্রচার-কাহিনী এখন শুনিলে গল্প বলিয়া মনে হয়। আহারের কোন স্থিরতা ছিল না, নগ্নপদে নিজেদের জিনিষপত্র স্কন্ধে বহন করিয়াই এই সকল দুর্গম স্থানে প্রচারার্থ গমন করিতে হইত। অনেক সময়ে অনাহারে দিন কাটাইতে হইত। এই

বিশ্বাসী ভক্তদ্বয় বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগের কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন!

ব্রজসুন্দরের অনুপস্থিতিতে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে যে ম্লানভাব আসিয়াছিল, বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথের প্রভাবে এইরূপে তাহা দূর হইয়া গেল এবং ঢাকাতে পুনরায় এক নব-জাগরণ আনিয়া দিল। বস্তুতঃ এই সময়ে অঘোরনাথের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত এবং বিজয়কৃষ্ণের ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রভাবে পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতাদিগের হৃদয়ে এই সত্যটী দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন যে শুধু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে চলিবে না, বিশ্বাস ও কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকা একান্ত আবশ্যক এবং সকল প্রকার কপটতা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার সঙ্গে কোন যোগ রাখা উচিত নহে। যুবকেরা তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সত্যধর্ম্ম জীবনে পালন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্বাপর ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ভার লইয়া না থাকিলেও অধিকাংশ সময়ই তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সংস্পৃষ্ট থাকিয়া পূর্ব্ববঙ্গের সেবা করিয়াছেন। কখন কখনও কলিকাতা, শান্তিপুর, মুঙ্গের ও বাঘআঁচড়ায় গমন করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ কিছুকাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বাঙ্গলা বিভাগে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিবার বাসনা এত প্রবল ছিল যে পার্থিব সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া জীবনের প্রথম হইতেই স্বদেশবাসীদিগের নিকট পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ধর্ম্মকে জীবনে এমন ভাবে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে তিনি যখন বিজয়কৃষ্ণের সহিত একত্রে বাস করিতেন, ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতে করিতে এক এক দিন সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত। একদিন বিজয়কৃষ্ণ ছাদে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে

বলিয়াছিলেন, যে "যদি কেহ বলে এই ছাদ হইতে পড়িলে ধর্ম্মলাভ হয় তবে এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে লাফ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি।"

বিজয়কৃষ্ণের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। অর্থের অভাবে পাছে তাঁহার স্থায় সাধু ও উন্নতচরিত্র ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে না পারেন তজ্জন্য ব্রজসুন্দর চিরদিনই তাঁহার সাংসারিক অভাব মোচনে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে আজীবন নিয়মিত মাসিক ২০৲ টাকা সাহায্য করিতেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার পরিবারের রোগ শোক এবং অন্যান্য দুঃখ দুর্দ্দিনে সর্ব্বদাই তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন; যখন যে অভাব উপস্থিত হইত অমনি তাহা মোচন করিতেন।

মুঙ্গেরের ভক্তি আন্দোলন উপলক্ষ্যে বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গিগণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্বাধীনভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে কৃতসংকল্প হইলেন, সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি আর প্রচার ফাণ্ড হইতে সাহায্য গ্রহণ করিবেন না এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের একটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার জন্য ব্রজসুন্দরকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

আমি কাহারও সাহায্য না লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে অভিলাষ করিয়াছি এজন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে মাসিক যে সাহায্য পাইতাম তাহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ধর্ম্মের কার্য্য করিয়া অর্থগ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মের জন্য যদি অন্নাভাবে শুষ্ক হইয়া মরিতে হয়, তজ্জন্য কি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিতে হইবে? কখনই নয়। যদিও আমি ধনহীন দরিদ্র কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে, তাঁহার উদার সদাব্রতে কেহই উপবাসী থাকে না।

আমি মনে করিয়াছি যে কোন স্থানে কৃষিকার্য্য করিব এবং সেখানে ডাক্তারি চিকিৎসা করিব, অতএব ঢাকা প্রদেশে এমন কোন স্থান আছে কি না যেখানে আমি অভিমত কার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি ? কোন মনুষ্যের অধীনতায় থাকিতে পারিব না। কারণ সময়ে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভ্রমণ করিতে হইবে। মহাশয় বহুদর্শী, আমাকে সৎপরামর্শ দিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবার উপায় বিধান করিতে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

১৭৮৭ শক, ১৫ই ভাদ্র,
শান্তিপুর। } শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ইহার পর বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরের পরামর্শানুসারে ঢাকাতে চিকিৎসা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং প্রধানতঃ ব্রজসুন্দরের অর্থ দ্বারা ঢাকায় একটী ক্ষুদ্র ঔষধালয় স্থাপন করিয়া ঢাকাবাসিগণের দেহ, মন ও আত্মার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিক বিজয়কৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরের যোগ মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় শোভন হইয়াছিল, পরস্পরে পরস্পরকে পাইয়া যেন কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। ইঁহাদিগের সাধু জীবন এবং জীবন্ত ধর্ম্মভাব পত্রের পংক্তিতে পংক্তিতে প্রকাশিত হইয়া হৃদয়কে আনন্দে আপ্লুত করে। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই এখন মৃত্যুর যবনিকার পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, তথাপি কি আশ্চর্য্য, অদ্যাবধি তাঁহাদের অমৃতময় পত্র সকল পাঠকদিগকে ধর্ম্মভাবের মধুর আস্বাদ দিতেছে। আর দেখিতেছি যে ব্রজসুন্দর মিত্র এই রত্নমালার বন্ধনগ্রন্থি, তিনি সকলের সুখ

দুঃখের সমভাগী, সকলের উৎসাহদাতা এবং বিপদে সাহায্যদাতা ; তিনি অর্থে সামর্থ্যে সকলেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ প্রভৃতির যে কয়েকখানি পত্র অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৭৮৭—২৩ শ্রাবণ।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ ১১ই আগষ্ট)

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

আপনি শান্তিপুরে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি আমাদের পীড়া এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, এবার বড় কষ্ট পাইলাম।

"বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামে আর একটী পৃথক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতেছে ইহাতে ঢাকা প্রদেশ হইতে অর্থ সাহায্যের অত্যন্ত প্রয়োজন।

এক দিবস আপনি আমাকে কহিতেছিলেন যে, ট্রাষ্টি দ্বারা যখন ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনতা বিলোপ হইতে লাগিল তখন একটা পৃথক সমাজ হইবে। এত দিনে সেই কথা সফল হইল, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনার বহুদর্শিতা আমাকে স্তব্ধ করিয়াছে। ঈশ্বর আপনার অভিজ্ঞতাকে দিন দিন বর্দ্ধিত করুণ। গোবিন্দ ভায়ার কর্ম্মের জন্য কলিকাতায় চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি কর্ম্ম খালি না থাকা প্রযুক্ত গোবিন্দ বসিয়া আছেন। বোধ হয় শীঘ্র কর্ম্ম হইবে। মান্যবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসু, শ্যামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপ্রসাদ ঘটক মহাশয়দিগকে অধমের শত শত নমস্কার জানাইবেন।

বশম্বদ
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৭৮৭ শক—১লা ভাদ্র।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)
শান্তিপুর।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

গোবিন্দ বাবু তাঁহার ভগ্নীকে লইয়া আসিবার জন্য ঢাকায় গমন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ত্রৈলোক্য বাবু গিয়াছেন। ত্রৈলোক্য বাবু বিষয় কর্ম্মের জন্য ঢাকায় গিয়াছেন এখন আপনার উপরেই নির্ভর। আমার মধ্যে জ্বর হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছি এখনও শরীরে জ্বর আছে, বমন উদ্রেক হইতেছে। অত্যন্ত অরুচি হইয়াছে। যদিও এই জীর্ণ রোগ শীঘ্র আমাকে নাশ করে, তথাপি পরকালেও আপনার মধুময় স্নেহ লাভ করিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পরকালে পুনর্ব্বার সম্মিলন হইবে। আর লিখিতে পারিলাম না।

আপনার স্নেহপাত্র
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বমী।

১৭৮৭ শক—১২ই ভাদ্র।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র পাইবার পূর্ব্বেই আরোগ্য লাভ করিয়াছি, কিন্তু এপিডেমিক্ জ্বর শীঘ্র নিঃশেষ হয় না। তজ্জন্য সন্দেহ যায় নাই। আমার পীড়ার ঔষধ ব্যয় অধিক নহে, বিশেষতঃ এইক্ষণ পীড়া নাই। আপনি আমাকে যে অমূল্য স্নেহ-রত্ন দান করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আমি অন্য দানের অভিলাষী নহি। আপনার অর্থ আমাকে চিরকাল সুখী করিবে না, কিন্তু আপনার স্নেহ দ্বারা চিরকাল সুখ ভোগ করিব। আপনার পত্র পাইলে এবং আপনাকে পত্র লিখিতে আমার যে আনন্দ

হয়, অর্থের সহিত তাহার বিনিময় হয় না। আমি যদি আমার পাষাণ হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেমে বিগলিত করিতে পারি এবং বন্ধুদিগের অমূল্য স্নেহ যত্ন উপভোগ করি তাহা হইলে দারিদ্র্য যন্ত্রণা আমার নিকটেও আসিবে না, তখন ছিন্ন বস্ত্র পট্ট বস্ত্র বোধ হইবে, তৃণশূন্য পর্ণকুটীর রাজপ্রাসাদকে তিরস্কার করিবে। বলিতে কি এই অবস্থাই এই অধমের প্রার্থনীয়। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুণ। আপনার দয়া অনাথদিগকে মাতর ন্যায় লালন পালন করুক ইহাই আমার প্রার্থনা। গোবিন্দ বাবু ও ত্রৈলোক্য বাবু ঢাকায় উপস্থিত হইয়াছেন। ত্রৈলোক্য বাবু ব্রহ্মবিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

গোবিন্দ বাবুর পরিবার আমার বাটীতে আছেন। মান্যবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বাবু, শ্যাম বাবু, হরিপ্রসাদ বাবু মহাশয়দিগকে আমার শত শত নমস্কার জানাইবেন।

কুমিল্লায় ব্রাহ্মধর্ম্মের কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহা লিখিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার এবং আপনার পরিবার বর্গের কুশলবার্ত্তা লিখিয়া সন্তুষ্ট করিবেন।

বিজয়।

১৭৮৭ শক—৩০শে ভাদ্র।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। মহাশয় প্রথমে যে ঢাকায় থাকা ভাল বোধ করিয়াছেন তাহা আমার মতে ভাল বোধ হইতেছে। কিন্তু দেখা কর্ত্তব্য আমার দ্বারা ঢাকার লোকেরা চিকিৎসা করাইতে সম্মত হইবে কি না। আমার বিষয় আমি এই পর্য্যন্ত জানি যে, মেডিকেল কলেজে বাঙ্গালা ক্লাসে যতদূর শিক্ষা হয় তদ্বিষয়ে আমার অপরিপক্কতা নাই। তবে আমার ডিপ্লোমা

নাই, সে জন্য লোকে শ্রদ্ধা না করিতে পারে যাহা হউক আপনি যদ্যপি ঢাকায় থাকা উচিত বোধ করেন সেখানে একটী বাসা স্থির করিয়া রাখিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মই আমার জীবন। যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অসুবিধা হইবে সেখানে আমার থাকা হইবে না। ঔষধাদি ক্রয় ও গমনের জন্য অনুমান ২৫০৲ টাকার প্রয়োজন। ঔষধ বিক্রয় হইলে টাকা পরিশোধ করিব। অতএব আপনি আমাকে টাকা কর্জ্জ দিয়া বাধিত করিবেন। কিছু টাকা নগদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা ঔষধাদির জন্য মহালানবিশ মহাশয়কে বরাত লিখিলেও হইতে পারে। এক্ষণে আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করিবেন। যদিও আত্মীয় স্বজনের নিকট ঋণ চাওয়া নীতি বিরুদ্ধ কিন্তু আপনার নিকট আমি কিছুতেই সঙ্কুচিত নই। পুনর্ব্বার লিখিতেছি বাসাটী যেখানে হউক ভাল হইলেই ভাল। আমরা ভাল আছি। আপনার পরিবার বর্গের কুশল লিখিয়া সন্তুষ্ট করিবেন।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

আমি ঢাকা নগরে থাকাই একান্ত স্থির করিয়াছি। অতএব যাহাতে দুর্গাপূজার পরেই তথায় যাইতে পারি তদ্বিষয়ে মহাশয়ের বিশেষ মনযোগ দিতে হইতেছে। পূর্ব্ব পত্রেও লিখিয়াছি যে ঔষধাদি ক্রয় ও গমনের জন্য অনুমান ২৫০৲ টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুই শত টাকার ঔষধাদি ক্রয় করিতে হইবে, সুতরাং ঐ টাকা কিছুতেই পড়িবার নহে, ঔষধের টাকার ক্ষতি হয় না কিন্তু বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। আমি মহাশয়ের নিকট এই ২৫০৲ টাকা কর্জ্জ করিতেছি। নগদ টাকা পাইলে উত্তম ঔষধ সস্তা দরে পাওয়া যাইবে। মহালানবিশ মহাশয়ের নিকট বরাত দিলে মূল্যের আধিক্য হইবে, সুতরাং ইহাতে কম মুনফা হইবে। অতএব নগদ টাকা দিলে অত্যন্ত উপকার হয়।

যদি নিতান্ত পক্ষে নগদ টাকা দিতে না পারেন অগত্যা মহালানবিশ মহাশয়ের নিকট ঔষধের বরাত দিবেন। অধুনা মহাশয় যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই হইবে।

বোধ হয় এই ২৫০৲ টাকা কর্জ্জ চাওয়াতে কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা হইল। কি করি আমার ইচ্ছা কিছুতেই আপনার নিকটে সঙ্কুচিত হইতে চাহিতেছে না, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার হৃদয়ের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিবেন। যদি আমাকে কর্জ্জ দেওয়া আপনার আন্তরিক অভিপ্রায় ও কর্ত্তব্য জ্ঞান হয় তবে পূজার মধ্যেই অথবা অব্যবহিত পরেই তাহা প্রেরণ করিবেন, নতুবা নিরস্ত হইবেন। আমি ব্যবসাদার নহি ইহাই যেন আপনার দৃঢ় প্রতীতি থাকে। যদি ঢাকায় থাকা উচিত বোধ করেন তবে এই কনিষ্ঠ উদ্ধত ভ্রাতার জন্য একটী ভাল বাসা স্থির করিয়া রাখিবেন নতুবা পরিবারদিগের তিরস্কার আপনাকেই সহ্য করিতে হইবে। যাহা হউক যাহাতে পূজার পরই ঢাকায় যাইতে পারি তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া এই অধম ভ্রাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া বাধিত করিবেন। পত্র পাঠ মাত্র উত্তর দিবেন আমি ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিব।

১৭৮৭ শক—১লা আশ্বিন,
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)
শান্তিপুর। } বশম্বদ—শ্রীবিজয়

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

আপনার ৪ঠা আশ্বিনের স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। মহালানবিশ মহাশয়কে একখানি পৃথক পত্র লিখিলে ভাল হয়, অতএব যাহা বিবেচনা হয় করিবেন। দুর্গাপূজার পরই ঢাকায় যাইতে মানস করিয়াছি। সপরিবারে ঢাকায় যাইতে অনুমান ৫০৲

টাকা ব্যয় হইতে পারে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ঋণ দিলে অত্যন্ত বাধিত হইব। আপনার ঢাকার বাসায় কতকগুলি কুসংস্কারী ভ্রাতা* বাস করেন, সেখানে পরিবার রাখা যদি আপনার মত হয় তাহাতে আমার আপত্তি কি? তবে একটী পৃথক বাসা আবশ্যক হইবে। ঢাকায় সেল্‌ফ ও আল্‌মারী পাওয়া যাইবে কি না তাহা লিখিবেন। এখান হইতে উক্ত দ্রব্যগুলি লইয়া গেলে ব্যায়াধিক্য হইতে পারে।

আপনি "বুড়া পাগল" নহেন, আপনি ব্রাহ্মদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং প্রধান বল। আপনি যেরূপ পাগল আমি তাহা জানিয়াছি। "ও ভাই ক্ষেপার ভাবে ভাব কত শত, তা বুঝে * * বাহিরেতে কত ভাব প্রকাশিলে এক এক ভাব ভাবুক বুঝে সেই ভাব অন্যে বুঝে কত শত।" আমি বুঝিতে পারিতেছি যে এই গীতটী আপনি না পাইলে তৃপ্ত হইতেছেন না, আচ্ছা দেখা যাবে। এটী পাগলা হরদেবের (বৃদ্ধ ব্রাহ্ম) গান।

যাহাতে শীঘ্র ঢাকা প্রদেশে যাইতে পারি তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিয়া বাধিত করিবেন।

১৭৮৭ শাক—১০ই আশ্বিন।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)

আপনার
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

* ব্রজসুন্দরের কর্ম্মচারিগণ

১৭৮৭ শক—১৪ই আশ্বিন।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

আপনার ৮ই আশ্বিনের স্নেহময় পত্রখানি পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন মহাশয় সম্প্রতি ঢাকায় পরিবার লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহার মতে স্থায়ী হইলে পরিবার লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। মহাশয়েরও যদি এই প্রকার মত উত্তম বোধ হয় তবে ৫০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে না। ২০৲ টাকার প্রয়োজন

হইবে। দীননাথ বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা মন্দ বোধ হইতেছে না। কিন্তু অনাথাদিগকে কোথায় রাখিব তাহাই চিন্তা করিতেছি। যাহা হউক যদি ঢাকায় পরিবার এই সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত বোধ করেন তবে কলিকাতার ট্রেজরিতে আমার নামে ৫০৲ টাকা মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইবেন। শান্তিপুরে রেজেষ্ট্রী করিয়া আমার নামে পত্র দিবেন তাহা হইলে কোন গোলযোগ হইবে না। যদি পরিবার লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য বোধ করেন তবে সম্প্রতি আপনার ঢাকার বাসা ঠিক করিয়া রাখিবেন, যেন অনায়াসে উপস্থিত হইতে পারি। আপনাকে যত ভালবাসি তত অধিক লিখি। ইহাতো মানব প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। আমরা এক প্রকার ভাল আছি, আপনার মঙ্গলবার্ত্তা লিখিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১লা কার্ত্তিক—১৭৮৭ শক।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

মহাশয়ের পত্রসহ মনি অর্ডার পাইয়া Treasury হইতে ৫০৲ লইয়াছি। মহাশয়ের নিকট যে জন্য ৫০৲ লইলাম সম্প্রতি তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। কলিকাতায় পরিবার রাখিয়া একাকী ঢাকায় যাইব। যদি ঢাকায় প্রচার কার্য্য ও অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হয় এবং স্থায়ী হইতে পারি, তাহা হইলে ঢাকায় পরিবার লইয়া যাইব। আপনার নিকট টাকা লইয়া যদিও ঢাকায় পরিবার লইয়া যাওয়া হইল না তথাপি অনাথাদিগকে কিছু সাহায্য করিয়া ঢাকায় যাইতে সক্ষম হইতেছি। ঢাকার অবস্থা শুনিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেও সাহসী হইলাম না। যদি রোগী পাওয়া যায় তবে অল্প মাত্র ভিজিট লইয়া প্রিচ্‌ক্রুপ্‌সন দিব। তাহারা ঢাকায় ডিস্‌পেন্‌সারীতে ঔষধ পাইতে পারিবে।

আপনি এই পত্রখানি পাইয়াই অনুগ্রহপূর্ব্বক ঢাকার কোন সম্ভ্রান্ত

হিতৈষী লোকের নিকট পত্র লিখিবেন যেন আমি উপস্থিত হইলে প্রচার ও চিকিৎসার সুবিধা হইতে পারে। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া লিখিবেন যে, চিকিৎসা দ্বারা ধনী ও মান্য হওয়া আমার কিছুমাত্র উদ্দেশ্য নহে, কোনরূপে কষ্টে পরিবার ভরণপোষণ পূর্ব্বক প্রাণ সম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। বোধ হয় আগামী শনিবারে অঘোর ও আমি কলিকাতা হইতে ঢাকা যাত্রা করিব, কেশব বাবু যান কি না সন্দেহ স্থল।

আমার পরিবার কলিকাতায়, গোবিন্দের পরিবার শান্তিপুরে আছেন। এখানে গোবিন্দের কায কর্ম্ম হওয়া কঠিন হইতেছে কারণ গোবিন্দের সার্টিফিকেট নাই, তথাপি ব্রাহ্মভ্রাতারা বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

বিজয়কৃষ্ণ।

১৭৮৭ শক—কার্ত্তিক।
১৮৬৫ খৃঃ অঃ—১১ই নবেম্বর।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

আপনার পত্রখানি পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। দীনবাবু প্রভৃতির পরামর্শে ঢাকায় সম্প্রতি চারিমাস থাকিয়া এখানকার অবস্থা ও আমার ঢাকায় অবস্থিতির বিষয় স্থির করিতে মনস্থ করিয়াছি। তজ্জন্য আমি মহাশয়ের নিকট যাইতে একপ্রকার অক্ষম হইতেছি। যদি আপনার বিশেষ অনুগ্রহবাক্য থাকে তবে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিয়া বাধ্য করিবেন। সম্প্রতি আমরা আপনারই প্রশস্ত ভবনে অথবা মিশন হাউসে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতেছি। আমাদের রন্ধনাদি কার্য্যও দ্বিতল গৃহে, কিছুতেই অসুবিধা নাই কিন্তু ভৃত্যাভাবে রন্ধন করিতে করিতে দিন দিন অসুস্থ হইতেছি। এই যে ভৃত্য না পাওয়া, ঈশ্বরের সমীপে ইহাও একটী ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে পরিগণিত।

বিজয়।

১৭৮৭ শক—১১ই অগ্রহায়ণ।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

অদ্য প্রাতঃকালে কেশববাবু এবং অঘোরনাথ ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ গমন করিলেন। আমি আপনার প্রশস্ত ভবনে একাকী রহিলাম। কিন্তু একাকী নহি যাঁহার সহিত কোন কালেই বিচ্ছেদ হইবে না সেই চিরজীবন সখাই আমার সঙ্গী।

এক্ষণ ঢাকার যে প্রকার অবস্থা তাহাতে কিছুকাল ঢাকায় অবস্থিতি করা নিতান্তই কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। আমি সেই জন্যই ঢাকায় রহিলাম। আপনি পুনঃপুনঃ কুমিল্লায় যাইতে অনুরোধ করিতেছেন কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমার ঔদ্ধত্য বা অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিবেন। আপনার উপরেই আমার যত আব্দার। স্থির চিত্তে সহ্য করিতে হইবে। আমার শেষ নিবেদন এই যে প্রতি সপ্তাহে এক একখানি পত্র লিখিয়া বাধিত করিবেন।

এই পত্রে ত্রৈলোক্যবাবু আমার নমস্কার জানিবেন। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতে বিলম্ব করিবেন না।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৭৮৭ শক—২৪শে অগ্রহায়ণ।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

কেবল মহাশয়ের উৎসাহেই ঢাকানগরে অবস্থিতি করিতে মনস্থ করিয়াছি সুতরাং মধ্যে মধ্যে আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্রাদি না পাইলে নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়। প্রতি সপ্তাহে অন্যূন একখানি পত্র না পাইলে আমার তৃপ্তি হইবে না।

এক্ষণ ঢাকাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব এত ম্লান হইয়াছে কেবল নাম মাত্র শ্রবণ করিতেছি। এখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম এখানকার নিদ্রিত জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। বস্তুতঃ ঢাকাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব নাই বলিলেই হয়। যাহা হউক এই অধম পাপীর হৃদয় ঢাকার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। ঢাকায় অনিত্য শরীর রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক চিকিৎসক আছেন কিন্তু চিরস্থায়ী আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য কাহারই যত্ন নাই। এই ভয়ানক মারীভয়ে একজন বিকারী চিকিৎসকের দ্বারা কি উপকার হইতে পারে? বিশেষতঃ আমাকে অর্থের জন্য অনেক সময় ক্ষেপণ করিতে হইতেছে। এই জন্য অনেক সময় বোধ হইতেছে যে অর্থ উপার্জ্জন এবং ধর্ম্ম প্রচার এক সঙ্গে হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক ঢাকার এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া কিছুকাল ঢাকায় থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

কলিকাতা হইতে ঔষধ আসিয়াছে। এক্ষণ আপনার আলমারীতে সেই ঔষধ রাখিয়াছি। পুস্তকগুলি একটী বাক্সে উত্তমরূপে রাখিয়া দিয়াছি। ঔষধ অল্প অল্প বিক্রয় হইতেছে। * * * * * * * * আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে উত্তেজনা করিতেছি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

কেশব বাবু ময়মনসিংহ গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পৌঁছন সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি জানি না কি বিপদ ঘটিয়াছে। এই পত্রে ত্রৈলোক্যবাবু নমস্কার জানিবেন। ক্ষেত্রনাথ ঢাকায় আসিয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৭৮৭ শক—১লা পৌষ।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আরোগ্য লাভ

করিয়া অন্নাহার করিয়াছেন, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল আছেন, এ অবস্থায় তাঁহার কুমিল্লায় যাওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ যাহাতে তিনি অধিক-কাল সংসারে অবস্থিতি করেন তাহাই প্রার্থনীয়। অতএব এ যাত্রায় তাঁহার কুমিল্লায় গমন করা হইল না এজন্য দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। আমরা সকলেই আপনার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছি, তথাপি ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা যে আপনার স্নেহাশ্রু আমাদের হৃদয়কে অভিষিক্ত করুক। ঢাকা প্রদেশে আপনারই প্রতি আমাদের আশা ভরসা এবং আবদার ও উপদ্রব। আপনার আহ্বান লঙ্ঘন করিতে হৃদয় কাতর হয়। কিন্তু কেশব বাবু কেবল পীড়া বশতঃই আপনার নিকটে যাইতে পারিলেন না। ঈশ্বর করুন যেন আবার শীঘ্রই তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। * *

আমার হস্তে টাকা না থাকা প্রযুক্ত আপনার আলমারী গ্রহণ করিয়াছি। অতএব শীঘ্র অন্য আলমারীর জন্য চেষ্টা করিব। পুস্তকাদি যাহাতে উত্তমরূপে রক্ষিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিব না।

বোধ হয় আমাকে পুনর্ব্বার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে মাসে অন্যূন ৬০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেছি। এত অধিক স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ আমার নিকট বিষতুল্য বোধ হইতেছে। এক্ষণে এক স্থানে বসিয়া প্রাণ সম ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা দর্শন করিতে নিতান্ত অক্ষম হইতেছি। ঔষধ আনাইয়াই বিপদ হইয়াছে। এক্ষণে কোনও সদুপায় আছে কিনা লিখিয়া শান্ত করিবেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৭৮৭ শক—২০শে ডিসেম্বর।
(১৮৬৫ খৃঃ অঃ)

অধমের নিবেদন—

আমি ভিখারীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ব্যবসা করা আমার কার্য্য নহে। আমি পুনর্ব্বার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলাম। বোধহয় অল্প-দিন মধ্যেই আপনার গৃহ শূন্য থাকিবে। ব্রাহ্ম ভ্রাতারা আমার সাহায্য করেন ভালই না করেন তাহাও ভাল। ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিয়াছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমাকে অনেকে অব্যবস্থিতচিত্ত বলিতেছেন ও বলিবেন, অন্তর্য্যামী ঈশ্বর আমাকে স্নেহের সহিত সাহায্য করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পোষণ করুক।

ব্যাকুলচিত্ত
বিজয়কৃষ্ণ।

পুঃ। ৫০৲ পাঠাইবার আর প্রয়োজন নাই।

বিঃ

১৭৮৭ শক—১৮ই পৌষ।
(১৮৬৬ খৃঃ অঃ)
বরিশাল।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রবোধবাক্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিরক্ত হইতে পারে না। আপনাকে আমি হৃদয়ের সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানি, সুতরাং প্রবোধবাক্যের কথা দূরে থাকুক আপনার ভর্ৎসনাতেও যদি বিরক্ত হই তবে নিজকে অপরাধী মনে করিব।

বরিশালে আসিয়া দুর্গামোহন বাবুর বাসায় অবস্থিতি করিতেছি। দুর্গামোহন বাবুর উদারতা ও ভ্রাতৃভাব নিতান্ত অনুকরণীয়। দুর্গা-মোহন বাবু আমাদের প্রধান বল, ঈশ্বর ইহাঁকে দীর্ঘজীবী করুন। দুর্গামোহন বাবুর স্ত্রী অত্যন্ত সরলা, ইঁহার কোন কুসংস্কার নাই; আমাদের সঙ্গে ইনি সমস্বরে উপাসনা করেন। ইঁহাকে দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম।

বরিশালে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার ব্রাহ্মভ্রাতাগণ উৎসাহী। এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। বরিশাল হইতে কুমিল্লা যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

আর ব্রাহ্মধর্ম্মকে কপটতা দ্বারা আচ্ছন্ন দর্শন করিয়া দুঃখিত হইতে পারি না। আমার শরীরের এক এক বিন্দু রক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পোষণ করুক ইহাই আমার প্রার্থনা।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৭৮৭ শক—৩রা মাঘ।
(১৮৬৬ খৃঃ অঃ)

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

গতকল্য নওয়াখালি মদন বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়াছি। মদন বাবুর যত্নে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু প্রায়ই সভ্য হয় না। এখানে পৌত্তলিকদিগেরই অধিক প্রাদুর্ভাব। যাহা হউক নওয়াখালির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ঈশ্বর প্রসাদে অবশ্যই এখানকার মঙ্গল হইবে। এখান হইতে বোধ হয় ৬ই মাঘ চট্টগ্রামে গমন করিব, তথা হইতে কুমিল্লায় যাইব।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৭৮৭ শক—১২ই মাঘ।
(১৮৬৬ খৃঃ অঃ)

সবিনয় নিবেদন—

গত ১০ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভাব কি" এই বিষয়ে প্রায় দু-ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা করিয়াছি। অভয় বাবু, রামকুমার বাবু, উপেন্দ্র বাবু, সোমনাথ বাবু, এরাটুন সাহেব প্রভৃতি প্রায় ৩০০ শতের অধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেককে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। বক্তৃতার পর শ্রবণ করিলাম শ্রোতাদিগের এত শুশ্রূষা-বৃত্তি বলবতী হইয়াছিল যে আর ২ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইলেও বোধ হয় তাহার নিবৃত্তি হইত না। কিন্তু একদিনে সকল সাধ মিটাইলে আর পাওয়া যাইবে না এই দোকানদারী তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।

এখানে আমরা সকলেই ভাল আছি। এই পত্রে শ্যামবাবু, উমাকিশোর বাবু, কালীমোহন বাবু, হরিপ্রসাদ প্রভৃতি বন্ধুগণ আমার সাদর নমস্কার গ্রহণ করুন।

"ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য" নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহার কিয়দংশ মহাশয়ের নিকটে পাঠও করিয়াছি। সেই প্রবন্ধটী মুদ্রিত করিবার জন্য বাঙ্গলাযন্ত্রে প্রদান করিয়াছি। শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন মহাশয় তাহার কাগজ দিতে সম্মত হইয়াছেন। অধুনা মহাশয় মুদ্রাঙ্কন ব্যয়টী দিলে ভাল হয়। এ পুস্তকের সত্ত্ব আমার নহে যাঁহাদিগের ব্যয়দ্বারা পুস্তক প্রকাশিত হইবে তাঁহাদের হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় মহাশয় বলিলেন দীনবন্ধু বাবু এ পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় না লইতে পারেন। অতঃপর মহাশয় যদি দীনবন্ধু বাবুর নিকট পত্র দ্বারা উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করেন তাহা হইলে আপনাকে ঐ ভারটী বহন করিতে হয় না, এই বিষয়ের উত্তর শীঘ্র পাইতে ইচ্ছা করি।

বিজয়

১৭৮৭ শক—১৪ই মাঘ।
(১৮৬৬ খৃঃ অঃ)

সবিনয় নিবেদন—

মহাশয় ৮ই মাঘে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাশয়ের স্নেহে আমি নিতান্তই বাধ্য হইয়াছি। বলিতে কি সময়ে সময়ে মহাশয়কে মনে করিয়া হৃদয় ক্রন্দন পর্য্যন্ত করিয়াছে।

আপনিও যে আমার মত কষ্ট পাইতেছেন তাহা আমি অগ্রেই জানিয়াছি।

মহাশয় ঢাকায় থাকিলে যে কত উপকার হইত তাহা বুঝিতেই পারিতেছি। যদিও দীনবাবু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন তথাপি প্রাচীন দিগকে আনা যাইতেছে না। কিন্তু যে ৩০০। ৩৫০ লোক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উপকার হইয়াছে। শান্তিপুর ও বাগআঁচড়ার পত্র মহাশয় যাহা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। ত্রিপুরাস্থ বন্ধুদিগকে আমার নমস্কার জানাইবেন ইতি—

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৭৮৭ শক—১০ই ফাল্গুন।
(১৮৬৬ খৃঃ অঃ)
ব্রাহ্মণবেড়িয়া।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

ব্রাহ্মণবেড়িয়া আসিয়া প্রীতিলাভ করিলাম এখানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উপাসনার মাধুর্য্য দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলাম। "পরিত্রাণ" 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি' 'উপাসনা' এই তিনটী বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছি। একটী বৃদ্ধ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

আমার বোধ হয় প্রত্যেক স্থানের ব্রাহ্মগণ যদি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ঈশ্বরের পূজা করেন এবং আত্মদোষ দর্শনে কৃতযত্ন হন তবে শীঘ্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়লাভ হইবে। বোধ হয় অদ্যই বরিশালে যাত্রা করিব।

বিজয়কৃষ্ণ।

১৭৮৭ শক—২৯ চৈত্র।
(১৮৬৬ খৃঃ অঃ)
কলিকাতা।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

আপনার পরিবারে উপাসনা কার্য্য নিয়মমত হইতেছে এবং আপনার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে এ সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার পরিবারের দৃষ্টান্তে এবং অর্থের সদ্ব্যবহারে বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হউক, আপনার নিকট বঙ্গদেশ অনেক প্রত্যাশা করিতেছে। বৃদ্ধদিগের মধ্যে আপনি ভিন্ন কেহই আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন না। এজন্য আমরাও আপনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতেছি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

এক্ষণ পদ্মাতে বড় ঝড় তুফান এজন্য কেহ পরিবার লইয়া ঢাকায় যাইতে সক্ষম হইতেছেন না, যাহা হয় জানিতেই পারিবেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৭৮৮ শক—৫ই জ্যৈষ্ঠ
(১৮৬৬ খৃঃ অঃ)
কলিকাতা।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

আলস্য ও পয়সার অনাটন বশতঃ আপনাকে পত্র লিখি নাই তথাপি এবার বেয়ারিং পত্র লিখিতে হইল। আমার স্ত্রীর শরীর অসুস্থ,

রীতিমত ঔষধ ও পথ্য দিলে শীঘ্র সুস্থ হইতে পারিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য এরূপে শরীর নাশও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। কেবল আমার নহে, প্রত্যেক প্রচারক পরিবারেরই এইরূপ দুর্দ্দশা। মরুক সকলে, শুষ্ক হইয়া, অনাহারে, রোগবিকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্য প্রাণত্যাগ করুক তথাপি যেন কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে বিরত না হন এই আমার আন্তরিক বাসনা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ আর বিদ্বেষানল প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না, যাহাতে প্রচার কার্য্যালয় বিলুপ্ত হয় ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় সংকল্প। যাহাতে কেশববাবুর প্রতি সাধারণের ঘৃণা হয় এই জন্য তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া অপবাদ দিতেছেন। কেশববাবু স্বীয় মহত্ত্বানুসারে যিশুখৃষ্টকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন, এই তাঁহার অপরাধ। যদি ব্রাহ্মসমাজে যাজ্ঞবল্ক্য, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতির গুণ কীর্ত্তন হয় তবে খৃষ্টের অপরাধ কি?

ঈশ্বর কেশববাবুকে রক্ষা করুন, আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় তাঁহার অপমান সহ্য করিতে পারে না। যিনি ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ভিখারী হইলেন এক্ষণে অপমানই তাঁহার পুরস্কার। তাঁহারা জানেন না যে খৃষ্ট আদিব্রাহ্ম, তাঁহার জীবন আমাদের আদর্শ।

অনাথনাথ ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের দাঁড়াবার স্থান নাই। ক্রমে ক্রমে সকল বন্ধু বান্ধবই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন; কোন দিন শরীরও ত্যাগ করিবে। ঈশ্বরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হউক যিনি দুঃখীদিগের বন্ধু।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১৮৬৩ খৃঃ অঃ।

নমস্কার নিবেদন—

আমি অগ্রে আপনাকে এক পত্র পাঠাইয়াছি কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাই নাই। আমি সেই পত্রে আমার জীবনের লক্ষ্য ব্যক্ত

করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি সে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না তাহা বলিতে পারিলাম না।

আমি অর্থলুব্ধ হইয়া এখানে আসি নাই কেবল ঈশ্বরের জন্যই এখানে আসিয়াছি। অধ্যাপনা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি অর্থের দাসও নহি বা কোন স্থানের দাসও নহি, আমি ব্রাহ্মধর্ম্মেরই দাস, আমি ঈশ্বরের দাস হইতে চাহি। কিন্তু আমি আপনার ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য যেরূপ উৎসাহ ও চেষ্টা শুনিতে পাই তাহাতে আমার বোধ হয় যে এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে আমরা যদি যথার্থ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করি তাহা হইলে আমরা কৃতকার্য্য হইবই। এখনো আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারি নাই। আমরা যে পরিমাণে সংসারের উপর প্রীতি স্থাপন করিয়াছি যদি ততটুকু ঈশ্বরকে প্রীতি করিতাম তাহা হইলেও আমাদিগের যথেষ্ট হইত। আমাদের মন এত নীচ ও ক্ষুদ্র যে, আমরা নীচ ও ক্ষুদ্র বিষয়েই নিতান্ত আসক্ত এবং যাহা সম্পূর্ণরূপে অপ্রীতিকর তাহাতেই আমরা প্রীতি স্থাপন করিতেছি। হায়! আমাদের কি দুর্গতি আমরা কি ভয়ানক দুরবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছি। নাথ! তুমি যদি আমাদিগকে এ দুরবস্থা হইতে মুক্ত না কর তবে আর আমাদিগের গতি কোথায়? অসাধু তোমারই আশ্রয় লইয়া সাধু হন, অনাথ তোমারই আশ্রয় লইয়া সনাথ হন, দুর্ব্বল তোমারই আশ্রয় লইয়া সবল হন।

ব্রহ্মবিদ্যালয় বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছে ইহার জন্য কতকগুলি নিয়ম করা আবশ্যক। বাস্তবিক ইহার অনেক অভাবও রহিয়াছে সে সকল অভাব বিদূরিত না হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

অদ্যাপি আমার এখানে বাসার কোন স্থির হয় নাই। আপনি অবশ্য অবশ্য শীঘ্র একখানি পত্র পাঠাইয়া এ অধমকে বাধিত করিবেন।

ইতি ১৮ পৌষ। ভৃত্য অঘোরনাথ।

DACCA.
The 26th December, 1864.

Dear Sir,

Through the blessings of the Almighty Father I have arrived safely at Dacca Depending on God alone have I taken the great, noble, and reponsible mission.

When I hear the voice of God within me, that my mission, my ideal, my destiny and my sphere are to propagate God's truth, though I am poor in conscience, poor in mind, poor in heart and in soul, still, I dare say that I have a magnanimous and heavenly might which my Eternal Father has given me and whereby I can comprehend the communion with the Great Infinite and Merciful Mother without which there is nothing to be wished for in this world. This right is my birth-right, and I will endeavour for this right with all my heart and soul.

I have not come as a common teacher to gather money, I am not bound by circumstances or any society, but I am bound in God's truth, and am a servant of Him, Who is the Lord of all. For His sake have I been engaged as a teacher of the Brahma School. Though my knowledge be humble, my power small and my heart impure, yet whatever I know I shall not spare to teach from my sense of duty. Sir, though I have taken this great charge, God, who is the Father of all sinners and help to the helpless, will be with me if I perform my task with good will.

The present system of teaching is defective. I

have decided to introduce a new system and to remove all the wants of the School.

May God be present in our hearts. May He encourage your good will, elevate your enthusiasm, increase your energy. Kindly oblige me by an early reply for which I shall be anxiously waiting.

Your most affectionate and obedient servant,

Aghore Nath Gupta.

---

4. 1. 65.

Dear Sir,

I have received two of your affectionate letters. Your affection encourages me, therefore I have been obliged to reveal my feelings to you.

I know not in what position Dacca now stands.

I think the men of Dacca are very poor in religion and morality. I have received a report that even the educated are addicted to drinking and debauchery. I have been sorry to hear these circumstances and have shuddered to fulfil my object. But I believe that if I seek the good of Dacca, Providence will assist me. This is my positive and spiritual belief.

The present condition of the Brahmo School is not sound and satisfactory and I feel many wants in it. I wish to bring it into the path of progress One hour is rather short for teaching theology and I feel the necessity of increasing the time for religious instructions. Moreover I am desirous of introducing English for a short period to teach the logical standard.

No book has yet been selected for this. I have written to Babu Keshub Chandra Sen about this.

I wish to know the state of Comilla in respect of religion.

I am totally unacquainted with Nundo Kumar Guha and would like to know who he is and what his principles are.

I think that I ought to address you like a son. Please therefore forgive me if I have written anything wrong or unseemly.

At present I am in need of money.

I request you to answer the above questions.

Please tender my best compliments to Bijoy and also to Sanyal mahasaya.

Yours most affectionate,
Aghore Nath Gupta.

৩০।১।৬৫

সাহ্মনয় সম্ভাষণ মিদং—

এ অভাগা কি আপনার স্নেহসম্বলিত ও প্রীতিপূর্ণ পত্রে বঞ্চিত হইল? দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে যে এক প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন সে বন্ধন হইতে কি আমরা কখনও বিযুক্ত হইতে পারি।

আমাদিগের লক্ষ্য অতি মহান্, আমাদিগের কার্য্য অতি গুরুতর, আমাদিগের উপাস্য দেবতা জীবন্তদেবতা।

ব্রাহ্মের আত্মার প্রত্যেক পংক্তি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ ঈশ্বরের জন্য। "ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরসপান" ইহার জন্যই আমাদের জন্ম।

আত্মাতে যিনি সেই অন্তরাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন তিনিই ধন্য তিনিই ধন্য।

এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতেছে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্তভাব প্রদর্শিত না হইবে সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না।

সত্য আর কতদিন প্রচ্ছন্ন থাকিবে ? ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে সকল পাপ, তাপ, ভ্রম, কুসংস্কার একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে তার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি হে "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।"

যদি ব্রাহ্মধর্ম্মকে পালন করিতে গিয়া আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, যদি এই অমূল্য জীবন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়স্কর ও প্রার্থনীয়।

ব্রহ্মবিদ্যালয় একরকম চলিতেছে। আমি বাঙ্গলা বাজারের সভাতে গিয়া তাহাতে একটী আলোচনা, উপদেশ ও চরিত্র সংশোধনের জন্য সভা সংস্থাপন করিয়াছি। ঈশ্বর করুন ইহাদিগের আত্মা যেন অচিরাৎ ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট হয় ও পবিত্র হয়। মধ্যে একদিন দীনবন্ধু বাবুর নিকট গিয়াছিলাম কিন্তু অধিক কথা হয় নাই। এখন এখানে এই কয়েকটী অভাব দেখিতেছি ঃ—প্রথম—চরিত্র বিশুদ্ধির অভাব, দ্বিতীয়—ঈশ্বর-স্পৃহা বলবতী নয়, তৃতীয়—উপাসনার ভাবের সতেজতা নাই, চতুর্থ—ধর্ম্মবলের অভাব ও পঞ্চম—ত্যাগ-স্বীকার নাই।

শীঘ্র একখানি পত্র লিখিয়া বাধিত করিবেন। আমার ভ্রমণেচ্ছা হইয়াছে—কুমিল্লাতে যাইবার ইচ্ছা হয়।

অঘোর।

১৬ই মার্চ্চ—১৮৬৫।

অদ্যাবধি আপনার কোন পত্র পাই নাই—তজ্জন্য আমি লিখিতেছি। এখানকার আর আর বিষয় একরকম মঙ্গল। কেবল আপনার

সমাজ-গৃহটী ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। একখানি বরগা পড়িয়াছে, কতকগুলি ইট পড়িয়াছে এবং ছাদের অনেক স্থান দিয়া জলও পড়ে। যাহাতে শীঘ্র ইহার সংস্কার হয় তাহা করা কর্ত্তব্য।

আর আমার কিছু টাকার আবশ্যক হইয়াছে কারণ এখানে নিয়মিত টাকা বড় পাওয়া যায় না।

* * * * * * * *

ইতি—

শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ত।

ঢাকা—২৭।৩।৬৫।

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যে ১০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন তাহাও প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণ এখানকার মঙ্গল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দান বিষয়ে আপনার মোট ৩০৲ টাকা দেয় আছে। আপনার সমাজ-গৃহটী একপ্রকার সংস্কার হইয়াছে কিন্তু আমার বোধ হয় যে তাহা উহার পক্ষে কিছুই হয় নাই, কারণ সমুদায় স্থান দিয়া জল পড়িত ছাদটী একেবারে পরিবর্ত্তন না করিলে বৃথা অর্থ ব্যয় মনে হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে তাহাতে আবার আমরা সভা ইত্যাদি সংস্থাপন করিয়াছি। বোধ হয় যে শীঘ্রই এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব দৃঢ়তর হইবার সম্ভাবনা। আর সকলেই ভাল—কিছুই অমঙ্গল দেখিতেছি না।

আপনার অঘোর।

৮।৬।৬৫—কুমিল্লা।

মহাশয়—

গত কল্য আমি এখানে আসিয়াছি। পথে নানা প্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরসে মন কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে নিমগ্ন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। বলিতে কি যখন আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম তখন কেবল আমার শরীর আপনাদিগকে ত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু মন কিছুতে ত্যাগ করিতে পারে নাই। পথে যে পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের সহবাস, বিশেষতঃ আপনার আশ্চর্য্য সরলতা আমার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হইয়াছিল ও এখনও রহিয়াছে। এখানে কল্যই এক বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল। বোধ হয় এখানে বিশেষরূপ কার্য্য হইতে পারে। কুমিল্লাস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নমস্কারের তালিকা ঃ—

শ্রীউমাকিশোর বাবু
শ্রীহরিপ্রসাদ বাবু
শ্রীরতনমণি বাবু
শ্রীশ্যামচাঁদ বাবু
শ্রীভারতচন্দ্র বাবু
শ্রীজগদীশ বাবু
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বাবু

শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ত।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া।
১৫।৬।৬৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এখানে বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। আজ অবধি ৫টী বক্তৃতা হইয়াছে। প্রথম দিন "আত্মজ্ঞান" বিষয়ের উপর বলা হইয়াছিল। পরদিন ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়স্থ ছাত্র একত্রিত করিয়া "শিক্ষা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা হইয়াছিল, আবার সন্ধ্যার পর সেরেস্তাদারের বাসায় "ধর্ম্ম কি", "ধর্ম্মই মনুষ্যের প্রকৃতি", "জীবনের লক্ষ্য", "ধর্ম্মই

মনুষ্যের সর্ব্বস্ব” এই সকল বিষয়ের উপর বলা হইয়াছিল। তথায় প্রায় ১৫০।২০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। পরদিন আর এক জনের বাসায় হইয়াছিল। সে দিবসও ঐরূপ লোক হইয়াছিল। সেদিন কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভাবের বিষয় বক্তব্য ছিল। পরদিন বৃষ্টির জন্য বাসাতেই কয়েকজন সমবেত হইয়া উপাসনা করিয়া “ঈশ্বর দর্শন” বিষয়ে আলোচনা করিলাম। পরে আজি তো রবিবার। অদ্য সাম্বৎসরিক সভার আনন্দ ভোগ করা গেল। আজ কেবল পৌত্তলিকতার বিষয় ছিল। আজ গানের দানসাগর হয়ে গেল।

ঈশ্বরের কৃপায় আবার একজন পরিচিত বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাশয়, বলিতে কি বড়ই আনন্দে আছি। ভগবান বাবু বড়ই চমৎকার লোক, তাঁহার সহবাসে অতিশয় সুখে আছি। এখানে অনেকের মধ্যে একটী কেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহা কিরূপ মধুময়! বোধ হয় আর দিন কতক এখানে বাস করিয়া ঢাকায় প্রস্থান করিব।

আপনার অঘোর।

উমাকিশোর বাবু! কোটী ২+৩+৫ খেলাটী স্থগিত হইয়াছে তো? আবার পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হয় নাই তো? ফলারের সংকল্পটী ভাল করে মনে করে রাখবেন নতুবা বড়ই বিভ্রাট।

হরিপ্রসাদ বাবু! এই অভাগারী দুটো শুষ্ক নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

রতনমণি বাবু! আপনার নিকট দুইটী অনুরোধ, উপাসনা ও প্রীতি এই দুটী চাই।

শ্যাম বাবু! দেখা যাবে, আপনি কেমন ইন্‌জিনিয়ার। সেই তাঁহার কাছে ইন্‌জিনিয়ারী পারিলেই প্রমোশন শীঘ্রই হবে। তজ্জন্য চিন্তিত হইবেন না।

আপনাদের সেই অঘোর।

ওঁ

ঢাকা—১৭।৭।৬৫

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

আপনার প্রেরিত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ কাল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র। এখন ব্রাহ্মদিগের কিঞ্চিৎ জীবন্ত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের মধ্যে উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। সম্প্রতি উপাসক সংখ্যা অধিক হওয়াতে সমাজে আর স্থান বা আসনের সমাবেশ হয় না। তাড়িত ব্রাহ্মদিগের নিমিত্ত যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহার আর প্রয়োজন হইতেছে না। ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। প্রাচীনদিগের কাল্পনিক বল আর কত দিন থাকিবে। সম্প্রতি আর একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গিয়াছে। সমাজে আসনের সমাবেশ না হওয়াতে কতকগুলি বেঞ্চ প্রস্তুত করা এবং একটী লাইব্রারী সংস্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। তৎজন্য আমি অনেকের নিকট গিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছি। অভয় বাবু ৩০৲ টাকা সাক্ষর করিয়াছেন। আর আর অনেকে করিতেছেন। আপনাকেও কিছু সাহায্য করিতে হইবে। শুনিলাম কমিশনার অফিসের নিকট রামকুমার বাবুর খানিক জায়গা আছে। আপনি তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য সেই ভূমিটী বিক্রয় করাইতে পারেন তবে বড়ই ভাল হয়।

কেশব বাবু আমাকে এক পত্র লিখিয়াছেন যে “সেখানকার প্রচারের দান সংগ্রহ বিষয় ব্রজসুন্দর বাবুর সহিত পরামর্শ করিবে।” আমি দীন বাবুর সহিতও এই পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছি যে “আপনি ঢাকাস্থ ভ্রাতাদিগকে সম্বোধন করিয়া এক পত্র লিখিবেন এবং আমাকে দান সংগ্রহ করিবার ভার দিবেন।” কেমন আপনার কি ভাল বোধ হয় না ?

কুমিল্লাস্থ ব্রাহ্মদিগকে নমস্কার দিবেন। শ্যাম বাবু বামাবোধিনী পাইয়াছেন কি ?

প্রিয় অঘোর নাথ।

ওঁ

ঢাকা।
২১।৭।৬৫

শ্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

মনুষ্যের সহিত ভ্রাতৃভাব যদি ঈশ্বরের আদেশ হয় তবে ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করা যে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি যে উপায়ে সেই ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দিতে পারেন তাঁহাকে সেইরূপ উপায়েই তাহা করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যে মনুষ্যে আবদ্ধ হইয়া আনন্দ লাভ করাতে যদি ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয় তবে কোন্ ব্যক্তি না তৎসাধনে যত্নবান হইবে?

বোধ হয় আপনি আমার উদ্দেশ্য এখনও বুঝিতে পারেন নাই। শুনিলাম কুমিল্লায় ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে। তৎপদে অবশ্যই একজন স্থাপিত হইবেন। কোনও ব্যক্তির তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা করা সম্বন্ধে বোধ হয় আপনার কোন আপত্তি নাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া স্কুলের সম্পাদককে বলেন তাহা হইলে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারেন। অবশ্য যদি আপনার কৃত-কার্য্য হইবার বিশ্বাস মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকে তবে বোধ হয় আপনার চেষ্টা করার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক নাই।

আমাদের এক সচ্চরিত্র প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ সেন, যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাতে গোলক সেন মহাশয় কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছেন, তিনিই এই পদের আকাঙ্ক্ষী এবং উপযুক্তও বটে। এখানে নানাপ্রকার গোলযোগ বশতঃ ঐ স্থানে যাইতে অভিলাষ করেন। সম্প্রতি ইনি ঢাকায় গ্রেগারী সাহেবের ইংরাজি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকতার পদে অভিষিক্ত আছেন কিন্তু থাকিলে কি হইবে তাহার বিশৃঙ্খলতার জন্য ইহাঁর অর্থ কষ্ট ও বড় কম হইতেছে না। যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ পদটী দেওয়াইতে পারেন তবে ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে একটী বড় উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হয়। অন্ততঃ যদি ঐ পদটী না হয় তবে ৩০৲ টাকার মতন কোন পদ শূন্য থাকিলে তাহারও চেষ্টা দেখার

ক্ষতি কি ? শ্রীনাথ বাবু আপনার নিকট আবেদন পত্র পাঠাইতেছেন। আপনি যদি পারেন তবে সম্পাদকের প্রশংসা-সূচক পত্র (recommendation) সহ ঢাকায় কিংবা কাছাড়ে মার্টিন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

আপনার অঘোর।

ঢাকা।
২৮।৮।৬৫

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

ক্রমাগত আপনার দুই পত্র পাইলাম, কিন্তু তাহার উত্তর দিতে না পারাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা করিবেন। সম্প্রতি ঢাকার অবস্থা তো অতি আহ্লাদজনক। ব্রাহ্মধর্ম্মের দুর্গে ঢাকা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। সমাজে তো লোক সংখ্যা অধিক হইয়াছে, তজ্জন্য বেঞ্চও প্রস্তুত হইতেছে। ফলতঃ এ ঘরে আর লোকের সঙ্কুলন হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্তভাবশূন্য হইয়া মানব প্রকৃতি আর কত দিন সুস্থির থাকিতে পারে ? আপনি এ সময় ঢাকায় উপস্থিত থাকিলে কি আনন্দই অনুভব করিতেন।

আপনি আমাকে কুমিল্লায় যাইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিবে না। কলিকাতায় তো আমাকে একবার শীঘ্রই যাইতে হইবে কারণ সেখানকার গোলমালের বিষয় যাহা দেখা যাইতেছে, তাহার ও প্রচার সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ আবশ্যক।

আপনি রামচরণ চট্টোপাধ্যায় সেরেস্তাদারের নিকট যে টাকা পাঠাইয়াছেন তাহা অদ্যাপি পাই নাই, বোধ হয় শীঘ্রই পাইব। এক দিন তাঁহার বাসায় গিয়াছি কিন্তু দেখা হয় নাই। আমি কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইবেন, কারণ তখন তো আমাকে পথ খরচ করিয়া যাইতে হইবে ? বোধ হয় ব্রাহ্মণ-বেড়িয়ার ভগবান বাবু পূজার সময় আমার সহিত কলিকাতায় যাইবেন।

সম্প্রতি একটি সুখবর দি। মুসলমানদের মধ্যে উর্দ্দু ভাষাতে সভা হইবে এমত প্রস্তাব হইয়াছে। বোধ হয় আগামী রবিবার দিন সভা স্থাপিত হইবে।

ত্রৈলোক্য ও গোবিন্দ বাবু শান্তিপুর হইতে ঢাকায় আসিয়াছেন। ত্রৈলোক্য বাবু ব্রহ্মবিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষকতা করিতেছেন। তিনি পূজার সময় আপনার নিকট যাইতে চাহেন। তাঁহার জন্য একটী কাজ কি যোগাড় করা যায় না? আপনার নিকট কোনও কাজ থাকিলে তাঁহাকে দিলে তো ভাল হয়। তাঁহার এক্ষণে কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।

গোবিন্দ বাবু কি জন্য আসিয়াছেন তাহা বোধ হয় আপনি জানেন না। তিনি কুমিল্লায় আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার দুঃখিনী ভগিনীকে নিয়া যাইবার জন্য আসিবেন। * * * * তিনি এখান হইতে তাঁহার সেই ভগ্নিকে লইয়া যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা সম্মত হইয়াও আবার অসম্মত হইয়াছেন। বোধ হয় সে হতভাগিনীর দুঃখের আর শেষ নাই। *

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যে নিষ্ঠুরেরা বিধবা বিবাহ দিতে চায় না, তাহারা অতি ভয়ঙ্কর দৈত্য। এ সকল কাণ্ড দেখিয়া কেহই যেন দুঃখিনী হতভাগিনী বিধবাদিগের বিবাহ দিতে আর তিলার্দ্ধের জন্যও বিলম্ব না করেন। আমরা একেবারে অবাক হইয়াছি। অদ্য এই পর্য্যন্ত। শীঘ্রই একখানি পত্র দিয়া বাধিত করিবেন।

অঘোর।

ওঁ

ঢাকা।

১২।৯।৬৫

প্রীতি পূর্ণ নমস্কার—

আপনার প্রেরিত মনিঅর্ডার খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি আমাকে পূজার সময় ঢাকা হইতে যাইতে নিষেধ করিতেছেন কিন্তু অদ্য

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এক পত্র পাইলাম। তিনি যেরূপে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আর আমার ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত হয় না।

তিনি লিখিয়াছেন তোমাকে না দেখিলে বোধ হয় আমি আত্মগ্লানিতে মরিব, আমার নিকট সকলই অসার সকলই শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। বলিতে ভয়ানক দুঃখ বোধ হয়, চিঠিখানি অত্যন্ত শোক সূচক।

শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ত।

Dacca,
18—9—65.

Dear Sir,

I received your affectionate letter yesterday after writing to you a letter in which I informed you about my earnestness to go to Calcutta to pay a visit to my elder brother there who has been very much anxious to see me.

I have written to Babu Keshav to come to Dacca by the 15th October for a month and stay here till the reopening of the Schools and Colleges.

I think that Keshav Babu's passage expense should be given by us.

Your subscription for the library should be sent to Calcutta when I write to you because the payment should be made to the bookseller.

English Theological and Philosophical books will be purchased out of the subscription.

Now good by.
Your affectionate,
Aghore Nath.

কলিকাতা।
২২এ জানুয়ারি ১৮৬৬।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনাকে অনেক দিবস পত্রাদি লিখিতে পারি নাই তজ্জন্য বোধ হয় আমার প্রীতি ও অনুরাগের ক্রুটী প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বিপরীত, মনুষ্যের প্রীতি ও সদ্ভাব অন্তরে। কখন কখন আবশ্যক হইলে বাহিরে তাহার কার্য্য হয় নতুবা অন্তরেই তাহার কার্য্য হইতে থাকে। আপনার সদ্‌গুণ ও অকৃত্রিম স্নেহ আমার মনকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আমার বিশ্বাস ইহা অনন্তকাল স্থায়ী। আপনি মনে করিতে পারেন যে আমি এখানকার আমোদে প্রমত্ত হইয়া আপনাদিগকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি বস্তুতঃ তাহা নহে। সমাজের কতকগুলি কার্য্য আমার হস্তে পতিত হওয়াতে আমি বড় অবসর পাই না এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আমার আলস্য ও থাকিতে পারে। এক্ষণে আমি কোন কোন কার্য্যে ব্যস্ত আছি। বোধহয় আপাততঃ বাঘআঁচড়ায় যাইতেছি পরে আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব বাঙ্গালায়ও যাইতে পারি। আমার মনে মনে বড় ইচ্ছা হয় যে কিছুদিন সপরিবারে থাকিয়া ধর্ম্ম প্রচার করি। অর্থাৎ দুই তিন বৎসর। কিন্তু তাহা হইলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা যায়। বিশেষতঃ প্রচার ফণ্ডের যেরূপ অল্প আয় তাহাতে এখানকার দুঃখী ভ্রাতাদিগকে বঞ্চিত করিয়া আমার লইতে ইচ্ছা হয় না। আমি স্বয়ং অসহ্য কষ্ট সহ্য করিতে পারি কিন্তু আমার প্রিয় ভ্রাতাদিগকে কষ্ট দিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বিশেষতঃ ঢাকায় ব্রাহ্মস্কুলকে উপলক্ষ্য ও উপায় করিয়া প্রচারকার্য্য করা আমার মনে লাগে না। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা তাদৃশ দেখা যায় না। এ বিষয়ে আপনার মত চাহি। দীনবাবু আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে আমি আর কি বলিব অতএব শীঘ্র একখানি পত্র দিয়া বাধিত

করিবেন। একটী নূতন সংবাদ দিতেছি—এবার ১১ই মাঘে কলিকাতা ট্রাষ্টী সমাজে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা উভয়ে মিলিয়া উপাসনা করিবেন।

স্নেহাস্পদ শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ত।

মাগুরা (যশোহর)।
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৬৬।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

আপনার সেই এক পত্র পাইয়াছিলাম এবং তাহাতে ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমি এখন সম্মত হইতে পারিলাম না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় বোধ হয় ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, বোধ হয় তিনি শীঘ্রই ঢাকায় উপস্থিত হইবেন। অতএব আপনি এ বিষয় যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নি যদি একবার হৃদয়ে প্রবেশ করে তবে সে আর কখন নির্ব্বাণ হইবার নহে। প্রকৃতরূপে ধর্ম্মের যথার্থ ভাব অন্তরে প্রবিষ্ট না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থিরীকৃত হইবে না। মানুষ আপনার অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিলে পাপ, কপটতা দেখিতে পারে না। বিশ্বাস, প্রীতি উজ্জ্বল না হইলে ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে না। এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা তাহাতে এই বিশ্বাস ও প্রীতির পরীক্ষার সময়। এখন ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ ও ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কেহই এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। যদিও প্রচার কার্য্য এখন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে তথাপি ইহা যে ভয়ানক কঠিন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বল লাভ না করিলে এই কার্য্য সংসাধন করা অতি গুরুতর। যখন আমি ধর্ম্ম-রাজ্যের অভাব দেখি তখন আমার মন কেমন জ্বলিয়া উঠে তাহা আর

বলিতে পারা যায় না। মানুষ সুখাভিলাষ ও সংসারাশক্তির বশীভূত হইয়া ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়। সংসারের জন্য মানুষ সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতেছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য কিছুই ত্যাগ করিতে পারে না। বোধ হয় আগামী শনিবার আমি যশোর যাইতেছি। এক আধখানি পত্র বড় প্রার্থনীয়। প্রিয় ভ্রাতা ত্রৈলোক্য কি করেন? তাঁহাকে আমার নমস্কার।

প্রিয় ভ্রাতা শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ত।

"সত্যমেব জয়তে"

১৮ই জুলাই—১৮৬৬।

শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার—

বহুদিবস আপনার পত্র পাই নাই। আপনার স্নেহ অনেকদিন অনুভব করি নাই। আপনাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের কি ভয়ানক অবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মেরাই ব্রাহ্মদিগকে নিষ্ঠুর রূপে নির্যাতন করিতেছেন। উদারতা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ব তাহা প্রকাশ করিলে লোকে কি অত্যাচার করে? সেদিন কেশববাবু ঈশার প্রতি উদার ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া সাধারণের নিকট খৃষ্টীয়ান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণ, সমগ্র-ধর্ম্ম ও সকল ধর্ম্মের সার সংগ্রহ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মূল, কাল্পনিক সমুদায় ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন ধর্ম্মকে একেবারে অসত্য বলিতে পারেন না এবং কোন সাধুকে ব্রাহ্ম না হইলেও অসাধু বলিতে পারেন না। তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক নীচ কাল্পনিক ভাব প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই, তাহা হইলে ত গোঁড়ামি হইল। খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু নিজ নিজ ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন আর সকলকেই অধার্ম্মিক, নাস্তিক, সত্যভ্রষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, ব্রহ্মেরা কি তাহাই করিবেন?

কেশববাবু যে বিষয় বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা প্রসিদ্ধ থিয়োডর পার্কার (Theodor Parker) অনেকদিন লিখিয়া গিয়াছেন অতএব ইহা কিছু নূতন বিষয় নহে। ঈশা একজন উৎকৃষ্ট সাধু ছিলেন। এদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের কি ভয়ানক আন্দোলন হইতেছে। শত শত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছেন। সত্যের জয় হইবেই হইবে, কে তাহাকে নিবারণ করে। ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতির সময় জগতে এইরূপই নির্য্যাতন হইয়া আসিতেছে সুতরাং তাহা এখন কেনই না ঘটিবে। আমি এখান হইতে দিনাজপুর, তথা হইতে মালদহ যাইব মানস করিয়াছি। ত্রৈলোক্য বাবুকে নমস্কার জানাইবেন। তাঁহার পত্র খানি পাইয়াছি। আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্র একখানি আমি নিতান্তই প্রত্যাশা করি, ইতি বিদায়।

অনুগত
শ্রীঅঘোরনাথ।

পত্রের ঠিকানা

মালদহ, উমাচরণ মুখোপাধ্যায়।
District Post Master এই ঠিকানায় পত্র দিলে পাইতে পারিব।

কলিকাতা।
২০এ আগষ্ট, ১৮৬৭।

সবিনয় নিবেদন—

এক্ষণে কলিকাতায় টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অর্থাভাবে সকল বিষয়ের বিলক্ষণ কষ্ট অনুভূত হইতেছে, অতএব আপনার প্রতিনিধি সভায় দেয় সকল টাকা পাঠাইলে অত্যন্ত উপকার হয়। কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল টাকা প্রাপ্য তাহা পাঠাইলেও ভাল। সেখানকার সমাজ কি প্রকারে চলিতেছে তাহা জানিতে নিতান্ত ইচ্ছা হয়। আপনার কন্যাদি সকলে ভাল আছেন কিনা লিখিবেন। এখানে

অনেকের জ্বর হইয়াছে, প্রায় সকলেই একরকম আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মানার্থ আপনার নিকট সাহায্য নিতান্ত প্রার্থনীয়। এ বিষয় আপনার যাহা অভিমত প্রকাশ করিবেন। এ আপনাদেরই কায। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জমিদার কেহ নাই যে সাহায্য পাইব। অধিকাংশই দরিদ্র। যাহাদের ভাল চাকরি আছে এ বিষয় তাঁহাদের উপরই অনেক নির্ভর করে। ক্ষেত্র ও চন্দ্রশেখর বাবুকে নমস্কার নিবেদন।

অঘোর।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে বাবু ভগবানচন্দ্র বসুর পত্র।

BRAHMANBARIA.

4th February, 1868.

My dear BROJOSUNDER,

Let me congratulate you on the birth of a child to your affectionate daughter and specially on her safe delivery. You must keep the child aud its mother very warm as the least cold would injure their health.

Thank you on your promising to advance Rs. 50 on my account.

I think you are misinformed about the Nazir's brother. I have heard from Ramkoomar and other sources that the Nazir has been suspended "sine die" and is likely to be committed to Fouzdari on a charge of misappropriation of Public money. I know that the Nazir does not scruple to meddle with Government money in his charge but the origination of the present complaint will be imputed to

Ramkoomar, whether he had a hand in the matter or not. At any rate I am sorry for the Nazir. You would not at all like the proceedings of Ramkoomar if you hear them all.

There has been going on a regular *daladalee* in our village—not for the Brahmo somaj, neither for a widow marriage, but for the epicurian pleasure of fowl-eating in public and for worldly fame. Spirited and honest as Ramkoomar is, I do not know what a great amount of good he will be able to do to the cause of Brahmoism if he had directed his attention and zeal to that most important matter. But you know he does not deign to take advice specially from poor and contemptible me.

I have not been able, for several reasons, to attend the exhibition and thereby have the pleasure of seeing you. The principal reason has been bad health from which I have been suffering for the past few days. There is also the inconvenience of travelling, for I am too weak yet to bear the fatigues of a long journey on an elephant.

Thus I do not know when, if ever, it will be possible for me to have an interview with you—a thing for which, if you believe me, I am very eager.

I have not told you that I have been able to get a copy of Newman's. "On the Soul". About a month ago, having seen a list of books consonant with our religion, in an issue of the "Hindu Patriot," I ordered a whole set but the book sellers sent me "Newman" and "Life of Jesus" saying that the other books were already disposed of. I must tell you

that the possession of Newman has made me happy. I have read it over once and found it superexcellent.

The idea that our religion finds a support from several of the wisest men of Christian Europe and Christian America is unspeakably pleading and alluring. Christianity has been torn threadbare in that book.

It appears that not only Newman but numerous other persons of England and France are Brahmos, although they do not call themselves by that name.

You must allow me to say that the "Dacca Prokas Bigyapani" is doing a great deal of good to our country not only by promoting enlightenment but also the cause of true religion, The articles which appear in them now and then are certainly precious. The article in the last number of the "Dacca Prokas" anent "Daily Worship" is a highly practical and instructive one. In my opinion a man cannot be a Brahmo, properly speaking, and cannot enjoy the real pleasures which that religion is apt to confer on humanity, without regular and sincere worship. Our religion is not founded on anything material, gross—a solid book printed and bound—but on an infinitesimally fine and imperceptible—I might say, etheria, hence how can it be possible for one to retain impressions thereof, unless by dint of devotional exercise, considering that the mind of man, as a general rule, has a greater prediliction for the world and its fascinations, for present happiness and enjoyment of the senses, than for matters spiritual and having relation to a future and yet unseen existence, and also because the mind is so

subtle and unsteady as to be able to traverse the whole world in a twinkling of the eye.

For my part (I take a pleasure in revealing my secrets to you) I pray twice a day and have set apart a small room for the purpose in the zenana; but I do not know with what success I do so, for on most occasions I cannot have that great state of mind which is so necassary for sincere worship. I really attribute the fact to my own past sins and perhaps to my not being yet able to shake off all that is impure in me.

I give myself no credit for the little that I have been able to know about Brahmoism, for I spent a large—very large fraction of my life in darkness and ignorance, and am therefore inclined to rebuke myself, and at the same time to take a lenient view of the trespasses of my neighbours; for while a man like myself could be blind to truth for so long a time, having numerous opportunities, within his reach for a knowledge of it, how can I teach others especially those who have had no such opportunities. You must therefore take it in the light of a sinner who is trying his best to repent and know not if that repentance will be acceptable in that High Tribunal, where unequalled Truth and Justice reign.

I agree generally to the opinions expressed by yourself in your long letter. I know that the time for those changes is not come yet. I know that a leap is not prudent, but I also think that the progress of time is dependent on the progress of mind, and that the progress of mind is influenced by nothing as by example; and this example some must show.

At all events it can not be denied that almost all our daily habits with reference to eating aud drinking are diametrically opposed to our belief and to the fundamental principles of universal fraternity—not to say, our proneness to indirectly encourage idolatory ....(ইহার পরের অংশ অর্থাৎ উপসংহার পাওয়া যায় নাই।

১৮৬৩ সনের শেষ ভাগে ব্রজসুন্দরের অন্যতম বন্ধু বাবু গৌরসুন্দর রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ রায় উপবীত ত্যাগ করেন এবং তিনি ও আরও কতিপয় যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ভ্রাতৃসমাজ:—১৮৬৩ সনের শেষ ভাগে হাইকোর্টের উকিল বিক্রমপুর নিবাসী বাবু কালীমোহন দাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু দুর্গামোহন দাস ঢাকায় গমন করেন এবং ব্রজসুন্দরের আরমানি টোলার বাটীতে অবস্থিতি করেন। দুর্গামোহন বাবু পূর্ব্বে পাঠ্যাবস্থায় থাকিতে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কালীমোহন বাবু ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ভ্রাতৃসমাজ (Society of Brothers) নামে একটি সভা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। জাতিভেদ দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর এবং ধর্ম্মসাধনের অন্তরায়, এই শিক্ষা দেওয়াই এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিক্রমপুর বীরতারানিবাসী প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার এবং বারুদি-নিবাসী শিবচন্দ্র নাগ এবং আর একটি যুবক এই সভার প্রথম সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন, কিন্তু শীঘ্রই ইহাদিগের উপর হিন্দু সমাজের উৎপীড়ন আরম্ভ হইল এবং ইহাদিগের মধ্যে একমাত্র প্রসন্নচন্দ্রই শেষ পর্য্যন্ত সত্যপথে স্থির ছিলেন। ইহার পর সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষও এই আরমাণি টোলার সমাজ-গৃহে একদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সঙ্গত সভা—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় প্রথম সঙ্গত সভা স্থাপিত

হয়। আত্মদৃষ্টির বিকাশ, চরিত্রের উন্নতি সাধন, ধর্ম্মভাব জাগ্রত করা এবং বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য পালনই এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে মতামত, আদর্শ ও সাধন প্রণালী বিষয়ে কিছুরই স্থিরতা ছিল না। সকলে সমবেত হইয়া ধর্ম্মমত ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির বিষয় আলোচনা করিতেন এবং যাহা স্থির হইত তাহাই ব্রাহ্মসমাজের মত এবং একান্তকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত ও পরিগৃহীত হইত। পূর্ব্ব রাত্রে যাহা স্থির হইত পরদিবস প্রাতঃকাল হইতে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে ইহাই সকলের ধারণা ছিল। বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে যাইয়া নিত্য নূতন নূতন পরীক্ষা ও সংগ্রাম যুবকবৃন্দের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা ও কঠোর সংগ্রামের মধ্যে যুবকেরা স্থির ধীর হইয়া দুঃখ ও দারিদ্র্যকে মস্তকে বরণ করিয়া লইতেন এবং বীরের ন্যায় কর্ত্তব্যসাধনে ব্রতী হইতেন। বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় এই সভার অগ্রণী ছিলেন। ইঁহাকে ব্রজসুন্দর পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং বঙ্গচন্দ্রও সমুদয় কার্য্যে তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ মতে চলিতেন। সঙ্গতের সভ্যদের জীবনে যখন যে পরীক্ষা উপস্থিত হইত, বাবু বঙ্গচন্দ্র সমুদয়ই ব্রজসুন্দরকে জানাইতেন। যখন তিনি অনুপস্থিত থাকিতেন তখন বঙ্গচন্দ্রের পত্রের উত্তরে উৎসাহ-প্রদ এবং উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়া সঙ্গতের সভ্যদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে বিশেষ সাহায্য করিতেন ও যখন তিনি উপস্থিত থাকিতেন তখন এই সঙ্গতের সভ্যদিগের প্রতি অতিশয় সমাদর দেখাইতেন। বালক ও যুবকগণ ব্রজসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি পরিণত বয়স্ক হইয়াও উন্নতিশীল যুবকদিগের সহায় ছিলেন। এই সঙ্গত সভা সে সময়ে ঢাকার যুবকমণ্ডলীর উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল। ইহারই প্রভাবে যুবকদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। এই সভার কার্য্য এমন উৎসাহের সহিত নির্ব্বাহিত হইত যে অল্পকালের মধ্যেই বহু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, ভুবনমোহন সেন, রজনীকান্ত ঘোষ, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, প্যারীমোহন গুপ্ত, কালীনারায়ণ গুপ্ত, রজনীনাথ রায়, অম্বিকাচরণ সেন, কেদারনাথ রায়, কৈলাশচন্দ্র নন্দী, শশিভূষণ দত্ত, বসন্তকুমার বসু, বরদানাথ হালদার, সারদানাথ হালদার, কালীনারায়ণ রায়, কালীপ্রসন্ন বসু, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডিচরণ সেন, বিহারীলাল সেন, গণেশচন্দ্র ঘোষ, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু যুবক যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা উৎসাহের সহিত এই সঙ্গত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ক্রমে ইঁহাদিগের সহিত ঢাকার মুসলমান সমাজের একটী ভদ্র সন্তান ও যোগদান করেন। তিনিই ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ জালালউদ্দিন মিঞা। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ইনি এবং বহু মুসলমান ছাত্র-অধ্যয়ন করিতেন। জালাল মিঞা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ঢাকার মুসলমানদিগের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বিশ্বাসী জালালমিঞাকে মুসলমান দিগের হস্তে নানাপ্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বহুবিধ নির্য্যাতনের মধ্যেও জালালের ধর্ম্ম-বিশ্বাস মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই। জালাল আর ইহলোকে নাই কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে, তাঁহার শেষ রোগ-শয্যায় ও অন্তিম কালে জলপাইগুড়ির ব্রাহ্মগণ এই ভক্ত-বিশ্বাসীর প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে উদাসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের গৌরবের হানি করিয়াছেন। জালালের মৃত্যুর পর মুসলমানগণ তাঁহার দেহ লইয়া গিয়া আপনাদের ধর্ম্মবিধান অনুসারে কবরস্থ করেন। তাঁহারা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে তাঁহাকে কল্‌মা পড়াইয়া শুদ্ধি সংস্কারের জন্য পীড়া পীড়ি করিয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বাসী জালাল আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে তিল মাত্র বিচলিত হন নাই। মুসলমানদিগের উপরোধ অনুরোধ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সে যাহাহউক সঙ্গতের হিন্দু সভ্যগণ এই মুসলমান ব্রাহ্মের সহিত একত্রে

আহার বিহার করাতে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং অনেককেই এই কারণে হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইল। যাঁহারা অল্পবিশ্বাসী ছিলেন তাঁহারা মিথ্যা আচরণ কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনর্ব্বার হিন্দু সমাজ ভুক্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু নির্য্যাতনের মধ্যে পড়িয়া বিশ্বাসীদলের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বঙ্গচন্দ্র এই দলের অগ্রণী ছিলেন। তিনি সমাজ ও গৃহচ্যুত যুবকদিগকে লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আর্ম্মাণি-টোলার বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সঙ্গতের যাবতীয় কার্য্য এই বাটীতে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। এই সময় মধ্যে মধ্যে বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। যুবকদল নানাপ্রকার নির্য্যাতন ও দারিদ্র্যের নিস্পেষনে ভীত না হইয়া অপূর্ব্ব উৎসাহের সহিত জীবন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সঙ্গত সভার সভ্যদিগের সম্বন্ধে বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল মহাশয় ঢাকা হইতে ব্রজসুন্দরকে যে সকল পত্র লিখিয়া-ছিলেন তাহা হইতে এ স্থলে ২ খানি পত্র উদ্ধৃত হইল।

১৭৮৮ শক।
২৯শে বৈশাখ।

সকৃতজ্ঞচিত্তে অসংখ্য নমস্কার ও বিবিধ বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন মেতৎ—

বালকদিগের যে স্বর্গ-রাজ্যে অধিকার আছে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন একথা অতি আদরনীয়। মহাশয়, অত্রত্য ছাত্রদিগের নির্জ্জন উপাসনা, প্রীতির ভাব দেখিয়া অনেক শিক্ষা পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের উপাসনায় আগ্রহ ও কাতরতা দেখিয়া হৃদয় আনন্দে বিগলিত হইতে থাকে। আপনার পরিশ্রমের ফল অবিরত এই ঢাকা নগরে দেখিতে পাইবেন এবং তজ্জন্য আপনাকে আপনি ধন্য মনে করিবেন ও তজ্জনিত সেই প্রাণের প্রাণ হৃদয়নাথকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে বারম্বার

ধন্যবাদ করিবেন তাহাতে আর বোধ হয় কিছু সংশয় নাই। আপনার নিজের অযোগ্যতা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, অবশ্য নিজের ক্ষুদ্রতা ঈশ্বরের মহান ভাবকে স্মরণ করাইয়া দেয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই কিন্তু মানবের সেই হীন ও মলিন ভাব কয় ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে? এইরূপে নিজেকে যাঁহারা নিয়ত ক্ষুদ্র বিবেচনা করেন তাঁহারা মহৎ এবং ঈদৃশ প্রীতিমান সাধুপুরুষেরাই জগত তলে ধন্য বলিয়া গণ্য হইবেন। * * *

আপনার নিতান্ত অনুগত
ত্রৈলোক্য।

ভক্তিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার ও বিনয় পুরঃসর নিবেদন—

মিত্র মহাশয়, ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেকটা উন্নতভাব ও অভিনব নব্য ভ্রাতাদিগের উৎসাহ পূর্ণ মুখশ্রী ও উপাসনার জাগ্রত ভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। আপনার প্রশস্ত ভবন পরব্রহ্মের জয় ধ্বনিতে অনুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এ বাটীতে যে ছাত্রগণ বাস করেন উহাদের স্বভাব অতি চমৎকার। বিদেশ হইতে স্বদেশে আসিয়া যেমত আনন্দলাভ করা যায় তদ্রূপ এখানকার ভ্রাতাদিগের সহবাস লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেছি। সমাজে অনেকগুলি সভ্য উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই ছাত্র। প্রাচীন-গোচের সভ্য প্রায় দেখা যায় না। মহাশয় যদি ঢাকার এই বর্ত্তমান অবস্থা অবলোকন করেন, বোধহয় তাহা হইলে আনন্দ রাখিতে স্থান পান না। এবার ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের নিয়ম অতি উত্তম হইয়াছে। প্রতি-দিবস আরম্ভে এবং শেষে উপাসনা হইয়া থাকে। শিক্ষক কয়েক জনও উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত। এই সকল আনন্দজনক ভাবের মূল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলে আপনাকে তাহার প্রধান কারণ বলিয়া আমাদের বোধনেত্রে প্রতিভাত হয় এবং আপনার উদার চিত্ততা

সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া ভক্তি প্রীতি উচ্ছ্বসিত হয়। সম্প্রতি আমরা আপনার উদার প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ অত্রত্য বিশ্রাম নিকেতনে সুখে বাস করিতেছি। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দে তায়ার বিষয় কিছু স্থির করিয়াছেন ? তাহাকে এখানে অনেক কষ্টে থাকিতে হয়। আপনার আফিসে কয়েকজন লোক নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল তাহার কোনও হুকুম আসিয়াছে কিনা এবং তাহার একটা কায ক্ষেত্রের হইতে পারে কিনা জানিতে বাঞ্ছা করি। যদি অভিপ্রায় করেন তবে আমাদের সঙ্গে ক্ষেত্রকে তথায় লইয়া যাইতে পারি। আমরা সকলে যেমন এককালে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি জগৎপিতা সে অভাব মোচনের জন্য আপনাকে তেমনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আমরা এক্ষণে কিছুদিন আমাদের সাংসারিক ও মানসিক উন্নতির জন্য আপনাকে বিরক্ত করিব। অবশ্য জানি আপনি তাহাতে বিরক্ত হইবেন না।

আপনার বাটীতে পূর্ব্বদিকে যে ঘরটার ছাদ প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বৃষ্টির জল পড়িয়া বাহির হইতে না পারায় সমুদয় জল বদ্ধ হইয়া থাকে, তথাকার জল বাহির করিয়া দিবার উপায় করিয়া দিলে ভাল হয়। আমি যাওয়ার সময় সে ঘরের মাপ লইয়া যাইব। আপনার যদি কোনও জিনিসের আবশ্যক থাকে তাহা লিখিলে আমি লইয়া যাইতে পারি। আমরা সকলে ভাল আছি। পত্রদ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ লিখিয়া সন্তোষ করিবেন। ইতি—

আপনার একান্ত বাধ্য—
ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সঙ্গত সভা তৃতীয় যুগ। প্রথম যুগে ব্রজসুন্দর ও তাঁহার বন্ধুবর্গের প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পৌত্তলিকতা বর্জ্জন। দ্বিতীয় যুগে রামশঙ্কর সেন, দীননাথ সেন, অভয়াকুমার দত্ত, অভয়চন্দ্র দাস, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ভগবানচন্দ্র বসু (মালখা নগর)

ভগবানচন্দ্র বসু (রাঢ়িখাল), কৈলাশচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, রাধিকামোহন রায়, আনন্দমোহন দাস, হরমোহন বসু, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, (দীনেশচন্দ্র সেনের পিতা) রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যতর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মল্লিক, উমাচরণ দাস, হরচন্দ্র চৌধুরী, গোপীমোহন বসাক, অক্ষয় কুমার সেন, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, উমেশ চন্দ্র দাস, বৈষ্ণবচরণ দাস, গুরুচরণ দাস, কালীকিশোর বিশ্বাস, পার্ব্বতীচরণ রায়, অমৃতলাল গুপ্ত, রূপলাল দাস প্রভৃতি বহু শিক্ষিত লোকের ব্রাহ্মসমাজে আগমন। এই শুভ যুগে বিখ্যাত লেখক ও বক্তা বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষও ব্রজসুন্দরের সংস্পর্শে ব্রাহ্মসমাজে আগমন করেন। কালীপ্রসন্ন বরিশালে থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় বাগ্মীপ্রবরকে ঢাকায় রাখিতে পারিলে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হইবে মনে করিয়া বাবু অভয়াকুমার দত্ত তাঁহাকে ঢাকায় রাখিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং এইজন্য তাঁহাকে নিজের অধীনে হেড্ ক্লার্কের পদ প্রদান করেন। এইরূপে কালীপ্রসন্নকে স্থায়ীভাবে পাইয়া ঢাকা সমাজের কার্য্যকারিতা শক্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম এবং প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে তাহা প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মই যে সকল ধর্ম্মের সার এই সত্য প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। একদিন বক্তৃতার পর রেভারেণ্ড এলেন সাহেব সভাপতির অনুমতি লইয়া কিছু বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হন এবং বলেন আমাদের লর্ডই যদি ব্রাহ্ম হন তবে আমরাও কি ব্রাহ্ম ? ইহাতে খৃষ্টানগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড এলেন্ ও এরাটুন সাহেব এই উপলক্ষে কতিপয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ঢাকায় গমন (প্রথমবার) ঃ—

ব্রজসুন্দর, বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথের ন্যায় কেশবচন্দ্রকেও ঢাকায় গমন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ তখন যাইতে পারেন নাই। প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি

ঢাকায় যাইতে ইচ্ছুক হইয়া অঘোরনাথের নিকট একখানি পত্র লেখেন। অঘোরনাথ কেশবের পত্রের অনুলিপি সহ কুমিল্লায় ব্রজসুন্দরের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার— ঢাকা ৯।৯।৬৫

অদ্য আপনাকে আবার একখানি পত্র দিতেছি। ইহার উত্তর অতি শীঘ্র চাই। যেন অন্যথা না হয়। এখানে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের দিন দিন উন্নতি চাই, শীঘ্রই ধর্ম্ম যুদ্ধে সকলকেই অগ্রসর হইতে হইবে। এখন ব্রাহ্মদিগের কার্য্যে, বাক্যে, চিন্তাতে পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিতে হইবে। সম্প্রতি কেশব বাবু ঢাকায় আসা সম্বন্ধে আমার নিকট মত চাহিয়াছেন। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম আপনাকে জানান নিতান্ত আবশ্যক বোধে তাহার অবিকল নকল পাঠাইতেছি। ইহার উত্তর শীঘ্র লিখিলে ভাল হয়। উক্ত পত্রের নিম্ন বিষয়টী (পাথেয়) দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। আমি যেন পত্র পাঠ মাত্র উত্তর পাই।

আপনার প্রিয়
অঘোর।

অঘোরনাথের নিকট কেশব চন্দ্রের পত্রের অনুলিপি।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার— ৯।৯।৬৫

তোমরা আমাকে ঢাকায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছ। আমারও নিতান্ত ইচ্ছা যে একবার ঐ অঞ্চলে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধান ও ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সহিত সদালাপ করি কিন্তু নানা কারণ বশতঃ এ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারি নাই। এক একবার মনে হইতেছে যে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে যে সাধারণ অবকাশ হইবে সেই

উপযুক্ত সময়ে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইব। সকলদিকে সুবিধা না হইলে কৃত কার্য্য হইতে পারিব না। যাহাহউক যদ্যপি যাইবার কোনও বাধা উপস্থিত না হয় এখান হইতে ঠিক কোন সময় যাত্রা করিলে ভাল হয় জানিতে ইচ্ছা করি। ঢাকায় কতদিন থাকা আবশ্যক এবং তথা হইতে পূর্ব্ববাঙ্গলার অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজে যাইবার কিরূপ সুবিধা হইতে পারে? আমার পাথেয় জন্য তথাকার ব্রাহ্মভ্রাতারা কিছু দান করিতে পারেন কি না, ঢাকায় অবস্থিতি করিবার কোনও সুবিধা আছে কি না, এ সকল বিষয়ে লিখিলে বাধিত হইব। তোমাদিগের মঙ্গল হউক, সত্যের জয় হইক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

বলা বাহুল্য ব্রজসুন্দর পরমানন্দে কেশবচন্দ্রের ঢাকায় গমনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র ঢাকায় গমন করিবার পূর্ব্বেই অঘোরনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তদানীন্তন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু দীননাথ সেনের বাটীতে একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাত্র পাচকের কার্য্য করিত এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। অঘোর বাবুর প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণের পর সেই ছাত্রটী উপবীত পরিত্যাগ করে। ইহাতে দীনবাবু ও অঘোর বাবুর মধ্যে মনোমালিন্য হয় এবং অঘোর বাবু ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা গমন করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কেশব বাবু ঢাকায় গমন করেন এবং অঘোর বাবু তাঁহার সহিত পুনরায় ঢাকায় যান। পুজার ছুটীর সময়ে অঘোর বাবু যাহাতে ঢাকাপ্রদেশের কোন স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন ব্রজসুন্দর তাঁহাকে এই অনুরোধ করেন, এবং তদুত্তরে অঘোরনাথ তাঁহাকে যে পত্র লিখেন তাহাতে তিনি যে কারণে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার বিন্দুবিসর্গের উল্লেখ ছিল না। অথবা দীনবাবুর বিরুদ্ধে একটী কথাও বলা আবশ্যক

মনে করেন নাই। বাবু অঘোরনাথের হৃদয় যে কত বিশাল ছিল ক্ষুদ্র এই ঘটনাটী হইতেই তাহা পরিষ্কার বোঝা যায় কিন্তু তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্য আর করেন নাই।

কেশববাবু ঢাকায় গমন করিবার পর বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরকে যে পত্র লিখেন তাহার কিয়দংশ এই—"গত মঙ্গলবার রাত্রিতে রাইমোহন রায়ের নাটমন্দিরে কেশব বাবু 'বিশ্বাস' বিষয়ে ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন, অধিকাংশ লোকই অশ্রুদ্বারা সভা মণ্ডপকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। অঘোর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। বোধ হয় কেশব বাবু ও অঘোর কুমিল্লায় যাইতে পারেন। আমার বোধ হয় যাওয়া হইবে না তবে বলিতে পারি না।"

বিজয়।

এই সময়ে অঘোরনাথ ব্রজসুন্দরকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমরা তো এখানে একরকম অবস্থিতি করিতেছি। মহাশয়, বলিতে কি দেশের বড়ই শোচনীয় অবস্থা। সত্যের বল, ধর্ম্মের বল বোধ হয় কোনও নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। এখানে নূতন পত্তন না হইলে আর প্রকৃত মঙ্গল নাই। সত্যের রাজ্যে সত্যের জয় হইবে ইহা নিশ্চিত অলঙ্ঘ্য বাক্য।

আগামী মঙ্গলবার হইতে কেশব বাবুর Series of lectures হইবে। স্থান বড় সংকীর্ণ। এ সময়ে আপনার ঢাকায় উপস্থিতি যে কি আনন্দদায়ক ও উপকারী হইত তাহা বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারেন।

বশংবদ

অঘোর।

অত্র পত্রেতে ত্রৈলোক্য বাবু নমস্কার জানিবেন। ঢাকায় প্রেরিত আপনার পত্রখানি দেখিয়াছি। ঈশ্বর আপনার ধর্ম্মতৃষ্ণার শান্তি করুণ। প্রেমের রাজ্য যেখানে, সেখানে তর্ক তরঙ্গে পতিত হইয়া যেন আপনার মহত্ত্ব আপনাকে পরিত্যাগ না করে। সমস্ত জগত যেন আপনার বিশ্বাসের কণামাত্র বিচলিত না করে। নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের সহিত আপনার গাঢ়তর সম্বন্ধ অনুভব করিবেন। তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরই ব্রাহ্মের জীবন।

প্রিয় ভ্রাতা অঘোর।

অত্রপত্রে

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়

সমীপেষু—

এই পত্রে আমার নমস্কার জানিবেন। আপনার সহিত সাক্ষাত করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। কিরূপে পূর্ণ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি এ সময়ে ঢাকায় না আসিলে বিশেষ কার্য্য হইবে না, যাহা হইবে আপনি থাকিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ হইবে জানিবেন।

নিবেদক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

অঘোরনাথ তাঁহার পত্রে ঢাকার দুরবস্থা সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কারণ এই যে ব্রজসুন্দরের অনুপস্থিতিতে তখনকার সমাজের পরিচালকগণ বোধ হয় কেহই কেশবচন্দ্রকে উপযুক্তরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ব্রজসুন্দর জানিতেন তিনি উপস্থিত না থাকিলেও অভয়াকুমার, দীননাথ প্রভৃতি কেশবচন্দ্রের যথোচিত অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা বোধহয় হয় নাই। কেশবচরিত লেখক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল এই সকল বিষয় লইয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। দোষারোপের কারণ

যে কিছু ঘটে নাই আমরাও তাহা বলিতেছি না। তাঁহার জন্য যে ভৃত্য নিয়োজিত হইয়াছিল তাহার গাত্রে দদ্রুরোগ প্রকাশ পাওয়ায় ২।১ দিন বৈষ্ণবদিগের আখড়া হইতে অন্ন আনয়ন করা হইয়াছিল। ব্রজসুন্দরের আর্ম্মানিটোলার বাটীর দ্বিতলগৃহে কেশবচন্দ্রের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি তখন কুমিল্লায় ছিলেন কিন্তু অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, বঙ্গচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই সেই বাটীতে বাস করিতেন। তখন সামাজিক জাতিভেদের বন্ধন এমন দৃঢ় ছিল যে অভয়কুমার প্রভৃতি কেশবচন্দ্রকে নিজগৃহে স্থান দিতে সাহসী হন হাই, অথচ তাঁহাদের ধারণা ছিল যে অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ ও বঙ্গচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কেশবচন্দ্রের কোনই অসুবিধা হইবে না। এমত অবস্থায় কেশবচন্দ্রের অযত্ন হইয়া থাকিলে আমাদের মনে হয় তজ্জন্য পারিপার্শ্বিক সঙ্গিগণই অধিক দায়ী। সম্ভবতঃ সান্ন্যাল মহাশয়ও সে সময় কুমিল্লা হইতে ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক কেশববাবু ঢাকায় ইংরাজি ও বাংলাতে ছয়টী বক্তৃতা করেন। তিনি অতি অল্পদিন ঢাকায় থাকিয়া ময়মনসিংহ গমন করেন। সেখান হইতে কুমিল্লায় ব্রজসুন্দরের নিকট যাইবার কথা ছিল কিন্তু ময়মনসিংহ হইতে ফিরিবার পথে জ্বর হওয়ায় আর যাইতে পারেন নাই। কুমিল্লায় গেলে দেখিতে পাইতেন ব্রজসুন্দর তাঁহার জন্য কেমন রাজোচিত অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য আইলার-গঞ্জে লোকজন প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং কেশব আসিতেছেন কি না অগ্রে সংবাদ দিবার জন্য সেখান হইতে দুই দিনের পথেও লোক প্রেরণ কবিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর কুমিল্লাতে আটচালা গৃহে বাস করিতেন। পাছে সেই গৃহে কেশবের অসুবিধা হয় সেইজন্য প্রাঙ্গনের উৎকৃষ্ট স্থানে কেশবচন্দ্রের বাসের জন্য মুল্যবান্ ও সুদৃশ্য গালিচা প্রভৃতি সরঞ্জামদ্বারা বৃহৎ তাম্বু সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক কেশবচন্দ্রের কোন কোন বক্তৃতায় খৃষ্টধর্ম্মের

বিরোধী কথা থাকাতে পাদ্‌রী এলেন ও নরম্যালস্কুলের আরাটুন সাহেব তাহার প্রতিবাদ করেন। কেশবচন্দ্রের পদার্পণে ঢাকায় একদিকে যেমন প্রবল ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তেমনি অপরদিকে হিন্দু সমাজে ইহার গতিরোধ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

এই সময়ে হিন্দুসমাজের নেতাগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কেশব চন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে কেহ না যায় এই মর্ম্মে নিজ নিজ বন্ধু ও পরিচিতের গৃহে এবং স্ব স্ব পরিবারে কঠোর আদেশ প্রচার করিলেন। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। অন্য নেতাগণের ন্যায় দীননাথ ঘোষ আপনার পরিবারের সকলকে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কালীপ্রসন্ন বসু (দীননাথ ঘোষের ভাগিনেয় ও বর্ত্তমান সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রচারক) দীননাথের বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। মাতুলের এই নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হওয়ার সময় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া রাত্রিতে তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সকলে তাঁহাকে মাতুলের আদেশ অবগত করাইলেন। তিনি তৎক্ষনাৎ দীননাথের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি ধীরভাবে মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন "আজ্ঞে আমি একটী কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, সেটী আপনাকে জানান নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।" মাতুল শুনিয়া বজ্র-নিনাদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "বুঝেছি কেশবসেনের বক্তৃতায় যাওয়া হয়েছিল।" কালীপ্রসন্ন পূর্ব্বের ন্যায় মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "আজ্ঞে আমি বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে কথা বলিতে আসি নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি যে মুসলমানের সঙ্গে একত্রে আহার করিয়াছি তাহা আপনাকে জানান একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই বলিতে আসিয়াছি।" দীননাথ চমকিয়া এবং ব্যাপার অনেক দূর গড়াইয়াছে দেখিয়া অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন "চুপ্ চুপ্, আচ্ছা তুই বক্তৃতা শুনিতে যাস্ কিন্তু খবরদার আর কাহাকেও এ কথা বলিস্‌নে ও আর কাহাকেও সঙ্গে নিস্ নে।"

আমরা এ স্থলে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা সম্বন্ধে আর একটী সুন্দর গল্পের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঢাকায় কেশবচন্দ্র ভক্তি বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই দিন লাকৃড়ীদাস বাবাজী নামে জনৈক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন। ভক্তি রসের মধুর স্রোতে শ্রোতৃবর্গকে অভিষিক্ত করিয়া কেশবচন্দ্র ব্রহ্মনামের মহিমা প্রচার করিতে ছিলেন। লাকৃড়ী দাস বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলাবাহুল্য এ সংবাদ তৎপর দিনই সহরের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ব্যাপার লইয়া হুল স্থূল পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মের বক্তৃতা শুনিয়া বৈষ্ণব কাঁদিবে কেন বলিয়া বৈষ্ণবগণ লাকৃড়ী দাসকে নির্য্যাতন ও একঘরে করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি লাকৃড়ী দাস বলিলেন "আমি বক্তৃতা শুনিয়া কাঁদিব কেন; বক্তৃতাতে প্রহ্লাদের নাম হইয়াছিল তাই আমি না কাঁদিয়া পারিলাম না।" তখন বৈষ্ণবগণ 'সাধু সাধু' বলিতে বলিতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য হিন্দু সমাজের নেতাগণ "হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিনী" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভা হইতে "হিন্দু-হিতৈষিনী" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে লাগিল। বাবু হরিশচন্দ্র মিত্র এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। "ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও গোবিন্দ প্রসাদ রায় যেমন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারবিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন, "হিন্দু-হিতৈষিনী" ও সেই প্রকার পৌত্তলিকতার সমর্থন করিয়া ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তৎকালীন জজ-আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু কাশী কান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং খ্যাতনামা দীননাথ ঘোষ, বরদাকিঙ্কর রায়, জগবন্ধু বসু, লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী, তারাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ হিন্দুসমাজের অগ্রগণ্য ও পরিচালক ছিলেন। ইহাঁরা ব্রাহ্ম এবং

ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতিকারক দিগকে নির্য্যাতন করিতে অত্যন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

কাশীকান্ত অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও ব্যক্তিগতভাবে ব্রজসুন্দরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিও ছিল। এই কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রগণ পূর্ব্ব হইতেই ব্রজসুন্দরের সংস্পর্শে ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; এবং কেশবচন্দ্রের আগমনে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময়ে হিন্দু সমাজ এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিল যে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিলেই যুবকদিগকে সমাজ ও পরিবারচ্যুত করিতে হইবে এই অভিপ্রায়ে এক স্বাক্ষর পত্র বাহির করিলেন। এই পত্রে ব্রজসুন্দরের বন্ধু এবং ঢাকা সমাজের অন্যতম সংস্থাপক বাবু রামকুমার বসু পর্য্যন্ত নাম স্বাক্ষর করিয়া বসিলেন। ইঁহার পুত্র বসন্তকুমার বসু কেশবচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের আগমনে রামকুমার পুত্রকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গেলেন এবং ব্রজসুন্দরকে কুৎসিৎ ভাষায় যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া পত্র লেখেন এবং তাঁহার আরমানিটোলার বাটী হইতে এই সকল আড্ডা উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন।

এই সময়ে অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরকে যে পত্র লিখিতেন তাহা হইতে অঘোর বাবুর দুইখানি পত্র উদ্ধৃত করা গেল।

১৮৬৫।

সবিনয় নিবেদন— ২৬শে জুন।

আমি গতকল্য ঢাকায় পৌছিয়াছি। পথে জলবৃষ্টির জন্য বিলক্ষণ বিলম্ব হইয়াছিল, আসিতে প্রায় ৬ দিন লাগিল। আপনি বোধ হয় অবগত হইয়াছেন যে ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় কি কি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-বেড়িয়াতে সর্ব্বশুদ্ধ ৯ দিবস বাস করি ও মোট ১০টী বক্তৃতা করি। তাহার মধ্যে একটী "প্রকৃত শিক্ষা" বিষয়ে আর কয়েকটী কেবল ব্রাহ্ম

ধর্ম্ম বিষয়ে। উমাচরণ বাবুর বাসায় ৩টী বক্তৃতা হয়—প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা ও প্রীতি (ঈশ্বরের প্রতি ও মানবের প্রতি)। মুন্‌সেফের বাসায় 'পরকাল ও মুক্তি', উকিলের বাসায় "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতভাব" (ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পত্তন ভূমি, ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁহার সহিত মানবের সম্বন্ধ)। এই বক্তৃতাতে একটী স্ত্রীলোকের মন আশ্চর্য্য ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ফৌজদারীর সেরেস্তাদারের বাসায় 'ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ', অবতারের প্রতিবাদ সূচক এবং পুত্তলিকা উপাসনার প্রতিবাদ সূচক কয়েকটী এবং "অন্তর্দৃষ্টি", "আত্মোন্নতি", "ঈশ্বর দর্শন" এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। সেখানে একটী তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। ৫৪৲ টাকা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ দান সংগৃহীত হইয়াছে, বোধ হয় পরে আরও কিছু হইতে পারে। আপনি যে আশঙ্কা করিয়া পত্র দিয়াছিলেন আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। বাস্তবিক বলিতে গেলে ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি। ভগবান বাবুর আশ্চর্য্য স্নেহ ও প্রীতির ভাবে সেখানে আমি একজন পরি বারের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছিলাম।

দেবেন্দ্রবাবুর পত্রে বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। বিজয়ের পত্র বড় কষ্টকর সন্দেহ নাই কিন্তু আমি কি করিব। গোবিন্দবাবু তাঁহার ভায়া আনন্দকে (ঢাকার উকিল আনন্দচন্দ্র রায়) এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে "বিজয় বাবু এত আশা টাশা দিলেন কিন্তু শেষ কালে কিছুই হইল না।" আরও দুই একটী কথা বিজয়ের প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন। আমি তাহাতেই লিখিয়াছিলাম যে অদ্যাপি বুঝি বিজয়ের সহিত গোবিন্দের বন্ধুত্ব হয় নাই। তিনি লেখার ভাবে যে প্রকার কষ্টের বিবরণ দিয়াছিলেন তাহাতে বোধ হয় বিজয়ই তাহার কারণ। যাহা হউক বিজয় উদ্যমে মত্ত হইয়া লোকের হৃদ্গত ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই একটি কার্য্য করিয়া বসেন, এ বিষয়টীও আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। বিজয়কে শীঘ্রই এক পত্র লিখিব। তাঁহার কষ্টের জন্য আমাকেও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে।

এখানে প্রাচীন সম্প্রদায় বড়ই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা গত রবিবারে সভা করিয়া এক স্বাক্ষর পত্র বাহির করিয়াছেন যে যাহারা ব্রাহ্মসমাজে যাইবে তাহাদিগকে পরিবারচ্যুত করিতে হইবে। তাহাতে অনেকে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আগামী ঢাকা প্রকাশে ইহার বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন। দীনবাবু প্রভৃতি তজ্জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন তাহা এই জন্য যে যাঁহারা সমাজে উপাসনা করিতে আসিবেন তাঁহারা যদি পরিবার হইতে বিচ্যুত হন তবে ব্রাহ্ম সমাজ যথা সাধ্য তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিবেন। অভয়া কুমার বাবু যেন কেমন কেমন করিতেছেন। আপনি তাঁহাকে ভাল করিয়া একখানি পত্র লিখিবেন। আপনাকেও চাঁদা দিতে হইবে। সম্প্রতি আমার থাকার বড়ই অসুবিধা হইতেছে। কোথায় থাকি কি করি কিছুই বুঝিতেছি না, কারণ উপরের ঘর প্রস্তুত হইতেছে ও দুর্গাদাস বাবু এখনও আছেন। স্কুলের বড়ই বিশৃঙ্খলা। দীনবাবু আবার সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার মন কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল হইয়াছে।

আপনার
অঘোর।

অঘোরনাথ ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ছিলেন বলিয়া জানিতেন না যে ঢাকা প্রকাশে এই চাঁদা সংগ্রহ সম্বন্ধে দীনবাবুর নামে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহা ব্রজসুন্দর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় উপস্থিত হইলে অভিভাবকগণ ছাত্রদিগের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন না করিলে পাছে বা তাহাদের শিক্ষার ব্যাঘাত হয় এই মনে করিয়া ব্রজসুন্দর নিজ হস্তে বিজ্ঞাপনটী লিখিয়া দীননাথের নামে ঢাকাপ্রকাশে পাঠাইয়াছিলেন।

চাঁদা আদায়ের জন্য বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছিলেন বটে কিন্তু উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হইলে নিজেই এই ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

দ্বিতীয় পত্র।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

আপনার পত্র পাইয়া উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে, দোষ মার্জ্জনা করিবেন। আমি অদ্য অভয়া বাবুর নিকটে গিয়াছিলাম। তিনি রামকুমার বাবুর স্বাক্ষরে বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। আপনার কথিত বাক্যানুসারে প্রচার কার্য্যের চাঁদা আদায়ের জন্য ঢাকা প্রকাশে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। আপনি ব্রাহ্মদিগকে সম্বোধন করিয়া বাঙ্গালাতে যে টুকু দিয়াছিলেন, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম। বেঞ্চ প্রস্তুত হইতেছে এ গৃহেও ধরে না, লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। মহাকষ্ট, আমাদেরই স্থান সমাবেশ হয় না, লোকের তো হইবেই না। যাহাহউক ইহাই আমাদের আনন্দের কারণ। আপনি পুস্তকের জন্য শীঘ্র টাকা পাঠাইবেন। ইংলণ্ডের সংবাদ চাই। আমি কলিকাতায় গিয়া হয় কোন ইংরেজ বণিকের নিকট টাকা জমা দিব নতুবা এখান হইতেই পাঠাইতে হইবে, অতি শীঘ্রই পাঠাইতে হইবে। গোবিন্দ আসিয়া জ্বরে বড় কষ্ট বোধ করিতেছেন। তাঁহার দুর্ভাগা ভগ্নীর বিষয় তো কিছুই হইতেছে না। যে ভয়ানক পিতা, হইবে কি? এই সকল ঘটনা দেখিয়া বিধবাগণের বিবাহ দিতে আর ক্ষণকাল জন্য বিলম্ব করা উচিত নহে। এই ঘটনাটা আমার মনকে বড়ই জাগ্রত করিয়াছে, বিশেষতঃ আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই আমার বিশেষ কর্ত্তব্য বোধ হইল। ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তির দমন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ব নহে ইহা নিশ্চয় জানিবেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাটা বড়ই প্রার্থনীয় কিন্তু এ যাত্রায় হইয়া উঠিল না। আপনার স্নেহ প্রেম কখনই ভুলিতে পারিব না। অদ্য এই পর্য্যন্ত, যেন অধমকে অন্তরে রাখেন। আমার কলিকাতায় গিয়া ফিরিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে।

উমাকিশোর বাবুকে আমার নমস্কার জানাইবেন, তথা শ্যামচান্দ বাবু ও হরিপ্রসাদ ঘটক মহাশয়। আপনার প্রিয় অঘোর।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফাণ্ড :—স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় জীবিত থাকিতে লেখিকার এক বন্ধু ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে "নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল তাঁহার প্রণীত কেশবচরিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফাণ্ড কেশবচন্দ্র দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রজসুন্দরের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ব্রজসুন্দরই উক্ত প্রচার ফাণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা। সান্যাল মহাশয় যে এ বিষয় অবগত ছিলেন না সেরূপ মনে হয় না, কারণ তিনি তখন ব্রজসুন্দরের আশ্রয়েই বাস করিতেন। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগামী দল যখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়েন তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ (আদি ব্রাহ্মসমাজ) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত Representative council of Brahmos অর্থাৎ ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা যে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা এই সকল গোলযোগে উঠিয়া যায়। আদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং রীতিমত প্রচার ফাণ্ড স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের অর্থাভাবে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল।" প্রচারকদিগের তৎকালীন দুঃখের কাহিনী শুনিলে হৃদয় দ্রব হইয়া যায়। প্রচারকগণ কোন কোনও দিন একেবারে অনশনে কাটাইতেন, এক একদিন এমন হইত যে ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া গোলদিঘীর জলে কাদা মিশাইয়া খুব ঘোলা করিয়া পান করিতেন যে ইহা দ্বারা উদরে কিছু চাপ পড়িলে কিছুক্ষণ ক্ষুধার তাড়না থাকিবে না !

সে যাহাহউক আমরা গোস্বামী মহাশয়ের জীবনচরিত গ্রন্থেও দেখিতে পাই ব্রজসুন্দরই উক্ত প্রচার ফাণ্ডের জন্মদাতা। বিজয়কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—

"ব্রজসুন্দর বাবু আমার পরম উপকারী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার দ্বারা আমি বহু প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ ও তাঁহার নিকট বিশেষভাবে উপকৃত। একদিন তাঁহার আরমানিটোলার বাটীতে

তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম একটী ফাণ্ড না থাকতে তাঁহাদের কোন কোনও দিন আহারেরই সংস্থান হয় না। শুনিয়া ব্রজসুন্দর বাবু বড় ব্যথিত হইলেন, সেই দিনই সমাজে (তখনও সমাজ তাঁহার আরমনিটোলার বাটীতেই হইত) যত উপাসক উপস্থিত হইলেন, সকলের নিকট প্রস্তাব করিয়া চাঁদা ধরিলেন, নিজেও স্বাক্ষর করিলেন, একদিনেই প্রায় ৭০০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইল। কয়েক দিবসের মধ্যে সমুদয় টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় পাঠান হইল। এইরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফাণ্ডের প্রথম সুত্রপাত হয়।" কেশব বাবুও যে কলিকাতায় প্রচার ফাণ্ড স্থাপনের চেষ্টা সেই সময়ে করিতেছিলেন তাহা আমরা জানি কিন্তু ব্রজসুন্দরের প্রেরিত এই ৭০০৲ টাকা তাহার ভিত্তিস্বরূপ হইল

তত্ত্ববোধিনী সভায়ও যে নিয়মমত সাহায্য করিতেন তাহাও তাঁহার জমা খরচের বহিতে দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রজসুন্দরের কিরূপ ঐকান্তিক যত্ন ও উৎসাহ ছিল এস্থলে একটী ঘটনাদ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেওয়া যাই-তেছে। ১৮৬৫ সনে কলিকাতায় ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা সংস্থাপিত হয়। তখনও কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়েন নাই। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে (আদি সমাজ) এই সভার জন্ম হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল। বাবু ঠাকুরদাস সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই সভা হইতেই সম্ভবতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রথম কলহ এবং পর-স্পরের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা সে সকল ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। এই সভা যখন স্থাপিত হয় তখন ব্রজসুন্দর কুমিল্লায় ও তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর কিন্তু অনিয়মিত ও অতিরিক্ত শ্রমে ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া প্রায় বৃদ্ধদশায় উপনীত হইয়াছেন। কুমিল্লা হইতে ঢাকায় যাইতে হইলে কোন কোনও স্থলে হস্তীতে এবং

কোথাও ক্ষুদ্র নৌকায় গেলে পাঁচ দিন লাগিত নতুবা সহজসাধ্য পথে আরও অধিক সময় লাগিত। তিনি ১০ দিনের ছুটী লইয়া এই ব্রাহ্ম-প্রতিনিধি সভার সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন এবং একটী সভা আহ্বান করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলন। তাঁহার স্মৃতিপুস্তকে দেখা যায় :—

8th February, 1865. In the evening called a meeting in the Brahmo Somaj Hall for the purpose of raising an annual Subscription in aid of the Representative Council of Brahmos Calcutta, to enable them to send out missionaries to the different parts of the country for the propagation of Brahmoism. Amount subscribed at the meeting was Rs. 223 per annum.

এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ঢাকায় পৌঁছিবার দিন বাদ দিয়া এক ক্রমে নয় দিন ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রাহ্ম সমাজ—অনুষ্ঠান ও প্রচার।

ব্রাহ্ম বিবাহ ঃ—১৮৬৭ সনে ব্রজসুন্দরের চতুর্থ (এখন তৃতীয়া) কন্যার ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয়। ব্রজসুন্দরের জীবনে অনেক পারিবারিক ঘটনাই সামাজিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। তখন দেশের এমন অবস্থা ছিল যে তিনি কন্যাকে বয়স্থা করিয়া বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন দেখিয়া, তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ পর্য্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মমতে বিবাহার্থী যুবক প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইবে। এমন কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং রাজনারায়ণ বসুও এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই চিঠিপত্রে উহা প্রকাশ পায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই এই কন্যার পাত্র জুটাইয়া দিয়াছিলেন। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস। ইনি মহর্ষিরই একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

আমরা ব্রজসুন্দরের ডায়েরীতে দেখিতে পাই—

My fourth daughter Uma married according to Brahmic system to Prasanna Kumar De Biswas of the Daksmin Rarhee class on the 14th October, 1867 monday, i. e. 29th Assin, 1294 at Comilla. Pandit Ananda Chandra Bedantabagis, Aujodha Nath Pakrashi, Eshan Chandra Bose and Pran Krishna Ghose came from Calcutta Somaj. Prasanna is born in the respectable Karnapur De family. He is the nephew of Babu Radha Nath Bose, Attorney-at-law of the High Court.

এই বিবাহ পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিতীয় ব্রাহ্মবিবাহ। ইহার অতি অল্পদিন

পূর্ব্বেই বরিশালের রাখালবাবুর ভগ্নী দীনতারিণীর সহিত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল।

ইহার একবৎসর পরেই তাঁহার আর এক কন্যারও ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয়। এই বিবাহ কলিকাতা ভবানীপুর বেলতলায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

ব্রজসুন্দরের স্মৃতি পুস্তকে দেখিতে পাই—

My daughter Jogon mohini married to Kedar Nath Guha Roy of Sreepore (Basirhat) of the family of the late Raja Pratab Adhiya of Jessore on Saturday the 9th Kartic 1275 B. S. at Beltala, Bhawanipore, Calcutta. Babus Dwijendra Nath Tagore, Ramtonoo Lahiri, Prosanna Kumar Sarbadhicary, Harro Lall Roy, Rajendra Lall Mittra, Ramsanker Sen, Aujodhya Nath Pakrasee, Becharam Chatterjee, Nabo Gopal Mitter, Bejoy Kissen Gossain, Krisna Dyal Roy, Kedar Nath Ghose, Obhoy Das Bose, Gurucharan Moholanabis, Baradakanta Bose, Prem Chandra Biswas of Shambazar and many others of Calcutta, Sreepore, Takee, Sodpur and Poora were present on the occasion and every thing went off most satisfactorily. Aujodhyanath Pakrasee was the Acharjya and Dyalchandra Shiromoni the Odheeta. The corresponding English date is, 24th October 1868.

নলগোলা সমাজ;—১৮৬৭ সনে বাবু জগদ্বন্ধু লাহা ও প্রসন্নকুমার শীল প্রভৃতির যত্নে নলগোলাতে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। সেই সমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে সমস্ত দিন ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল; এইটী ঢাকার প্রথম ব্রহ্মোৎসব।

কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয়বার ঢাকায় গমন;—উক্ত উৎসবের পরে ১৮৬৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কেশবচন্দ্র দ্বিতীয়বার ঢাকায় গমন

করেন। তিনি প্রথমে আরমানিটোলায় ব্রজসুন্দরের গৃহেই অবস্থিতি করেন কিন্তু সেখানে বাবু কালীনারায়ণ গুপ্তের ভৃত্যের বসন্তরোগ হওয়ায় কেশবচন্দ্রকে নিরাপদ করিবার জন্য সকলে তাঁহাকে বালিঘাটীর জমিদার বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের বংশীবাজারস্থ বাসাবাটীতে স্থানান্তরিত করেন। তিনি এই সময়ে নবাবসাহেবের আসান মঞ্জিল গৃহে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করেন এবং অন্যান্য স্থলে অন্যান্য বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার আগমনে এইবারও বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজগৃহ সংস্থাপন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদি বহু দিন ব্রজসুন্দরের নলগোলার বাসা বাটীতে চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৫৭ সনের কিছু পূর্ব্বে তিনি আরমানিটোলায় একটী বৃহৎ বাটী ক্রয় করিলেন এবং "ঢাকা প্রকাশে" প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়া ঐ বাটীর একাংশ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারের জন্য প্রদান করিলেন। সেই গৃহেই ১২।১৩ বৎসর সমাজের কার্য্যাদি চলিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে ক্রমেই এত অধিক লোক সমাগম হইতে লাগিল, যে উক্ত গৃহে সমাজের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হইতে লাখিল।

ব্রজসুন্দর এই সময়ে কুমিল্লা নগরে ছিলেন। কর্ম্মোপলক্ষে সময় সময় ঢাকায় গমন করিতেন। পুরাতন চিঠি পত্রে দেখা যায় বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, দীননাথ প্রভৃতি সকলেই এই স্থানাভাবের বিষয় তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আরমানিটোলার সমাজ-গৃহে এত অধিক লোক আসিতে আরম্ভ করিল যে আর স্থানের সমাবেশ হইতেছে না এই সংবাদ শুনিয়া তিনি যে কত আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা আর বলা যায় না। ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালার কেন্দ্রস্থল, সেখানে পূর্ব্ববাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য সভাসমিতি করিবার উপযুক্ত কোন স্থান না থাকাতেও অত্যন্ত অসুবিধা বোধ হইতেছিল। ব্রজসুন্দর

ও তাঁহার বন্ধুগণ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের জন্য এবং প্রকাশ্যভাবে সভা সমিতির জন্য একটী প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রজসুন্দর তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে এই কার্য্যের জন্য প্রত্যেকে এক মাসের আয় দিবেন এই প্রস্তাব করিয়া কুমিল্লা হইতে পত্র লিখিলেন। অনেকেই অতি উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রত্যেকে এক মাসের আয় প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। বাবু দীননাথ সেন এই সময়ে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই সময়েই ব্রজসুন্দরের অন্যতর বন্ধু বাবু অভয়চন্দ্র দাস চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় আসেন। তাঁহার ন্যায় কার্য্যকুশল ও সৎকার্য্যে উৎসাহশীল ব্যক্তি বাবু দীননাথ সেন ও বাবু অভয়াকুমার দত্তের সহিত যোগ দেওয়াতে এই প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইল।

পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মানে দান সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা ব্রজসুন্দরের পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যে একখানি অতি জীর্ণ আবেদনপত্র পাইয়াছি; এ পত্রের সমুদায় অংশ নাই, একাংশ একেবারে ছিন্ন। আরব্ধ কার্য্যে জনসাধারণের সহানুভূতি এবং বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য ব্রজসুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন ঢাকায় যে সকল সভ্যেরা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের নামে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল বটে কিন্তু ব্যবস্থাটী ব্রজসুন্দরের। অঘোরনাথ গুপ্তের পত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবেদন পত্রের প্রাপ্ত অংশ :—

"এই টাকার জন্য আমরা দায়ী থাকিব এবং যদি সমুদায় টাকা আদায় না হওয়া নিবন্ধন, অথবা অন্য কোনও অপ্রীতিকর কারণ বশতঃ গৃহ নির্ম্মাণ না করা হয় তবে আপনাদের টাকা প্রত্যার্পণ করিব। টাকা সমাজগৃহ-সম্বন্ধীয়-কমিটির কোষাধ্যক্ষ বাবু রাধিকামোহন রায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে। তিনি টাকা প্রাপ্ত হইয়া রসিদ প্রদান করিবেন।"

নিবেদক—

শ্রীঅভয়চন্দ্র দাস।
শ্রীরাধিকামোহন রায়।
শ্রীদীননাথ সেন।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীরামশঙ্কর সেন।

এই ছিন্ন পত্রেরই অপর দিকে লিখিত আছে ঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস	১০০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র	৬০০৲
একজন হিতৈষী *———	৬০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন	৪০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু	৪০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ গাঙ্গুলী	২০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়	২০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র ঘোষ	২০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু বৈষ্ণবচরণ দাস	২০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ দাস	২০০৲
দুই শত টাকার ন্যূন চাঁদার সমষ্টি——	১০০০৲
দফে অল্প চাঁদার সমষ্টি——	৪৭৫৲
মোট—	৫৮৭৫৲

অমৃতসর হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এই পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্যে ৫০০৲ শত টাকা দান করেন। নিম্নে মহর্ষিদেবের পত্র উদ্ধৃত হইল—

* আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি ইনি স্বর্গীয় বাবু অভয়াকুমার দত্ত।

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র
ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয় সমীপেষু।

সাদর নিবেদন,

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অর্দ্ধ নোট এখান হইতে পাঠাইতেছি ইহার প্রাপ্তি সংবাদ পাইলে দ্বিতীয় খণ্ড প্রেরিত হইবে। ইতি— নিঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসাজ গৃহ নির্ম্মাণ কমিটি যে সংস্থান পত্র দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করেন তাহা এই ঃ—

১। আমরা এই অঞ্চলের লোকদিগ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালা প্রদেশবাসী ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের লোকদিগের ব্যবহার নিমিত্ত ঢাকা নগরীতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ নামক একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্বে এই কমিটী স্থাপন করিলাম।

২। এইক্ষণ এইরূপ প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ এই প্রদেশের ব্রাহ্ম সমাজ সমূহকর্ত্তৃক বৎসর বৎসর মনোনিত তিনজন ট্রাষ্টীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে; এবং তাঁহারা ঐ সমুদয় ব্রাহ্ম সমাজের অনুমতি অনুসারে যে যে কার্য্য উচিত বিবেচনা করিবেন, তন্নিমিত্ত ঐ গৃহ ব্যবহার করিবেন।

৩। এই গৃহ সংস্পৃষ্ট একপ স্থান থাকিবে যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ অথবা তদ্রূপ অন্য লোক আসিয়া থাকিতে পারেন।

৪। নীতি, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকের যে একটী লাইব্রেরি এই গৃহে সংস্থাপন করা যাইবে, গৃহের চাঁদাদায়ী অথবা উক্ত ট্রাষ্টীগণ যেরূপ নিয়ম করিবেন, তদনুসারে সেই পুস্তকালয় পূর্ব্ববাঙ্গালা প্রদেশের ব্রাহ্মসমাজ সমূহ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৫। এই কমিটী চাঁদা সংগ্রহ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। গৃহ নির্ম্মিত হইলে চাঁদাদায়ী মহাশয়-দিগের এক সভা আহ্বান করা যাইবেক, তাহাতে এই গৃহের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে নিয়ম নিরূপিত হইবে।

৬। এইক্ষণ এরূপ অনুমান করা যায় যে গৃহনির্ম্মাণ নিমিত্ত ৭০০০৲ টাকা আবশ্যক হইবে। জিনিষ পত্র প্রস্তুত করিতে ১০০০৲ টাকা এবং পুস্তকালয় স্থাপনে ২০০০৲ টাকা, একুনে ১০০০০৲ টাকা আবশ্যক হইবে।

৭। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কমিটীর পক্ষ হইতে চাঁদা সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, কুমিল্লা। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস, বরিসাল। শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু, ফরিদপুর। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ। শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন, কিশোরগঞ্জ। শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু, ব্রাহ্মণবেড়িয়া। শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী। শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মৌলিক, মাদারীপুর। শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দাস, যশোহর। শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী, সহর সেরপুর।

৮। যিনি যত টাকা স্বাক্ষর করিবেন, একত্র বা মাসে মাসে ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

ঢাকা ২৫এ আগষ্ট ১৮৬৬ ইং।

শ্রীঅভয়চন্দ্র দাস (সভাপতি)।
শ্রীরামকুমার বসু।
শ্রীকৈলাশচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।
শ্রীগোপীমোহন বসাখ।
শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।
শ্রীউমেশচন্দ্র দাস।
শ্রীরাধিকামোহনরায় (কোষাধ্যক্ষ)।
শ্রীদীননাথ সেন (সম্পাদক)।

উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে ১৮৬৮ সনে গৃহ নির্ম্মান কার্য্য আরম্ভ হয়। এই গৃহ নির্ম্মাণ উপলক্ষে বাবু অভয়চন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার সেন, রাধিকামোহন রায়, অনাথবন্ধু মল্লিক, শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গোপীমোহন বসাক, উমেশচন্দ্র দাস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। বাবু রামমাণিক্য সিংহ গৃহ নির্ম্মান করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাবু উমাকান্ত ঘোষ ইঞ্জিনিয়ার এই সমাজ গৃহের নক্সা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই গৃহের ভিত্তি সংস্থাপন কালে বিজকৃষ্ণ, অঘোরনাথ এবং ঢাকার সকল ব্রাহ্মবন্ধুগণ ব্রজসুন্দরকে ঢাকায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যদিও ইহার পূর্ব্বে তিনি নানা কার্য্যোপলক্ষে কুমিল্লা হইতে সময় সময় ঢাকায় আসিতেন কিন্তু ঠিক এই সময় সেরূপ কোন সুযোগ না হওয়ায় নিতান্ত ইচ্ছা সত্যেও ব্রজসুন্দর ঢাকায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ব্রজসুন্দরের অনুপস্থিতিতে তাঁহার ও অপরাপর সকলের ইচ্ছায় ও অনুরোধে তাঁহার অন্যতম বন্ধু বাবু অভয়াকুমার দত্ত (ঢাকার তৎকালীন ছোট আদালতের জজ) পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। আমরা ভক্তিভাজন বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে অভয়াকুমার ভিত্তি সংস্থাপন কালে অনুপস্থিত বন্ধু ব্রজসুন্দরকে স্মরণ করিয়া সময়োপযোগী একটী অতি হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অভয়াকুমারের প্রার্থনায় সমবেত শ্রোতৃবর্গের হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। আমরা ব্রজসুন্দরের এই সময়কার স্মৃতি পুস্তকে দেখিতে পাই ঃ—

On the 22nd of January 1868 corresponding with 9th Magh 1274 B. S. I addressed a letter to Babu Devendra Nath Tagore and another to Babu Keshav Chandra Sen requesting them to come to Dacca and lay the foundation stone of the East-Bengal Brahmo Somaj.

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অর্থাৎ প্রায় দুই বৎসরে এই সমাজ-গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা-দিনের সাম্বৎসরিক উৎসব যাহাতে এই নবনির্ম্মিত পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সম্পন্ন হয় সেজন্য ব্রজসুন্দর এবং আরও অনেকের একান্ত আগ্রহ ছিল এবং কার্য্যেও তাহাই হইল—ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবের দিনেই নূতন মন্দির প্রবেশ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

বাবু দীননাথ সেন প্রমুখ কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন এই গৃহ কেবল উপাসনালয় রূপে "ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত না হইয়া "পূর্ব্ব বাঙ্গালা সাধারণ হল" নামে অভিহিত হউক। ব্রজসুন্দর এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখেন এবং তিনি বলেন যে ইহা যে কেবল উপাসনালয় রূপেই ব্যবহৃত হইবে তাহাও নহে, এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইতে পারিবে এবং সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারে ইহা উপাসনালয় রূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মন্দির নির্ম্মিত হইলে বিজয়কৃষ্ণ এবং ঢাকার অন্যান্য ব্রাহ্মবন্ধুগণ ব্রজসুন্দরকে মন্দির প্রবেশ সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য ব্যাকুলভাবে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনিও বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আশা করিয়াছিলেন যে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বন্ধুগণের সহিত একত্র মিলিত হইবেন। কিন্তু তখন তিনি অতি অল্প দিন হইল চব্বিশ পরগনায় বদলি হইয়াছেন। স্থান নূতন, ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী নূতন, তাঁহার সহিত ব্রজসুন্দরের তেমন হৃদ্যতাও ছিল না। হাতের কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে বিদায় চাহিতে পারিবেন না মনে করিয়া ব্রজসুন্দর শরীরের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

আমারা তাঁহার জেষ্ঠা কন্যার নিকট শুনিয়াছি এই সময় ব্রজসুন্দর অতি প্রত্যুষে আফিসে যাইতেন এবং রাত্রি ১০।১১ টার সময় গৃহে

আসিতেন। কিন্তু এইরূপ অক্লান্ত ভাবে খাটিয়াও যখন দেখিলেন হাতের কার্য্য শেষ করিতে পারিতেছেন না তখন আর তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। যাহাহউক মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া তিনি প্রধানাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ঢাকায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু তিনি যাইতে অপারগ হওয়ায় ব্রজসুন্দরের অনুরোধে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রকে সঙ্গে লইয়া ঢাকায় গমন করিলেন। এই সঙ্গে বাবু অমৃতলাল বসু এবং গুরুচরণ মহলানবিশও গমন করেন।

এই উপলক্ষেই কেশবচন্দ্রের তৃতীয় বার ঢাকায় গমন। ২৩শে অগ্রহায়ণ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন। কিন্তু ২৩এ না হইয়া ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার পড়ায় ২২শে অগ্রহায়ণই পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রবেশ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। উৎসবের দিন প্রাতঃকালে ব্রজসুন্দরের আরমানিটোলার বাটী হইতে ব্রাহ্মগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে পাটুয়াটুলীর নূতন মন্দিরে প্রবেশ করেন। ইতিপূর্ব্বে ঢাকায় কখনও ব্রাহ্মদিগের নগর কীর্ত্তন হয় নাই। কলিকাতায়ও ইহার পূর্ব্ব বৎসর এইরূপ নগর-কীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। সেদিনের কীর্ত্তনে ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ এবং আকুল ভাব বর্ণনীয় নহে। সে দিন সহরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মদিগের এই প্রথম নগরকীর্ত্তন দেখিবার জন্য ঢাকাবাসিগণ দলে দলে সমবেত হইয়াছিল; এবং সম্ভ্রান্ত ধনী দরিদ্র নানা শ্রেণীর লোক এই মহোৎসব দর্শন করিবার জন্য সমাজপ্রাঙ্গন ও সমাজগৃহ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এমন কি নবাব আবদুল গনি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণের সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে যে আন্তরিকতা ও মনোহর দৃশ্য দেখা গিয়াছিল তাহা এখনও অনেকের হৃদয়পটে মুদ্রিত আছে। এই সময় হইতেই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ "পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ" নামে

অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কেশবচন্দ্র ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ব্রজসুন্দর এমন দিনে ঢাকায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আনন্দোৎসবে স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলেও দূর হইতে ঢাকার ব্রাহ্মভ্রাতা দিগের সহিত প্রাণে প্রাণে যোগ দিয়াছিলেন। গৃহ প্রবেশের দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাছারী হইতে আসিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গীকে ডাকিয়া বলিলেন "আজ সমাজ আরমানিটোলার বাটী হইতে নূতন মন্দিরে যাইবে।" কন্যা তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "তবে আর আমাদের বাড়ীতে সমাজ হইবে না?" কন্যার চক্ষে জল দেখিয়া বলিলেন "এ তো কাঁদিবার বিষয় নয় এযে আনন্দের বিষয়; আজ কত আনন্দ। এমন আনন্দের দিনে আমি থাকিতে পারিলাম না। এসো আজ আমরা এখানে বসিয়াই ঢাকার ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের সহিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিই।" এই বলিয়া সপরিবারে উপাসনা করিতে বসিলেন।

যদিও সরকারী কার্য্যে বিব্রত থাকায় মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই তথাপি দূর হইতে এই গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে নানা খুঁটিনাটি বিষয়েও সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে নিত্য এবং পারিবারিক উৎসবাদি উপলক্ষে যেমন দরিদ্রসেবা হইত তেমনি এই সামাজিক উৎসব উপলক্ষেও তিনি দরিদ্রদিগকে বিস্মৃত হন নাই।

ব্রজসুন্দর ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে আলোকমালায় সমাজগৃহ এবং সমাজপ্রাঙ্গণ সুসজ্জিত করার এবং দরিদ্রসেবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছায় সে দিন দরিদ্রদিগকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন, পয়সা ও বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল এবং আলোকমালায় মন্দির ও প্রাঙ্গণ সুশোভিত হইয়াছিল। প্রথম উৎসবের দিন দরিদ্রদিগকে দান করিবার সময় বড় এক হাসির ব্যাপার ঘটে। কাঙ্গালীরা শীতবস্ত্র ও মিষ্টান্ন পাইয়া আনন্দে ব্রাহ্মদিগকে আশীর্ব্বাদ

করিতে করিতে চলিল, কিন্তু ব্রাহ্ম আর খ্রীষ্টানের মধ্যে যে কোন প্রভেদ আছে তাহা তাহারা জানিত না। তাই "খ্রীষ্টানদের জয় হোক্" বলিতে বলিতে চলিল। দাতা ব্রাহ্মগণ তখন বলিতে লাগিলেন "আরে আমরা খ্রীষ্টান না বল ব্রহ্মজ্ঞানীদের জয়"—কিন্তু কে কার কথা শোনে? তাহারা "খ্রীষ্টানদের জয় হউক্" বলিয়াই চীৎকার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মেরা যতই বলেন "আরে আমরা খ্রীষ্টান না" ততই তাহারা খ্রীষ্টান বলিয়া চীৎকার করে।

সেই সময় হইতে এখনও পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে দরিদ্রদিগকে বস্ত্র চাউল এবং অর্থ বিতরণ করিবার প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রজসুন্দরই এই প্রথার প্রবর্ত্তক তাহা অনেকেই জানেন না।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিম্নলিখিত নগরকীর্ত্তনটী গীত হইয়াছিল।

নগরকীর্ত্তন।

তোরা আয় রে ভাই এতদিনে দুঃখের নিশি
হল অবসান নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন,
পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন;
দিতে পরিত্রাণ, করুণা নিধান
ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ।
খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন,
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,
তথায় দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান,
নরনারী-সাধারণের সমান অধিকার।
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি নাহি জাতবিচার,
ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার বিনাশিতে,
স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্তে আইল।

যে যাবি আয় বিনা মূল্যে ভবসিন্ধু পার ;
তোরা আয় রে আয় ত্বরায় -- এবার নাই কোন ভয়,
পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।
একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার। সংসারে মিছে মায়ায়
ভুলনারে আর, চল সবে যাই বিলম্বে কায নাই ;
দীননাথের লইয়ে শরণ, হৃদয় মাঝে হৃদয় নাথে কর
দরশন। ঘুচিবে যন্ত্রণা পাইবে সান্ত্বনা, প্রভুর
কৃপাগুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধাম।

চল্লিশ জন শিক্ষিত যুবকের একত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ :—এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্রের আগমন ও বক্তৃতাদিতে পূর্ব্ববঙ্গে এক প্রবল ধর্ম্মোৎসাহের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই চিরস্মরণীয় মহোৎসবের দিনে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে ৪০ জন যুবক কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। উঁহাদের মধ্যে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণই ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন :—বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দী, অম্বিকাচরণ সেন, বিহারীলাল সেন, কৈলাশ-চন্দ্র নন্দী, কালীনারায়ণ গুপ্ত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, প্যারীমোহন গুপ্ত, গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত, বরদানাথ হালদাথ, সারদানাথ হালদার, কেদার নাথ রায়, রজনীকান্ত ঘোষ, প্রসন্নকুমার রায়, প্রসন্ন চন্দ্র মজুমদার, কালী নারায়ণ রায়, ভুবন মোহন সেন, নবকান্ত চট্টো-পাধ্যায়, বঙ্গচন্দ্র রায়, গণেশ চন্দ্র ঘোষ, মিয়া জালালুদ্দিন, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে ইঁহারা সকলেই বহুপূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সঙ্গত সভার উৎসাহী সভ্য ছিলেন। বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ রায়, রজনীকান্ত ঘোষ, বরদানাথ হালদার প্রভৃতি বিক্রমপুর হিন্দুসমাজের ও অন্যান্য স্কুলের সম্ভ্রান্ত যুবকগণ পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুসমাজের কঠোর নির্য্যাতন উপেক্ষা করিয়া

প্রকাশ্যভাবে সঙ্গত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পরে এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহারা কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হন।

ব্রজসুন্দরের ঢাকায় গমন ঃ—১৮৬৯ সনে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইবার অব্যবহিত পরেই ব্রজসুন্দর ২৪ পরগণা হইতে ঢাকায় বদলি হন। বলা বাহুল্য, অনেক আকিঞ্চনের পর তিনি ঢাকার ব্রাহ্মদিগকে ও ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হন। আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সমাজের কার্য্য চলিতে লাগিল। ১৮৭০ সনের শ্রাবণ মাসে যুবক ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য "বঙ্গবন্ধু" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। এই পত্রিকা দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কতক পরিমাণ সাহায্য হইয়াছিল। বাবু বরদানাথ হালদার ও কৈলাশচন্দ্র নন্দী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। যুবক ব্রাহ্মগণ এই সনেরই ফাল্গুন মাসে "শুভসাধিনী" নামে একটী সভা স্বংস্থাপন করেন। সুরাপান, বাল্যবিবাহ নিবারণ, রুগ্নব্যক্তিদিগকে সাহায্য ইত্যাদি এই সভার প্রধান কার্য্য ছিল। এই সভা উৎসাহের সহিত ৩।৪ বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে অধিকাংশ সভ্যের স্থানান্তর গমনে ইহার কার্য্য আর নিয়মমত চলিতে পারে নাই। এই সভা হইতে "শুভসাধিনী" নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি পত্রিকাও বাহির হইয়াছিল। বাবু কালীনারায়ণ রায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী-নিয়োগ ও নিয়মাবলী প্রণয়ন ও সংশোধন।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ ১৮৪৬ সনে স্থাপিত হইলেও এতকাল ইহার নিজ গৃহ কিম্বা স্থাবর অস্থাবর কোন সম্পত্তিই ছিল না। ব্রজ-

সুন্দরের গৃহেই সমাজ সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যাদি পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। সমাজের নিজের গৃহ না থাকায় সময় সময় বড়ই অসুবিধা হইত। ব্রজসুন্দরের গৃহে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হওয়াতে তাঁহার জননী ও কম অত্যাচার করিতেন না। যখনই জননী কাশীশ্বরী কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় যাইতেন বাড়ী ফিরিবার সময় ব্রাহ্মসমাজের আস্‌বাব্ নৌকা বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেন। পুত্র আফিস হইতে আসিয়া যখন দেখিতেন ব্রাহ্মসমাজের গৃহ একেবারে শূন্য তখনই বুঝিতেন ইহা জননীর কর্ম্ম; সেই জন্য কখনও কাহাকেও এসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতেন না, কিম্বা কেহ তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে ও সাহস পাইত না। তিনি পুনরায় সমস্ত ক্রয় করিয়া কিম্বা প্রস্তুত করাইয়া দিতেন। জননী এইরূপে ক্রমে এত আস-বাব লইয়া গিয়াছিলেন যে পরে ব্রজসুন্দর ঐ সকলের সাহায্যে উলাইল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উপাসক ব্রাহ্মগণও সময় সময় জননী কাশীশ্বরী দ্বারা যথেষ্ট অভ্যর্থিত হইতেন। উপাসনা শেষে তাঁহারা যখন প্রাঙ্গন দিয়া গমন করিতেন তখন কাশীশ্বরী অনেক সময় উপর হইতে গোময় মিশ্রিত জল তাঁহাদিগের মস্তকে ঢালিয়া দিতেন এবং তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি গালি দিতেন। ব্রজসুন্দর জননীকে কিছু বলিতে না পারিয়া শশব্যস্তে উপাসকদিগের নিকট জননীর এই কার্য্যের জন্য নানা অনুনয় বিনয় প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিতেন। যাহাহউক ১৮৬৯ সনে ব্রাহ্মসমাজের নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইলে ব্রজসুন্দর সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি নবনির্ম্মিত পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহকে নিরাপদ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন এবং ট্রাষ্টী-নিয়োগ ও নিয়মাবলী প্রণয়ণ ও সংশোধন করিতে মনযোগী হইলেন।

আমরা ঢাকা অথবা পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী ও কার্য্যবিবরণ পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে যেসময় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে সমাজ সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি

সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল সেই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজে কিম্বা তৎপরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও তদ্রূপ নিরাপদ নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইহাতে কখনও কোনও ব্যক্তিবিশেষকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। ইহা ব্রজসুন্দরের এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের কার্য্য-দক্ষতা, সদ্বিবেচনা এবং গভীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। যদিও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইতে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২২।২৩ বৎসর বলিতে গেলে ব্রজসুন্দর একাকী ইহার অধিকাংশ ব্যয় ভার এবং দায়ীত্ব বহন করিয়াছিলেন তথাপি তিনি কখনও নিজে সামাজিক কার্য্যাদিতে কর্তৃত্ব কিম্বা আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হন নাই; এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কীয় কার্য্যেই হউক কিম্বা অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যেই হউক, সকলের অগ্রগামী হইলেও তিনি নিজকে সকলের পশ্চাতে রক্ষা করিতেন। সমাজের কল্যাণই ব্রজসুন্দরের একমাত্র কামনা ছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাবে একদিনের জন্যও তিনি আপনার চিত্তকে কলুষিত হইতে দেন নাই, ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্ম্মাণ হইলে অর্থসাহায্যকারী ব্যক্তিগণের সভাতে যে সমস্ত প্রস্তাব স্থিরকৃত হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণ কমিটীর সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন আয় ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে যে রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহা মান্য করিয়া লওয়া গেল।

২। উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ কমিটী তাঁহাদিগের সংস্থান পত্রে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে উক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইলে তাহা পূর্ব্ব-বাঙ্গালা স্থিত ব্রাহ্মসমাজ সমূহের মনোনীত নিতজন ট্রাষ্টীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। কিন্তু তদ্রূপ নিয়ম না করিয়া তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র নিয়ম করা হউক।

৩। উক্ত গৃহনির্ম্মাণকমিটী ইহাও প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে গৃহ

প্রস্তুত হইলে তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ অথবা অন্য প্রকার কোন কোন লোকে সময়ে সময়ে বাসা করিয়া থাকিতে পারিবেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত তদনুরূপ গৃহ প্রস্তুত না হওয়াতে এইক্ষণ তদ্বিষয়ে নিয়ম করা অনাবশ্যক।

৪। বিগত ১২৭৫ সনের শ্রাবণ মাসে গৃহনির্ম্মাণ কমিটীর পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের সংস্থাপন পত্র নামক যে এক দলিল লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়াছিলেন তাহার অন্তর্গত নিয়মাবলী, এইক্ষণ গৃহ সম্বন্ধে যে সমুদায় নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাইবেক, তাহার মধ্যে নিবেশিত করা হউক।

৫। গৃহ নির্ম্মাণ কমিটীর প্রস্তাবিত পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ব্যবহার বিষয়ক নিয়মাবলি পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের পর যেরূপ হইল তাহা লিপিবদ্ধ করা হউক।

৬। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ও ট্রাষ্টী নিয়োগ এবং পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিবার পর যেরূপ সুস্থির হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ভার নিম্ন লিখিত কমিটীর উপর অর্পিত হউক। তাঁহাদিগের লিখিত নিয়মাবলা প্রস্তুত হইলে পুনরায় উপস্থিত চাঁদাদায়ীদিগের দ্বারা আলোচিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইবেক।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, সভাপতি।
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ (উকীল), সভ্য।
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ (ক্লার্ক), সভ্য।
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সভ্য।
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন, সম্পাদক।

নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিবার ভারপ্রাপ্ত কমিটীর লিখিত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের পর যেরূপ স্থিরিকৃত হইল তাহা লিপিবদ্ধ করা হউক।

গৃহনির্ম্মাণ কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকামোহন রায়ের নামে গৃহ সংসৃষ্ট ভূমির পাট্টা যে লিখিত আছে, তাঁহারা তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ট্রাষ্টীগণের নামে নূতন পাট্টা লিখিয়া দিবেন।

৯। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ এই সভার প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা মনোনিত করিলে, এবং সেই সভাগৃহনির্ম্মাণ কমিটীরকৃত ঋণ ও অন্যরূপ গৃহসম্বন্ধীয় দেনা পরিশোধ করিবার ভার গ্রহণ করিলে, গৃহনির্ম্মাণ কমিটী উক্ত গৃহ সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ ভার তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিবেন। সেই পর্য্যন্ত এই গৃহ এইক্ষণকার ন্যায় গৃহনির্ম্মাণ কমিটির হস্তে থাকিবেক। তাঁহারা দেনা পরিশোধের জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

১০। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণার্থ চাঁদাদায়ীদিগের নিকট হইতে শীঘ্র শীঘ্র সমুদয় চাঁদার টাকা অদায়, এবং নূতন চাঁদা সংগ্রহ করিয়া গৃহনির্ম্মাণকমিটীর কৃত ঋণ পরিশোধ ও গৃহের আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র প্রস্তুত, পুস্তকালয়ের জন্য পুস্তক ক্রয়, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ, ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

১১। যদি কোন ব্যক্তি পুস্তকালয়ের জন্য দশ হাজার টাকা, এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য পাঁচ হাজার টাকা, এককালীন দান করেন, তবে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ঐ পুস্তকালয় এবং বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নামে ঐ পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন।

১২। এই সমুদয় কার্য্য সমাপ্ত হইলে যাঁহারা এপর্য্যন্ত চাঁদা দিয়াছেন, এবং অতঃপর যাঁহারা চাঁদা দিবেন, তাঁহাদিগের সমুদায়ের নাম প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত করিয়া, অথবা অন্য প্রকার স্থায়ী রূপে লিখিয়া, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজ গৃহের কোন প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দিবেন।

১৩। গৃহনির্ম্মাণ কমিটী এপর্য্যন্ত এই গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগের সকলকে বিশেষতঃ তাঁহাদিগের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাস ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন মহাশয়কে, বিশেষ ধন্যবাদ প্রদত্ত হউক।

১৪। গৃহ নির্ম্মাণ কমিটীর সম্পাদক তাঁহার রিপোর্টে শ্রীযুক্ত বাবু উমাকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক মহাশয়গণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ বিষয়ে যে সহায়তা পাইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

১৫। গৃহ নির্ম্মাণ কমিটি এই গৃহের ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে প্রদান করিলে পর, গৃহ সম্পর্কীয় নিয়মাবলী বলবৎ হইবেক এবং তদনুসারে কার্য্য হইতে থাকিবেক।

পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ নির্ম্মাণার্থ চাঁদাদায়ীদিগের নিরূপিত, উক্ত গৃহ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

প্রথম ভাগ—গৃহের ব্যবহার বিষয়ক নিয়মাবলী।

১। একমাত্র অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত এই পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল।

২। এই পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ, ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত সামাজিক উপাসনার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে। উক্তরূপ উপাসনা কালে সকল জাতীয় ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকের উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

৩। এই গৃহে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার সামাজিক উপাসনা হইবে। এতব্যতীত ১১ই মাঘ অর্থাৎ যে দিবসে বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম সংস্থাপিত হয়; এবং ২২শে অগ্রহায়ণ অর্থাৎ যে

দিবসে ঢাকা নগরে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন নিবন্ধন পূর্ব্ববাঙ্গলা প্রদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, এবং পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহও যে দিবসে প্রতিষ্ঠিত হয় ; আর বঙ্গীয় নববর্ষের প্রথম দিবস এই তিন দিবসে সামাজিক উপাসনা ও উপলক্ষসমুচিত বক্তৃতাদি হইবে।

৪। এই গৃহে পূর্ব্বোক্তরূপ সামাজিক উপাসনা ব্যতীত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচার নিমিত্ত, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন, তদর্থ সভা ও বক্তৃতাদি হইতে পারিবে।

৫। অন্যান্য স্থানের লোক ঢাকায় উপস্থিত হইতে পারেন এমন কোন সময়ে ঐ গৃহে প্রতি বৎসর অন্যূন একবার একটী সভা হইবে। তাহাতে পূর্ব্ববাঙ্গলা প্রদেশবাসী সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আহুত হইবেন, এবং তাহাতে সামাজিক উপাসনা ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি এবং প্রচার নিমিত্ত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন তদর্থ, বক্তৃতা প্রবন্ধপাঠ আলোচনা অথবা অন্য কার্য্য হইবে।

৬। এই গৃহের অভ্যন্তরে কিম্বা প্রাঙ্গনমধ্যে কোথাও পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ব্যতীত, কোন সৃষ্টবস্তু বা মনুষ্য অথবা কল্পিত দেবদেবীর উপাসনা, বন্দনা, পূজা কিংবা পদধারণ প্রভৃতি কোন প্রকার পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদিত কোন কার্য্য অথবা উপাসনা স্থানের গৌরবনাশক কোন প্রকার ব্যাপার, অথবা পান ভোজনাদি হইতে পারিবে না।

৭। এই গৃহের অন্তর্গত পার্শ্বস্থ দ্বিতল গৃহে যে গ্রন্থাধান সংস্থাপিত হইবে, তাহাতে ধর্ম্ম, নীতি ও জ্ঞান শিক্ষার উপযোগী পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি থাকিবে। এই গৃহের ব্যবহার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিরূপিত নিয়মানুসারে এই গ্রন্থ সংগ্রহ সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থ সংগ্রহে কোন প্রকার কুনীতি-প্রবর্ত্তক পুস্তকাদি থাকিতে পারিবে না।

৮। এই গৃহের এই সংস্থানপত্রে নিম্নলিখিত ধর্ম্মবীজ চতুষ্টয় ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলবীজ এবং ভিত্তিরূপে পরিগৃহীত হইল।

(১) পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

(২) তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ, কহ সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

(৩) একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

(৪) তাঁহাকে প্রীতিকরা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

দ্বিতীয় ভাগ—পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিকার ও দায়িত্ব-বিষয়ক নিয়মাবলী।

৯। এই গৃহ, পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক, ট্রাষ্টীগণের অধিকাংশের সম্মতিতে নিয়োজিত,—ঢাকায় উপস্থিত থাকেন এমত অন্যূন পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্ক,—সাতজন সভ্যের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। ট্রাষ্টীগণও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হইতে পারিবেন।

১০। এই গৃহ যে সমুদয় কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ার নিয়ম, নিরূপণ করা গেল, পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, এই গৃহ সেই সমুদয় কার্য্যে ব্যবহার করিবেন; এই গৃহে তদ্বিপরীত কোন কার্য্য হইতে দিবেন না। এই গৃহ এবং তৎসংস্থষ্ট ভূমি জিনিসপত্র ও পুস্তক সংগ্রহ ইত্যাদির সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধান করিবেন; এই গৃহ এবং তৎসংসৃষ্ট জিনিসপত্র আবশ্যকমত সময়ে সময়ে মেরামত করিবেন; পুস্তক সংগ্রহ বৃদ্ধি করিবেন; গৃহ ও তৎসংস্থষ্ট ভূমির খাজানা আদায় করিবেন; এবং উপযুক্ত আচার্য্য প্রভৃতি কর্ম্মচারী

নিযুক্ত করিয়া এই গৃহ এবং তৎসংস্পৃষ্ট ভূমি জিনিসপত্র ও পুস্তক সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কীয় সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবেন; এবং তৎসম্পর্কে যতপ্রকার ব্যয় আবশ্যক হইবে তাহা নির্ব্বাহ করিবেন; আর এই গৃহসম্পর্কীয় সকল প্রকার দেনার জন্য উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ সকলে ও প্রত্যেকে দায়ী থাকিবেন।

১১। উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি এই গৃহ অথবা তৎসংস্পৃষ্ট ভূমি জিনিসপত্র কিংবা পুস্তকসংগ্রহ কিছুই দান বা বিক্রয় করিতে, অথবা বন্ধক দিতে, অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের কোন প্রকার দেনার জন্য এই গৃহ কিংবা তৎসংস্পৃষ্ট ভূমি জিনিসপত্র পুস্তকসংগ্রহ ইত্যাদি কিছুই ক্রোক বা নীলাম হইতে পারিবে না।

১২। যদি সাধারণ মেরামত ভিন্ন, এই গৃহ অথবা তৎসংস্পৃষ্ট ভূমি জিনিসপত্র বা পুস্তক সংগ্রহের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া বা বিক্রয় করিয়া, বিশেষ পরিবর্ত্তন কি মেরামত করা আবশ্যক হয়; অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচার কিংবা ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন তৎসমুদয় বিষয়ের সুবিধার জন্য এই গৃহের বৃদ্ধি অথবা এই গৃহ সংস্পৃষ্ট ভূমিতে নূতন গৃহাদি প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়; তবে ট্রাষ্টীগণের অধিকাংশের স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা তাঁহাদিগের অভিমত লইয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যেরা তাহা করিতে পারিবেন। কিন্তু এই গৃহ অথবা তৎসংস্পৃষ্ট ভূমি জিনিসপত্র পুস্তক সংগ্রহ ইত্যাদির উন্নতি ও বৃদ্ধি এবং এই নিয়মাবলীর লিখিত কার্য্য সমুদয়ের অধিকতর সুবিধা সম্পাদন উদ্দেশ্য ভিন্ন, উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ অথবা ট্রাষ্টীরা এই গৃহ এবং তৎসংস্পৃষ্ট ভূমি জিনিসপত্র পুস্তকসংগ্রহ ইত্যাদি ভাঙ্গিতে বা বিক্রয় করিতে অথবা কোন প্রকার অপচয় করিতে পারিবেন না।

১৩। পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উক্ত সমা-

জের আয় ব্যয়ের হিসাব তিন তিন মাস অন্তর প্রত্যেক ট্রাষ্টীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

তৃতীয় ভাগ—ট্রাষ্টীগণের অধিকার ও দায়িত্ব-বিষয়ক নিয়মাবলী।

১৪। পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ব্যবহার, এবং উক্ত গৃহের সহিত পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সম্পর্ক বিষয়ে যে সমস্ত নিয়ম নিরূপিত করা গেল, সেই সমুদয় নিয়ম অনুসারে কার্য্য চলিতেছে কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা ট্রাষ্টীগণের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইবে।

১৫। ব্রাহ্মধর্ম্মের চারিটি মূল বীজ বলবৎ রাখিয়া কি কি কার্য তদনুমোদিত, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন্ কোন্ বিষয় প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন, তাহা ট্রাষ্টীগণের মতানুসারে নির্দ্ধারিত হইবে। যদি ট্রাষ্টীগণ তদ্বিপরীত কোন বিষয় অথবা এই নিয়মাবলীর কোন নিয়মের অন্যথা কোন কার্য্য হইতে দেখেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদিগের অধিকংশের স্বাক্ষরিত পত্র স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে স্বকীয় অভিমত জানাইবেন্। ট্রাষ্টীগণ কর্ত্তৃক এইরূপ পত্র প্রকাশিত হইলে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যেরা তদনুসারে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হইবেন।

১৬। যদি পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, ট্রাষ্টীদিগের প্রকাশ্য অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে এই নিয়মাবলীর লিখিত কোন বিষয়ের অন্যথাচরণ করিতে থাকেন, তবে উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশের এক মাস পরে ট্রাষ্টীদিগের অধিকাংশ স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া এই গৃহ এবং তৎসংক্রান্ত ভূমি জিনিসপত্র পুস্তক সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যবহার করিবার অধিকার, উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্ত

হইতে উঠাইয়া লইয়া এই নিয়মাবলী প্রচলন বিষয়ে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

১৭। যদি পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কিংবা ঐ সমাজের পক্ষে অন্য ব্যক্তি হইতে এই গৃহসংস্থষ্ট ভূমির খাজানা পরিশোধ না হয়, তবে যে কোন ট্রাষ্টী আপনা হইতে ঐরূপ দেনার টাকা পরিশোধ করিবার পরে, আদালতে নালিস ইত্যাদি উপযুক্ত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যগণ অথবা তাঁহাদিগের প্রত্যেক হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

১৮। যদি পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার শৈথিল্য বশতঃ এই গৃহসংস্থষ্ট জিনিসপত্র পুস্তক বা অন্য প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হয়, অথবা উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই গৃহসংস্থষ্ট কোন অস্থাবর সম্পত্তির অযথা ব্যবহার অথবা উপযুক্তরূপ তত্ত্বাবধানের ক্রটি দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতি করেন, তবে যে কোন ট্রাষ্টী ক্ষতিপূরণের জন্য আদালতে নালিশ করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের সমুদয় ও প্রত্যেক হইতে উপযুক্ত পরিমাণে টাকা ডিক্রী করিয়া, ঐ অপচয়ের পূরণ করিতে পারিবেন।

১৯। যদি ভূমির খাজানা অথবা ভূমি সম্পর্কীয় অন্য প্রকার দায় আদায়ের নিমিত্ত এই গৃহ অথবা তৎসংস্থষ্ট ভূমি নীলাম হইয়া যায়, তবে সেই ক্ষতিপূরণের জন্য ট্রাষ্টীগণের প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্ট নালিশ করিয়া নীলাম দ্বারা বিক্রীত সম্পত্তির উচিত মূল্যের পরিমাণ টাকা আদায় করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট সেই টাকা ঢাকাস্থ সাধারণের জ্ঞানোন্নতি সাধন সম্পর্কীয় কোন কার্য্যে ব্যবহার করিবেন।

২০। পূর্ব্ববাঙ্গলা প্রদেশ নিবাসী ও পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ভিন্ন, এবং ত্রিংশৎ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক, কোন ব্যক্তি ট্রাষ্টীরূপে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। যাঁহারা ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা

যাবজ্জীবন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন ; কিন্তু ইচ্ছা করিলে সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া কোন ট্রাষ্টী স্বকীয় পদ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। যদি কোন ট্রাষ্টী কোন কারণে ট্রাষ্টীর কার্য্যভার প্রাপ্ত থাকিবার অনুপযুক্ত হন, অথচ স্বয়ং সেই পদ পরিত্যাগ না করেন, তবে অবশিষ্ট ট্রাষ্টীগণের অধিকাংশ এক মত হইলে তাঁহারা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

২১। মৃত্যু, পদপরিত্যাগ বা পদচ্যুতির দ্বারা কোন ট্রাষ্টীর পদ শূন্য হইলে, পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ট্রাষ্টী নিয়োগ নিমিত্ত একটি অধিবেশনের দিন ধার্য্য করিয়া তাহার অন্যূন এক মাস পুর্ব্বে ট্রাষ্টীগণকে তত্ত্ব দিবেন। এই সভাতে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য এবং ট্রাষ্টীগণের মধ্যে যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদিগের অধিকাংশের মতানুসারে ট্রাষ্টী মনোনীত হইবেন। যদি কোন ট্রাষ্টীর পদ শূন্য হইবার পর ছয় মাস মধ্যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যেরা উক্তরূপ ট্রাষ্টী নিয়োগ নিমিত্ত অধিবেশনের দিন নিরূপণ করিয়া ট্রাষ্টী নিয়োগ না করেন তবে ট্রাষ্টীগণ আপনাদিগের অধি-কাংশের মতানুসারে নূতন ট্রাষ্টী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

২২। নিম্নলিখিত ১৪ জন ব্যক্তিকে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ট্রাষ্টীর পদে নিয়োগ করা গেল; ইঁহাদিগের মধ্যে যে সাত জনের পদ প্রথমতঃ শূন্য হইবে তাঁহাদিগের স্থলে নূতন ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইবেন না। তৎপরে যখনই ট্রাষ্টীগণের পদ শূন্য হওয়া দ্বারা ট্রাষ্টী-গণের সংখ্যা সাত জনের ন্যূন হইবে, তখনই পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নূতন ট্রাষ্টী নিয়োগ করিয়া উক্ত সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র (উলাইল)
শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াকুমার দত্ত (জৈনসার)
শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাস (লোনসিং)
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস (তেলীর বাগ)
শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু (মালখাঁ নগর)

শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন (বেথুরা)
শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসু (মালখাঁ নগর)
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ (যোলঘর)
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুকার সেন (রূপঠা)
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ (ভরাকইর)
শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকামোহন রায় (ঢাকা)
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ (হাঁসাড়া)
শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় (নবগ্রাম)
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন (বাএড়া)

চতুর্থ ভাগ—পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কীয় নিয়মাবলী।

২৩। নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসারে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, এই অভিপ্রায়েই উক্ত সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি গৃহ ব্যবহার করিবার ভার অর্পিত হইল। উক্ত সমাজের কার্য্য এই সমুদায় নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত না হইলে, তাঁহারা উক্ত গৃহ ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন না।

২৪। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ বিবিধ সদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজচতুষ্টয়ের অনুযায়ী ধর্ম্ম সাধারণ্যে প্রচার করিবেন; নীতি ও জ্ঞান শিক্ষার দ্বারা দেশীয় লোকের মন মার্জ্জিত ও উন্নত করিবেন; এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অন্যান্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণ মঙ্গলোন্নতি সংসাধন করিবেন।

২৫। পূর্ব্ব বাঙ্গালা প্রদেশ নিবাসী বা প্রবাসী যে কোন ব্যক্তি অন্যূন অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক হইবেন, ও ব্রাহ্মধর্ম্মবীজচতুষ্টয়ে বিশ্বাস করিবেন, এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক অন্যূন তিন টাকা দান করিবেন, তিনিই কার্য্য নির্ব্বাহ সভার সভ্যগণের অধিকাংশের দ্বারা মনোনীত হইলে, উক্তসমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।

২৬। বিদেশীয় লোক ঢাকাতে উপস্থিত হইতে পারেন এমত কোন সময়ে, পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবে তাহাতে বৎসর বৎসর নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্য মনোনীত করা, পূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্যগণের কার্য্য বিবরণ আলোচনা করিয়া তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা, ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদিত হইবে। স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলে, সভ্যগণ পত্রদ্বারা প্রতিনিধি নিয়োগ, অথবা অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, এই বাৎসরিক অধিবেশনের বিতর্কিত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে, মতপ্রকাশ করিতে পারিবেন। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে সমুদয় বিষয় নিরূপিত হইবে।

২৭। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের চতুর্থাংশ একমত হইলে তাঁহারা, অথবা সম্পাদক, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ব-বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশনের জন্য সভ্যগণকে আহ্বান করিতে পারিবেন। এইরূপ সভাতে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের নিয়মানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অথবা অন্য সময়ের সাধারণ অধিবেশনের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হইবেন।

২৮। প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সাতজন কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য মনোনীত হইবেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই আবশ্যক হইবে, যে তাঁহারা ঢাকায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন, এবং পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রহ্মসমাজের সভ্য ও অন্যূন পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক হইবেন। যাঁহারা এক বৎসর কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য থাকিবেন, তাঁহারা পর বৎসরের জন্যও পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন। যদি ট্রাষ্টীগণের অধিকাংশ স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া কোন এক কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্যের নিয়োগের পর দুই মাস মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে অসম্মতি প্রকাশ করেন, অথবা

অন্যরূপে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কোন সভ্যের পদ শূন্য হয়, তবে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অবশিষ্ট সভ্যগণ তৎপদে অন্য লোক নিয়োগ করিবেন। এই কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উপর পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবার ভার থাকিবে, এবং তাঁহারা তন্নিমিত্ত দায়ী থাকিবেন।

২৯। এই কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্যগণ একজন সম্পাদক, এবং সামাজিক উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এক বা ততোধিক আচার্য্য, ও সমাজ সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। এবং সময়ে সময়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিবেন। সম্পাদক কার্য্য নির্ব্বহক সভার সভ্য ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারিবেন না। প্রতি মাসে এবং আবশ্যক হইলে অন্য সময়ে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হইবে। পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য্য হইতে পারিবে এবং অধিকাংশের মতে সমুদয় বিষয় নিরূপিত হইবে। এই সমুদয় অধিবেশনে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ নিম্নলিখিত কার্য্য সম্পাদন করিবেন; যথা—পূর্ব্ব-বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের নূতন সভ্য মনোনীত করা; আবশ্যক হইলে সভ্য শ্রেণী হইতে কোন ব্যক্তির নাম রহিত করা; সমাজের উপরিউক্ত সমুদয় কর্ম্মচারী নিয়োগ ও আবশ্যক হইলে রহিত করা; সমাজের হিসাব পত্র রাখা ও পর্য্যবেক্ষণ করা; এবং সমাজ সম্পর্কে অন্যান্য সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করা ইত্যাদি।

৩০। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা, সমাজ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বহি রাখিবেন। (১) সভ্যগণের নাম ও চাঁদার সংখ্যা। (২) আয় ব্যয়ের হিসাব। (৩) সমাজের বার্ষিক এবং অন্য সময়ের সাধারণ অধিবেশনের এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভার মাসিক এবং অন্য সময়ের অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ বহি। (৪) সম্পাদক অথবা সমাজের অন্য কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রের নকল বহি। (৫) সমাজ অথবা সমাজের কোন কর্ম্মচারীর নিকট অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত পত্রের ফাইল।

(৬) সমাজে যে সমুদয় প্রবন্ধ পঠিত ও বক্তৃতা হইবে তাহার সারমর্ম্মের বহি এবং প্রবন্ধ সমুদয়ের একপ্রস্থ নকল এবং বক্তৃতা লিখিত হইলে তাহারও একপ্রস্থ নকলের ফাইল। (৭) পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহসম্পর্কীয় সমুদয় জিনিস পত্র ও পুস্তকের তালিকা। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্যের এই সমস্ত বহি দর্শন অথবা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

৩১। পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সাম্বৎসরিক অধিবেশনের একমাস পূর্ব্বে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বিজ্ঞাপন দিয়া সেই সভা আহ্বান করিবেন। এবং তাহাতে গতবৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব, তাঁহাদিগের কার্য্য বিবরণ এবং সাধারণতঃ সমাজ সম্পর্কীয় সমুদয় বিষয়ের এক রিপোর্ট পাঠ করিবেন এবং নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্য মনোনীত হইলে তাঁহাদিগকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিবেন। বৎসর বৎসর সেই রিপোর্ট ও সমাজে পঠিত প্রবন্ধ বা বক্তৃতাদির মধ্যে যাহা উপযুক্ত বোধ করিবেন, তাহা পুস্তাকারে প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক সভ্যের নিকট এক এক খণ্ড পাঠাইবেন এবং অবশিষ্ট উচিত মূল্যে বিক্রয় করিবেন। সমাজে পঠিত প্রবন্ধ ইত্যাদি মুদ্রাঙ্কন অথবা বিক্রয় ইত্যাদি লেখকগণ করিতে পারিবেন।

৩২। পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে যে সমস্ত পুস্তক অথবা জিনিস পত্র খরিদ হইবে অথবা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণার্থ চাঁদাদায়িগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত জিনিস পত্র ও পুস্তকের সহিত মিলাইয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সমুদয়ের তালিকা রাখিবেন। এবং সেই সমুদয় জিনিস পত্র ও পুস্তক ইত্যাদি উক্ত গৃহের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে।

৩৩। পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশনে অধিকাংশের মত হইলে, এবং ট্রাষ্টীগণের অধিকাংশ সম্মত হইলে, কেবল এই চতুর্থ ভাগের লিখিত পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কীয় সমুদয় নিয়ম পরিবর্ত্তীত হইতে পারিবে। নতুবা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা ও তাহার প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজে গভীর আন্দোলন।

কুলীন কুমারী বিধুমুখী ঃ—পূর্ব্ববাঙ্গলার ব্রাহ্মগণ কিরূপে প্রথমে সংস্কার কার্য্যে ও নারীজাতির উন্নতিকল্পে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হইতেছে। ইংরাজি ১৮৭১ সনের অগষ্ট মাস বিক্রমপুরের এক কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল। বাবু বরদানাথ হালদার ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অতি নিকট আত্মীয়া কুলীন কুমারী বিধুমুখী দেবীর একজন অতি বৃদ্ধ কুলীনের সহিত বিবাহ স্থিরীকৃত হয়। উৎসাহী ব্রাহ্মযুবক বরদানাথ ও নবকান্ত এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে একান্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহারা প্রাণপাত করিয়া বিধুমুখীকে এই সামাজিক ভীষণ অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং এক দিন গোপনে তাঁহাকে ছদ্মবেশে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। সেখানে প্রথমে ব্রাহ্ম-দিগের নিকটে ও পরে কেশবচন্দ্রের ভারত আশ্রমের অভেদ্য দূর্গে বিধুমুখী আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। বিধুমুখী পিত্রালয় হইতে চলিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু ইঁহার বিপদের এখানেই শেষ হইল না। এই ঘটনায় ঢাকা নগরে এবং বিক্রমপুরের হিন্দু সমাজে ও তৎকালীন ঢাকা ও কলিকাতার পত্রিকাসমূহে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বিধুমুখী দেবীর অভিভাবকগণ বাবু বরদানাথ হালদারের নামে ম্যাজিষ্ট্রেট লায়াল সাহেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং তাঁহার নামে এক ওয়ারেণ্ট বাহির করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে বরদানাথ প্রভৃতিরই জয় হইল। বিধুমুখী দেবীর আত্মীয়গণ তাঁহাকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু এড্‌ভোকেট জেনারাল ইহার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। সুতরাং বিধু-মুখীর উপর বলপ্রয়োগ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। ইহাতে তাঁহার অভিভাবকগণ বরদানাথ, সারদানাথ, নবকান্ত প্রভৃতির উপর জাতক্রোধ হইলেন। নানা প্রকারে তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে

লাগিলেন; এমন কি তাঁহাদের জীবন সংশয় পর্য্যন্ত হইয়াছিল। একদিন বরদানাথকে ডালবাজারের নিকটবর্ত্তী সবজী মহলের রাস্তায় গুণ্ডা দ্বারা মস্তকে দারুণ প্রহার করিয়া হত্যা করিবার উপক্রম করিয়াছিল। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রজনীনাথ রায়ের সহিত বিধুমুখী পরিণীতা হন। রজনীনাথ পরে Accountant General হইয়াছিলেন। এই আন্দোলনের সময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরে "পুণ্যভূমি-ভারতবর্ষ" বিষয়ে একটী ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি অগ্নিময় বাক্যে দেশীয় নানাবিধ কুরীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই সময় বরদানাথ হালদারও "নির্ম্মলার উপাখ্যান" নামে একখানি অতি সুন্দর সামাজিক উপন্যাস প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে কৌলিন্য প্রথার দোষ সুন্দর-রূপে চিত্রিত হইয়াছিল। এই প্রকার নানা উপায়ে ব্রাহ্মগণ সেই সময় দেশ মধ্যে এক নবচৈতন্য, নব জাগরণের ভাব আনিয়া দিয়াছিলেন। চারিদিকের আন্দোলন এবং তীব্র প্রতিবাদেরও সুফল ফলিল—ব্রাহ্মগণের প্রাণ গত চেষ্টা বৃথা হয় নাই—অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিক্রমপুর, মাণিকগঞ্জ, মহেশ্বরদি প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকটী বিধবা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন।

নৃত্যকালী দেবী ঃ—এই সময়ে বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোহাগ-দল গ্রাম হইতে শ্রীমতী নৃত্যকালী দেবী নাম্নী জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা পত্নী, দুইটী অবিবাহিতা কন্যা, পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। এই নৃত্যকালী দেবীর স্বামী জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় কিঞ্চিৎ উদার ভাবাপন্ন ছিলেন এবং কুলীন হইয়াও কৌলিন্য প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে পত্নীকে বলিয়া গিয়াছিলেন—"পুত্রকন্যাদের লেখা পড়া শিখাইও এবং বয়স্ক হইলে বিবাহ দিও।" নৃত্যকালী দেবীও প্রাণপাত করিয়া পতির শেষ ইচ্ছা পালন করিয়া-

ছিলেন। ইনি যেরূপ আশ্চর্য্য সাহসিকতা ও বিশ্বাসের বল দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। নৃত্যকালী দেবী বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে থাকিয়া পুত্রকন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কন্যারা লেখা পড়া করিত বলিয়া তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভ্রাতার সাহায্যে নৃত্যকালী দেবী নিজেও কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক পত্রিকাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন এবং গোপনে উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। সময় সময় ঠাকুর ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া পাঠ ও উপাসনা করিতেন। তিনি কন্যা-দিগকে কৌলিন্যপ্রথার কবল হইতে রক্ষা করিবাব জন্য বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করাই স্থির করিলেন এবং গঙ্গাস্নান উপ-লক্ষে পুত্র, পুত্রবধু ও কন্যাদুটীকে লইয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকা যোগে কলিকাতায় গমন করিলেন। তখনকার দিনে কলিকাতার পথ কিরূপ বিপদময় ছিল তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাদের আসিতে ১৪।১৫ দিন সময় লাগিয়াছিল। সে সময় পথে যে কত সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়া আসিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে নৃত্যকালী দেবীর হৃদয়ের বল ধারণা করা যায়। কলিকাতার ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগকে পরম আদরে গ্রহণ করেন। তিনিও সেই সকল স্বজনপরিত্যক্ত দেবচরিত্র ব্রাহ্মযুবকগণের মাতার অভাব, ভগ্নীর অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। নৃত্যকালী দেবী কলিকাতায় কিছুদিন থাকিয়া ঢাকায় গিয়া ভ্রাতা নবকান্তের সহিত কিছুদিন বাস করেন, এবং কন্যা দুটী ও পুত্রবধুকে ঢাকা ফিমেল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবীর ধর্ম্মশীল সাধু যুবা অধ্যাপক অম্বিকাচরণ সেনের সহিত বিবাহ হয়। অম্বিকাচরণ Statutory Civilian ছিলেন ও পরবর্ত্তী জীবনে District Judge হইয়া-

ছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা বগলাসুন্দরীর কালীকচ্ছ নিবাসী ধর্ম্মোৎসাহী কৈলাসচন্দ্র নন্দীর সহিত বিবাহ হয়।

সুদক্ষিণা দেবীর বিবাহ বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অসবর্ণ বিবাহ। এই স্থলে সুদক্ষিণা দেবীর তেজস্বিনী জননীর সহস্র সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। যে কার্য্য পুরুষের পক্ষেও কঠিন সেই অসমসাহসিক কার্য্য তিনি নারী হইয়া কিরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিষয় সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজন, দেশ, সমাজ সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া কৌলিন্য প্রথার কবল হইতে কন্যাদুটীকে রক্ষা করিবার জন্য অকুল সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। জননীর সৎসাহসের পুরস্কার স্বরূপ সুদক্ষিণা ও বগলা উপযুক্ত পতি লাভ করিয়াছিলেন ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। নৃত্যকালী দেবী যথার্থ ই ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে ঢাকার বিধান পল্লীতে বাস করিতেন। সেখানে ১৯০০ সনের ২৪শে সপ্টেম্বর ভগবানের নাম করিতে করিতে ভবধাম ত্যাগ করেন। নৃত্যকালী দেবীর জীবনের কাহিনী হইতে সুস্পষ্ট অনুমান করা যায় ব্রাহ্মসমাজের সাধু-কার্য্যের কি আশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছিল। হিন্দুসমাজের কঠিন বক্ষ ভেদ করিয়া, তাহার অজেয় দুর্গের অভ্যন্তরে হিন্দুরমণীর প্রাণের দ্বারে গিয়া সে স্রোত আঘাত করিয়াছিল। তখনকার বঙ্গদেশ আর বর্ত্তমান সময়ের দৃশ্য—কি প্রভেদ! ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সার্থকতা ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যায়। বিধুমুখীর সহিত রজনীনাথ রায়ের পরিণয় এবং সুদক্ষিণার সহিত অম্বিকাচরণ সেনের বিবাহ যেন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে উড্ডীন বিজয় নিশান। নিষ্ঠুর দেশাচারের যূপকাষ্ঠে যে সকল জীবন বলিরূপে উৎসর্গী-কৃত হইতে যাইতেছিল, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের সম্মুখে কি সুখ সৌভাগ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন, বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা! সৎসাহস ও সাধু কার্য্যের পুরস্কার বিধাতা এমনি করিয়াই দিয়া থাকেন।

ইহার পর, অন্যান্য আগত বিধবা ও কুলীন কুমারীগণও সৎপাত্রে পরিণীতা হইয়াছিলেন।

এই বৎসর অর্থাৎ ১৮৭১ সনে "ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা" নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। যদিও ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্যান্য অনেক স্ত্রীশিক্ষা-হিতৈষী ব্যক্তি এই সভার সভ্য ছিলেন কিন্তু এই কার্য্যে ব্রাহ্মগণই বিশেষ উৎসাহান্বিত ও অগ্রসর ছিলেন। হিন্দু ও ব্রাহ্মগণ সমবেত ভাবে ইহার কার্য্য করিতেন, এবং প্রায় ১২ বৎসর কাল অতি সুচারুরূপে এই সভা পরিচালিত হইয়াছিল। ঢাকা জেলার নানা স্থানের অনেক মহিলা এই সভার অধীনে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এই সভায় বার্ষিক ১৫০৲ টাকা সাহায্য করিতেন এবং চাঁদার দ্বারাও বিস্তর টাকা উঠিত। বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও প্রাণকুমার দাস ইহার সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু নবকান্ত বাবু ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

বৈষ্ণব কুমারী লক্ষ্মীমনিঃ—১৮৭৩ সনের মার্চ মাসে আর একটী ঘটনা ঘটে। ঢাকার নারাণদিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী লক্ষ্মী-মণিকে তাঁহার বৈষ্ণব মাতা বেশ্যা করিবাব উদ্যোগ করিতেছিল। বাবু নবকান্ত চট্টোপাধায় এই ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহার দুইটী ব্রাহ্মযুবক বন্ধুর সাহায্যে ঐ বালিকাকে নিজ বাসায় আনয়ন করেন। বালিকার মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া তাহার কন্যাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে ব্রাহ্মদিগের নামে অভিযোগ করে। কিন্তু আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট চার্লস্ (Charles) সাহেব স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র সেনের সাক্ষ্য লইয়া লক্ষ্মীমণিকে বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে প্রদান করেন। নবকান্ত বাবু তাঁহাকে কলিকাতায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে পরম যত্নে শিক্ষাপ্রদান করিয়া বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়। এই ঘটনা লইয়াও ঢাকায় বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

"ঢাকাপ্রকাশ" "হিন্দুহিতৈষিণী" "বঙ্গবন্ধু" "ভারত-সংস্কারক" "ইণ্ডিয়ান মিরার" প্রভৃতি পত্রিকাতেও এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া পতিতাশ্রম সংস্থাপন ও পতিত কন্যাদিগকে রক্ষা করার আবশ্যকতা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। "হিন্দুহিতৈষিণী" ব্রাহ্মদিগের সকল কার্য্যেরই বিরোধী ছিলেন; কিন্তু এই ঘটনায় ব্রাহ্মদিগের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আপন সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। "লক্ষ্মীমণি-চরিতে" এই ঘটনার করুণ-কাহিনী বিবৃত আছে। এই সময়ই "বাল্য বিবাহ নিবারণী" সভা হইতে "মহাপাপ বাল্য বিবাহ" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিকা প্রায় ২ দুই বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রচার দ্বারা বাল্যবিবাহ নিতান্ত দূষণীয়, পূর্ব্ববাঙ্গালার ছাত্রদিগের অনেকের হৃদয়ে এরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল। বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র সেন এবং নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় দ্বারা এই পত্রিকা সম্পাদিত হইত। ১২৭৮ সনের চৈত্র মাসে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারিণী সভা সংস্থাপিত হয়। এই সভা হইতেই বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি যুবকগণ শ্রীহট্টে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র যে কতদূর প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন মুদ্রিত থাকিবে। অর্দ্ধ শতাব্দীর কার্য্য তাঁহাদের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই সাধিত হইয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনে এমন সকল কর্ম্মবীর পাইয়া ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইয়াছিলেন।

বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়।

(পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের মধ্যে প্রথম প্রচারক)

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক হইলেও বাবু বঙ্গচন্দ্রই পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের মধ্যে প্রথম প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন।

তিনি প্রথমতঃ ৯। ১০ বৎসর কাল পোগোজ স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সে সময়ে স্কুলের ছুটী উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে যুবকবন্ধুগণকে লইয়া প্রচার করিতে গমন করিতেন। এইরূপে ক্রমে প্রস্তুত হইয়া তিনি ১৮৭৩ সনে প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ব্রজসুন্দরের সহিত তাঁহার নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। বাবু বঙ্গচন্দ্র ব্রজসুন্দরের প্রভাবেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন এবং কুচবিহার বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নানা ভাবে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর সম্বন্ধে বঙ্গবাবু আমাদের নিকট যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

"১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম হয় ও নয় মাস বয়ঃক্রমের সময় পিতৃবিয়োগ হয়, তাহার পর মা আমাকে লইয়া আমার মাতুলালয়ে গিয়া অবস্থিতি করেন। এখানে আমি এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মা'র স্নেহে লালিত পালিত হইয়া বার বৎসর বয়ক্রম কালে মাতৃহীন হই। ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য মা আমাকে টোলে পড়িতে দেন। তখনও পূর্ব্ববঙ্গে পাঠশালা সংস্থাপিত হয় নাই। টোলের পণ্ডিতমহাশয় আমাকে একদিন বলেন যে ঢাকানগরে ব্রজসুন্দর মিত্র নামে একজন অতি ভাল লোক আছেন; তিনি তত্ত্বানুসন্ধান করিতে ভালবাসেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ ভ্রান্তি যে ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান সাধারণ্যে প্রচার করিতে ব্যাকুল। এই কথা শুনিবামাত্র আমার অন্তরে ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অতীব উচ্চধর্ম্ম এই প্রতীতি হয়। মাতৃবিয়োগের পর আমি কিশোরগঞ্জ ইংরেজীবাঙ্গলা স্কুলে পড়িবার সময় মিত্র মহাশয় সার্ভেডেপুটি কলেক্টররূপে তথায় গমন করেন। ইহাতে একজন ব্রাহ্ম আসিয়াছেন বলিয়া জনরব হয়। তিনি মুন্সেফবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াই এই বলেন, আমার জন্য য়েন কোন জীবহত্যা না হয়। ইহা শুনিয়া আমার মিত্র মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ হয়। তিনি যখন আমাদের স্কুল পরিদর্শন

করিতে আসিলেন, তাঁহার সৌম্য ও উজ্জ্বলমূর্ত্তি দেখিয়া অন্তরে যে কি আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তাতে ছাত্রদের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল। আমাদের মাথার চুল লম্বা ও হাতে বালা দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই শুনিয়া আমি হাতের বালা ত্যাগ ও চুল খাটো করি এবং ইহাতে আমি খৃষ্টান হইয়া যাইব, অভিভাবকদের মনে এরূপ আশঙ্কা হয়। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট এবং জাতিভেদের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়। এমন কি একজন মুসলমান সমপাঠীর নিকট যাইয়া পড়াশুনা করিবার সময় তাহাকে সেই বিছানায় আহার করিতে দিতে আমার মনে কোন দ্বিধা হইত না। স্কুলের পড়া সমাপ্ত হইলে ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে প্রবেশ করি। অল্পকাল মধ্যেই ছাত্রদের মধ্যে চরিত্রদোষ লক্ষিত হওয়ায়, চরিত্র সংশোধন ও গঠন উদ্দেশ্যে স্কুলে একটি সাপ্তাহিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রথম শ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের অনেকে যোগদান করাতে ছাত্রদের মধ্যে চরিত্রগঠন সম্বন্ধে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত এবং নৈতিক উন্নতির স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। খ্যাতনামা আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি অনেক ছাত্র এই সভার সভ্য ছিলেন। এই সভাতে সমুদয় শিক্ষকের সমক্ষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের "Young Bengal, this is for you" প্রবন্ধটি পঠিত হয়। ইহাতে চরিত্রগঠনের আবশ্যকতা সকলেরই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে এই বুঝা গেল যে, ধর্ম্মের সঙ্গে নীতির এরূপ অবিচ্ছিন্ন যোগ যে ধর্ম্ম ছাড়া নীতি দাঁড়াইতে পারে না। এই সময়ই আমার মন বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহার কিছুদিন পরে ঢাকা কলেজে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদের মধ্যে ওরূপ সমিতি সংস্থাপনের চেষ্টা বিফল হয়। কলেজ ত্যাগের পর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত অঘোরনাথ গুপ্তের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিয়া আমার বিশেষ উৎসাহ হয় এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সঙ্গত সভা গঠিত হয়।

এই সভার সভ্য কয়েকটি যুবকের সহিত একত্রে শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের বিশেষ সহানুভূতিতে তাঁহার আরমানিটোলাস্থ প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহে স্থান প্রাপ্ত হই; মিত্র মহাশয় সঙ্গত সভার সভ্যদের অভিভাবক হন। বলিতে কি পার্থিব জীবনের আরম্ভে আমি পিতৃহীন বলিয়া যে অভাব বোধ করিতেছিলাম ধর্ম্মজীবনের অভ্যুদয়ে শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে ধর্ম্মপিতারূপে এবং সঙ্গতের সভ্যদিগকে ধর্ম্মভ্রাতারূপে পাইয়া অতুলানন্দ লাভ করিয়াছিলাম। P. K. Roy প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের উন্নতিশীল যুবকগণ এই সঙ্গত সভার সভ্য ছিলেন। এই সময়ে মিত্র মহাশয়েয় সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার না হইলেও এরূপ ঘনিষ্ঠতা হয় যে, তিনি আমার পত্রাদির উত্তর অতি স্নেহের সহিত প্রদান করিতেন। গুরুতর পরীক্ষাতে তাঁহার নিকট হইতে এমন উপদেশপূর্ণ পত্র পাইতাম যে, তাহাতে আমার বিশেষ উৎসাহ ও উপকার হইত। তাঁহার উচ্চপদাভিষিক্ত এক বন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গতে যোগদান করাতে তিনি আমার ও সঙ্গতের বিরুদ্ধে মিত্র মহাশয়ের নিকট এক পত্র লিখেন এবং তাঁহার বাড়ী হইতে সঙ্গত উঠাইয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। মিত্র মহাশয় কতকগুলি মোটামুটি রকমের দোষ উল্লেখ করিয়া লেখেন যে আমাদের সেই সব দোষ থাকিলে অবশ্যই তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। আমাকেও এরূপ লিখিয়াছিলেন যে, আমি যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আমার বন্ধু, তোমাদিগের প্রতি তৎসমুদয় দোষ আরোপ করিতে কখনও পারিবেন না, সুতরাং তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই। অন্য সময়ে কয়েকটি বন্ধু আমার বিরোধী হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া মিত্র মহাশয় আমাকে এই উপদেশ করেন—"Pray for those who persecute you" এইরূপে তিনি দূরে থাকিয়াও অনেক সময় আমার প্রতি ধর্ম্মপিতার বাৎসল্য আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিতেন। তিনি যখন হাওড়া ডিষ্ট্রীক্টের সার্ভে ডেপুটী কলেক্টারের কার্য্য করিতেছিলেন তখন আমি একবার মাঘ

মাসের সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে প্রথম কলিকাতায় যাই। তিনি সেই সময়ে আমাকে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট নানা প্রশংসাবাক্যে পরিচিত করেন। তাহাতে তিনি এই বলিয়া আমাকে সাবধান করেন যে অনেক যুবক খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের জন্য ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া থাকেন, সেই বিষয়ে আমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের এই স্নেহপূর্ণ বাক্যে আমার মন অত্যন্ত উৎফুল্ল হইল; এবং তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে অতর্কিত ভাবে তাঁগার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদের কথা উল্লেখ করিলাম এবং বলিলাম যে ব্রাহ্মসমাজে সামান্য কারণে বিচ্ছেদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে দেখিতেছি। তদুত্তরে তিনি আমাকে সস্নেহে এই বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদের সঙ্গেও আছি, কিন্তু যাঁহাদিগকে পূর্ব্বে বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম, সেই পুরাতন বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

কিছুকাল পরে মিত্র মহাশয় বদলী হইয়া ঢাকায় আসেন। সে সময়ে আমাকে প্রায়ই সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিতে হইত। তিনি কখনো কখনো ভক্তিগদগদকণ্ঠে সঙ্গীত করিতেন। এইরূপে ধর্ম্মপিতার সঙ্গে মিলিতভাবে উপাসনা করিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইত। ক্রমে তাঁহার সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ এরূপ গভীর হইল যে, আমাদিগের মধ্যে কখনও কোন কারণে ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু এক বিশেষ উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে লইয়া স্বতন্ত্র গৃহে সামাজিক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণের সঙ্গে যুবকদলের কিছুদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের তখনও আমাদের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ সহানুভূতি ছিল। যেমন সঙ্গতে, তেমনি প্রাচার কার্য্যে তিনি আমার সহায় ছিলেন। তিনি আমার পরিবারের প্রতিও পিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সুখে ও দুঃখে যার-পর-নাই সহানুভূতি প্রকাশ

করিতেন। আমি প্রচার কার্য্যে বাহির হইলে তিনি ঢাকায় আমার পরিবারের তত্ত্বাবধান করিতেন, এমন কি নিজে আসিয়া দেখিতেন শুনিতেন। ব্যারামাদি হইলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেন। তাঁহার দ্বারা কতরূপে যে আমি উপকৃত হইয়াছি বলিয়া উঠিতে পারি না। আমাকে নানা সময়ে নানা ঘটনায় চিরদিনই বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইতে হইয়াছে। দেহত্যাগ পর্য্যন্ত মিত্র মহাশয় আমার প্রতি ধর্ম্মপিতার ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার দরিদ্রাবস্থা হইতে যে, ক্রমে ধনে মানে উন্নত হইয়াছিলেন, ইহাতে কেবলই ঈশ্বরকৃপা অনুভব করিতেন। ভক্তিবিগলিত অন্তরে অনেক সময় ইহা তিনি আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাঁহার জীবনে আশ্চর্য্য সরলতা দেখিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গে তিনিই সর্ব্বাগ্রে পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপিত এবং সাংসারিক জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত করেন। তিনি এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গের সমুদায় ব্রাহ্মের ধর্ম্মপিতার স্থান লাভ করিয়া গিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার পরলোকগমণের পর যখন কয়েকটী ব্রাহ্ম প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া ঢাকায় একটী আশ্রম স্থাপন করেন এবং অনেক ব্রাহ্ম ধর্ম্মসাধনার্থে সপরিবারে তাহাতে যোগদান করেন তখনও আমরা তাঁহার আরমানিটোলার গৃহেই স্থান প্রাপ্ত হই। এইরূপে ভগবান তাঁহার গৃহেই ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মবিদ্যালয়, সঙ্গত সভা, সাধনাশ্রম সংস্থাপন ও সংরক্ষণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে নববিধান প্রকটনের সূত্রপাত করেন।”

নবীন ও প্রবীনে সংঘর্ষণ ঃ—(প্রথম) ইংরাজী ১৮৭১ সনে কুলীনকুমারী বিধুমুখীকে ভীষণ কৌলীন্য প্রথার কবল হইতে উদ্ধার সম্পর্কে হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই ঘটনারই প্রাক্কালে প্রবীন ব্রাহ্মদিগের অন্যতম অগ্রণী বাবু অভয়চন্দ্র দাস ঢাকা কলেজ ইন্‌ষ্টিটিউটে কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ এবং যুক্তিপূর্ণ ইংরাজী-প্রবন্ধ পাঠ করেন;

কিন্তু কার্য্যকালে অর্থাৎ বিধুমুখীর উদ্ধারকালে তিনি ও বাবু দীননাথ সেন শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রভৃতি প্রবীন ব্রাহ্মগণ, কর্ম্মোৎসাহী নবীন ব্রাহ্মগণের সহায়তা করা দূরে থাকুক তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ইহাই নবীন ও প্রবীনে প্রথম সংঘর্ষণ।

বিধুমুখীর উদ্ধারের কিছুদিন পরেই বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় গমন করেন। তখন বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষের পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি হিন্দুমতে পিতৃশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই ঘটনায় হিন্দুসমাজভুক্ত এবং হিন্দু অনুষ্ঠানাদিতে রত ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইতে পারেন না এই বলিয়া কোন কোন প্রবীণ এবং অধিকাংশ নবীন যুবক ব্রাহ্ম কালীপ্রসন্ন ঘোষের উপাচার্য্য থাকা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। ইহাই দ্বিতীয় সংঘর্ষণ।

এই সময়ে কি প্রকার লোকের উপাচার্য্য নিযুক্ত হওয়া উচিত এই বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলনে এক ব্রজসুন্দর ব্যতীত আর সকল প্রবীণই নবীনদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রজসুন্দর চিরদিনই মত ও কার্য্যে সামঞ্জস্যের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি চিরদিনই বিশ্বাস করিতেন কায়মনোবাক্যে আগ্রহশীল ব্যক্তিই উপাচার্য্য হইবার অধিকারী। সমাজের শৈশব অবস্থায়ও ঠিক এই কারণে তিনি রামকুমার বেদপঞ্চাননকে উপাচার্য্যের পদ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। বয়সে সকলের প্রবীণ হইলেও ব্রজসুন্দরের মত অতি পরিষ্কার ও উদার ছিল। আমরা বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে মহর্ষির পুত্র ও পৌত্রদিগকে উপবীত প্রদানের বিবরণ যখন তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় তখন বঙ্গচন্দ্র এই পত্রিকার একখণ্ড হস্তে লইয়া ব্যাকুল হইয়া ব্রজসুন্দরের নিকট

উপস্থিত হইলেন এবং শুনিলেন ব্রজসুন্দর তখনও পত্রিকা পাঠ করেন নাই। তিনি ব্রজসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে কি উপবীত গ্রহণ হইতে পারে ?" ব্রজসুন্দর অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "সেকি কথা তাহা কখনই হইতে পারে না ; এবং যদি হয় তবে প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে—নতুবা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পুনরায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ভেদ উপস্থিত হইবে।"

বঙ্গবাবু তখন হস্তস্থিত তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় বর্ণিত উপনয়ন ক্রিয়ার স্থানটুকু তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। ব্রজসুন্দর হস্তের কায স্থগিত রাখিয়া পত্রিকা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্গবাবু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং দেখিলেন পত্রিকা পড়িতে পড়িতে ব্রজসুন্দরের মুখ কালিমায় একেবারে ঢাকিয়া গেল এবং তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বঙ্গবাবু একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। পড়া শেষ হইলে ব্রজসুন্দর বিমর্ষ ভাবে পত্রিকাখানি ফিরাইয়া দিলেন ও পুনরায় নিজের মত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন "ব্রাহ্মের আবার পৈতা কি ?" কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক একটী বাক্য উচ্চারণ করিলেন না এবং দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন। সে যাহা হউক উপাচার্য্যবিষয়ক আন্দোলনের মীমাংসার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আহুত হইল এবং "কেবল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মই উপাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন" ব্রজসুন্দর সভাতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ও অধিকাংশের মতে ইহা গৃহীত হইল। পরে "বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়কে উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত করা হউক" এই প্রস্তাব করিলেন এবং ইহাও অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

তৃতীয় সংঘর্ষণ এবং প্রকাশ্যে বিচ্ছেদ—আমরা দেখিয়াছি উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইবার উপযোগিতা নির্দ্ধারণের সময় ব্রজসুন্দর প্রবীণ হইয়াও নবীনদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত প্রাচীনদলের বাবু দীননাথ সেন নবীনদিগের প্রতি বিশেষ ভাবে অসন্তুষ্ট হন এবং বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় উপাচার্য্যের পদে নিয়োজিত হওয়ায়

তাঁহার এবং নবীনদিগের প্রতি ব্রজসুন্দরের পক্ষপাতিতা দর্শনে অতিশয় রুষ্ট হন। কথা প্রসঙ্গে একদিন দীনবাবু ব্রজসুন্দরকে বলেন যে বঙ্গচন্দ্র কেশব বাবুকে অবতার মনে করিয়া থাকেন সুতরাং তিনি উপাচার্য্যের পদের অধিকারী নহেন। ব্রজসুন্দর এই কথায় অতিশয় চঞ্চল হইয়া বঙ্গচন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং শুনিলেন যে একথা সত্য নহে। বঙ্গবাবু বলিলেন যে তিনি কেশব বাবুকে তাঁহার নিজেরই মত মানুষ বলিয়া বিবেচনা করেন কিন্তু তাঁহাকে সমধিক অগ্রসর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার মত উন্নত হইতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করেন। ব্রজসুন্দর এই কথা কেবল নিজে শুনিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, একখণ্ড কাগজে তাঁহার দ্বারা উহা লিখাইয়া লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভায় উপস্থিত করিলেন। যাহা হউক উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসা হইল বটে কিন্তু উভয়দলের মনোমালিন্য কিছুতেই বিদূরিত হইল না। এই সময় আবার নূতন এক গোলযোগ উপস্থিত হইল।

১৮৭২ সনে যুবক ব্রাহ্মগণ একটী বিশেষ উৎসব করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উহা সম্পন্ন করিবার জন্য এবং উৎসবে খোল করতাল ব্যবহার করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসব করিবার অনুমতি দিলেন কিন্তু খোল করতাল ব্যবহার করিবার অনুমতি দিলেন না। এই ঘটনার কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ নবীনদলের মধ্যে ভাবুকতার বিশেষ প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইতেছিল। ব্রজসুন্দর অতিরিক্ত ভাবুকতার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি বলিতেন ভাবুকতার জন্যই চৈতন্য ধর্ম্ম এইরূপ অধঃপতিত হইয়াছে। অতিরিক্ত ভাবুকতা হইতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীনগণ সমাজ-গৃহমধ্যে খোল করতাল ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন এবং পূর্ব্ব হইতেই তদনুরূপ নিয়ম ও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় দীননাথ সেন ও ব্রজসুন্দর উভয়েই খোল করতাল ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

নবীনদলের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়ায় তাঁহাদিগের নেতা বিজয়কৃষ্ণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দলবল সহ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; এবং "ঢাকা প্রকাশে" বিজ্ঞাপন দিয়া সাচি পান্দরিপা দেওয়ান সাহেব হাবেলীতে একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে ৬০ জন নবীন ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণের সহিত যোগ দেন। বঙ্গচন্দ্র এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের সম্যক পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু তথাপি তিনি নবীন দলের সহিতই যোগ দিয়াছিলেন।

যে যুবকদিগের সাধুচরিত্র, ধর্ম্মোৎসাহ, আশাদীপ্ত মুখশ্রী দেখিয়া ব্রজসুন্দর প্রাণে কত আশা, কত আনন্দ অনুভব করিতেন, যাঁহাদিগকে এতদিন প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার প্রাণ-প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রধান আশা ও অবলম্বন তাঁহারা সামান্য মত ভেদের জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। আমরা বঙ্গবাবুর নিকট শুনিয়াছি সেজন্য তিনি তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া গেলেও ব্রজসুন্দর বিজয়-কৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ সমাজে কার্য্যকরিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু গোস্বামী মহাশয় তাহাতে সম্মত না হওয়াতে বিচ্ছেদ আরও কিছুকালের জন্য রহিয়া গেল। এদিকে ব্রজসুন্দর কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না, তিনি নবীনদলের প্রতি পূর্ব্ববৎ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিজয়কৃষ্ণের ব্যয় ভারও বহন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পারিবারিক তত্ত্বাদিও লইতে লাগিলেন। শুধু ইহাই নহে, তিনি নবীনদিগের উপাসনা স্থলেও গমন করিতেন এবং তাঁহাদিগের নানা বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। একদিন তথায় গিয়া দেখেন যে দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে উপাসনা স্থলে পাখা অভাবে সকলে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। গৃহে ফিরিয়াই ব্রজসুন্দর নিজের একখানি পাখা ও সরঞ্জাম সহ একজন মিস্ত্রিকে পাঠাইয়া দিলেন। নবীনদল সম্বন্ধেও

একথা বলা উচিত যে তাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেও, ব্রজসুন্দরের সহিত সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতেন এবং তাঁহার গৃহে সঙ্গতের অধিবেশনেও উপস্থিত হইতেন।

বিজয়কৃষ্ণ ও বঙ্গচন্দ্র পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলে সমাজের কার্য্যের বড়ই বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। ব্রজসুন্দর অযোধ্যা-নাথ পাকড়াশী মহাশয়কে কিছু কাল ঢাকায় আনয়ন করিয়া তাঁহা দ্বারা উপাচার্য্যের কার্য্য করাইয়াছিলেন। নিজেও মধ্যে মধ্যে করিতেন। কিন্তু পাকড়াশী মহাশয় অধিকদিন ঢাকায় থাকিতে পারেন নাই।

এই ভাবে তিন বৎসর অতিবাহিত হইল। প্রবীন ব্রাহ্মগণ দেখিলেন যে নবীনদিগকে ত্যাগ করিয়া আর চলে না। নবীনগণ ও দেখিলেন পিতৃসম ব্রজসুন্দর ও পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া আর চলে না। বাবু দুর্গামোহন দাস প্রমুখ অধিকাংশ ট্রাষ্টীগণের অনুরোধে নবীনদল পুনরায় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে স্থান প্রাপ্ত হইলেন এবং এবার তাঁহারা সমাজ প্রাঙ্গনে খোল করতাল ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। রবিবার প্রাতঃকালে নবীনদিগের নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে এবং স্বায়ংকালে প্রবীনদিগের নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে উপাসনা হইতে লাগিল। নবীনদলের অনেকে স্বায়ংকালীন উপাসনায়ও যোগ দিতেন। যাহাহউক কিছুকাল পরে উভয়দলে কোন পার্থক্যই রহিল না; এবং প্রাচীন ও নবীনদলের পুনর্মিলন সংঘটিত হইল।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মসমাজের ১২৯১ সালের কার্য্যবিবরণীতে বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১২৯২ সালের ১৭ই শ্রাবণের সাধারণ সভায় যে বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে এই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ ও পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে ও এই নবীন ও প্রাচীনদলের সংঘর্ষণ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ভ্রম ছিল। আমরা যতদূর পারিলাম এস্থলে বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়ের সাহায্যে ও ব্রজসুন্দরের ডায়েরী এবং তত্ত্ব-বোধিণী পত্রিকা হইতে তাহা সংশোধন করিয়া দিলাম।

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

অযোধ্যানাথের মৃত্যুর পর "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকাতে তাঁহার নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ—

১৬ই ভাদ্র ১৭৯০ সনের ধর্ম্মতত্ত্ব।

"মগরার নিকটে ট্যালাণ্ডু মাইল পাড়া নামক পল্লীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে খাঁটুরা বঙ্গবিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কর্ম্ম করিতেন। সেই সময় হইতে তাঁহার জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রচারিত মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে কিছুদিন নিযুক্ত থাকেন। সেই সময় তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মমতে পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। সংস্কৃত ভাষাতে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার বাঙ্গালা লেখাও অতি সুমিষ্ট এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল। মহাভারত অনুবাদ সমাপ্ত হইলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীর বালক বালিকাগণের শিক্ষা কার্য্যে তিনি নিয়োজিত হন। তথায় কিছুদিন পরে তিনি দেবেন্দ্র বাবুর অতিশয় প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রমে দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাকে সমাজের উপাচার্য্য ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক করিয়াছিলেন। পাকড়াশী মহাশয়ের লিখিবার ও বলিবার শক্তি ভাল থাকাতে কলিকাতা সমাজের স্বাধীন সভ্যগণ তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। পরে যখন দেবেন্দ্রবাবু তাঁহাকে বিদায় করেন তখন অনেকেই দুঃখিত হয়েন এবং তাঁহার কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে পৃথক্‌রূপে একটী সমাজ ও একখানি সংবাদ পত্র করিয়া দেওয়ার আয়োজন করেন। কিন্তু কর্ম্মচ্যুত হওয়ায় অল্প দিন পরেই তিনি উদরাময় রোগে কাতর হইলেন এবং সেই রোগেই তাঁহার দেহ পতন হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি রোগ দারিদ্রতায় বড় কষ্ট পাইয়াছেন। শ্রুত হওয়া যায় ভদ্রাসন্‌ বাটী পর্য্যন্ত ঋণে আবদ্ধ আছে। যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাও হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর ৩।৪ দিবস পূর্ব্বে তাঁহার বাকরোধ হইয়াছিল।

কেবল শেষাবস্থায় তাঁহার পুত্রকে একটী সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তিনি এতদিন যাঁহাদের সঙ্গে একত্রে কার্য্য করিলেন তাঁহারা এই বিপদ সময় একবার চক্ষেও দেখিলেন না। অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়ার জন্য ঘাটে লইয়া যায় এমনও কেহ ছিল না। আমাদের কোন কোনও বন্ধু এখান হইতে গিয়া মৃত দেহ সৎকার করেন। দয়াময় ঈশ্বর সেই পরলোকগামী আত্মাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করেন এই মাত্র আমাদের প্রার্থনা।”

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় ব্রজসুন্দরের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ১৮৬৭ সনের প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। পরে বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ভাটপাড়া গ্রামে গিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি ঢাকার ব্রাহ্ম-যুবক-দিগের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হন এবং তাঁহাদের ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি আদি-ব্রাহ্মসমাজে সময় সময় উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। ব্রজসুন্দর ঢাকা-ব্রাহ্মসমাজের জন্য একজন উপযুক্ত উপাচার্য্য চাহিয়া মহর্ষির নিকট পত্র লিখিলে তিনি অযোধ্যানাথকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। এতদুপলক্ষে তিনি কিছুকাল ঢাকায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল এবং তিনি বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সময়ে সমাজ-গৃহে এত অধিক জনসমাগম হইত যে এক বিজয়কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও কার্য্যকালে সেরূপ কখনও দেখা যায় নাই। তিনি আদি-সমাজের পদ্ধতি-মতে উপাসনা করিতেন। উপদেশকালে শাস্ত্রোক্ত বচনাদি উদ্ধৃত করিতেন বলিয়া ইহাঁর উপদেশ শুনিবার জন্যই বহু লোক-সমাগম হইত। কিন্তু ইঁনি উপবীত-ধারী ছিলেন বলিয়া এবং সামাজিক উন্নতি কিম্বা ধর্ম্মসাধনোপযোগী উপদেশ না দেওয়াতে ঢাকার যুবক-ব্রাহ্মগণ ইঁহার প্রতি তত সন্তুষ্ট ছিলেন না। ব্রজসুন্দরের নিকট মহর্ষির লিখিত পত্রে প্রকাশ পায় যে, অযোধ্যানাথ, নবীন যুবকগণ তাঁহাকে

চান না ইহা বুঝিয়াই বহুদিন ঢাকায় থাকা সঙ্গত মনে করেন নাই; যাহা হউক কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়ার পর কেশবচন্দ্রের কোন কোনও কার্য্য সমর্থন করায় দেবেন্দ্রনাথের সহিত অযোধ্যানাথের মনান্তর ও বিচ্ছেদ হয়। এই সময়ে অযোধ্যানাথ অর্থাভাবে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছিলেন। ইনি এদিকে আবার এরূপ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন যে, তাহা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। সুতরাং ব্রজসুন্দর এ বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই, যখন জানিতে পারিলেন এবং সাহায্য করিবার জন্য উৎসুক হইলেন তখন অযোধ্যানাথ অভাব অভিযোগের অতীত স্থানে গিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর ইহার জন্য মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য নিজেও যেমন অর্থ সাহায্য করিতেন ঢাকাস্থ বন্ধুগণ হইতেও চাঁদা তুলিয়া পাঠাইতেন, তাঁহার স্মৃতিপুস্তকে তাহার উল্লেখ দেখা যায়।

নবম অধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ—তিন আইন—কুচবিহার বিবাহ ও পরিণতি।

ইহার পূর্ব্ব অধ্যায়ে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বলতম যুগের বিবরণ আংশিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সময়কার ব্রাহ্মগণ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দুরন্ত ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে ভীত বা পশ্চাৎপদ করে সংসারে এমন কাহারও সাধ্য ছিল না। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে পরস্পরের ভিতর বিশেষ কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে কেশবচন্দ্র বিযুক্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহা হইলেও উভয়পক্ষেই প্রীতি এবং শ্রদ্ধার ভাব যথেষ্ট ছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গে তাহার কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত ব্রজসুন্দরের হৃদ্যতা ও সদ্ভাব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বেই পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব হইতেই যোগ ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন মহর্ষিকে ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিযুক্ত হইলেন তখন ব্রজসুন্দর তাঁহার কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং যথাসাধ্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহায়তা করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন দিনই মহর্ষিদেবের সহিত তাঁহার বন্ধুতা শিথিল হয় নাই এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্য করিয়াছিল। পাঠকপাঠিকাগণ এখন তাহার পরিচয় পাইবেন। বহুকাল হইতে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বাঙ্গালার লোকদিগের ভিতর নানা প্রকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারিত হইবার পর সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের ভিতরও নূতন ভাব ও নূতন শক্তি আসিয়া পড়িল। ইহা সত্য বটে পশ্চিমবঙ্গেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল। কি রাজা রামমোহন রায় কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহারা উভয়েই পশ্চিমবঙ্গবাসী কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে, সমাজসংস্কার জাতিভেদ দূর করা এবং স্ত্রীশিক্ষার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মগণ যেরূপ

ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সংগ্রাম করিয়াছেন, এমন ভাবে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের ভিতর তেজস্বিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বল অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মগণও সংস্কার প্রিয়, উন্নতিশীল, দুর্জ্জয় ধর্ম্মযোদ্ধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গই বিধবাবিধাহ, অসবর্ণবিবাহের অনুষ্ঠান ক্ষেত্র হইয়া পড়িল। ঢাকা এবং বরিশালের ব্রাহ্মগণ বীরদর্পে নিত্য নব নব কার্য্যে এবং সংস্কারের হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মসমাজের বল বাড়িয়া যাইতে লাগিল, এবং শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

তিন আইন বিধি।—সংস্কারপ্রিয় ব্রাহ্মগণের চেষ্টায় অচিরে ব্রাহ্মসমাজে, অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতে লাগিল। এখন প্রশ্ন উঠিল আইনতঃ এই সকল বিবাহ সিদ্ধ কি না ? অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে এই সকল বিবাহের সন্তানগণ পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে হিন্দুসমাজের আত্মীয় স্বজন দ্বারা বঞ্চিত হইতে পারেন। কেশবচন্দ্র বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মবিবাহ আইনানুমোদিত করা একান্ত প্রয়োজন। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মবিবাহ আইন নামে স্বতন্ত্র একটী আইন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। সেই আবেদনানুসারে গবর্ণর জেনারালের সভার আইনসদস্য মেইন্ সাহেব (Sir H. S. Maine) ১৭৭১ সনে উক্ত আইনের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই আইনের ঘোর বিরোধী হইলেন। ঢাকাতে ব্রজসুন্দরও এই আইনের অত্যন্ত বিরোধী হইলেন। ব্রজসুন্দরের পুরাতন চিঠিপত্র হইতে স্পষ্ট দেখা যায় তিনি আইনের কোনও আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না ; বলিতেন সর্ব্বদর্শী পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর ও ধর্ম্মবন্ধুদিগকে সাক্ষী করিয়া যে বিবাহ হয় তাহাই ধর্ম্মানুমোদিত এবং যথার্থ বিবাহ ; ইহার জন্য আবার আইনের আবশ্যকতা কি ? ব্রাহ্ম-বিবাহে ধর্ম্ম অপেক্ষা আইনকেই প্রাধান্য দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে

করিতেন না। আইনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিদেশীয় গন্ধ ছিল বলিয়াও বোধ হয় ব্রজসুন্দরের ইহা পছন্দ হয় নাই। অসবর্ণ বিবাহ এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের পৌরহিত্য নিতান্তই হিন্দুবিবাহ-বিধি বিরুদ্ধ কথা। ব্রজসুন্দর স্বয়ং অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন শিক্ষা ও অন্তরের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধির সহিত ব্রাহ্ম-সমাজে কেন কালক্রমে হিন্দুসমাজেও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইবে। সহসা এই আইন প্রচলিত করিতে গেলে, শিক্ষা ও মনের এই প্রকার অপ্রস্তুত অবস্থায় ইহা একটী পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি ও বিপ্লবের কারণ হইয়া উঠিবে এবং ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে একে-বারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব দ্বারা হিন্দুসমাজ অগ্রসর হইলে কালে নিশ্চয়ই হিন্দুসমাজেও অসবর্ণ বিবাহ পদ্ধতি প্রবাহিত হইবে কারণ হিন্দুসমাজের কোন কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নেপাল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি দেশে কোন কোনও জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রথা বর্ত্তমান সময়েও প্রচলিত আছে। ব্রজসুন্দর ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সংস্কৃত সংস্করণ মনে করিতেন। তাই ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, তিনি ইহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। যাহা হউক এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই ব্রজসুন্দর দেবেন্দ্রনাথের সহিত এক যোগে এই অইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি হইয়াও কেন যে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন ইহা আমাদের নিকট বড়ই বিস্ময়ের কথা। ব্রজসুন্দর অতি উৎসাহের সহিত এই প্রতিবাদ ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন এবং যাহাতে এই আইন বিধিবদ্ধ না হয় তাহার জন্য বিধিমতে চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি ও দেবেন্দ্রনাথ বিক্রমপুর ও অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে "আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বিবাহ হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী নহে" এই মর্ম্মে এক পাতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত পাতি গ্রহণে ব্রজসুন্দরকে প্রভূত অর্থ ব্যয়

করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জমা খরচের বহি ও অন্যান্য কাগজপত্রে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রজসুন্দরের পুরাতন কাজপত্রের মধ্যে একটী নথীতে "Abstract of the proceedings of the Council of the Governor General of India assembled for the purpose of making Laws and Regulations under the provisions of the Act of Parliament 24 and 25" দেখিতে পাই। এই সম্বন্ধে অন্যান্য কাগজ পত্রের মধ্যে ব্রজসুন্দর ব্যবস্থাপক সভায় এই আইনের বিরুদ্ধে যে দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারও একটা অপরিষ্কৃত খস্‌ড়ার (draft) কতক অংশ ছিন্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দরখাস্তের তৃতীয় কারণে দেখা যায় লিখিতেছেন যে "হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ অবস্থা এবং ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে হিন্দুধর্ম্ম হইতে বহুসংখ্যক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে এবং এইক্ষণও হইতেছে। তাহাদিগের মত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম হইতে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন, তাহাদিগের রীতিনীতিও হিন্দুশাস্ত্র হইতে অনেক পরিমাণে বিপরীত, তথাপি সে সম্বন্ধে কখনও কোন আপত্তি কিম্বা সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। ব্রাহ্মগণের সম্বন্ধেও তো সেইরূপ হইতে পারে। বিশেষত হিন্দুধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত এই সকল সম্প্রদায়ের বিবাহ পদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্র হইতে যত বিভিন্ন ব্রাহ্মদিগের বিবাহ পদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্র হইতে ততদূর বিভিন্ন নহে তাহাতে অগ্নি সাক্ষী পদ্ধতি পরিত্যাগ করিলেও বিবাহ অসিদ্ধ হইতে পারে না।"

চতুর্থ কারণে লিখিয়াছেন "এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে ব্রাহ্মগণ হিন্দুদিগ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িবেন। একে ব্রাহ্মগণ সংখ্যায় অতি অল্প তাহাতে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তাহাদিগের শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে ও অবনতি সম্পাদন করা হইবে। ইহা অবশ্য আইন কর্ত্তার উদ্দেশ্য নহে। ব্রাহ্মসমমাজের উদ্দেশ্য সমগ্র হিন্দুসমাজকে ক্রমে উন্নতির পথে চালিত করা; ইহার এই তরুণ

অবস্থায়ই ইহা হিন্দুসমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে হিন্দুসমাজের উন্নতিসাধন করা আর ব্রাহ্মদিগের সাধ্যায়ত্ত থাকিবে না তাঁহারা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইবেন।”

এই আইনের বিরুদ্ধে তিনি আরও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কালীর বিকৃত অবস্থা এবং মধ্যে মধ্যে কীটদংষ্ট্র হওয়াতে অক্ষরগুলি বড়ই অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ১৫০ শত ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সে সময়কার অবস্থার পক্ষে ইহা কিছু কম নহে; এই সকল ব্যক্তির মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহার প্রাচীন বন্ধু। ঢাকার যুবকব্রাহ্মদল তখন পর্য্যন্ত সাঁচি-পান্দরিপা সমাজেই ছিলেন সুতরাং পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে এই বিষয় লইয়া বিশেষ কোনও সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় নাই; ব্রজসুন্দর নির্ব্বিবাদে আপনার মতানুসারে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছিলেন।

গভর্ণর জেনারালের নিকট তখন কেশবচন্দ্রের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং প্রতিবাদ সত্ত্বেও আইন পাস হইয়া গেল। তবে কেশবচন্দ্র ইহাকে “ব্রাহ্ম-বিবাহ-আইন” নামে অভিহিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রজসুন্দর প্রমুখ ব্রাহ্মদিগের প্রতিবাদে এই আইন “সিভিল-বিবাহ-আইন” নামে বিধিবদ্ধ হইল। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অথবা প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায় বহির্ভূত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে কেহ সিভিল বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকেই এই আইনের শরণাপন্ন হইতে হয়।

এতদিন পরে আমরা তিন আইনের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়াই পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। ব্রজসুন্দরের ভয় যে অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক ছিল না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা ঢাকার নববিধানাচার্য্য বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট শ্রুত হইয়াছি যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রজসুন্দরের সহিত এই বিবাহ-বিধির প্রতিবাদ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্যই

আর একবার ঢাকায় গমন করেন। নবনির্ম্মিত মন্দিরে উপাসনা করিবার জন্য ব্রজসুন্দর অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখিত একখানি পুরাতন চিঠিতেও দেখিতে পাই। চিঠিখানি এই—

প্রীতিভাজনেষু—

আপনার ৭ই জ্যৈষ্ঠের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট কৃপা এবং আমারও ইচ্ছা যে একবার ঢাকার নূতন ব্রহ্মমন্দিরে আপনাদের সহিত একত্রে মিলিয়া ব্রহ্মোপাসনার পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি। কিন্তু আমার ইচ্ছা কি প্রকারে কবে যে সুসম্পন্ন হইবে তাহার আশা আমি কিছুই দিতে পারি না। যাঁহার হস্তে সকল ঘটনা তিনি আমাকে তথায় লইয়া না গেলে আর উপায় নাই। আমি তথায় যাইতে পারিলেও আমার স্বীয় আনন্দলাভ ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কোনও উপকারের প্রত্যাশা নাই। পাকড়াশী মহাশয় থাকিলে যে উপকার হইতে পারে আমার মতন সহস্র লোকের দ্বারা তাহার সম্ভাবনা নাই। আমি এজন্য তাঁহাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তিনি অনায়াসে তাহা কাটিয়া আইলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে ঢাকা হইতে তাঁহার দ্বারা পত্রিকা সম্পাদনের কার্য্য ভাল হয় না। আমি তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া কাজে কাজেই তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে বলিলাম। তাঁহার সাধু ইচ্ছার আমি অনুমোদন করিতে পারি কিন্তু তাঁহাকে অনুরোধ করিতে পারি না। * * * * * *

নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে সময়ে ঢাকায় যাইতে না পারিলেও এই সময়ে গিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় গমন করিলে ব্রজসুন্দর তাঁহাকে পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন,

আমরা বঙ্গবাবুর নিকট শুনিতে পাই যে, তিনি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন নাই। ঢাকা তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেখানে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের অত্যন্ত প্রভাব দেখিয়াই তিনি ব্রজসুন্দরকে বলিয়াছিলেন ঢাকার ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে পছন্দও করিবেন না এবং তাঁহার দ্বারা কোন উপকারও বোধ করিবেন না। ব্রজসুন্দরের নির্দ্দেশমতে বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় কয়েকটী যুবক ব্রাহ্মকে সঙ্গে লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নৌকায় গমন করিলেন। সেই সময়ে সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবও চলিতেছিল। আমরা ব্রজসুন্দরের ডায়েরীতে দেখিতে পাই যে, মহর্ষি শেষে সমাজে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ডায়েরীতে আছে ঃ—

Babu Debendra Nath Tagore, Prodhan Acharjee of the Bramho Somaj arrived at Dacca on the 22nd Agrahain 1279 (7th December 1872) early in the morning. In the evening of the same day he delivered a sermon in the Bramho Somaj on the occasion of the anniversary of the East Bengal Brahmo Somaj. In the morning of the following day he came to my house. All my daughters tendered their *pronams* to him. He was eager to take my boy to his lap but Joti did not venture to go He made *ashirbad* to all of them. He remarked that the boy was promising and wished heartily that he would follow me in every respect in his boy hood, manhood and old age. He further remarked that all my daughters were সুশীলা, and that I had got a large number of them. He then went to my wife's room who was ailing and made *ashirbad* to her by placing his hand on her head. On the following day, being Sunday, he delivered a sermon in the Brahmo Somaj. In the evening he delivered another sermon

after *upasona* which he himself offered from the *vedi.*

তিন আইন মতে ঢাকায় প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ:—তিন আইন প্রণয়ণের বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্রজসুন্দর স্বীয় কন্যাদিগকে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়াছিলেন, যথাস্থানে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দুই কন্যার ঐরূপ বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে হইলেও তিনি তাহাতে স্ত্রীআচার ও সপ্তপদী গমন প্রভৃতি হিন্দুবিবাহের আচার ব্যবহার অনুষ্ঠিত হইতে দেন নাই এবং উপবীতধারী উপাচার্য্যের সহিত স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ও কার্য্য করিয়াছিলেন। বয়সে ব্রজসুন্দর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্ম হইলেও তিনি সময়ের অনেক অগ্রে ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রথমাবস্থা হইতে দেশ প্রচলিত রুচিবিরুদ্ধ এবং অসঙ্গত আচার ব্যবহার কখনও তিনি নিজ পরিবারে অনুষ্ঠিত হইতে দিতেন না। যাহাতে পবিত্র বিবাহ পদ্ধতিতে কোনও আবর্জ্জনা না প্রবেশ করে সে বিষয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। ব্রজসুন্দর তিন আইনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করুন আর নাই করুন ভগবানের বিধান অন্যরূপ হইল। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহারই গৃহে তিন আইন মতে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মবিবাহ অনুষ্ঠিত হইল।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বজ্রযোগিণী-নিবাসী বিখ্যাত দাতা চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের পৌত্র সাধুচরিত্র রজনীকান্ত ঘোষের সহিত তাঁহার ষষ্ঠ কন্যার বিবাহপ্রস্তাব চলিতেছিল। ব্রজসুন্দর তিন আইনের ঘোর বিরোধী কিন্তু রজনীকান্ত নব্যদলের উৎসাহী ব্রাহ্ম, তিনি আইন অগ্রাহ্য করিয়া বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন। ব্রজসুন্দরের নিকট এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইল। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৫ সনে যুবক ব্রাহ্মদল ব্রজসুন্দরের সহিত পুনর্মিলিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত এ সম্বন্ধে তাঁহার বহুদিন ধরিয়া মহা তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল, এমন কি এক একদিন তর্কবিতর্ক ও কথাবার্ত্তায় রাত্রি ১১।১২ টা বাজিয়া যাইত।

কিন্তু কিছুতেই মতদ্বৈধের মীমাংসা হইল না দেখিয়া ব্রজসুন্দর অগত্যা পাত্রান্তরে কন্যাকে বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন। পত্নী ব্রহ্মময়ী রজনীকান্তের স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি এবং মধুর প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার সহিতই কন্যার বিবাহ দিবার জন্য মৃত্যুশয্যায় স্বামীকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর মতের খাতিরে পত্নীর অন্তিম অনুরোধও উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। যাহা হউক ব্রজসুন্দরের মনের ভাব গোপন রহিল না। কিন্তু কন্যা ভুবনমোহিনী তখন সপ্তদশ বর্ষীয়া ও শিক্ষিতা; এবং ইতিপূর্ব্বেই তিনি রজনীকান্তের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। সুতরাং উপস্থিত সঙ্কট সময়ে আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে মনে করিয়া ভুবনমোহিনী সাহসে ভর করিয়া পিতার নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন "আপনি যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে জানিয়াছি যে একজনের প্রতি অনুরক্তা হইয়া অন্যকে বিবাহ করা পাপ, সুতরাং আমার জন্য আপনি অন্যত্র বিবাহের চেষ্টা করিবেন না।"

বলা বাহুল্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্রজসুন্দর কন্যার এই পত্র পাইয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। সন্তানবৎসল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতা কন্যার মঙ্গলার্থ আপনার মত বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্থির হইল তিন আইন মতেই রজনীকান্তের সহিত ভুবনমোহিনীর বিবাহ হইবে। একদিন মাতৃজীবনকে রক্ষা করিতে গিয়া সন্তানবাৎসল্যকে বলিদান করিয়াছিলেন, আজ সন্তানবাৎসল্যই পুনরায় তাঁহাকে স্বীয় মত বলিদান করিতে সমর্থ করিল। ব্রজসুন্দরের দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিষয় স্মরণ করিলে তাঁহার ঈদৃশ আচরণেরও সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। ব্রজসুন্দর একদিন কর্ত্তব্যবোধে সকল বন্ধুবান্ধবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় বালবিধবা কন্যার ভবিষ্যৎসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। আজ সেই কর্ত্তব্যবোধেই তাঁহাকে কন্যার মতের নিকট স্বীয় মতকে বলি দিতে সমর্থ করিল। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন চিরপোষিত ভাবগুলিকে দলিত করিয়া তিনি প্রাণে কি

বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ মন যেন এই আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, ইহা সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। ব্রজসুন্দরের সদা প্রফুল্লমুখ কালিমায় ঢাকিয়া গেল। তিনি আত্মবলি-দান দ্বারা পিতৃ-কর্ত্তব্যপালনে প্রস্তুত হইলেন। এই বিবাহ ব্যাপার লইয়া তিনি যুবকদলের সহিত আঁটিতে না পারিয়া জামাতা কেদারনাথ রায়কে ঢাকায় ডাকিয়া আনিলেন। কেদারনাথ নব্য ব্রাহ্মদলের একজন অগ্রণী। তিনি শ্বশুরের প্রকৃতি জানিতেন। যাহাতে উভয়-কুল রক্ষা হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া একটা মীমাংসা করিতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি মধ্যস্থ হওয়াতে ব্রজসুন্দর সাক্ষাৎ ভাবে যুবকদলের সহিত তর্কবিতর্ক করার বিরক্তিকর দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন। কেদারনাথের কয়েকদিন মাত্র ছুটি ছিল, তাহার মধ্যেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে বলিয়া রজনীকান্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এইরূপে বিবাহের তারিখ স্থির হওয়ার পর জানা গেল যে আইন মতে বিবাহের ১৪ দিবস পূর্ব্বে নোটিস দিতে হয় কিন্তু নির্দ্দিষ্টদিনে বিবাহ হইলে ৭ দিন মাত্র হয়। এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে রজনীকান্তের যুবক-বন্ধুদলের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন রজনীকান্ত নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কি করেন নিরুপায়, কথায় আবদ্ধ। এই উভয়সঙ্কটে রজনীকান্ত বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। একদিকে জননী, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃগণ ব্রাহ্মবিবাহের ঘোর বিরোধী, অপরদিকে ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহানুভূতিও হারাইয়া বসিলেন। ধীরপ্রকৃতি রজনীকান্ত কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন। বিবাহের দিন স্থির রহিল, তিনি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। মিঃ কে, এন্, রায়, বাবু কালীনারায়ণ রায়, বিহারীলাল সেন, গণেশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজদাস দত্ত, কৈলাসচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মবন্ধুগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। বিবাহের দিন উপস্থিত হইল, কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ নাই। রজনীকান্ত যদিও কেদারনাথকে স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন যে "আমার কোনও আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব

বিবাহে উপস্থিত না হইলেও, আমি একা আসিয়া বিবাহ করিব তথাপি ব্রজসুন্দর উক্ত বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না। যাহা হউক বিবাহের সময় ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বিবাহের দিন সন্ধ্যার সময় খবর আসিল রজনীকান্তের বন্ধুবর্গ ও ভ্রাতা রাধাকান্ত ঘোষ বিবাহে উপস্থিত হইবেন। যথাসময়ে বন্ধুবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বর আসরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অত্যধিক সংস্কারপ্রিয়-ব্রাহ্ম রজনীকান্ত পুনঃ পুনঃ ব্রজসুন্দরের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও মছলন্দ-বিছানায় উপবেশন করিতে স্বীকৃত হইলেন না এবং বিবাহের পূর্ব্বে নববস্ত্র পরিধান করিলেন না। বৃত হইতেও সম্মত হইলেন না দেখিয়া রজনীকান্ত ও জ্যেষ্ঠজামাতাদিগের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সকল সুসজ্জিত রেকাব বিবাহ সভায় নীত হইয়াছিল অত্যন্ত বিষাদের সহিত ব্রজসুন্দর সে সমস্ত ফিরাইয়া দিলেন। এখানেই গোলমালের অবসান হইল না। যুবকদল বিবাহ পদ্ধতিতে 'সম্প্রদান' শব্দ ব্যবহারের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ব্রজসুন্দরও ছাড়িবার পাত্র নহেন। কিন্তু তিনি যেই সম্প্রদান শব্দটী উচ্চারণ করিয়াছেন অমনি জনৈক যুবকব্রাহ্ম বলিয়া উঠিলেন "সম্প্রদান শব্দটীও বাদ গেল না ?" এই কথা শুনিবামাত্র ব্রজসুন্দর যুবকটিকে মুখ ফিরাইয়া একবার দেখিলেন। তখন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যুবকের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া গেল। কিন্তু এত গোলযোগে সেদিন বিবাহ হইবে কি না তাহার স্থিরতা ছিল না বলিয়া সেদিন আগন্তুকদিগের আহারের কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। তৎপরদিন অবশ্য প্রচুর ভোজের আয়োজন হইল। ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে নোটিস্ না দেওয়াতে ৭ দিন পর্য্যন্ত রজনীকান্ত নবপরিণীতা পত্নী হইতে পৃথক্ রহিলেন। ৭ দিন পরে রেজিষ্টারী হইল। এইরূপে ঢাকায় তিন আইনের বিধি অনুসারে সর্ব্বপ্রথম বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার কন্যার বিবাহের নোটিস্টী ঘটনাক্রমে ঠিক তাঁহার কাছারির এজলাস্-গৃহের প্রবেশদ্বারেই প্রদত্ত হইয়াছিল।

ইহাতে তিনি যেন মরমে মরিয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য পিতৃতুল্য ব্রজসুন্দরের অন্তরে যাঁহারা আঘাত দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি অল্পদিন পরেই নির্দ্দোষ অর্ঘ্য প্রদান অপেক্ষা শতগুণ আপত্তিজনক কার্য্যে (যথা—নিশান পূজা প্রভৃতি) লিপ্ত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই; ইহা ভাবিলেও অবাক হইতে হয়।

১৮৭৪ সনের ডিসেম্বরে (১২৮১ সালে ঢাকা-ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে) বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঢাকায় গমন করেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলা কয়েকটী বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিয়া ঢাকা সহরে উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন।

ব্রজসুন্দরের পরলোকগমনের পর পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ব্রজসুন্দর ১৮৭৫ সনের ডিসেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন।

১৮৭৭ সনে কুচবিহার বিবাহ হয়। এই বিবাহ ব্যাপার লইয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ সমূহে যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজও সেই আন্দোলনের এক প্রধান ক্ষেত্র হইয়া পড়িল। বিবাহের সংবাদ ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হইলে ২৭শে মাঘ তত্রত্য আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ এক সভা আহ্বান করিলেন এবং বিবাহের অবৈধতা প্রদর্শন করিয়া বাবু কেশবচন্দ্রের নিকট এক প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিলেন। এই বিবাহ হইয়া যাইবার পরেও ঢাকায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই সকল আন্দোলন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই আন্দোলনের ফলে ঐ বিবাহ সমর্থনকারী ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আরমানিটোলায় এক পৃথক্ উপাসনামন্দির স্থাপন করেন। বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়, দুর্গাদাস রায়, গোপীমোহন সেন, ঈশানচন্দ্র সেন এবং দুর্গানাথ রায় এই সমাজের পরিচালকদিগের মধ্যে উল্লেখ

যোগ্য ব্যক্তি। বাবু বিহারীলাল সেন, কৈলাসচন্দ্র নন্দী, রামপ্রসাদ সেন, প্রভৃতি উক্ত সমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

কুচবিহার বিবাহের পর পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমান যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। এই নবীন যুগের সঙ্গে ব্রজসুন্দরের কোন সম্পর্ক ছিল না কেননা এই বিচ্ছেদের পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়। এই নবযুগের আবির্ভাবের সময়ে তাঁহার চির স্নেহাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নূতন উৎসাহ ও তেজের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হন। পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কার্য্যাবলী চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। জীবনের পরিণাম সময়ে তিনি তাঁহার চিরাশ্রয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে কত অমূল্য জীবন দান করিয়া গেলেন। বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন এমন অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম এখনও ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যমান। পরে তিনি যাহাই করুন, যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিব না, যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা স্থায়ী সম্পত্তি।

বিজয়কৃষ্ণের পর যে কয়জন পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রজনীকান্ত ঘোষ এবং স্বর্গীয় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রজনীকান্ত দীর্ঘকাল ঢাকা সহরে বাস করিয়া নানাভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উপাসনাশীলতা ও উন্নতচরিত্র, একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়াছে অপরদিকে তেমনি জনসাধারণের নিকটেও ব্রাহ্মজীবনের উচ্চ আদর্শ ধরিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বর্গীয় ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ও ব্রাহ্মসমাজের এক মহা কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন। নিরক্ষর, অজ্ঞ, দুঃখী লোকদিগের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এক দুরূহ সমস্যা। বলিতে কি একমাত্র কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় এই সমস্যা মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিছু কিছু কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। দরিদ্রদিগের প্রতি তাঁহার

অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল এবং তাহাদিগের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আপনার শক্তি সামর্থ নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতেছেন এস্থলে তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করা নিপ্প্রয়োজন।

১৮৪৬ সন হইতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং উপাচার্য্যদিগের নাম যাহা বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় দ্বারা লিখিত হইয়াছিল ঃ—

১৮৪৬ হইতে ১৮৮৩ পর্য্যন্ত।

সম্পাদক।	সহকারী সম্পাদক।
১। বাবু যাদবচন্দ্র বসু।	১। বাবু নন্দকুমার গুহ।
২। ,, হারানচন্দ্র সরকার।	২। বাবু অনাথবন্ধু মল্লিক।
৩। ,, দীননাথ সেন।	৩। বাবু আদিনাথ দাস।
৪। ,, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।	
৫। ,, অভয়চন্দ্র দাস।	
৬। ,, দুর্গাদাস রায়।	
৭। ,, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।	

উপাচার্য্য।

১। বাবু চন্দ্রকিশোর বসু।	১০। বাবু রামপ্রসাদ সেন।
২। পণ্ডিত রামকুমার বেদপঞ্চানন।	১১। ,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ।
৩। ,, কৃষ্ণকমল গোস্বামী।	১২। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
৪। ,, দয়ালচন্দ্র শিরোমণী।	১৩। ,, অযোধ্যানাথ পাকড়াসী।
৫। বাবু হরচন্দ্র বসু।	১৪। বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়।
৬। ,, হারানচন্দ্র সরকার।	১৫। ,, রজনীকান্ত ঘোষ।
৭। ,, দীননাথ সেন।	১৬। ,, কালীনারায়ণ গুপ্ত।
৮। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।	১৭। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন।
৯। সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত।	১৮। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়।
	১৯। বাবু প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার।

১৮৮৪ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, যাহা বাবু মথুরানাথ গুহ বর্ত্তমান সম্পাক কর্ত্তৃক সংগৃহীত :—

সম্পাদক

১। বাবু রজনীকান্ত ঘোষ—১৮৮৪-৮৫।

২। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়—১৮৮৫-৮৬।

৩। বাবু রজনীকান্ত ঘোষ—১৮৮৬-৮৭ হইতে ১৯০১-০২ পর্য্যন্ত ১৬ বৎসর।

৪। ,, ভুবনমোহন সেন—১৯০২-০৩ হইতে ১৯০৫-০৬ পর্য্যন্ত ৫ বৎসর।

৫। ,, সতীশচন্দ্র ঘোষ—১৯০৬-০৭ হইতে ১৯০৭-০৮ পর্য্যন্ত ২ বৎসর।

৬। ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায়—১৯০৮-০৯ হইতে ১৯১১-১২ পর্য্যন্ত ৪ বৎসর।

৭। বাবু মথুরানাথ গুহ—১৯১২-১৩ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত।

উপাচার্য্য।

১। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
২। বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩। ,, চণ্ডীকিশোর কুশারি।
৪। ,, রজনীকান্ত ঘোষ।
৫। ,, শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
৬। ,, প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার।
৭। ,, গিরীশচন্দ্র মজুমদার।
৮। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন।
৯। বাবু কালীপ্রসন্ন বসু।
১০। ,, মনোরঞ্জন গুহ।
১১। ,, রজনীকান্ত বসু।
১২। ,, শশিভূষণ বসু।
১৩। বাবু ভুবনমোহন সেন।
১৪। ,, নীলমণি চক্রবর্ত্তী।
১৫। ,, নবদ্বীপচন্দ্র দাস।
১৬। ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
১৭। বাবু বরদাপ্রসন্ন রায়।
১৮। ,, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।
১৯। ,, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।
২০। ,, অমৃতলাল গুপ্ত।
২১। ,, মধুসূদন সেন।
২২। ,, শিবনাথ দত্ত।
২৩। ,, কাশীচন্দ্র ঘোষাল।
২৪। ,, সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

১৮৭০ সন হইতে ১৮৮৫ সন পর্য্যন্ত যাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উল্লেখ যোগ্য। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, দীননাথ সেন, অভয়চন্দ্র দাস, গোবিন্দপ্রসাদ রায়, রূপলাল দাস, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ সেন, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, পার্ব্বতীচরণ রায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বঙ্গচন্দ্র রায়, দুর্গাদাস রায়, কৈলাসচন্দ্র নন্দী, গঙ্গাচরণ সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, হারানচন্দ্র সরকার, হরিচরণ চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত ঘোষ, কালীনায়ণ রায়, ডাঃ পি, কে, রায়, বাবু অক্ষয়কুমার সেন, জগদ্বন্ধু লাহা, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

আমরা উপরোক্ত উপাচার্য্যের তালিকায় কিন্তু কিছু ভুল দেখিতে পাই। বাবু যাদবচন্দ্র বসু, উদয়চন্দ্র আঢ্য এবং ব্রজসুন্দরের নাম এই তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। ব্রজসুন্দর যে সময় সময় কেবল উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন তাহাও নহে তিনি সামাজিক উপাসনায় সঙ্গীতের কার্য্যও করিতেন। তিনি যে সুগায়ক ছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঢাকা সমাজের বাল্যাবস্থায় তিনিই গায়ক এবং সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মসমাজের বর্ত্তমান গায়ক বাবু চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও তাঁহার নিকট সময় সময় সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন তাহাও আমরা শুনিয়াছি। পরবর্ত্তী কালে যখন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, অমৃতলাল গুপ্ত, কালীপ্রসন্নঘোষ ব্রাহ্ম সমাজের জন্য সঙ্গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ব্রজসুন্দর স্বয়ং অনেক সঙ্গীতের সুর বাঁধিয়া দিতেন। ব্রাহ্ম সমাজের পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে আমরা একখানি অতি জীর্ণ খাতা দেখিতে পাই। খাতা খানি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান করা যায় উহা কবি কৃষ্ণচন্দ্রের। তিনি কয়েকটী কবিতা ঐ খাতায় প্রথম রচনা করিয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র এই কবিতাগুলি রচনা করিয়া বোধ হয় ব্রজসুন্দরকে দেখাইয়া ছিলেন কেন না আমরা দেখিতে পাই খাতায় "অয়ি সুখময়ী উষে" কবিতাটীতে ব্রজসুন্দরের নিজ হস্তে সুর বাঁধা রহিয়াছে। ব্রজসুন্দর যে

কবিতাগুলির ভাষাও স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন এবং বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন তাহারও সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। কালের ধ্বংশকারী প্রভাবে এতদিনেও উভয়ের হস্তাক্ষর ও কালীর বৈষম্য লোপ করিতে পারে নাই।

ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যাত্ম বিভাগে ব্রজসুন্দরের দানের কথাও একটী উল্লেখ যোগ্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত উপাসনা পদ্ধতি ও ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাসনা পদ্ধতির মধ্যস্থলে যে পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছিল তাহা ব্রজসুন্দরের। আমরা ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কার্য্যবিবরণীতে ইহা দেখিতে পাই।

পদ্ধতিটী এই—উদ্বোধনের প্রাক্কালে বেদীতে বসিবার পূর্ব্বে আচার্য্য দণ্ডায়মান হইয়া "পিতানোঽসি" শ্লোকটী উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিবেন। পরে—

১। উদ্বোধন-সঙ্গীত।

২। উদ্বোধন।

৩। "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" এই শ্রুতি উচ্চারণ।

৪। নমস্কার।

৫। ঈশ্বরের স্বরূপ কীর্ত্তন, স্তুতি ও প্রার্থনা।

৬। সঙ্গীত।

৭। উপদেশ।

৮। প্রার্থনা।

৯। সঙ্গীত।

১০। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" উচ্চারণ।

১৮৪৬ সন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইল। যাঁহারা এই সমাজ গঠনে দেহ মনের শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। হয়ত বা কাহারও

নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই তাহা আমাদের ইচ্ছা-কৃত অপরাধ নহে। যথার্থ ভগবানের দাস যাঁহারা তাঁহারা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় বিধাতা ব্রজসুন্দরকে ইহার প্রচার এবং পুষ্টি সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর একা যে দুরূহ ভার বহন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে সম্মিলিতভাবে বহু ব্রাহ্ম যে ভার বহন করিতেছেন, বলিতে গেলে এক সময়ে একাকী তাঁহাকেই সেই সমুদায় ভার বহন করিতে হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহার গৃহই ব্রাহ্মদিগের এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই বাটীতেই ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মবিদ্যালয়, ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাস ও প্রচারকনিবাস ছিল এবং সঙ্গত সভার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। এখানেই ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন মুখপত্র "ঢাকা-প্রকাশ" পত্রিকার কার্য্যালয় ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের যত কার্য্য এবং তখনকার অধিকাংশ ব্রাহ্ম এবং প্রচারক সকলেরই আশ্রয় স্থান ছিল তাঁহারই ভবন। তাঁহার অর্থই ছিল মিশন ফাণ্ড, তিনিই ছিলেন পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি ভূমি—কেবল প্রতিষ্ঠাতা নয়, প্রতিপালক ও পরিরক্ষক।

১৮৬৫ সনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

ঢাকা প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিষয় যখনই স্মরণ করি তখনই আপনার প্রতি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হয়। যদিও ঢাকা প্রদেশ আপনাকে অস্বীকার করিতে উদ্যত হয় তথাপি তাহাকে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। এখনও অনেকে আপনার দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। এ অবস্থায় আপনাকে বৃদ্ধ হইয়াও সিংহের ন্যায় বল ধারণ করিতে হইতেছে, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া আপনার পরিবারকে পূর্ব্ববাঙ্গালার দীপ স্বরূপ করিতে হইবে। সেই দীপ আমার

নীচেয় না রাখিয়া পর্ব্বতের শিখরে সাধারণের দৃষ্টির উপর স্থাপন করিতে হইবে। *

আপনার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ব্রজসুন্দর কি ভাবে আপনার দেহ মনের শক্তি অর্থ সামর্থ্য ব্রাহ্মসমাজের সেবায় এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের বিশেষ উপকার হইতে পারে। ব্রজসুন্দর ধনী ছিলেন না, দুরন্ত জীবনসংগ্রাম দ্বারা তাঁহাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম শত শত ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু এমন করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন কয়জন? দেশের সুদূর প্রান্ত হইতে যে কেহ যে কোন সৎকার্যের জন্য তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছেন তখনই আহ্লাদের সহিত তাহা যথাসাধ্য পূর্ণ করিয়াছেন। তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্ম প্রচারক ছিলেন। তাঁহাদের পরিবারের ভার বহন করিতে তিনি যেন আপনাকে দায়ী মনে করিতেন। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য জীবন দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিবারের অন্নবস্ত্রের জন্য ব্যাকুল করা অতিশয় অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদিগের পরিবার পরিজনদিগকে আপনার পরিবারের ন্যায় মনে করিতেন; যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের সকল সংবাদ রাখিতেন। তাঁহাদের পীড়া হইলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেন; সুপক্ব ফল, সুখাদ্য, মুখরোচক আচার পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। প্রয়োজন হইলে টাট্‌কা মৎস্য পর্য্যন্ত নিয়মমত পাঠাইতেন। এমন কি একজন প্রচারকের স্ত্রী অলঙ্কার না পাইলে পতির সহিত ব্রাহ্মসমাজে আসিবেন না জানিতে পারিয়া ব্রজসুন্দর তাঁহার পত্নীর আব্দার পূর্ণ করিবার জন্য অলঙ্কার দিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরের

---

* ব্রজসুন্দর যে তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণকে প্রকাশ্যে বাহির করিতেন না এস্থলে বিজয়কৃষ্ণ তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ন্যায় সহৃদয় দাতা বড়ই দুর্ল্লভ। কেবল কি তিনি অর্থ সাহায্যে মুক্তহস্ত ছিলেন? যখন যেখানে থাকুন, ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের দিকে তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত, সুদূর হইতে তাহার সকল সংবাদ রাখিতেন। সভ্যদিগের উপস্থিতির তালিকা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইত, তিনি মনোযোগ দিয়া তাহা দেখিতেন। নূতন কেহ ব্রাহ্মসমাজে আসিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ-সংক্রান্ত যত কার্য্য হইত, তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কিছুই হইত না। ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে তাঁহাদের অভিভাবকের ন্যায় দেখিতেন। তিনিও তাঁহাদের প্রতি অতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন; কাহারও স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই জন্যই সকল কার্য্য এমন সুচারুরূপে ও সহজভাবে সম্পন্ন হইত। সকল ব্রাহ্মই জানিতেন ব্রজসুন্দর তাঁহাদের প্রধান বল, প্রধান ভরসা, তিনিই সকলের বন্ধনরজ্জু, তিনি সকলের প্রাণ। কেবল কি তিনি এই প্রকারে পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করিয়া নিবৃত্ত ছিলেন তাহা নয়, তিনি স্বয়ং একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার একদিনের ডায়েরীর নকল প্রদত্ত হইল ঃ—

January 1865, I wrote a letter to Babu * * * at Cooch-Behar requesting him to look after his own soul and to seek for its Maker. In reply he expressed great regret for his past life and conduct and sincerely wished to know how best he could pass the remaining portion of his life. I wrote him a lengthy letter on the subject and at the same time arranged to send him Tattva-bodhini and Dharmatattva Patrikas for his perusal.

এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তিনি কার্য্যোপলক্ষে যেখানে যাইতেন সেখানেই একটী ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইত। তিনি নূতন স্থানে গিয়াই সেখানে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি বাহির

করিতেন, ও তাঁহার সহিত হৃদয়ের বন্ধুতা করিয়ালইতেন। অপরের ভিতর ধর্ম্মের ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য কত শত শত ধর্ম্মপুস্তক নিজ ব্যয়ে কিনিয়া বিতরণ করিতেন। যাহাতে সাধারণের মধ্যে সদ্‌গ্রন্থের প্রচার হয়, সেইজন্য যে কত চেষ্টা, কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার জমা খরচের বহিতে পত্রে পত্রে তাহার নিদর্শন পাই। যথা :—

মেদিনীপুর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে পাঠান যায়—১৪৲

দরুণ উক্ত বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার ৩০ খণ্ড খরিদ করা যায়—৭৷৷০

বাকি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে—২৷৷০

"সত্যধর্ম্ম অন্তরে" পুস্তকের ৯ খণ্ড খরিদ করা যায়—১৶০

"ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" ১৪ খণ্ড খরিদ করা যায়—৭৲

"বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ"—৩৲

কলিকাতা মোকামে ব্রাহ্মধর্ম্মসংক্রান্ত ইংরাজী পুস্তক খরিদ ৭২৷৵০র মধ্যে গুরুচরণ মহলানবিশের নিকট পাঠান যায়—৫০৲

পুস্তক খরিদ ইত্যাদি বাবদ হুণ্ডি ও ডাক ষ্ট্যাম্প পাঠান যায় মোকাম কলিকাতা বরাবর গুরুচরণ মহলানবিশ—৯০৷৷৶০

"ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" ২৫ খণ্ডের মূল্য দেওয়া যায়—১২৷৷০

বাবু দীননাথ সেনকে তাঁহার কৃত "সদ্ধর্ম্ম-সঙ্কাশিনী"র মূল্য বাঁবদ দেওয়া যায়—১৮৲

ব্রাহ্মধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক খরিদ বাবদ বাবু ঈশানচন্দ্র বসুকে দেওয়া যায়—১০৲

ঐ বাবদ বাবু হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া যায়—১২৷৶০

এইরূপ কত লেখাই রহিয়াছে। ব্রহ্মসঙ্গীতই বা কত ক্রয় করিয়াছেন দেখা যায়। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচারিত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক অনুবাদিত থিওডোরপার্কারের 'প্রার্থনা-

মালা' বিতরণ করিবার জন্য কতবার বাবু দুর্গামোহন দাসের নিকট অর্থ প্রেরণ করিতেছেন। কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক লিখিলে যে তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন আজিও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। নিজে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন, কিন্তু অনেক দুঃস্থ অথচ আগ্রহশীল লোকদিগের জন্যও উক্ত পত্রিকার বাহুল্য সংখ্যা সকলের মূল্য দিতেছেন ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। পত্রিকাগুলির যতদূর সদ্ব্যবহার করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতেন, যত লোককে পড়ান যাইতে পারে পড়াইতেন। এ বিষয়ে তাঁহার একটু সুবিধা ছিল; তাঁহার সহিত এত লোকের স্বার্থের যোগ ছিল যে অনেকে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যও পত্রিকা পাঠ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

শুধু যে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সহিতই ব্রজসুন্দরের প্রাণের গভীর যোগ ছিল তাহা নহে; পূর্ব্ববঙ্গের সকল ব্রাহ্মসমাজের সহিতই তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চট্টগ্রামেও ব্রজসুন্দরের আশৈশব বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ সেন, রামশঙ্কর সেন, অভয়চন্দ্র দাস, কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রভৃতি রাজ-কার্য্যোপলক্ষে অবস্থিতি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের দ্বারাই সেখানে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রজসুন্দরকেও কর্ম্মোপলক্ষে কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট হইতে চট্টগ্রামে যাইতে হইত। এবং চট্টগ্রামে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বিস্তারের মধ্যেও ব্রজসুন্দরের অন্ততঃ পরোক্ষভাবে কোনও হস্ত ছিল না একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ব্রজসুন্দর এবং তাঁহার বন্ধুগণই পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম শিক্ষিত দল। তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রথিতনামা প্রচারক দলের ন্যায় দেশে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের উপর ব্রজসুন্দরের কিরূপ প্রভাব ছিল তাহা পুরাতন চিঠিপত্রে প্রকাশ পায় কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়

এই যে ব্রজসুন্দরের লোকান্তর গমনের পর এই সকল উৎসাহী বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শ হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। *নওয়াখালিতেও ব্রজসুন্দরের বন্ধু এবং অনুগামী মদনমোহন গুপ্ত দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ তো ব্রজসুন্দর কর্ত্তৃকই প্রত্যক্ষ ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার স্থানান্তর গমনের পর সম্ভবতঃ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইহার ভার লইয়াছিলেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে ব্রজসুন্দরের প্রেরণা বিদ্যমান একথা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও স্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাবু হরিশ্চন্দ্র মজুমদার এবং অপর যে কয়েক ব্যক্তির দ্বারা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহাঁরা অনেকেই ব্রজসুন্দরের ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শেই শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং বরিশাল ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনে তাঁহার সাহায্য পাইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ বাবু কালিকাদাস দত্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন কল্পে যে ব্রজসুন্দরের কিছু মাত্র প্রভাব ছিল না একথা স্বীকার করা যায় না। তিনি শ্রীহট্টের সদরে সর্ব্বদা না থাকিলেও ইহার নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন, এবং এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন তিনি যখন যেখানে যাইতেন সেই খানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের হাওয়া বহিত।

কালীকচ্ছের প্রসিদ্ধ রামদুলাল মুন্সীর পুত্র বিখ্যাত ভক্ত আনন্দ-চন্দ্র নন্দী প্রভৃতি তাঁহার প্রভাবেই ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শান্তিপুর, ফরিদপুর, কুমারখালি, মেদিনীপুর, বেহালা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিতও তাঁহাকে সংসৃষ্ট দেখা যায়। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নির্ম্মাণে এবং প্রচার ফাণ্ডে কিরূপ প্রচুর দান করিয়াছিলেন তাহা পুরাতন ধর্ম্মতত্ত্বে দেখা যায়।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ বিশেষ অভাব মোচন এবং সৌষ্ঠব বৃদ্ধি।

ট্রাষ্টী-নিয়োগ এবং নিয়মাবলী প্রণয়ন ও পুরাতন নিয়ম সকল সংশোধিত করার পরেই ব্রজসুন্দর সমাজ গৃহকে সুসজ্জিত করিবার জন্য মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সমাজের জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইলে সকলেই গৃহের অনুরূপ বেদীর অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত এই বেদী নির্ম্মাণ কল্পে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন; কিন্তু সুদূর হইতে মার্ব্বেল প্রস্তর ও কৃষ্ণনগর হইতে কারিকরদিগকে আনয়নে এবং তাহাদিগের শৈথিল্যে দেবেন্দ্রনাথের দেয় অর্থে সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহ হয় নাই। আমরা ব্রজসুন্দরের জমাখরচের বহিতে দেখি তিনিও আপন তহবিল হইতে ন্যূনাধিক ২০০৲ শত টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের গৃহ-প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্ব হইতেই ব্রজসুন্দর সমাজের জন্য বেঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবিষয় আমরা অঘোরনাথ গুপ্তের চিঠিতে এবং হিসাবের বহিতে দেখিতে পাই। তিনি যে নিজ ব্যয়ে আলোক, পাখা ও কিছু কিছু সরঞ্জামাদির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাও হিসাবের বহি হইতে জানা যায়।

এস্থলে, ইহা উল্লেখযোগ্য যে হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল বাবু কালীমোহন দাস একটী মূল্যবান হারমোনিয়াম দান করিয়া সমাজের একটী বিশেষ অভাব মোচন করেন।

ব্রজসুন্দর মধ্যে মধ্যে তাঁহার আর্ম্মানী বন্ধু বান্ধব কিম্বা নবাগত ইয়োরোপীয়দিগকে সমাজগৃহ দেখাইতে লইয়া যাইতেন। এইরূপে তাঁহার আর্ম্মাণী বন্ধু বিখ্যাত জমিদার এন্, পি, পোগোজ সাহেবকে এক রবিবারে সমাজ গৃহ দেখাইতে লইয়া গেলে তিনি সুন্দর স্থানে সুন্দর গৃহটী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন কিন্তু সমাজ-

গৃহে উপযুক্ত আলোকের অভাব দেখিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ৭০০ টাকা মূল্যের দেওয়ালগীর ও ঝাড় লণ্ঠন দান করেন।

বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ট্রাষ্টী বাবু রেবতীমোহন দাসের অর্থসাহায্যে সমাজগৃহ বৈদ্যুতিক পাখা এবং আলোকমালায় শোভিত হইয়াছে। এই কার্য্যে রেবতী বাবু সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে ব্রজসুন্দরই প্রথম পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে বাবু অভয়চন্দ্র দাস যখন সম্পাদক হইয়াছিলেন তখন পুস্তকালয়টী উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তৎপরে ডাক্তার পি, কে, রায় এবং স্বর্গীয় বাবু রজনীকান্ত ঘোষের তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরীর আরও উন্নতি হয়। পরিশেষে প্রথমতঃ স্বর্গীয় বাবু রজনীকান্ত ঘোষ এবং পরে বাবু মথুরানাথ গুহ এবং বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির বিশেষ চেষ্টায় উক্ত সমাজ-লাইব্রেরী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান "রামমোহন রায়" লাইব্রেরীতে পরিণত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সমাজ প্রাঙ্গণে দশ-সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়ে একটী সুন্দর ও দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই গৃহনির্ম্মাণ কল্পে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক বাবু রতনমণি গুপ্ত, রায় সাহেব, পাঁচ হাজার এবং বোম্বাইবাসী বিখ্যাত দাতা স্বর্গীয় দামোদর দাস গোবর্দ্ধন দাস এক হাজার টাকা প্রদান করেন। বক্রি অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল। "রামমোহন রায়" লাইব্রেরী-গৃহ নির্ম্মাণের বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮৪ সনে সম্পাদক বাবু রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে মন্দির প্রাঙ্গনে বর্ত্তমাণ "রাজচন্দ্র প্রচারক নিবাস" নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঢাকার ব্যাঙ্কার এবং জমিদার স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র দাস তাঁহার পিতার স্মরণার্থ এই প্রচারক নিবাসের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ইহার নির্ম্মাণকল্পে ন্যূনাধিক পাঁচসহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এই প্রচারক নিবাসের গৃহ-প্রবেশের সময় পণ্ডিত শিবনাথ

শাস্ত্রী মহাশয় দুইবার ঢাকায় গমন করেন। এই সময়ে ঢাকাতে ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের দোষ প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করেন এবং ব্রাহ্মদিগকে নানা প্রকারে আক্রমণ করেন। তিনি সাকার উপাসনা সমর্থন করাতে জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ বাবু কুঞ্জলাল নাগ এম্, এ, তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দুইটী বক্তৃতা করেন। কুঞ্জবাবু পৌত্তলিকতার অসারতা বিলক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তৎপরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ নাট্যগৃহে ক্রমান্বয়ে তিনটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তন্মধ্যে "ঈশ্বর বিধাতা ও পরিত্রাতা" এবং "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ক বক্তৃতাদ্বয় ছাত্র মণ্ডলী ও অন্যান্য শিক্ষিতগণের বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। তিনি শেষোক্ত বক্তৃতাতে হিন্দু শাস্ত্র হইতে অকাট্য যুক্তিদ্বারা সাকার উপাসনা যে উপাসনাই নহে তাহা অতি সুন্দর ও বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে দুইমাস কাল ঢাকাতে যে ধর্ম্মান্দোলন চলিয়াছিল, পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ দেখা যায় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মকে খর্ব্ব করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে পৌত্তলিক হিন্দুগণ সময়ে সময়ে অনেক আন্দোলন করিয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপ একটী আন্দোলন। কিন্তু এই সকলের মধ্যেও পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে এবং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

১৮৮৬ সনের শেষ ভাগে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া পুনরায় ঢাকায় গমন করেন ও কয়েক সপ্তাহ সেখানে থাকিয়া কয়েকটী বাঙ্গালা ও ইংরাজী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সমাজ মন্দিরে উপাসনা করেন। তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশে ছাত্রদিগের মধ্যে বিশেষভাবে ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৮৭ সনে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ভার লইয়া ঢাকায় গিয়া বাস করেন এবং ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য

"ছাত্র সমাজ" সংস্থাপন করেন। ইহার পর প্রসিদ্ধ বক্তা ও প্রচারক স্বর্গীয় বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপর্য্যুপরি দুইবার ঢাকায় গিয়া বক্তৃতা ও উপদেশাদি প্রদান করেন।

সম্প্রতি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ মহাশয়ের উদ্যোগে ঢাকায় "ব্রজসুন্দর হষ্টেল" স্থাপিত হইয়াছে। যিনি আজীবন ছাত্রদিগের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, হষ্টেল তাঁহারই নামে স্থাপিত হওয়া উচিত হইয়াছে।

এই প্রকারে ব্রজসুন্দর যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা কত লোকে কত প্রকারে সম্পন্ন করিয়াছেন। আজও পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজ ঢাকাবাসীর সেবায় নিযুক্ত। বর্ত্তমান সেবকদলের সেবার কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ হইল না। বর্ত্তমান ত সম্মুখে, তাই কেবল অতীতের দিকেই আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিলাম।

দশম অধ্যায়।

শিক্ষা বিস্তার।

জ্ঞান-স্পৃহা ব্রজসুন্দরের চরিত্রের একটী বিশেষত্ব ছিল, কিন্তু একাকী জ্ঞানের অমৃতরস পান করিয়াই তিনি তৃপ্ত হন নাই, দেশবাসী-দিগকে ঐ অমৃতের আস্বাদন দিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রজসুন্দর বুঝিয়াছিলেন দেশের দুর্নীতি ও দুর্গতি দূর করিবার জন্য একদিকে যেমন ব্যক্তিগত জীবনে সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করাও একান্ত আবশ্যক। শিক্ষাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল ব্যাধির মহৌষধ। এই মহা সত্যটী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি পূর্ব্ববঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারকল্পে প্রাণপণ যত্ন, চেষ্টা ও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এ বিষয়ে ব্রজসুন্দরের আগ্রহ ও উৎসাহের কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা এই অধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১৮৩৫ সনে পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছিল। এই বৎসরই পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীতে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রজসুন্দর, অভয়াকুমার দত্ত, রামশঙ্কর সেন, দ্বারিকানাথ সেন ও সম্ভবতঃ দীননাথ সেন, ভগবানচন্দ্র বসুদ্বয়, অমৃত-লাল গুপ্ত, কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই এই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র ছিলেন। তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রতি এ দেশবাসী জনসাধারণের প্রবল বিদ্বেষ ছিল। ব্রজসুন্দর এবং তাঁহার বন্ধুগণ পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম ইংরাজী শিক্ষিত দল এবং ইহাঁরাই পূর্ব্ববঙ্গের সেই সময়কার সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল। এই কর্ম্মিদলের মধ্যে আবার ব্রজসুন্দর সর্ব্ববিষয়ে নেতা ও অগ্রণী ছিলেন।

সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ যখন ঘোর অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন, ব্রজসুন্দর তখন ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোক হস্তে স্বদেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নবযুগের সুপ্রভাতে, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষার উষাকালে, ব্রজসুন্দরের ন্যায় ব্যক্তিগণ যদি যুগ-সন্ধিস্থলে জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে কখনই পূর্ব্ববঙ্গের এত কল্যাণ এবং এত সহজে গন্তব্য পথ নির্ণয় হইয়া যাইত না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন শুধু পূর্ব্ববঙ্গে কেন, পশ্চিমবঙ্গেও শিক্ষার অবস্থা অতি হীন ছিল। ১২৬১ সালে (১৮৫৪ খৃঃ অঃ) কলিকাতার সহরতলী ভবানীপুরে "সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী" নামে একটী সভা ছিল। ব্রজসুন্দর ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এই সভার আলোচ্য বিষয়ের একখানি প্রশ্নপত্র আমরা পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে পাইয়াছি। এই প্রশ্নপত্র খানি দেখিলে পাঠক সে কালে বঙ্গে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার কতকটা আভাস পাইবেন।

প্রশ্নপত্র খানি এই ঃ—

১। পৃথিবীমণ্ডলে ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার মত চলিতেছে। ফলতঃ ধর্ম্ম নানা প্রকার হওয়া পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কি না ?

২। চন্দ্র সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণ সজীব কি নির্জীব ? তাঁহাদের আকার কি ? এবং কি প্রকারে কোথায় আছেন ?

৩। পৃথিবীর আকার কি ? তিনি কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছেন ? তাঁহার গতি আছে কি না ?

৪। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর কারণ কি ?

৫। বৃষ্টি হওয়ার কারণ কি ? বৃষ্টি হওয়ায় স্বভাবিক নিয়ম ব্যতীত দৈব সাহায্যের অপেক্ষা করে কি না ?

৬। ছায়ার কারণ কি ? এবং তাহা কেন কখন ছোট এবং কখন বড় হয় ? এবং দীপ ছায়ায় যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যাইতেছে তাহারই বা কারণ কি ?

৭। বায়ুর গুরুত্ব আছে কি না ? এবং তাহা পরিমেয় কি-না ?

৮। ভারতবর্ষের চতুঃসীমা কি ? এবং রাঢ় বঙ্গ ইত্যাদির ন্যায় কতটা দেশ তাহার অন্তর্গত আছে ? এবং ঐ সমস্ত দেশের নাম ও সীমা কি ?

৯। এইক্ষণ যে সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ দেশ এবং রাজ্যের নাম শ্রুত হইতেছে, এবং যে সমস্ত দেশীয়দের সহিত আমাদের আলাপ হইতেছে ইহার উল্লেখ ও বিবরণ পুরাণাদিতে আছে কি না ? থাকিলে কোন পুরাণের কোন অধ্যায়ে ? না থাকিলে তাহার কারণ কি ? পৌরাণিক সময়ে কি ঐ সমস্ত দেশ ছিল না ? অথবা তাহা নির্ম্মনুষ্য ছিল ?

১০। সংস্কৃত কিম্বা অন্য যে কোন ভাষাই হউক তাহা মনুষ্যকৃত কি না ? কোন ভাষাকে মনুষ্যকৃত এবং কোন ভাষাকে দৈবভাষা বলা বিচার সম্মত কি না ?

১১। পশু পক্ষ্যাদির, মনুষ্যবৎ সার্থক শব্দে কথোপকথন অথবা পরমেশ্বরের আরাধনা করা সম্ভব্য ও বিবেচনা সম্মত কি না ?

১২। জন্ম সময়েই কি প্রাণিবর্গের পরমায়ু নির্ণয় হইয়া থাকে ?

১৩। সচরাচর বলা গিয়া থাকে কাল পূর্ণ হইলে যমদূত আসিয়া জীবকে যমমন্দিরে লইয়া যায়। এরূপ দূতাগমন যথার্থ ও বিবেচনা সম্মত, কি তাহা পৌরাণিক বর্ণনামাত্র ? পিপীলিকা মশকাদি ক্ষুদ্র জীবিদের নিমিত্তে ও এরূপ দূতাগমন হইয়া থাকে কি না ? বিবেচনা করুন নিমেষের মধ্যে আমাদের সাক্ষাৎকার কত শত কীটাদির মৃত্যু হইতেছে ?

১৫। ব্রাহ্মণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?

১৬। ব্রাহ্মণের মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হওয়া যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা সামান্য অগ্নি কি তাহার আর কোন অর্থ ছিল ?

১৭। সৎগুরু আশ্রয় পূর্ব্বক আলোচনা করণ ব্যতীত জ্ঞানোদয় হয় না। এবং তাহা বুদ্ধ্যাদি মনোবৃত্তির প্রখরতার প্রতি বিশেষ নির্ভর করিতেছে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে কথিত উপায় ব্যতীত

মরণ সময়ে যখন ইন্দ্রিয় সমস্ত একেবারে শক্তিহীন হয় তখন কোনমতে জ্ঞানোৎপত্তি হওয়া সম্ভব্য কি না ?

১৮। বিধাতাপুরুষ কর্তৃক শুভাশুভ লিপিবদ্ধ হওয়া যথার্থ কি না ? এরূপ লিপি বন্ধন কেবল মনুষ্যের নিমিত্তে কি তাবৎ জীবের নিমিত্তেই প্রয়োজনীয় ? মনুষ্য ভিন্ন অপর জীবের নিমিত্তে না হইবার কারণ কি ? এবং মনুষ্যের নিমিত্তে মাত্র হইলে কেবল আমাদের ললাটেই ষষ্ঠদিবসে এরূপ লিখিত হইয়া থাকে কি অন্যান্য জাতীয় ও দেশীয়দের ললাটে ও বিধাতাপুরুষকে লিপি করিতে হয় ?

১৯। হিন্দু শব্দ সংস্কৃত কি না ? তাহার যথার্থ ব্যুৎপত্তি কি ?

২০। অমূলক স্তাবকতা (যথা অদাতাকে দাতা বলা ইত্যাদি) অনুচিত এবং সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ হয় কি না ?

২১। মনুষ্যপ্রতি ভূত পিশাচ গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরা প্রভৃতির আবির্ভাব সম্ভব্য কিনা ?

২২। শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন অথবা জল বায়ুর দোষ কিম্বা সংসর্গ কি ক্ষেত্র দোষ ব্যতীত, বিশেষ কোন ব্যক্তির অভিশম্পাত কি অন্য কারণ দ্বারা রোগের উৎপত্তি হওয়া, ন্যায় ও বিবেচনা সম্মত কি না ?

২৩। যথার্থ সাক্ষ্য দেওয়া হইতে নিবারিত থাকার চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য ও অধর্ম্ম কি না ? দেশে সংস্কার অথবা কোন লিখিত বাক্যের অনুরোধে, স্বরূপকথা অথবা অন্তঃকরণে যেরূপ উদয় হয় এবং যাহা যথার্থ বিবেচনা সিদ্ধ হয় তাহা না বলা, অথবা মতান্তর বলা দূষণীয় এবং অধর্ম্ম কি না ?

শাস্ত্র ব্যবসায়ী যে কোন অধ্যাপক মহাশয়কে এতৎ প্রশ্ন প্রেরণ হয়। বাসনা যে উত্তর প্রদানে অনুগ্রহের ন্যূনতা না করেন। ১২৬১ সালের ১লা চৈত্রের পূর্ব্বে উত্তর দিতে হইবেক। নানা স্থান হইতে উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গেলে পণ্ডিত ও বিজ্ঞবর্গের বিবেচনায় যাঁহার উত্তর

সদুত্তর এবং উৎকৃষ্ট হইবেক তাঁহাকে ১০০ মুদ্রা পারিতোষিক এবং প্রশংসা পত্র দেওয়া যাইবেক। উত্তরকারি মহাশয়দিগের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছুক হন অন্যান্যের প্রদত্ত উত্তরও দেখিতে অথবা পত্র দ্বারা প্রার্থনা জানাইলে বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রদত্ত উত্তরের প্রতিরূপ পাইতে পারিবেন এবং তদুপলক্ষে, কি স্বীয় উত্তরের পোষকতায়, যদি ভবিষ্যতে তাঁহার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা বলিতে পারিবেন।

ভবানীপুর
সত্য জ্ঞান সঞ্চারিণী সভা — শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২রা আশ্বিন, ১৭৭৬।

সভাপতি।

ঢাকা। — { শ্রীযুত ব্রজসুন্দর মিত্র। শ্রীযুত গোপীমোহন রায়।

যদিও দেশের প্রাচীন এবং সনাতন মহামূল্য বস্তুর উপর ব্রজসুন্দরের প্রাণের গভীর আকর্ষণ ছিল, কিন্তু নূতন যুগের নূতন ভাব গ্রহণ এবং দেশবাসীকে তাহা দিবার জন্যও তিনি ব্যাকুল ছিলেন।

আমরা তাঁহার কর্ম্মজীবন অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি যখন যেখানে যাইতেন সেখানে কোনও বিদ্যালয় থাকিলে তাহার উন্নতি বিষয়ে নানাপ্রকারের সাহায্য এবং সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেন, এবং বিদ্যালয় না থাকিলে স্থানীয় ভদ্রলোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে এবং নিজেও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ফেলিতেন। এইরূপে তাঁহার যত্ন ও উৎসাহে পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে ন্যূনকল্পে ৫০টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও অনেক বিদ্যালয়ে ব্রজসুন্দরকে নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য করিতে হইত।

রাজকার্য্যোপলক্ষে ব্রজসুন্দরকে অনেক সময় জেলার সদর ছাড়িয়া সুদূরতম স্থানেও যাইতে হইত। সুতরাং শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারক-

রূপে তাঁহার জীবন সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের উপর কি অপূর্ব্বপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আজ ব্রজসুন্দরের মৃত্যুর প্রায় ৪০ বৎসর পরে তাঁহার জীবনের এই কর্ম্মোৎসবের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তথাপি তাঁহার অসম্পূর্ণ ডায়েরী, জমাখরচের বহি এবং সমসাময়িক জীবিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ও অন্যান্য কাগজপত্র হইতে যতদূর সম্ভব আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

1. Re-opened the Dhamrai School (Vernacular) District Dacca, Manickgunje, in November 1855.

2. Opened a School by the name of Fulbaria Vernacular School in the month of—.The name of the School was subsequently changed to Ulyle School after the name of my own village. The change of name has received the sanction of Government.

3. Opened a Vernacular School at Mirpur in 1857.

4. Opened a Vernacular School at Mejina in 1858.

5. Opened a Vernacular School at Arial in 1858.

6. Opened the Panchgaon Vernacular School in 1858.

7, May 1859—Opened a Vernacular School at Lohajung in which Babu Ananda Mohan Pal took great interest.

8. 7th July 1862—Submitted an application to Government for grant-in-aid to establish a Brahmo School at Dacca. Mr: Martin recommended it

9. Took measures to open a Vernacular School at Chandpur in Noakhali, Perganah Poorchandi during the field-season of 1862-63. The School received Government aid.

10. Opened a Female School at Ulyle through the aid of my son-in-law Kasicharan in January 1864.

11. 12 and 13—On the 22nd February 1865 addressed a letter to Babu Sreenath Bhadra, Deputy Inspector of Schools, Noakhali and Chittagong, to open Circle Schools at Korpara, Lamchur and Duttpara (zillah Noakhali).

14. April 1864—Opened a Vernacular School at Raipur (Bhoolooah) and received Government aid for it.

15. Received an application from Babu Harish Chandra Basu, Zemindar Tiperah, Furkabad, asking for a monthly subscription of Rs. 8 for opening a Vernacular school at his village Coroctolly.

এইরূপে বুতুনী, সীমুলিয়া, কাওয়ালীপাড়া প্রভৃতি স্থানে ৫০টীর অধিক বিদ্যালয় তাঁহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইহার অধিকাংশেরই অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য মঞ্জুর করাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত ব্রজসুন্দরকে মাসিক ১০। ১৫। ২০ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতে হইত। আমরা তাঁহার জমা খরচের বহিতে দেখিতে পাই যে কোন কোনও বিদ্যালয়ে আজীবন সাহায্য করিয়াছেন!

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ব্রজসুন্দর সার্ভে বিভাগীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তৎপরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি দেশমধ্যে এতগুলি বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার সংরক্ষণের বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে ১৮৫৯—৬০ সনে ডিরেক্টার অব পাবলিক ইনস্‌ট্রাকসনের রিপোর্টে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল—"In Dacca the native gentleman most earnest in the cause of education is Babu Brojo Sunder Mitter, a Deputy Collector in the

Survey Department. He is the patron of all schools that fall under his notice." অর্থাৎ ঢাকাতে শিক্ষাবিস্তার-কল্পে দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে সার্ভেবিভাগের ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যায়। ব্রজসুন্দরের দৃষ্টিপথে কোন বিদ্যালয় পতিত হইলেই তিনি তাহার পৃষ্ঠপোষক হন।

একটী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে যে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিল, এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল। পাঠক তাহা হইতে সেকালের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন।

"নিঃস্বার্থ পরোপকারী বিদ্যোৎসাহী দয়াদি বিবিধ সৎগুণভূষিত শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র-মজুমদার, উলাইল বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা মহাশয় করকমলেষু—

মহানুভব,

আমরা ভবদীয় উৎসাহ এবং যত্নে যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি তাহা বর্ণনার অতীত হইলেও বাস্তবিক। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্য কোন উপায় না থাকাতে তদভাবের প্রতিনিধি-স্বরূপ এই অভিনন্দন পত্র সাদরে এবং সবিনয়ে ভবদীয় করকমলে প্রদান করিতে উৎসুক হইয়াছি, গৃহীত হইলেই কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

আপনা হইতে যে অশেষবিধ উপকার লাভ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ না করিলে হৃদয়োচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি হয় নাই বিধায় নিম্নে তাহার কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ করা গেল।

ভবদীয় ঐকান্তিক উৎসাহ দান ভিন্ন এ প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের যেরূপ শিক্ষার অবস্থা ছিল তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় আমাদের নানা বিষয়ে আশাতীত উন্নতি লাভ হইয়াছে। এখানে ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা হইবে এবং এখানকার

লোক বর্ত্তমান সময়ের সভ্য পদবীতে আরোহণ করিবে এরূপ আশা কখন মনে ধারণা করিরার সম্ভাবনা ছিল না। গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সাধারণরূপে লেখাপড়া শিখিয়া যাহারা অতি অল্প বেতনে কর্ম্মগ্রহণ করতঃ জীবিকানির্ব্বাহ করিত আপনার প্রসাদে তাহাদের সন্তানগণ সুশিক্ষা লাভ করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। নিঃস্বার্থভাবে যদি আপনা কর্ত্তৃক এই বিদ্যালয় স্থাপিত না হইত তাহা হইলে আমাদিগের অবস্থা কিরূপ থাকিত সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই মহৎ সুখকর পরিবর্ত্তন আপনা কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইয়াছে। চিরসঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকাররাশি আপনার যত্নে বিংশতি বর্ষ মধ্যে অনেকটা অপনীত হইয়াছে।

আপনার স্থাপিত বিদ্যালয়ের শুভফলের নিদর্শনস্বরূপ এই বলা যাইতে পারে যে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া ৪৬ জন নানা স্থানে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, ১৫ জন অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে এবং এ পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয় হইতে ১৮ জন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ও তন্মধ্যে ৮ জন বৃত্তিলাভ করিয়াছে।

আপনার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আমরা যে জ্ঞান ধন ও জীবিকা লাভ করিয়াছি এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালনে সমর্থ হইতেছি ভাবিয়া দেখিলে আপনি তাহার নিদান।

আপনার যত্নের ফলেই এইক্ষণে সাহস সহকারে বলিতে পারি যে আমরা অন্যান্য প্রদেশীয় সভ্য লোক হইতে কোন বিষয়ে নিতান্ত ন্যূন নহি।

আপনি আমাদের দেশের গৌরব ও অলঙ্কার। আমাদের কোন স্থানে পরিচয় দিতে হইলে আপনকার প্রতিবেশী বলিয়া পরিচয় প্রদানে বিশেষ গৌরব জ্ঞান করি।

উপসংহারকালে আমরা জগদীশ্বর সমীপে কায়মনে প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া পূর্ব্ব-অবিচলিত উৎসাহ ও যত্ন সহকারে দেশের ও শিক্ষার উন্নতি করুন। সন ১৮৭১, ৮ই কার্ত্তিক।

বিনয়াবনত,

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী—ফুলবাড়িয়া।
শ্রীচন্দ্রকান্ত চৌধুরী—ঐ
শ্রীবিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী—ঐ
শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ঐ
শ্রীজগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী—ঐ
শ্রীপ্রসন্নকুমার ভৌমিক—ঐ
শ্রীইন্দ্রকুমার ভৌমিক—ঐ
শ্রীজগদ্বন্ধু বনিক্য—ঐ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—বাগবাড়ী।
শ্রীপ্যারিমোহন ঘোষ—তেতুলঝোড়া।
শ্রীবাণীনাথ সাহা—কোণ্ডা।
শ্রীমথুরানাথ দাস—বাগবাড়ী।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র গুহ—ঐ
শ্রীজগদ্বন্ধু গুহ—ঐ
শ্রীদ্বারকানাথ রায়—তেতুলঝোড়া।
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সাহা—শ্যামপুর।
শ্রীগোকুলচন্দ্র সেন—উলাইল।
শ্রীহরিনাথ বসু—শাক্তা।
শ্রীমহিমচন্দ্র ভৌমিক—ডুবধারা।
শ্রীগুরুচরণ রায়—তেতুলঝোড়া।
শ্রীরাইমোহন দত্ত—সাভার।

শ্রীআনন্দলাল ঘোষ—তেতুলঝোড়া।
শ্রীরজনীকান্ত বসু—বাইনারা।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মজুমদার—উলাইল।
শ্রীতারাপ্রসন্ন মজুমদার—বীরতারা।
শ্রীবিপিনচন্দ্র সেন—উলাইল।
শ্রীনকড়ীচন্দ্র রায়—তেতুলঝোড়া।
শ্রীরসময় বসু—ছন্‌কা।
শ্রীগঙ্গাময় বসু—ঐ
শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায়—কোটাপাড়া।
শ্রীহরিকুমার বসু—কুড়ি কাউনা।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপ—সমলাশীর।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র সেন—উলাইল।
শ্রীযাদবচন্দ্র সেন—ঐ
শ্রীনীলকমল রায়—বোয়ালী।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়—তেতুলঝোড়া।
শ্রীচন্দ্রনাথ শীল—ফুলবাড়িয়া।
শ্রীদ্বারকানাথ দে—ঐ
শ্রীতারকচন্দ্র চৌধুরী—ঐ
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র গুহ—বাগবাড়ী।
শ্রীগোবিন্দলাল দাস—তেতুলঝোড়া।
শ্রীভুবনমোহন সাহা—শ্যামপুর।
শ্রীহরনাথ রায়—সন্তভাগ।

ব্রজসুন্দর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহুবিদ্যালয়ের মধ্যে এই একটী মাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের কৃতজ্ঞতাসূচক অভিনন্দনপত্র আমরা পাইয়াছি।

সেই সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলিই এখন উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া শত শত বালক ও যুবকের ভাবী জীবনের উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষা সম্বন্ধীয় আন্দোলনে ব্রজসুন্দরের স্থান যে কত উচ্চে তাহা দেশবাসিগণ সে সময়ে সম্যক্ উপলব্ধি করিলেও মধ্যভাগে বলিতে গেলে তাঁহার নাম প্রায় একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; যাহা হউক ধীরে ধীরে দেশবাসগিণ পুনরায় ব্রজসুন্দরের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছেন।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজ ঃ—এই কলেজ এখন পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চশিক্ষার একটী প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু উহা সর্ব্বপ্রথম ব্রজসুন্দরের গৃহেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। ১৮৫৮ সনে ব্রজসুন্দর তাঁহার আরমানিটোলার বাটীতে দরিদ্র ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য, সম্ভবতঃ অবৈতনিক, একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৬২ সনে ঐ বিদ্যালয় উন্নতি লাভ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়টীই উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া বর্ত্তমান জগন্নাথ কলেজে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৯—৬০ সনের কেলেণ্ডারে জগন্নাথ কলেজের ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"The Dacca Brahmo School, which was founded in the year 1866* by the joint efforts of Babus Dinanath Sen, Parvati Charan Roy, Anath Bandhu Mullick and the late Babu Brojo Sunder Mitter and continued up to 1871 under the management of a committee of native gentlemen consisting of the founders and a few others, ceased to exist as such in

* এইটী ভুল। ইহা ১৮৫৮ সন হইবে।

the year 1872. The management in that year passed into the hands of Babu Kissori Lall Roy Choudhury Zaminder of Baliati and the institution came to be called the Jagnnath School, after the late Babu Jagannath Roy Choudhury, the proprietor's father. &c &c."

In connection with the college there exists also an Art School, teaching painting and statuary." &c.

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলেণ্ডার হইতে উদ্ধৃত জগন্নাথ কলেজের বিবরণটীর মধ্যে আমরা অনেকগুলি ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। ইহাব মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুতর, কিন্তু বৎসরের পর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলেণ্ডারে এই ভ্রমগুলি চলিয়া আসিতেছে।

ভ্রমগুলি এই :—

১। ঢাকায় সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা প্রচলনের জন্য ব্রজসুন্দর প্রথমে ১৮৫৮ খৃষ্টব্দে একটী বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তৎপরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয় এবং তদবধি উহা ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে অভিহিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান জগন্নাথ কলেজ যে বিদ্যালয়ের পরিণতি, তাহা ১৮৫৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ১৮৬৬ সনে নহে।

২। আদিম বিদ্যালয়টীকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পরিণত করিবার সময়ে ব্রজসুন্দর দীননাথ সেনের সহিত পরামর্শ করিয়াই করিয়াছিলেন এবং দীননাথ সেন এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন বটে কিন্তু ব্রজসুন্দরই ইহার প্রতিপালক ছিলেন। বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়ের ঐ স্কুলটীর সহিত কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। ইহা স্থাপিত হইবার অনেক পরে বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। আমরা এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ই ইহার আদ্যোপান্ত তত্ত্ব জানেন। অধিকন্তু আমরা সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের চিঠিপত্র হইতে এবং

ব্রজসুন্দরের স্মৃতিপুস্তকেও ইহাই দেখিতে পাই। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জন্য যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহাও ব্রজসুন্দরের চেষ্টায়।

বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক এখনও জীবিত আছেন। আমরা প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি তদুত্তরে বাবু মথুরানাথ গুহ এম্, এ, মহাশয় দ্বারা নিম্নলিখিত বিবরণটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ঃ—

পরলোকগত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের উৎসাহে ও আর্থিক সাহায্যে এবং পরলোকগত দীননাথ সেন, কৈলাস চন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন পরিচালকগণের তত্ত্বাবধানে ১৮৫৮ কি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্রজসুন্দর বাবুর আরমানিটোলার বাটীর একাংশে “ব্রহ্মবিদ্যালয়” নামে একটী মধ্য বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হয়। বাবু দীননাথ সেন মহাশয় স্কুলতত্ত্বাবধায়ক কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত ঐ বিদ্যালয়ের প্রধম হেড্ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। অঘোর বাবুর পর ক্রমান্বয়ে বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় এবং জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী মহাশয় ঐ স্কুলের হেড পণ্ডিতের কার্য্য করেন। তার পর কয়েক বৎসর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মৌলিক স্কুলের হেড পণ্ডিত ও সুপারিন্টেনডেণ্টরূপে কার্য্য করেন। ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সহিত একটী মাইনার স্কুল (মধ্য ইংরাজী স্কুল) সংযুক্ত করা হয়। ইহার অল্পকাল পরেই ঢাকা-নগরী-স্থিত গ্রেগরী-উচ্চ-ইংরাজী স্কুল (Entrance School) উঠিয়া যাওয়াতে অনাথ বাবুর বিশেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের পরিচালকদিগের তত্ত্বাবধানে একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলটীও ব্রাহ্ম-এণ্ট্রান্স-স্কুল রূপে অভিহিত হয়। এই স্কুল পরিচালনে ক্রমে ঋণ হইতে থাকে। ঋণের পরিমাণ যখন বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিল (ব্রজসুন্দরও এই সময়ে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলেন) তখন অনাথ বাবু অনন্যোপায় হইয়া ১৮৭২ সনে বালিয়াটীর জমিদার

বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর হস্তে স্কুলের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করার প্রস্তাব করেন। কিশোরী বাবু তাঁহার পিতা জগন্নাথ রায় চৌধুরীর স্মৃতিস্থাপন উদ্দেশ্যে স্কুলটী জগন্নাথ-এণ্ট্রান্স-স্কুল নামে অভিহিত করিয়া উহার সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। সেই অবধি ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ও এণ্ট্রান্স স্কুলের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক রহিত হয়। অনাথ বাবু তখনও ঐ বিদ্যালয়ের স্থপারিন্‌টেনডেণ্টরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। ১৮৮৪ সনে কিশোরী বাবু তাঁহার নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে জগন্নাথ কলেজ স্থাপন করেন এবং ১৯০৭ সনে ঐ কলেজের যাবতীয় কর্ত্তৃত্বভার তিনজন ট্রাষ্টীর হস্তে অর্পণ করেন।"

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষা-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যখন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, সেই সময় ব্রজসুন্দর সম্পূর্ণ অন্যবিধ রাজকার্য্যে নিবিষ্ট থাকিয়াও জনসাধারণের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত, সুলেখক বা সুবক্তা ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার অর্থ এবং সামর্থ্যে যাহা হইতে পারে তাহাতে একদিনের জন্যও বিমুখ হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তকাদি রচনা করিয়া জীবনে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে তাঁহার সুযোগের অবধি ছিল না। বিদ্যাসাগরের ন্যায় ঐ উভয় সুযোগ ব্রজসুন্দরের ছিল না কিন্তু এমন অশ্রান্তকর্ম্মী, এমন হৃদয়বান্ ব্যক্তির পক্ষে, যে কোন কার্য্য অশেষ কষ্টকর হইলেও অসাধ্য ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষাবিস্তার কল্পে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন ভাবিলে আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন সন্দেহ নাই কিন্তু শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে বিদ্যাসাগর এবং ব্রজসুন্দরের আদর্শের একটু বিশেষ বিভিন্নতা ছিল। বিদ্যা-সাগরের শিক্ষানীতি কেবল জ্ঞানমূলক ছিল। ব্রজসুন্দর ভাবী-

স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র।

বংশীয়দিগের জ্ঞানোন্নতি সাধনের উপায় উদ্ভাবন ও বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাই ব্রজসুন্দরের আদর্শ ছিল। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব বিকাশ ও সৎকর্ম্মে অনুরাগ। কিন্তু ধর্ম্মের সহিত শিক্ষার যোগ না থাকিলে সাধুচরিত্র ও সৎকর্ম্মশীল হওয়া অসম্ভব। সত্য নিষ্ঠা, জ্ঞান পিপাসা, সৌন্দর্য্যবোধ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি গুণই মনুষ্যত্ব লাভের পরিচায়ক। ব্রজসুন্দর বুঝিয়াছিলেন জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, মানবাত্মায় এই ত্রিবিধ গুণের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ না হইলে মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, সেই জন্য তাঁহার শিক্ষার আদর্শের ভিতর সাহিত্যের সহিত বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানের সহিত শিল্পের এবং প্রয়োজনের সহিত সৌন্দর্য্যের ও নীতির সহিত ধর্ম্মের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্রজসুন্দরের সহায়তায় অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র তাঁহার এই উন্নত আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পান নাই। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিলে ব্রজসুন্দরের চিন্তার গভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে জ্ঞান শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কেবল ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা নয়—সঙ্গীত, ভাস্কর ও শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। যে যুগে গুরুজনদিগের সম্মুখে সঙ্গীত দূরে থাকুক, উচ্চৈঃস্বরে বাক্যালাপ করাও অশিষ্ট আচরণ বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই যুগে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সঙ্গীত শিক্ষা করিত! ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্প ও নানাবিধ পশুপক্ষীর মৃতদেহ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। ব্রহ্মবিদ্যালয় যখন জগন্নাথ স্কুলে পরিণত হয় তখন ব্রজসুন্দর কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং সুরক্ষিত মৃতদেহ, মূর্ত্তি এবং চিত্রগুলি পুঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন লাইব্রেরীগৃহে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধ বিকাশের জন্যও ব্রজসুন্দর নানাবিধ উপায়ে চেষ্টা

করিতেন। শিক্ষা বিষয়ে ব্রজসুন্দরের এই উন্নত আদর্শ আমরা কখনও বিস্মৃত হইতে পারি না। তিনি যে, সময়ের কত অগ্রে গিয়াছিলেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার পরে এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহই এ বিষয়ে চেষ্টা করেন নাই।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। অনেক টোলের অধ্যাপক যে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইতেন জমা খরচের বহিতে তাহার নিদর্শন পাই। তাহাতে অনেক তর্কপঞ্চানন, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়দিগের নাম দেখিতে পাই।

বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে ব্রজসুন্দরের বড় আশ্চর্য্য নিয়ম ছিল। স্কুল স্থাপন করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না। স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ, আসবাব সংগ্রহ, সম্পাদক ও শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্য পুস্তক নির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় খুঁটিনাটি নিজেই দেখিতেন। তাঁহার হিসাবের বহিতে স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়—ঢাকার উত্তর দিগস্থ বংশাল নামক স্থানের বিখ্যাত মুসলমান ঘরামীদিগের দ্বারা স্কুল গৃহের আটচালা, চৌচালা প্রভৃতি নির্ম্মান করাইতেন। নিজের বাসগৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে লোকের যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ পাইয়া থাকে তিনি সেইরূপ করিতেন এবং গৃহের উপাদান সমূহ প্রস্তুত হইলে নিজে প্রজাদিগের দ্বারা নৌকাযোগে নানা স্থানে প্রেরণ করিতেন। যখন মফঃস্বলে যাইতেন নিজের গুরুতর পরিশ্রমের ভিতরও তাঁহার প্রিয় বিদ্যালয়-গুলির নিয়ত তত্ত্বাবধান করিতেন ; সকল বিদ্যালয়েই অন্যান্য কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে করিতে ছাত্রদিগের সহিত সদালাপ করিতে ভুলিতেন না এবং তাহাদিগকে অন্য সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিতেন। একবার পানগাঁও স্কুল দেখিতে গিয়া ব্রজসুন্দর ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা বলত তোমরা কেন লেখা পড়া শিখ্‌ছ ?" ছাত্রদের মধ্যে কেহ বলিল "আমি মস্ত চাকরি কর্‌ব", কেহ বলিল "আমি বড় লোক হব", "আমি পণ্ডিত হব"। এইরূপে নানা ছেলে নানা রকম উত্তর দিল, কেবল একটীমাত্র বালক বলিল "আমি লেখা পড়া

শিখে ভাল লোক হব"। ব্রজসুন্দর এই উত্তর শুনিবার জন্যই ইচ্ছুক ছিলেন; উত্তর শুনিয়া বড় খুসী হইলেন এবং ঢাকায় গিয়া ঐ বালকটীর জন্য নানাবিধ উপহার প্রেরণ করিলেন। চরিত্র লাভ করাই যে বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ কথা ব্রজসুন্দর সকলের মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইতেন। সেই জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যাহাতে সচ্চরিত্র শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তখনকার দিনে পাঠ্যপুস্তক অধিক ছিল না এবং তাহা সহজ প্রাপ্যও ছিল না। একখানি পুস্তক সংগ্রহ করা এক কঠিন ব্যাপার ছিল, বিশেষতঃ মফঃস্বলে। ব্রজসুন্দর কর্ম্মোপলক্ষে যখন যেখানে যাইতেন, বিস্তর পাঠ্য পুস্তক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াই দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করিতেন, তাঁহার হিসাবের বহিতে দেখিতে পাই। তখনকার দিনে এই সকল পাঠ্য পুস্তক ছিল—বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, শিশুশিক্ষা, বস্তুবিচার, চারুপাঠ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোলসূত্র, হিতোপদেশ, রত্নসার, ব্যাকরণ প্রবেশ, পাটীগণিত ইত্যাদি। কোথাও দেখিতে পাই কোন কোন পুস্তক ৫০ কপি পর্য্যন্ত কিনিতেছেন। বলিতে কি, ব্রজসুন্দর একটী সারকুলেটিং লাইব্রেরী ছিলেন। আন্তরিক জ্ঞানপিপাসা এবং নরপ্রীতি তাঁহাকে সর্ব্বদাই নানা সৎকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিত। কোন বিদ্যালয়, কোনরূপে বিপদগ্রস্ত হইলে ব্রজসুন্দর তাহা নিজের বিপদ জ্ঞানে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতেন এবং বিপদ নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। নিম্নে তাহার একটীমাত্র ঘটনা উল্লেখ করা গেল।

কুমিল্লা বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের সময় স্কুলের সম্পাদক বাবু দুর্গাচরণ দত্ত স্থানীয় জমীদার মিঃ ডিলেনী সাহেবের কারখানা হইতে ৪ খানা চালা এবং কয়েকখানা খুঁটী আনিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল জিনিষের মূল্য শোধ না হওয়ায় ডিলেনী সাহেব সম্পাদকের নামে ১০০৲ এক শত টাকার দাবীতে আদালতে অভিযোগ করেন। ব্রজসুন্দর তখন কুমিল্লায় ছিলেন। তিনি বিপন্ন বিদ্যালয়টীর সাহায্যার্থে

কি করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত দরখাস্ত হইতে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন। দরখাস্তখানি এই :—

দরখাস্ত শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র সাং হাল কুমিল্লা জিলা ত্রিপুরা, আমার নিবেদন এই শ্রীযুক্ত মিঃ ডিলেনী সাহেব বাদী অত্র কুমিল্লার বঙ্গ বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব-সম্পাদক দুর্গাচরণ দত্ত যে বাদীর নিকট হইতে কয়েকখানা চালা ও কাষ্ঠ আনিয়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার মুল্য বাবদে ১০০৲ টাকার দাবীতে উক্ত দুর্গাচরণ দত্ত ও বর্ত্তমান সম্পাদক হরিপ্রসাদ ঘটক বিবাদীগণের নামে নালিস করিয়াছেন। উক্ত দ্রব্যাদির মুল্য সম্বন্ধে বিবাদীগণ কোনও দায়ী নহে, কেন না ঐ দ্রব্যাদি দ্বারা বঙ্গবিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে এবং তাহা বর্ত্তমান আছে, এমতাবস্থায় ঐ মূল্যের বাবদ বঙ্গবিদ্যালয়ই দায়ী বটে। আমাদের এরূপ বিশ্বাস ছিল বাদী উক্ত চালা ও কাষ্ঠ ইত্যাদি বাবদ মুল্য গ্রহণ করিবেন না এবং তজ্জন্য টাকা দেওয়া হয় নাই। অতএব আমি বঙ্গবিদ্যালয় স্থায়ী রাখার মানসে নিজ হইতে দাবীর উক্ত ১০০৲ টাকা অত্র দরখাস্ত দ্বারা দাখিল করিয়া প্রার্থনা করি যে রীতিমতে উক্ত টাকা দাখিল করিয়া লইতে আজ্ঞা হয় ইতি ১২৭৫—১৮ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র।

মারফতে—শ্রীদীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়।

১৮৬৮ সন।

এইরূপে ব্রজসুন্দর ১০০৲ টাকা দিয়া এই বিপন্ন বিদ্যালয়টীকে রক্ষা করেন।

দরিদ্রছাত্র প্রতিপালন।

বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক দান করিয়াই ব্রজসুন্দর নিরস্ত থাকিতেন না। দরিদ্র ছাত্রদিগকে প্রতিপালন করা তাঁহার আর এক প্রীতিকর কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহার গৃহে বহু দরিদ্র ছাত্র আহার পাইত। অপরিচিত বালকেরাও তাঁহার নিকটে বিদ্যাশিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য পাইত। তাঁহার নিয়ম ছিল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে

শিক্ষকের সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে। নিম্নে সেইরূপ একখানি সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইল ঃ—

"রজনীকান্ত মিত্র অল্পদিন হইল মডেল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া এ পর্য্যন্ত পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছে, বোধ করি পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিলে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। ইহার দৈনিক উপস্থিতি মন্দ নহে। সন ১৮৭৫, তারিখ ৩০শে মার্চ্চ।

দীননাথ সেন।

ব্রজসুন্দরের সহানুভূতি যে একমাত্র হিন্দুবালকদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তাঁহার দ্বার, হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান সকলের নিকটই উন্মুক্ত ছিল। দান করিতে যাইয়া ব্রজসুন্দর কেবল উপযুক্ততারই বিচার করিতেন, কিন্তু কোন দিনই জাতি বিচার করেন নাই।

ছাত্রদিগের মধ্যে মনুষ্যত্ব এবং স্বাবলম্বনের ভাব বর্দ্ধিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং তিনি বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কখনও কাহাকেও অর্থ সাহায্য করিতেন না। ছাত্রদিগের প্রতি ব্রজসুন্দরের অত্যন্ত সহানুভূতি ছিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"এদের মানুষ করিলে একটী একটী পরিবারের উপায় করে দেওয়া হয়।" এইরূপে কত ছাত্রকে ব্রজসুন্দর মানুষ করিয়া দিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে অনেকে পরজীবনে দেশের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছেন। একশতের মধ্যে যদি একটী ছাত্রও দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহার প্রাণগত চেষ্টার পুরস্কার।

স্ত্রীশিক্ষা।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই ব্রজসুন্দর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। জনশিক্ষার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই তিনি স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্ত্রীশিক্ষার নামে এদেশের লোক শিহরিয়া উঠিত, এবং এই

ভীষণ অবরোধপ্রথা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা কখনও সম্ভব হইবে ইহা কেহ কল্পনা করিতেও সক্ষম হইত না। কিন্তু ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে দেশের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে ব্রজসুন্দর মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যে প্রকারেই হউক দেশমধ্যে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে। ব্রজসুন্দর তখন যুবক, সুতরাং তিনি স্থির করিলেন পত্নী ব্রহ্মময়ীকেঁ সর্ব্বাগ্রে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু পরিবারের মধ্যে পাছে বা এ বিষয় লইয়া অশান্তি উপস্থিত হয়, এই অশঙ্কায় তিনি প্রকাশ্যে মনের ভাব কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। নীরবে তাঁহার কার্য্য চালতে লাগিল, এবং গভীর নিশীথে পরিবারস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে প্রতিদিন ২।১ ঘণ্টা করিয়া ব্রহ্মময়ীকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্বাশুড়ী ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না, এই ভয়ে ব্রহ্মময়ী দিবসে পুস্তকখানি সন্তর্পনে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। যাহা হউক ব্রজসুন্দরের স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের এখানেই প্রথম সূত্রপাত।

১৮৪৬ সনে ব্রজসুন্দরের জেষ্ঠা কন্যার জন্ম হয়। তিনি তৎপূর্ব্বেই পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামীর একান্ত ইচ্ছাসত্বেও সময় ও সুযোগ অভাবে পত্নী ব্রহ্মময়ী রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু কন্যাকে সময়োপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য ব্রজসুন্দর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে জামাতা কাশীচরণ রায়ের সাহায্যে নিজগ্রামে একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ব্রজসুন্দরের কন্যাগণ এবং গ্রামস্থ অপর কতিপয় বালিকা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। অতঃপর কর্ম্মোপলক্ষে ব্রজসুন্দর যখনই যেখানে থাকিতেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য সেখানেই তিনি একান্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। ১৮৬২ সনে তিনি কুমিল্লায় বদলী হইয়া যান। কুমিল্লাতে তখন বালিকা-বিদ্যালয় ছিল না; সুতরাং তিনি বাবু ত্রৈলক্যনাথ সান্যাল মহাশয়কে নিজ কন্যাগণের

শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং অবশেষে সেখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কেবল বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না; বয়ঃপ্রাপ্তা মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য জজ রিচার্ডসন সাহেবের পত্নীর সহিত একযোগে সহরস্থ ১৫টী পরিবারে অন্তঃপুর শিক্ষাও প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার ডায়েরীতে এ'সম্বন্ধে এক স্থলে দেখিতে পাই :—

"On the 1st of march 1868, Zenana education had been introduced into 15 families at Comilla under the auspices of Mrs H. C. Richardson."

উপরোক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তাঁহার ডায়েরীতে এইরূপ লিখিত আছে :—

"On monday, the 3rd February, 1868, corresponding with 21st of Magh 1274 B. S., the first prize distribution of the Comilla Female School had taken place. Amongst the persons present on the occasion were Lord Ullick Browne, Lady Browne, Mr. and Mrs. Richardson, Dr. and Mrs. Green, Miss Barber, Mrs. Auley, Mr. Peirara and other gentlemen of note at Comilla. All present were perfectly pleased with the progress the girls had made and the needle works that were displayed. Almost all the needle works were sold on the spot. In the latter part of the proceedings the Commissioner delivered a speech in Hindustanee on the advantages of Female Education and requested the native gentlemen present to follow my example,"

তাঁহার ডায়েরীর আর এক স্থানে লিখিত আছে : -

"At 5 o'clock of the same day Lady Browne accompanied by Mrs. Richardson visited my family.

They were much pleased with the arrangements of the house. She requestsd my eldest daughter and my niece to read a book, and they were perfectly pleased with their reading. Then they had many familiar talks with my wife and daughters. &c. &c. On the next day my daughters Hemlata and Preomboda went to the Circuit-house to pay respects to Lady Browne."

2nd April, 1866.

Mrs. Richardson, Session Judge's wife, commenced visiting my family and teaching needle-workd to my daughters.. She is also trying to enlighten their mind.

ব্রজসুন্দর নানা প্রতিকুল ঘটনার মধ্যেও নিজ কন্যাদিগের শিক্ষার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে ত্রুটী করেন নাই। এবং পিতার যত্নে ও আগ্রহাতিশয্যে ব্রজসুন্দরের কন্যাগণ বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষাও করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদিগের তুলনায় সে শিক্ষা সামান্য হইলেও তখনকার দিনে তাহারই বা কত গৌরব ছিল। ব্রজসুন্দর সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কন্যাদিগের ধর্ম্মশিক্ষারও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; এবং যাহাতে তাহাদের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইতে পারে তাহার প্রতিও সর্ব্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। ইহার ফলে তাঁহার কন্যাগণ সকলেই জীবনে ত্যাগ এবং সেবার ভাব দেখাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রী, করুণাময়ী (দীননাথ ঘোষের কন্যা) বঙ্গভাষায় বিশেষ শিক্ষিতা হইয়াছিলেন, এবং সে সময়ে সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা শোনা যাইত। করুণাময়ী অতি সুন্দর কবিতা এবং রচনা লিখিতেন এবং সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিতেন। একমাত্র ব্রজসুন্দরেরই উৎসাহে তিনি এ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

ঢাকা ইডেন ফিমেল স্কুলের সূত্রপাত তাঁহারই হস্তে হইয়াছিল

একথা আমরা নানাস্থান হইতে শুনিয়াছি।* প্রথম প্রথম তিনি ইহাতে অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানেও তিনি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং বালিকাদিগের শিল্প-শিক্ষার জন্য কলিকাতা হইতে নানাবিধ উপকরণও আনিয়া দিতেন।

খৃষ্টান জেনানা মিসনের সহিতও ব্রজসুন্দরের যোগ ছিল, এবং তিনি নারিন্দা, বনগ্রাম, বাঙ্গালাবাজার, লিভিংষ্টোন সাহেবের বালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতি আরও অনেক বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। ঢাকাতে সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থই ইহার নিদর্শন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া নারীজাতির উন্নতি-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ এক সময়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ব্রজসুন্দরের অনুরাগ থাকা সত্বেও বর্ত্তমান স্ত্রীস্বাধীনতার ভাব তাঁহার হৃদয়ে তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু তিনি পরিবারস্থ রমণীদিগের স্বাধীন মতের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। মনোনীত বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার অন্তঃপুরে গমন করিলেও সে সময়ের প্রচলিত আদব কায়দা অতিক্রম করিয়া তাঁহার পরিবারের মহিলাগণ প্রকাশ্যভাবে কোথাও যাতায়াত করিতেন না। ব্রজসুন্দর দ্রুতগতি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না, সুতরাং এ বিষয়েও বোধ হয় তিনি হঠাৎ দেশপ্রচলিত রীতিকে উল্লঙ্ঘন করা উচিত মনে করেন নাই।

সুরাপান ও অন্যান্য দুর্নীতি নিবারণ এবং যুবকবৃন্দের কল্যাণ চেষ্টা।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুসমাজে সর্ব্বত্রই ঘোর তান্ত্রিকতার প্রাদুর্ভাব ছিল। শাক্তদিগের মধ্যে সুরাপান দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। পারি-

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত "রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ।

বারিক অনেক অনুষ্ঠানে, এমন কি শিশুপুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সর্ব্বাগ্রে দেবপ্রসাদ রূপে শিশুর মুখে একটু মদিরা স্পর্শ করান হইত। সে সময়ে সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে উহার আনুষঙ্গিক ব্যভিচারস্রোত ও সমাজে প্রবলবেগে বহিতেছিল। উলাইলের মিত্র-মজুমদার বংশ ঘোর শাক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মদ্যপান সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে একদিন শবদাহ করিতে যাইয়া মদ্যপান করিতে করিতে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া শবের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন!

ব্রজসুন্দর শৈশব হইতেই স্বীয় বংশীয়দিগের মধ্যে সুরাপানের ও তদানুষঙ্গিক দুর্নীতির প্রকোপ দেখিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রকার নানাবিধ পাপ প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও তিনি স্বীয় চরিত্রকে সম্পূর্ণ নির্ম্মল রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখনকার প্রচলিত কোন দুর্নীতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই।

তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াও দেখিয়াছিলেন, যে, প্রথম ইংরাজী শিক্ষিত দলে সুরাপান অত্যধিক মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে। সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার দূরীকরণ এবং শিক্ষার একটা প্রধান নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং যিনি প্রকাশ্য ভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনিই একজন সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আপামর সাধারণ এবং এমন কি দেশের শিক্ষিত সমাজের অবস্থা যখন এইরূপ ছিল, তখনকার দিনে সুরাপান নিবারণ ও অপরাপর সামাজিক দুর্নীতি দমনের প্রয়াস ব্রজসুন্দরের পক্ষে সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় কোন কোনও সভ্য সুরাপান করিতেন। ব্রজসুন্দর ইহা জানিতে পারিয়া প্রাণপণে তাঁহাদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠক "ব্রাহ্ম সমাজ" শীর্ষক অধ্যায়ে বাবু রাজনারায়ণ বসুর নিকট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া থাকিবেন।

ব্রজসুন্দরের সময় ঢাকার ছাত্রগণ অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া

উঠিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে সুরাপান ও ব্যভিচারস্রোত প্রবলবেগে চলিয়াছিল। দেশের ভাবী আশাস্থল শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে পাপের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য ব্রজসুন্দর মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন; এবং বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়, দীননাথ সেন, গোবিন্দপ্রসাদ রায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতিকে লইয়া একটী সমিতি গঠন করিলেন। ইহাঁরা রাত্রিকালে দলবদ্ধ হইয়া মদের দোকান ও বারবনিতালয় পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে অনেক ছাত্র ধরা পড়িতে লাগিল, এবং স্খলিত চরিত্র ছাত্রদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য গোপনে নানা প্রকার উপদেশাদি দেওয়া হইতে লাগিল। যাহাদিগকে উপদেশের বহির্ভূত মনে করা হইত, তাহাদিগকে যথারীতি শাসন করা হইত, এবং প্রয়োজন মনে হইলে প্রহারও করা হইত। আমরা ব্রজসুন্দরের জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট শুনিয়াছি যে তিনি একদিন এইরূপ একটী ছাত্রের প্রহারের বিষয় টের পাইয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর অন্তঃপুরে গেলে কন্যা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রজসুন্দর উত্তরে "ও বড় দুষ্ট হইয়াছে পড়াশুনা করে না, তাই মারিয়াছি" বলিয়া চলিয়া গেলেন; কন্যা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে পরের ছেলে পড়ে না, তার জন্য বাবা এত রাত্রে মারিতে গেলেন কেন? এই ছাত্রটীর পিতা একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমীদার ছিলেন। অভিভাবক বিহীন অবস্থায় পুত্রকে ঢাকায় রাখা একান্ত অনুচিত এই মর্ম্মে ব্রজসুন্দর পরদিন তাঁহাকে পত্র লিখিলেন, এবং কয়েক দিবসের মধ্যে পিতা আসিয়া পুত্রকে লইয়া গেলেন।

সে যাহাহউক ব্রজসুন্দরের এই গুপ্ত সভাদ্বারা ক্রমে ঢাকার ছাত্রবৃন্দের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং আমরা শুনিয়াছি সমিতির চেষ্টায় অনেক কলুষিত-চরিত্র যুবক চিরদিনের জন্য পাপের পথ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার এই ছেলেধরা পদ্ধতি বড়ই কাজের হইয়াছিল, এবং তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে পূর্ব্ববঙ্গের নৈতিক উন্নতির জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন ইহার তুলনা

কোথায়ও মিলে না। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রকার নৈতিক উন্নতির এবং শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারাদির মূলে আজ ব্রজসুন্দরের আড়ম্বরশূন্য চরিত্র প্রভাবই প্রাণরূপে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রজসুন্দর সুরাপানের কিরূপ বিরোধী ছিলেন নিম্নলিখিত একটী মাত্র ঘটনা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বহু কাল পূর্ব্বে একবার ঢাকায় ডেঙ্গুজ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় এই সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হইয়া একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। যখন চৈতন্য হইল তখন দেখেন যে ব্রজসুন্দর ও অভয়াচরণ দাস তাঁহার শয্যা পার্শ্বে দণ্ডায়মান। ব্রজসুন্দর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই।" ডাক্তার ডাকা হইল, চিকিৎসা চলিল, চন্দ্রনাথ বাবু সারিয়া উঠিলেন। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং ডাক্তার চন্দ্রনাথ বাবুকে পোর্ট ওয়াইন খাইতে বলিলেন; ইহাতে ব্রজসুন্দরের ঘোরতর আপত্তি হইল। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাঁহাকে শীঘ্র আরোগ্য করিবার জন্য, অভয় বাবু ব্রজসুন্দরের অজ্ঞাতসারে পোর্ট ওয়াইন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পাপের প্রতি ব্রজসুন্দরের এরূপ প্রবল বিদ্বেষ ছিল যে শুনিলে অবাক হইতে হয়। স্বীয় জননীর পুরোহিত তাঁহার গ্রামস্থ বাটীর কোন পরিচারিকাকে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়ায়, ব্রজসুন্দর এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত পুরোহিতকে নিজ গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে জননীর ঐকান্তিক অনুরোধও তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল। এবং ব্রজসুন্দর যতদিন জীবিত ছিলেন, ঐ পুরোহিত ঠাকুরটী গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার ডায়েরীতে আছে ঃ—

Dacca, 25th February, 1875.

* * Thakur, grandson of our ancestral priest late * * Chakravarti, was found in a hut of my

village-house where a widow maidservant, Haria's wife, was sleeping at night. I at once issued orders to drive him out of the village and not to allow him to come there again. This was done; but on the 3rd. Falgoon when a mahotsab was celebrated in commemoration of my wife's death, * * Thakur was seen in the village and on enquiry it was found that he was invited by my mother who, being very old, could not realize that such a man (the priest of the family) would be dangerous to the family. Her kind feelings dictated her to forgive the man on this special occasion.

I sent for naib Joy Ray, Nobin Sirdar and Ramsahaya Sing, who arrived at Dacca, on the 17th February or 6th Falgoon 1281. I ordered them to go to Tetuljhora and remove * * Chakravarti's wife from the village and not to allow * * to come there again.

She was thus sent away to Khidraguttee. No force was used by my men. She left as soon as she was told to do so.

উক্ত পুরোহিত সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার দূর-সম্পর্কিত অপরিণত বয়স্ক যুবকও লিপ্ত ছিল। ব্রজসুন্দর তাহাদিগকে তাঁহার আরমানিটোলাস্থ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি তাহাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন, সত্য, কিন্তু তাঁহার কোমল হৃদয় তাহাদিগের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আবার অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ব্রজসুন্দর উক্ত যুবকদ্বয়ের একজনকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

পরম কল্যাণবরেষু—

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মিত্র এখানকার নর্ম্মালস্কুলের শাখা মডেল স্কুলে নিজ ব্যয়ে দুই মাস কাল পড়িয়া নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন মহাশয়ের এক সার্টিফিকেট আনিয়া আমাকে দেখাইয়াছে যে, সে যে ভাবে এইক্ষণ পড়িতেছে এই ভাবে পড়িলে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সে স্কুলে কখনও গরহাজির হয় না। আমি তাহাকে বলিয়াছি—"তুমি অন্য বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া কর, দুই বেলা আমার বাসায় আসিয়া আহার করিয়া যাইবে, আমি তোমার বাসা ভাড়া এবং স্কুলের বেতন বাবদ মাসিক সাহায্য করিব। অতএব লিখি তোমারও যদি ঐভাবে লেখা পড়া শিক্ষা করার ইচ্ছা হয় তবে তোমাকেও আমি ঐরূপ আহার, পাঠ ও বস্ত্রাদির ব্যয় দিতে স্বীকৃত আছি। নচেৎ তোমাকে যে বাড়ী করিবার জন্য স্থান দেওয়া হইয়াছে সেখানে গিয়া বাড়ী করিবে। তোমাকে আর আমার বাড়ীতে রাখিতে পারি না। যে বালক লেখা পড়া শিক্ষা করার সময় লেখা পড়া না করিয়া কুকার্য্যে অনর্থক কাল হরণ করে, তাহাকে আমি আহার দেওয়াও অন্যায় মনে করি—কেবল অন্যায় কেন, মহা অন্যায় জ্ঞান করি। তোমাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, তোমাদের অবস্থা এই যে "ন অন্নং ন বস্ত্রং নচ বারিপাত্রং" কিন্তু তোমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পার না। আমি সেই বিবেচনায় তোমার পাঠের ব্যয় দিতে প্রস্তুত আছি। তোমাদের যে প্রকার ব্যবহার তাহাতে মানুষ দূরে থাকুক ভগবানও বাম হন।"

পাপের প্রতি প্রবল ঘৃণা ব্রজসুন্দরের চরিত্রের একটী বিশেষত্ব ছিল। পাপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে লোকের প্রতি সময় সময় তিনি কঠোর ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না ; কিন্তু পাপীর ভাবী মঙ্গল চিন্তা করিতে তিনি কখনই বিস্মৃত হইতেন না ; উপরোক্ত চিঠিখানা ইহার একটীমাত্র নিদর্শন।

সেই সময় ব্রজসুন্দর সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে পূর্ব্ববঙ্গে অনেকের নিকটই সুপরিচিত ছিলেন; এবং অনেকেই ব্রজসুন্দরকে প্রবাসী পুত্র বা আত্মীয় ছাত্রবৃন্দের অভিভাবক স্বরূপ মনে করিতেন। বলা বাহুল্য ব্রজসুন্দর ও অভিভাবকের ন্যায় সর্ব্বদা যুবকবৃন্দের তত্ত্বাবধান লইতেন, এবং কখনও কাহারও ব্যারাম হইলে কিম্বা চিকিৎসা বিষয়ে ত্রুটী হইতেছে শুনিলে, অমনি ডাক্তারাদি প্রেরণ করিয়া এবং প্রয়োজন হইলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সুচিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন, যাহাদিগের অর্থের অনাটন হইত তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন এবং আবশ্যক হইলে নিজ বাটীতে আনিয়াও চিকিৎসা করাইতেন।

একাদশ অধ্যায়।

নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি।

বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ ও নানাবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠান।

ব্রজসুন্দর যে একজন খাঁটি সংস্কারক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাকে রক্ষণশীল-দলের অগ্রণী বলিয়াই বোধ হইবে। বিশাল হিন্দুসমাজকে সুসংস্কৃত করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। সুতরাং এই নীতি সম্মুখে রাখিয়াই তিনি নানাবিধ সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসংস্কারের পরেই তিনি নারীজাতির দুঃখ মোচন এবং উন্নতি বিধানের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নরসেবা যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল তাঁহার মত পরদুঃখকাতর হৃদয়বান ব্যক্তি কি দুঃখিনী বঙ্গরমণীর কথা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন? তাহা সম্ভব নয়। বঙ্গরমণীর প্রতি প্রধান অবিচার বালবিধবার চিরবৈধব্য প্রথা! ইহাই তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়াছিল; তাই তিনি যৌবন-কালেই এই নিষ্ঠুর দেশাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। চিরাগত দেশাচারের অভেদ্য দুর্গে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় অশনিবৃষ্টি করিতে-ছিলেন। যুবা ব্রজসুন্দর পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গবাসী রাজা রাজবল্লভ হিন্দু বালবিধবাগণের পুনর্বিবাহ প্রচলনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টম বর্ষীয়া শিশুকন্যা বিধবা হইলে তাহাকে পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য বাঙ্গালাদেশের পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ

শোনা যায় যে তাঁহারা অধিকাংশই বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে মত দিয়াছিলেন, কিন্তু কাশীর পণ্ডিতদিগের ব্যবহারে তিনি এই সংকল্প ত্যাগ করেন। কাশীর পণ্ডিতগণ রাজার অনুচরদিগকে একটী সদ্যজাত গোবৎস দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধমত বুঝিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না; অনুচরগণ মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, রাজা রাজবল্লভ অতি কষ্টে প্রাণের বাসনা বিসর্জ্জন দিলেন।

১৮৬১ সনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক-প্রস্তাব" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ব্রজসুন্দর ঐ গ্রন্থের ১০০০ কপি নিজব্যয়ে বাবু যদুনাথ বসুর নামে পুনর্মুদ্রিত করিয়া ঢাকা এবং শ্রীহট্ট জেলায় বিতরণ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব" প্রকাশিত হইলে উহা এবং প্রথম প্রস্তাব একত্রে ৫০০ শত কপি মুদ্রিত করিয়া পুনরায় বিতরণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিতরণের জন্য তাঁহাকে ২০০ কপি প্রদান করিয়াছিলেন। এই পুস্তক যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, সে কালে ইহার ১৫০০ কপি ছাপাইতে ব্রজসুন্দরের কিরূপ অর্থব্যয় হইয়াছিল।

তিনি কেবল পুস্তক বিতরণ করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুস্তক দ্বারা যাহাতে বহুলোক বিধবা-বিবাহের যুক্তিযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, সেই জন্য পুস্তক গ্রহীতার নাম ধাম লিখিয়া রাখিতেন এবং প্রত্যেককে এই অনুরোধ করিতেন যে এই পুস্তক যেন একাকী পাঠ না করেন, যত অধিক সম্ভব তত লোক একত্রিত করিয়া একজন উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইবেন এবং পরে পুস্তকখানি অন্য ব্যক্তিকে দিবার সময় এই নিয়মে পাঠ করিতে অনুরোধ করিবেন। তখনও বাঙ্গালাভাষায় পুস্তকের সংখ্যা অধিক ছিল না, সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই পুস্তকগুলি লোকে যে কি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিত তাহা বলা বাহুল্য।

যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলন হয়, তাহার জন্য তিনি, সম্ভবতঃ ১৮৬১।৬২ সনে, পূজার ছুটীর সময় ঢাকায় একটী বৃহৎ সভা আহ্বান করেন। তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ সমাজের অগ্রণী-গণ সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই একবাক্যে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে নিজ নিজ পরিবারে বালবিধবা থাকিলে তাহাদিগের বিবাহ দিতে চেষ্টা করিবেন এবং যাঁহারা এইরূপ অনুষ্ঠান করিবেন তাঁহাদিগের প্রতি কার্য্যতঃ সহানুভূতি দেখাইবেন। এই সভাই পূর্ব্ববঙ্গে সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথম সভা। এই উপলক্ষে শিক্ষিত লোকের চিন্তার মধ্যে যে বীজ রোপিত হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমানে বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যকালে এক ব্রজসুন্দর ব্যতীত আর কেহই অগ্রসর হইলেন না। তিনি দেশমধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন এবং তাহার ফলে দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল আন্দোলনের যে কিছু-মাত্র ফল হয় নাই তাহা নহে। ইহাতে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত অনেক উদার করিয়া দিয়াছিল ও বিধবা-বিবাহের পক্ষ-পাতী যুবকদিগের একটী দল গঠিত হইয়াছিল। ইহাতে যদিও আশা-নুরূপ ফল ফলিল না তথাপি দুই একটি করিয়া বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইতে লাগিল। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের মধ্যে ব্রজসুন্দরের দ্বারাই প্রথম বিধবা-বিবাহ সংঘটিত হয়; কিন্তু বিবাহটী পূর্ব্ববঙ্গে না হইয়া কলিকাতায় হইয়াছিল। তাঁহার ডায়েরীর এক স্থানে দেখিতে পাই :—

First widow marriage. On the 23th June, 1867 the marriage of the widow daughter of late Babu Ramdyal Roy of Maloochee with Babu Kalinath De of Mymensing, Head master of the Sibsagar Government School, was celebrated with *eclat* at Calcutta by Babu Kristodyal Roy, pleader, High Court, brother of Babu Ramdyal, in spite of vehement opposition

raised against it by his relations and fellow caste-men. (vide "The Hindoo Patriot" and "The Indian Mirror" of 1st July, 1867). The bridegroom was selected by me. Babu Gurucharan Mahalanobis of Panchasar was also very forward in this cause.

* * * * * * *

ব্রজসুন্দর যে এই বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার ডায়েরী হইতে জানা যায়। তিনি লিখিতেছেন:—29th March, 1865—Wrote a letter to Babu Dinonath Sen, Head master, Pogose School, Dacca and another to Babu Bhagaban Chandra Bose of Rarikhal, Deputy Magistrate of Faridpur, to ascertain whether Adinath Mitra of Chura-mondal, Bikrampur, Head master, Dacca Branch School, is willing to marry the widow neice of Babu Kristodyal Roy of Maloochee.

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে রামদয়াল বাবু জীবিত থাকিতেই কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদয়ালকে ইহার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। সে সময়ে এরূপ একটী কার্য্য করা যে কি ভীষণ ব্যাপার ছিল এখন তাহা কল্পনা করা কঠিন। কৃষ্ণদয়াল বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং তাঁহার অনেক ধনী মক্কেল ছিলেন। এই অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে যে বিষম ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে বোধ হয় ইহা চিন্তা করিয়াই তিনি কালবিলম্ব করিতেছিলেন, কিন্তু ব্রজসুন্দরের প্রেরণায় অবশেষে বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দিলেন। ইহাতে তিনি যে প্রকার সৎসাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সে সময়ের পক্ষে একেবারেই বিরল। আত্মীয় স্বজন ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর শ্বশুরকুলের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি যে এ কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন ইহা তাঁহার পক্ষে কম সাধুবাদের কথা নহে।

ফলতঃ এই বিবাহের পরেই কলিকাতার হিন্দুসমাজ ও তাঁহার ধনী মক্কেলগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং সম্ভবতঃ এই কারণে তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল এবং চিরজীবন অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

ব্রজসুন্দরের ডায়েরীর স্থানে স্থানে বিধবাদিগের সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জ্ঞাতসারে কেহ কোনদিন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিয়া নিষ্কৃতি পাইত না। দুষ্টের দমনের জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার হৃদয় অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করিতে পারিত না। তাঁহার কুমিল্লা অবস্থান কালে ভুলুয়া পরগণার দত্তপাড়ার এক সূত্রধর তাহার স্বজাতীয়া এক বিধবাকে বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ করিয়াছিল কিন্তু সেখানকার নায়েব গঙ্গাদাস মুন্সী বিবিধ উৎপীড়ন করিয়া ইহাদিগকে সমাজচ্যুত করে। ব্রজসুন্দর এই বিষয় অবগত হইয়া নায়েবকে জব্দ করিতে না পারিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন যে তিনি পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহকে (ভুলুয়া ইঁহারই জমিদারীভুক্ত ছিল) বলিয়া এই নায়েবের অত্যাচারের প্রতিবিধান করেন। তাঁহার ডায়েরীতে আছে :—

5th. April, 1865. A carpenter living near village Duttapara, Perganah Bhoolooa, having married a young widow of his caste and the ceremony having been performed by a Brahmin, the naib of Bhoolooa named Gangadas Munshi has been persecuting them. They have been outcasted by their community. On hearing this, wrote a letter to Pundit Issur Chandra Vidhysagar requesting to exert his influence on the Raja of Paikepara to put a stop to this persecution.

জগতের সাধু মহাত্মাদিগের জীবনে যেমন নারীসৌহার্দ্দ দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজসুন্দরের জীবনেও তেমনি নারীর সকল অবস্থার প্রতি

অতি অকৃত্রিম সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবাদিগের প্রতি তাঁহার এই সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে এইরূপ কত ঘটনার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।

ব্রজসুন্দর তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান কর্ণপাড়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তেঁতুলঝোড়ায় নূতন গ্রাম ক্রয় করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। ঐ গ্রামে দুইটী ব্রাহ্মণ সহোদর বাস করিত। জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য, কনিষ্ঠ জয়নাথ ভট্টাচার্য্য। কনিষ্ঠের অনেকগুলি পুত্র কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথের হরসুন্দরী নামে একটী মাত্র বিধবা কন্যা ছিল। সে পিতৃগৃহে বাস করিত এবং বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষা করিত। শ্রীনাথ মৃত্যু কালে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে এবং গ্রামের লোকদিগের নিকট বলিল "আমার মৃত্যু হইলে আমার কন্যা হরসুন্দরী আমার অংশের বাটীতে থাকিবে এবং আমার অংশের ফলফুলারী বিক্রয় করিয়া খাইবে।" শ্রীনাথের মৃত্যু হইলে ব্রজসুন্দরের জননী হরসুন্দরীকে ডাকিয়া বলিলেন "হরঠাকুরাণী, আমার নূতন বাড়ী, বাগবাগিচা কিছুই হয় নাই, তোমারও ফল বিক্রয় ছাড়া অন্য সংস্থান নাই, বাজারে ফল বিক্রয় করিতেও একটী লোকের দরকার, আর আমি যদি তোমার সব গাছ জমা করিয়া লই, তোমারও সাহায্য হইবে, আমার বহু পরিবার, আমারও সুবিধা হইবে।"

কাশীশ্বরীর বন্দোবস্তে হরঠাকুরাণী সম্মত হইলেন এবং দুই তিন বৎসর এই ভাবে চলিল। কাশীশ্বরী একদিন ঐ বাগানের ফল আনিতে লোক প্রেরণ করিলে হরসুন্দরীর খুল্লতাত-পুত্র হরি ভট্টাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "বাবুর বাড়ীর চাকরেরা কেন আমার বাড়ীর ফল লইতে আসিবে; এ সব আমার। আমার গাছপালার ব্যবস্থা করিবার জন্য হরসুন্দরী কে?" এই বলিয়া চাকরদিগকে তাড়াইয়া দিল।

জ্যেষ্ঠ তাতের মৃত্যুর পর হইতেই হরিঠাকুর হরসুন্দরীর উপর নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল; এক এক দিন প্রহার পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইত। হরসুন্দরী সর্ব্বদাই কাশীশ্বরীর নিকট আসিয়া

ক্রন্দন করিত। তিনি কখনও তাহাকে আহার করাইতেন, কখনও বা আহারের দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেন আর বলিতেন "তুমি স্থির হও, আমার বিরজু (ব্রজ) বাড়ী আসুক—তোমার একটা উপায় হইবে।" যথাসময়ে ব্রজসুন্দর বাড়ী আসিলে, জননী পুত্রকে হরসুন্দরীর দুঃখের কথা বলিলেন। ব্রজসুন্দর তখনই হরিঠাকুরকে ডাকাইলেন। হরিঠাকুর একজন গণ্ডমূর্খ গাঁজাখোর গোঁয়ার, সে কাহাকেও ভ্রুক্ষেপ করিত না। অন্যে ডাকিলে কখনই আসিত না, তবে বাবু ডাকিয়াছেন বলিয়াই আসিল, কি জানি কখনও দায়ে ঠেকিলে যদি বাবুরই শরণাপন্ন হইতে হয়। হরিঠাকুর আসিলে ব্রজসুন্দর হরসুন্দরী সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সকল প্রশ্ন করিলেন, হরিঠাকুর সবই মিথ্যা বলিল। বলিল "আমার জেঠা সবই আমাকে দিয়া গিয়াছেন। আপনার মাতাঠাকুরাণী জোর করিয়া ফল আনেন, আর হরকে টাকা দেন।" এইরূপ নানা কথা বলাতে ব্রজসুন্দর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তেজের সহিত বলিলেন "তুমি যে এই বিধবাকে মারিবে আর তাড়াইয়া দিবে, আমি থাকিতে তাহা কখনই হইতে পারিবে না।" তখন হরিঠাকুরেরও মেজাজ গরম হইয়া উঠিল। সেও বলিয়া উঠিল "হর আমার জ্যেঠতুত ভগ্নী, কিন্তু দেখিতেছি আমার অপেক্ষা উহার প্রতি আপনার দয়াটা বড় বেশী।" তখন ব্রজসুন্দর বলিলেন "ওহে ঠাকুর, স্বার্থের ঘর্ষণে তোমার দয়া কি আর আছে ; তা হলে কি আর বিধবার প্রতি এত অত্যাচার করিতেছ ?" হরিঠাকুর তখন অত্যন্ত চড়িয়া গিয়া দর্পভরে বলিল "আমি মোকদ্দমা আনিব, দেখিব কোন আইনে, বিধবা কন্যা পিতার সম্পত্তি পাইতে পারে, এমন বিধান আছে।" তখন ব্রজসুন্দরও রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন "আমি এই বিধবার পক্ষ হইয়া মোকদ্দমা চালাইব, দেখিব তুমি হরিঠাকুর কেমন করিয়া বিধবাকে তাড়াইয়া দেও।" হরিঠাকুরকে এইরূপ ভর্ৎসনা করার পরেই ব্রজসুন্দর ক্রমে শান্ত হইয়া মিষ্টকথায় একটী গল্প বলিলেন। তাহার তাৎপর্য্যে

দেখাইলেন, ভগবান সবলের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া দুর্ব্বলেরই আশ্রয় হন। ক্রমে হরিঠাকুরও শান্ত হইল, আর মোকদ্দমা হইল না এবং হরসুন্দরীও তাড়িত না হইয়া পিতৃগৃহে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

ব্রজসুন্দরের বাসগ্রামের নিকট বাগবাড়ী নামক গ্রামে শম্ভু মজুমদার নামে একজন অতি কৃপণ লোক ছিল। তাহার স্ত্রী অতি নির্ব্বোধ ছিল। শম্ভুর সঙ্কটাপন্ন পাড়া দেখিয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র রক্ষু মজুমদার খুল্লতাতকে সমস্ত জমীজমা নিজের নামে লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিল। শম্ভু স্বীয় পত্নীর ভরণ-পোষণের ভার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর দিয়া টাকাকড়ি জমীজমা সমুদয়ই তাহাকে দিয়া গেল। রক্ষু ইতিপূর্ব্বে খুড়ীকে একখানি লালকস্তা পেড়ে কাপড় কিনিয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিল, খুড়ী কোনই আপত্তি করিল না। কিন্তু শীঘ্রই অশান্তি উপস্থিত হইল—শম্ভুর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীর প্রতি নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ হইল। শম্ভুর পূর্ব্বপক্ষের কন্যা, বিমাতার দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়া তাহাকে গৌহাটী লইয়া গেল এবং ৭ বৎসর বিমাতাকে নিজের নিকটে রাখিল। ৭ বৎসর পরে বিমাতা দেশে আসিয়া দেখিল জমীজমা সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিছুই নাই। তাহাকে দেখিয়া রক্ষু বলিল "আমার গৃহে তোমার স্থান নাই, আমারই দিন চলে না—তোমাকে খাইতে দিতে পারিব না।" যাহা হউক বিধবা তো পথে পড়িয়া মরিতে পারে না, গ্রামের লোক বলিয়া কহিয়া শম্ভুর স্ত্রীর জন্য দিনে আধসের চাউলের বরাদ্দ করিয়া দিল, বিধবা আধসের চাউল পাইয়া অপরের বাটী হইতে তেল টুকু লবণ টুকু সংগ্রহ করিয়া অপরের বাড়ীতেই একমুষ্টি রান্ধিয়া খাইত। রক্ষুর কার্ত্তিক নামে একটী ছেলে ছিল, সে যেদিন চাউল দিত, সে দিন বিধবার পেট ভরিত, তাহার মা দিলে কম পড়িত, আর তুমুল ঝগড়া বাধিয়া যাইত, পাড়া-শুদ্ধ লোক রক্ষু ও শম্ভুর স্ত্রীর ঝগড়ায় কাণ

পাতিতে পারিত না। রক্ষু একদিন ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া বলিল "আমি তোমাকে খাইতে দিতে পারিব না, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও।" শম্ভুর স্ত্রী বলিল "আমি কি পেটের জ্বালায় জাত হারাব?" তখন রক্ষুর স্ত্রী বলিল "ঐ তো মুচিপাড়া দেখা যায়, যা পেটের জ্বালায় ওদের কাছে গিয়া জাত দে।" শম্ভুর স্ত্রী নিরূপায় হইয়া একদিন ফুলবেড়িয়ার চন্দ্রনাথ গুহের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন "আমি তোমার কি করিব? অমন দয়াল বাবু (ব্রজসুন্দর) তোমাদের গ্রামের নিকটেই থাকেন তুমি এক রবিবার, তিনি বাড়ী আসিলে তাঁহার নিকট যাইও, নিশ্চয় তোমার একটা উপায় করিয়া দিবেন।"

একদিন রবিবার দেখিয়া শম্ভুর স্ত্রী দ্বি-প্রহরের সময় চটের মত একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া পাগলের ন্যায় চোখ্ করিয়া অন্তঃপুরে ব্রজসুন্দরের জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট আসিয়া বলিল "বাবুর বড় মেয়ে মাতঙ্গ কে? তাকে ডাকিয়া দেও।" মাতঙ্গী তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলেন "কেন আমিই তো সেই বড় মেয়ে, তুমি কি চাও?" সে চোক কট্ মট্ করিয়া বলিল "আমার বাবুর কাছে অনেক নালিস আছে।" তাহার পেটে ভাত নাই, মাথায় তেল্ নাই, পাগলের ন্যায় চাহনী দেখিয়া বালিকা মাতঙ্গী ভীত হইয়া তাহাকে বিদায় করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বলিলেন "বাবা এখন বাহিরে।" তখন বিধবা জোড়হাত করিয়া মাতঙ্গীকে বলিল "আমায় রক্ষা কর, তোমার বাবাকে আমার কথা বল।" মাতঙ্গী তাহাকে বসিতে বলিলেন।

ব্রজসুন্দর যখন ২।১ দিনের জন্য বাড়ী যাইতেন তখন বিস্তর জন-সমাগম হইত, সকলের নালিস শুনিতে হইত, অনেকের আর্থিক ও পারিবারিক গোল মিটাইতে হইত; এই সব কাজে ব্যস্ত থাকায় স্নানাহার করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইত। সেদিনও সেইরূপ করিতেছিলেন। জননীর অনেক অনুরোধের পর ব্রজসুন্দর স্নান করিয়া সবে আহারে বসিয়াছেন, কাশীশ্বরী নিকটে বসিয়া যত্ন পূর্ব্বক পুত্রকে খাওয়াইতেছেন, এমন সময়ে বালবুদ্ধি মাতঙ্গী সেই বিধবাকে লইয়া পিতার নিকট

উপস্থিত হইলেন। কাশীশ্বরী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মাতঙ্গীকে ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন যে "সুস্থির হইয়া দুটী ভাত খাইবে, তাও তোমরা দিবে না!" ব্রজসুন্দর কন্যাকে বলিলেন "অনেক বেলা হইয়াছে উহাকে স্নান আহার করাও, পরে সমুদয় শুনিব।" উন্মাদিনী বিধবা কিছুতেই স্নানাহার করিবে না, আগে তাহার দুঃখের কথা শুনিতে হইবে। মাতঙ্গী স্নানাহারের কথা উত্থাপন করিতেই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। কন্যাকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া ব্রজসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন "সে স্নান করিতে গিয়াছে তো?" কন্যার নিকট তাহার প্রস্থানের কথা শুনিয়া ব্রজসুন্দর আর ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলেন না, অস্থির হইয়া শিকদার পরান দাদাকে বলিলেন "শীঘ্র যাও, যেখানে পাও সেই বিধবাকে লইয়া আইস।" পরান শীকদার দৌড়িয়া গেল কিন্তু সে বিধবা কিছুতেই আসিবে না, মাতঙ্গী ও শিকদার তাহার হাত ধরিয়া অনেক কষ্টে টানিয়া আনিয়া স্নানাহার করাইল। স্নান করিয়া বিধবা কাপড় ছাড়িল না—কাপড় দিতে গেলে বলিল "গায়ে কাপড় শুকানই আমার অভ্যাস।" তখন মাতঙ্গী আবার বলিয়া কহিয়া কাপড় ছাড়াই-লেন। আহারের পরই ব্রজসুন্দর রক্ষু মজুমদারকে ডাকাইয়া সমুদয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রক্ষু বলিল "আমার বৃহৎ পরিবার, অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে, আমি কিছুতেই চালাইতে পারি না।" ব্রজসুন্দর হাসিয়া বলিলেন "সকল ভার বহিতে পার কেবল খুড়ীকে একমুষ্টি অন্ন দিতে পার না।" রক্ষু মজুমদারের ৯ পাখি মাত্র জমি ছিল। ব্রজসুন্দর তখনই তাহার ৫ পাখি বিধবা খুড়ীর নামে লিখাইয়া লইলেন। বিধবা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিবার সময় কাশীশ্বরী দেবীকে প্রণাম করিতে গেল, তিনি বলিলেন "তোমার একটা উপায় হইল ভালই হইল, কিন্তু তোমরা আমার ছেলেকে বড় কষ্ট দাও, সমস্ত বেলাটুকু তো গেল, একদিনের জন্য বাড়ী আসিবে, একটুও সুস্থির হইতে দিবে না, আমি যে দুটো ঘরের কথা বলিব তার সময় টুকুও পাই না।" বিধবা পরে ব্রহ্মময়ীর নিকট বিদায় লইতে গেল, তিনি সমুদয় জিজ্ঞাসা করিয়া

বলিলেন "৫ পাখি জমীতে তোমার তো চলিবে না, তুমি আমার নিকট থাক, জমীর ধান বিক্রী করিয়া দুপয়সা হাতে রাখিও।" বিধবার উদ্ধার হইল—সে ব্রজসুন্দরের গৃহে রহিয়া গেল। সেই উন্মাদিনী বিধবা ক্রমে ভাল হইল, ব্রজসুন্দরের সন্তান দিগকে আপন সন্তানের ন্যায় ভাল বাসিতে লাগিল। ব্রজসুন্দরের পরবর্ত্তী সন্তানগণ তাহাকে 'বুড়া মা' বলিয়া ডাকিত। যে পেটের জ্বালায় পাগলের ন্যায় হইয়াছিল, নির্ব্বোধ বলিয়া যাহাকে স্বামী কিছুই দিয়া যান নাই, সেই দুঃখিনী ব্রজসুন্দরের বাটীতে গৃহিনীর ন্যায় সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া তৃপ্ত হইত, নিজের আহারের দিকে ভ্রুক্ষেপও ছিল না। ক্রমে তাহার বুদ্ধি বিবেচনা সুন্দর ফুটীয়া উঠিল এবং শেষ জীবনে ব্রজসুন্দরের কন্যাদিগের সেবায় পুত্রকন্যাবতীর ন্যায় শান্তিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল।

ব্রজসুন্দর যে কোথা হইতে কায খুঁজিয়া বাহির করিতেন তাহার ঠিক ছিল না। আমরা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট শুনিয়াছি বাল্যকালে ব্রজসুন্দর একদিন শুনিয়াছিলেন যে দেবীপ্রসাদ মজুমদারের (তাঁহার প্রপিতামহ) ৭ কন্যা ছিল। এক কন্যার বিক্রমপুর বজ্রযোগিনীতে বিবাহ হয়। সার্ভে কার্য্য উপলক্ষ্যে যখন বজ্রযোগিনী গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তখন যেমন প্রত্যেক গ্রামেই করিতেন অর্থাৎ সেখানে কত ঘর কায়স্থ, কত ঘর ব্রাহ্মণ, কত ঘর মুসলমান, এবং গ্রামের নানাবিধ অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। একটী লোকের মুখে পরিচয় পাইলেন যে কিশোর নারায়ণ বসুর পিতা উলাইলে বিবাহ করিয়াছিলেন, এখনও কিশোর নারায়ণের বিধবা পত্নী এবং দুইটী কন্যা বর্ত্তমান আছেন। সেদিন এই পর্য্যন্ত হইল, কেন না তখনও সেখানে জমির মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে বাকি আছে। যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি কিশোরের জ্ঞাতি ভাইপো। কিছুদিন পরে এই ভাইপো কিশোরের স্ত্রীকে বলিলেন "খুড়ীমা, হাকিমটী দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি মিষ্টভাষী। কেবল কাজের কথা বলেন না, সরকারি

কাজ হইয়া গেল কেমন সকলের খোঁজ করেন। কার কয়টী সন্তান, কে কি করে এইরূপ অনেক আলাপ করেন। সকলের চেয়ে তোমাদের কথা খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করিলেন।" কিশোরের স্ত্রী কিছুই বুঝিলেন না। ঐ বৎসর পুজার সময় ব্রজসুন্দর ঢাকা হইতে লোক ও নৌকা পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে তেতুলঝোড়ায় আনাইলেন, কিন্তু যতক্ষণ ব্রজসুন্দর বাড়ী না আসিলেন বেচারীদের কেহ চিনিতে পারিল না।

ব্রজসুন্দরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন:— বিজয়ার দিন প্রতিমা বিদায় হইয়া গেলে সন্ধ্যাকালে বাবা বাড়ী গিয়া সকলকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, বজ্রযোগিনীর খুড়ীমা কোথায়?" তিনি নিকটে আসিলে বাবা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "এখন তো চিনিলেন, যখন ইচ্ছা এখানে আসিবেন এবং যতদিন ইচ্ছা থাকিবেন।" এই বিধবা যে বাবাকে কত আশীর্ব্বাদ করিতেন আর বলিতেন "আমার ভাসুর-পুত্র জঙ্গল খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়াছেন।" তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হইত বাবা সব দিতেন। প্রতি বৎসর পুজার সময় তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া নিমন্ত্রণের রান্না রান্ধিতেন। এই পতিপুত্র হীনা বিধবার শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ যাত্রাদির ব্যয়ও বাবা দিতেন। একবার তাঁহার দুশ্চিকিৎস্য নেত্ররোগ হইয়াছিল, বাবা নিকটে আনাইয়া চিকিৎসা প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল আনন্দের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ব্রজসুন্দরের এইরূপ স্বভাব ও ব্যবহারের জন্য তাঁহার জীবিত কালে সম্পর্কিত, দূরসম্পর্কিত, পরিচিত, অপরিচিত, নিকট ও দুরান্তর হইতে বহু বিধবা আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করিত—তিনি সকলের ভার বহন করিতেন। তাঁহার বাড়ীটীকে একটী বিধবাশ্রম বলিলেও হইত। সম্ভ্রান্ত ঘরের বিধবাগণও অনেকে মোকদ্দমার জন্য, কেহ বিষয় বিক্রয়ের জন্য, তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেন এবং মাসের পর মাস অথবা বৎসরাবধি তাঁহারই গৃহে বাস করিতেন।

ব্রজসুন্দর বিধবাদিগের প্রতি যে কেবল এই ভাবের সহানুভূতি

প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে। আত্মীয় স্বজনের কবল হইতে বিধবাদিগের প্রাপ্য ধন সম্পত্তি উদ্ধার চেষ্টায় তাঁহার জীবনের অনেক সময় ব্যয়িত হইয়াছে। এজন্য অর্থ সামর্থ্য, এমন কি নিজ স্বাস্থ্যের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। অসমর্থপক্ষে নিজ ব্যয়ে তিনি ইহাদিগের মোকদ্দমা চালাইয়াছেন, তাঁহার জমাখরচের বহিতে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক নিঃসম্বল বিধবাকে তিনি কলিকাতায় বাবু কালীমোহন দাস ও বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় দিগের নিকটও প্রেরণ করিতেন, কেন না তাহা হইলে অধিক অর্থব্যয় হইত না। ইহাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে এইরূপ অনেক বিধবার সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিতেন। ব্রজসুন্দরের জ্যেষ্ঠা কন্যা লেখিকার নিকট কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দারজিলিঙ্গে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"তখন কেহ বিধবার বিষয় কিনিত না কিন্তু বাবা কিনিতেন। তৎপরে মোকদ্দমা করিয়া তাহা দখল করিতেন; আপোষে অতি অল্প স্থলেই কার্য্য হইত। এজন্য ঠাকুরমা বলিতেন "বিরজু, তুমি কি অন্য সম্পত্তি চোখে দেখিতে পাও না, বিধবার ছটাক নটাক সম্পত্তি কিনিয়া কেন এত কষ্ট পাও?" বাবা বলিতেন "কেহ যে বিধবার সম্পত্তি কিনিতে চায় না। ইহাদের সম্পত্তি পরহস্তে থাকে এবং নিজেরা কপর্দ্দক-হীন হইয়া বাস করে। আমি তো ইহা সহ্য করিতে পারি না।" বাবার কাছে কত বিধবাই আসিতেন। বাগবাড়ী, জালাল্‌দী, কাঠালিয়া, কর্ণপাড়া, মত্ত, বেনেজুড়ি, বইট্টা, ডোয়াজানী, আদাজান, সিমুলীয়া প্রভৃতি কত জায়গার, বিক্রমপুরের কত গ্রামের কত বিধবা ঠাকুরাণীই যে আসিতেন এবং সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া লইতেন। তাঁহাদের অনেকের চেহারা মনে আসে কিন্তু নাম স্মরণ হয় না। প্রথমে যে সুন্দরী বালিকার সহিত বাবার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল সেই চন্দ্রমণি চৌধুরাণীও কালক্রমে বিধবা হইয়া সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। দশচিড়ার স্বরূপ ঘোষের দুই পুত্র ছিল—রামদয়াল

ও জগু ঘোষ। রামদয়াল কুচবিহারের মহারাজার নিকট কোনও অপরাধ করায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহাকে কয়েক মুষ্ঠি ধান ও চাউল মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হইত, তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাছিয়া তাহাই খাইতেন। কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কনিষ্ঠ জগু ঘোষ পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। ইহার এক কন্যা শিবমনমোহিনীকে ভাগলপুরের হরিসুন্দর বাবু বিবাহ করেন। এই জগু ঘোষের স্ত্রীর সহিত আমাদের দূর সম্পর্ক ছিল। স্বরূপ ঘোষের স্ত্রী বাবার নিকট বিধবা পুত্রবধুটীকে লইয়া আসেন ও বাবার দ্বারা পপারে (pauper) সম্পত্তির দাবী করিয়া দরখাস্ত দেন এবং বহুদিন আমাদের বাটীতে থাকেন। দরখাস্ত মঞ্জুর হইল বটে কিন্তু এই সময় বাবার মৃত্যু হওয়ায় আর কোনও তদ্বির চলিল না। এবারও কাশীতে জগু ঘোষের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল—কত কথাই বলিলেন। বলিলেন "আমার জন্য তোমার বাবা কত রাত্রি জাগিতেন, কত পরিশ্রম করিতেন—সে রকম লোক কি আর দেখা যায়।"

ব্রজসুন্দরের জ্যেষ্ঠা কন্যা 'স্মরণ নাই' বলেন বটে কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার এত স্মরণ আছে যে, সে সকল কাহিনী শ্রবণ করিলে মনে হয় কেবল বিধবা দিগের সাহায্যকল্পেই যেন ব্রজসুন্দর সমগ্র জীবন খানি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সে সকল কথা লিখিতে গেলে কাহিনী অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এস্থলে কেবল একখানি পত্র উদ্ধৃত করিব।

মহিমাবরেষু—

অনেক দিবস গত হইল আপনার পত্রাদি না পাওয়ায় নিতান্ত চিন্তান্বিত আছি অতএব সত্বরে যাহাতে এই চিন্তানল হৃদয়-আকাশ হইতে অন্তর্হিত হয় তাহাই একমাত্র বাসনা। বিশেষতঃ শুনিতে পাই যে আপনি অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। এক্ষণ কি প্রকার আছেন তাহার কিছুই জানিতে না পারিয়া সেই চিন্তা দ্বিগুনতর প্রজ্বলিত হইয়াছে। আমার সহায় সম্পদ, বলভরসা সকলই আপনি। আপনি গেলে আর কে আছে? আমি শ্রীমতী দিগকে লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে

তীর্থস্থান সমুদয় পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছি। আমাদের কোন সরিক 'টেপারি' নামক মহাল অন্য এক সরিকের নিকট কট দিয়াছিলেন। এইক্ষণ ঐ সম্পত্তি লইয়া অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীমথুরানাথ বর্ম্মনের বাচনিক সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া যেরূপ করা ভাল বিবেচনা করেন তাহা সত্বর লিখিবেন।

তিল্লির এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমার অভাবে যে শ্রীমতীরা এখানে নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিবে এমন কোন সম্ভাবনা নাই অতএব আমার ইচ্ছা যে আমার নামে যে উইল আছে আমি জীবিত থাকা সত্বেই শ্রীমতী দিগকে উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া যাই, কারণ আমি অভাবে সম্পত্তি লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইবে। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে সম্পত্তির দান বিক্রী ইত্যাদি সত্ব আমার নিজের থাকে এবং আমি অভাবে শ্রীমতীরা জীবিত কাল পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী থাকিতে পারে। কিন্তু এইক্ষণ কি প্রকারে তাহা করা যাইতে পারে? সকলই টাকার কায অতএব উপরোক্ত বিষয় যদি আপনার অভিপ্রেত হয় এবং কি প্রকারে তাহার মুসাবিদা করিতে হইবে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

নিঃ শ্রীরাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী
(তিল্লির বাবু জগদানন্দ রায়ের পত্নী)

এই সকল শরণাগত বিধবার সম্পত্তি উদ্ধার করিতে হইলে ব্রজসুন্দরকে যাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইত, তাহাদের সহিত অন্যান্য সূত্রে তাঁহার আত্মীয়তা থাকিলেও এ বিষয়ে তিনি চক্ষুলজ্জার খাতির করিতেন না। নিকটতম আত্মীয়, ঘনিষ্টতম বন্ধুও তাঁহার নিকট বিধবার অনিষ্টকল্পে কিছুমাত্র প্রশ্রয় পাইতেন না।

বহু বিবাহ নিবারণ চেষ্টা।

স্ত্রীজাতির প্রতি ব্রজসুন্দরের সর্ব্বতোমুখীন সহানুভূতি ছিল।

নারী জাতির যে কোন প্রকার দুঃখ দেখিলেই তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। দেশ মধ্যে কৌলিন্য প্রথা বর্ত্তমান থাকাতে সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল ব্রজসুন্দর তাহা যৌবনেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বহুবিবাহে তাঁহার কিরূপ বিরাগ ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হইবেঃ—তাঁহার মাতুলপুত্র সীমুলিয়ার বাবু শ্যামাপ্রসন্ন রায়, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কখনও তাহার মুখদর্শন করেন নাই। ব্রজসুন্দরের অনুপস্থিতিতে তিনি কখনও কখনও তাঁহার জননী কাশীশ্বরীর নিকট আসিতেন। তিনি যখন কুলীন-প্রধান বিক্রমপুর সার্ভে করেন তখন তাঁহার তাম্বুতে সান্ধ্যসম্মিলনে সর্ব্বদা এই সামাজিক কুরীতিটীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

যখন ১৮৫৮ সনে আইন দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণের কথা হয়, তখন দেখা যায় বোর্ড অব রেভেনিউ হইতে ব্রজসুন্দরের নিকট এই বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে Extract from the despatch from the Hon'ble Court of Directors in the Legislative Department প্রেরিত হইয়াছিল এবং এই বিষয়ে তাঁহার মতামত এক মাসের মধ্যে দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন চেষ্টা করেন কুমিল্লা হইতে ব্রজসুন্দরও ইহার নিবারণকল্পে ছোট লাঠের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন এবং ঢাকা হইতেও যাহাতে ঐ প্রকার আবেদন পত্র প্রেরিত হয় তজ্জন্য তাঁহার চিরসুহৃদ অভয়াকুমার দত্ত ও দীননাথ সেনকে পত্র লেখেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিপুস্তকে লিখিতেছেনঃ—

26th march, 1866—Submitted a petition to L G. of Bengal for the abolition of polygamy, from Comilla. Wrote to Obhoy and Dinanath at Dacca to forward similar petitions from there.

আবার ১৮৭৪ সনে অর্থাৎ উপরোক্ত আবেদন পত্র পাঠাইবার ৮ বৎসর পরে গভর্ণর জেনারাল লর্ড নর্থব্রুক যখন ঢাকায় গমন করেন তখন ব্রজসুন্দর রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় দ্বারা চারিহাজার কুলীনের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতি পুস্তকে দেখিতে পাই :—

3rd August, 1874—Laid before Mr: Lyall a petition from Rash Behari Mukherjee with several pamphlets and another petition signed by 4000 *kulins* and others, praying to have a law for the prevention of *kulin* polygamy. They were submitted by the Magistrate to the Commissioner of Dacca on the same day for the purpose of laying them before His Excellency the Viceroy and Governor General who was coming to Dacca.

ব্রজসুন্দর মিত্র ও রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৪।৫৫ সনে ব্রজসুন্দর যখন বিক্রমপুর সার্ভে করেন, তখনই রাসবিহারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কিন্তু তখন রাসবিহারী অল্পবয়স্ক। নিশ্চয়ই রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভিতর এমন কিছু ছিল যাহাতে তিনি ব্রজসুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ব্রজসুন্দরের উদার মত অন্তরে গ্রহণ করেন। রাসবিহারীর অবস্থা নিতান্তই মন্দ ছিল। বহু পরিবারের ভারে তিনি সর্ব্বদাই বিব্রত থাকিতেন। তিনি স্বয়ং ১৪টী রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এমন ব্যক্তি যখন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন তখন ব্রজসুন্দর তাঁহার দ্বারাই পূর্ব্ববঙ্গে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ব্রজসুন্দরের এই বিশ্বাস ছিল তিনি বহু বিবাহের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তাহার যত না মূল্য হইবে, স্বয়ং কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহ-পীড়িত ভুক্তভোগী জন যে কথা বলিবেন তাহার মূল্য

অনেক অধিক হইবে। রাসবিহারীকে যন্ত্র করিয়া ব্রজসুন্দর যে পূর্ব্ব বঙ্গে বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার ডায়েরী ও জমাখরচের খাতা হইতে তাহার কিছু আভাস পাই। ব্রজসুন্দরই পূর্ব্ববঙ্গের প্রাণ ছিলেন। এই দুর্নীতি দেশ হইতে যাহাতে দূর হইয়া যায় তজ্জন্য তিনি চেষ্টাও করিয়া ছিলেন। শুভক্ষণে রাসবিহারীকে পাইয়া আর প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্ম সমাজের নামে কিছু করিলেন না। নিজে পশ্চাতে থাকিয়া অর্থ দিয়া রাসবিহারী দ্বারা কার্য্য করাইতে লাগিলেন। রাসবিহারীর অনেক সঙ্গীত ব্রজসুন্দরের উপদেশে রচিত হইয়াছিল। রাসবিহারীকে সর্ব্বদাই ব্রসুন্দরের বৈঠকখানায় বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। অনেকের ধারণা যে যদিও পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সকল প্রকার সাধু কার্য্যের মূলে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রজসুন্দর কিন্তু কৌলিন্য প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য হিন্দু সমাজের রাসবিহারীই প্রথমে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি ব্রজসুন্দরই রাসবিহারীর শুভকার্য্যের প্রণোদক ছিলেন। আমরা ব্রজসুন্দরের হিসাবের খাতা উলটাইতে গিয়া এই সব দেখিকে পাই যথা ঃ—

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সাং তারপাশা বহু বিবাহ নিবারণ ব্যয়—৫৲

ব্রাহ্মণ কুলীনগণের বহুবিবাহ নিবারণ পক্ষে দরখাস্ত স্বাক্ষর করার জন্য তারপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া যায়— ১০৲

বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে দরখাস্তের মুসাবিদা পাঠাইয়াছেন তাহা যে বিক্রমপুর তারপাশা গ্রামে সাক্ষর জন্য রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাঠান হয় ও তজ্জন্য ফুলস্কেপ কাগজ খরিদ হয় তাহার ব্যয়— ৩৲

বহুবিবাহ নিবারণ জন্য লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের হুজুরে এক দরখাস্ত পাঠান হয় তাহার ডাকমাশুল— ৷৵০

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সাং তারপাশা বহু বিবাহ নিবারণ ব্যয়—৪৲

তারপাশার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়— ২৲

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বাবদে তাঁহার জীবন চরিত নামক
পুস্তক ছাপানের জন্য মারফৎ আনন্দ চন্দ্র সেন—

এই প্রকার কত স্থানে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম হিসাবের খাতায় আছে। ব্রজসুন্দর রাসবিহারীর এক জীবন চরিত লিখাইয়া ছাপান। তাহার কারণ, রাসবিহারী দরিদ্র কেবা তাঁহাকে চিনিবে, তাঁহার জীবন চরিত পাঠ করিলে সকলেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে এবং তাহাদ্বারা কাজ হইবে। রাসবিহারী যখন যেখানে যাইতেন ব্রজসুন্দর তাঁহার নৌকা ভাড়া দিতেন। হিসাবের খাতার এক স্থানে তাঁহার শীতবস্ত্র কিনিবার উল্লেখও দেখি। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, রাসবিহারীকে ব্রজসুন্দর কত স্নেহ করিতেন, কিভাবে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিতেন, এবং সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কত ভাবিতেন।

সালিসীতে গৃহবিবাদ মীমাংসা।

আজকাল আর সালিসীতে গৃহ বিবাদ মীমাংসা হয় না। এ সব সেকালের কথা হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর সালিসীর দিন নয়, মাম্‌লা মোকদ্দমার দিন। বিষয় আশয়, ধনসম্পত্তি লইয়া গৃহে বিবাদ হইলে আর সালিসীতে মীমাংসা বড় হয় না, মাম্‌লা মোকদ্দমা করিয়া বড় বড় ধনীকেও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। ব্রজসুন্দরের উপর জনসাধারণের এতদূর বিশ্বাস ছিল, যে কত ধনী ও জমীদারের গৃহ-বিবাদে তিনি সালিসীর কাজ করিয়া অর্থশোষিণী মোকদ্দমার হস্ত হইতে উভয় পক্ষকে রক্ষা করিয়াছেন। ব্রজসুন্দর যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন, তাহাই উভয় পক্ষের শিরোধার্য্য হইত। এইরূপে রোয়াইল, পাইনা, কাগমারি (সন্তোষ) প্রভৃতি জমিদারগৃহে ব্রজসুন্দর সালিসীতে গৃহবিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন। এই রোয়াইলের জমিদার রাজমোহন রায়ই প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সময় ব্রজসুন্দরের উপর খড়গহস্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কত নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। সালিসীতে গৃহবিবাদ মীমাংসা করিতে যাইয়া ব্রজসুন্দর বিধবাদিগের

ন্যায্য অধিকারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং সম্পত্তির অধিকার দিয়া কিম্বা মাঁসহারার বন্দোবস্ত করিয়া তবে নিরস্ত হইতেন। বানিয়াজুড়ীর ঘোষ পরিবারের গৃহবিবাদ মীমাংসাই তাঁহার শেষ সালিসী। ইহাঁরা পুরুষানুক্রমে কুচবিহারের রাজার দেওয়ান ছিলেন, এবং অতুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই পরিবারের দীননাথ ঘোষ ব্রজসুন্দরের মাসতুতো ভ্রাতা ছিলেন। তিনিই বাল্যকালে ব্রজসুন্দরকে লালন পালন করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই ঘোষ পরিবারে যখন দারুণ গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল তখন দীননাথ ঘোষের দুই বিধবা ভ্রাতৃবধু ব্রজসুন্দরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহুদিন তাঁহার গৃহেই ছিলেন। ব্রজসুন্দর বহুদিন দুরন্ত শ্রম করিয়া এই বিবাদ মীমাংসা করেন এবং প্রত্যেক সরিকের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অনেকগুলি সরিক ছিলেন, কেহ কোন প্রস্তাবে সম্মত হন, কেহ হন না। ব্রজসুন্দর অস্নাত অনাহারী থাকিয়া সকলকে খোষামোদ করিয়া, কাহারও পায়ে পড়িয়া, কাহারও হাতে ধরিয়া অতি কষ্টে এই ভয়ঙ্কর গৃহবিবাদ শান্ত করেন। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া অস্থির, বিধবাদের হইয়া বলিবার কেহ ছিল না। তাঁহারা কুলবধু, ভাসুরের সম্মুখে কোন কথা বলিতে পারেন না—পর্দ্দার অন্তরালে নীরবে বসিয়া থাকিতেন। ব্রজসুন্দর সর্ব্বদাই বিধবাদের ন্যায্য অধিকার বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহা দেখিয়া অন্য সরিকরা ক্রোধে অন্ধ হইয়া যাইতেন। দীননাথ ঘোষের প্রচণ্ড ক্রোধের উদয় হইত, তিনি সজোরে সম্মুখস্থিত বাক্স চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন "তা বটেইত, আমার দিকে না দেখিয়া বিধবাদের জন্য তুমিইত বলিবে।" (অর্থাৎ আমি তোমার দাদা তোমাকে মানুষ করিয়াছি, আর যাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নাই তাহাদের স্বার্থ দেখ, আমার দেখ না)। বিপুলকায় দীননাথের তর্জ্জন গর্জ্জন কটুক্তি শুনিয়া অন্য লোকেরা কম্পান্বিত হইত। ব্রজসুন্দর মর্ম্মাহত হইয়া কাতর স্বরে বলিতেন "দাদা, আপনারা নিজের নিজের কথা বল্‌ছেন, ওঁদের

হইয়া কেহ বলিবার নাই, আমি উহাদিগের দিকে না দেখিলে কে দেখিবে? কিন্তু আমি কি আপনার উপর অন্যায় করতে পারি?” এই সালিসীতে ব্রজসুন্দরের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইল। অনাহারে অনিদ্রায় তুমুল সংগ্রাম করিয়া দেহপাত হইল, কঠিন ব্যাধির সূত্রপাত হইল এবং তাহাতেই তাঁহার জীবনের শেষ হইল। ব্রজসুন্দরের জননী সর্ব্বদাই ক্ষোভ করিয়া বলিতেন “বেনেজুড়ীরাই তোকে মানুষ করিল আর তারাই তোকে শেষ করিল।” বস্তুতঃ সেই প্রকারই ঘটিল। ব্রজসুন্দর কোমল প্রাণ মিষ্টভাষী ছিলেন বটে কিন্তু তিলমাত্র অন্যায় অবিচারের প্রশ্রয় জীবনে এক দিনের জন্যও দিতে পারেন নাই।

ঢাকায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র।

ব্রজসুন্দর ধর্ম্ম, শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া ছিলেন এবং রামকুমার বসু, ভগবানচন্দ্র বসু (ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা) প্রভৃতির সহায়তায় ঢাকায় একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন। কোন্ সনে ইহা স্থাপিত হয় ঠিক বলা যায় না, তবে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বেই ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সে যাহা হউক আরমানিটোলার বাড়ীতে বহুকাল এই যন্ত্রটীর কার্য্যালয় ছিল। এই যন্ত্র হইতেই “ঢাকাপ্রকাশ” নামে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেকালে “ঢাকাপ্রকাশ” পত্রিকা ঢাকায় এক নবযুগের সূত্রপাত করে। ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার কার্য্যে “ঢাকা প্রকাশ” বিশেষ ভাবে ব্রতী ছিল। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন; পরে বাবু গোবিন্দ প্রসাদ রায় ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। ব্রজসুন্দর এবং তাঁহার বন্ধুগণ যখন এই মুদ্রাযন্ত্রটী ক্রয় করেন, তখন দেশের লোকেরা তাঁহাদিগকে অনেক নিন্দা করিয়াছিল। ভদ্রলোকের সন্তান হইয়া ইহাঁরা এমন দুষ্কার্য্য করিলেন বলিয়া বড়ই লাঞ্ছনা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল!

নবাব আবদুলগণি এবং এন, পি পোগোজ ইহার পরে ঢাকায় একটী ইংরাজি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন; তাহা হইতে Dacca News পত্রিকা বাহির হইত। প্রিন্‌সিপ্যাল হ্যারিস সাহেব এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য।

ব্রজসুন্দর বুঝিয়াছিলেন যে কেবল চাকুরী দ্বারা লোকের অভাব দূর হইবে না, দেশেও ধনাগম হইবে না। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ বৃদ্ধি করেন। নিজের কনিষ্ঠ সহোদর দুর্গাদাস মিত্রকে কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্গাদাস কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ব্যবসা ভদ্রলোকের কার্য্য নয় ইহা তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু ব্রজসুন্দর নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না, সর্ব্বদাই লোকের মনে ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রেষ্টতা মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার জীবিত কালে দেশ মধ্যে চা পান করিবার প্রথা তত প্রচলিত হয় নাই, কেবল দুই চারিজন বড় লোকেই চা খাইতেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই চায়ের ব্যবসায়ে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে এবং ঢাকা জেলার বনমধুপুর অঞ্চলের ভূমি চা বৃক্ষের পক্ষে অনুকুল মনে করিয়া, সম্ভবতঃ ১৮৬১।৬২ সনে নিজ জমিদারীর মধ্যে চা বাগান করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যকালে আব্ হাওয়া অনুকুল না থাকায় তাঁহার পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছিল।

লোন অফিস স্থাপন।

১৮৬৬ সনে থাকবস্তা জরীপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে ব্রজসুন্দর দেখিয়াছিলেন যে সামান্য দেনার দায়ে সুদখোর নিষ্ঠুর মহাজনেরা অধমর্ণ দিগের যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করে এবং একেবারে নিঃস্ব করিয়া ফেলে। এই জন্য তিনি ১৮৬৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কুমিল্লায় একটী

লোন অফিস স্থাপন করেন। ইহাতে অল্প সুদে দরিদ্র প্রজা দিগকে প্রয়োজন মত ঋণ দেওয়া হইত। ঢাকায় থাকিয়াও ব্রজসুন্দর এই লোন আফিসের কার্য্যের সাহায়তা করিতেন। তাঁহার জমাখরচের বহিতে "কুমিল্লা লোন অফিস" সম্বন্ধে স্থানে স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহাও দেখা যায় যে তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদুর সাধ্য দেশের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন।

সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বানুরাগ।

ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় বাবু অমৃতলাল গুপ্ত লিখিয়াছেন "মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রপ্রসাদ মিত্র বি এল, তাঁহার পিতার পুস্তকালয়ের অনেকগুলি গ্রস্থ ঢাকা রামমোহন লাইব্রেরীতে দান করিয়াছেন। ঐ পুস্তকগুলি দেখিলেই মিত্র মহাশয়ের জ্ঞানানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যও তাঁহার চেষ্টা ছিল। তিনি তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকায় বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ" শীর্ষক একখানি বাঙ্গালা পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি ১৭৯৬ শকে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় বাঙ্গলাভাষায় তাঁহার কিরূপ দখল ছিল।" বাঙ্গালা ভাষায় কেহ কোনও পুস্তক লিখিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে প্রায় কেহই বিমুখ হইতেন না, তাহার প্রমাণ আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই। তাঁহার জমাখরচের বহিতে ইহার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য ব্রজসুন্দরের যেমন যত্ন ছিল তেমনই দেশের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ বিষয়েও তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। যাহা কিছু পুরাতন তাহার প্রতিই তাঁহার অত্যধিক যত্ন দেখা যাইত। পূর্ব্বপুরুষদিগের আমলের অতি পুরাতন কাগজপত্র অন্যের নিকট যাহার কোন মূল্যই নাই, তাহাও তিনি কত যত্নে রক্ষা করিতেন, তাহাতে কত তালি লাগাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতেন। সেই সকল

কাগজ পত্রের মধ্যে ২১২ বৎসরের পূর্ব্বেরও দলিল দেখিতে পাই। তখনও ইংরেজ এদেশে আসেন নাই। ব্রজসুন্দর কর্ত্তৃক বহুযত্নে রক্ষিত দলিল গুলি হইতে স্পষ্ট দেখা যায় পূর্ব্বকালে বিনা ষ্ট্যাম্পে সাদা কাগজে কেমন দলিলাদি প্রস্তুত হইত। তাহার পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাদা মোহর অঙ্কিত কাগজের প্রচলন হইয়াছিল। পরে ক্রমে রঙ্গীন মোহরের প্রচলন হইয়াছে। অতীতের প্রতি তাঁহার এতই অনুরাগ ছিল যে পিতামহ, প্রপিতমহের অতি সামান্য দ্রব্যও মহামূল্য জ্ঞানে রক্ষা করিতেন। অতীতের প্রতি এইরূপ অনুরাগ ছিল বলিয়াই গুরুতর শারীরিক ও মানসিক শ্রমসাধ্য সার্ভে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি পুরাতন মঠ, দেবমন্দির, মসজিদ, পীরের সমাধিস্থান, পুরাতন রাজধানীর চিহ্ন, প্রস্তর ও তাম্রফলক, মুদ্রা প্রভৃতির তত্ত্বানুসন্ধান ও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। Beveridge, Wise, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সে সময়ের পুরাতত্ত্ববিদ্ দিগের সহিত তাঁহার বন্ধুতাও ইহার কারণ। নানা জাতীয় পুরাতন মুদ্রা সংগ্রহ করা ব্রজসুন্দরের এক রোগবিশেষ ছিল। এই শ্রেণীর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এখনও তাঁহার গৃহে রহিয়াছে।

কোন জিনিষের সহিত ঐতিহাসিক সম্বন্ধ দেখিলেই তিনি তাহার প্রতি যে মনযোগ প্রদর্শন করিতেন তাঁহার ডায়েরী পড়িলে বেশ জানা যায়। একস্থানে আছে ঃ—

The grand palaces and temples of Raja Rajballav Sen of Rajnagar were washed away by the floods of the river *Kirtinasha* between the years 1276 and 1279.

অন্যস্থানে দেখিতে পাই ঃ—

The Sahas of Baliati assumed the title of Ray Chowdhury about 30 years ago and the Kundus of Bhagyacool about 20 years ago, while Jiban Babu's family assumed that title in 1806 after they purchased

Perganah Mukimabad. The Pauls of Louhajung got the title of Paul Chowdhury from the Mahomedan rulers. They belong to a very old family.

মাননীয় রিজ্‌লী সাহেবের Tribes and Castes of Bengal নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলনে ব্রজসুন্দর রিজ্‌লী সাহেবকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ" নামক উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি উপকরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজসুন্দরের জীবনকাল পর্য্যন্ত নানা বিবরণ ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যশাসন প্রণালী, শিল্প, বাণিজ্য, সামাজিকবিধান, বাঙ্গালী সৈন্যের বীরত্ব কাহিনী, বার ভুঁইঞার পরিচয়, দুর্গ, গড়, কামান প্রভৃতি সকল বিষয়ের অবতারণাই ইহাতে আছে। সংগ্রহগুলি যেমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তেমনি তাহাতে পারিপাট্যও আছে। বাঙ্গলার প্রাদেশিক ইতিহাস সংগৃহীত হইলেই বঙ্গের সম্পূর্ণ ইতিহাস হওয়া সম্ভব, বোধ হয় ইহা মনে করিয়াই ব্রজসুন্দর চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল নিজের বংশের ইতিহাস লিখিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। যাহাতে প্রত্যেক প্রদেশের ইতিহাস লিখিত হয়, সেদিকে তাঁহার চেষ্টা ছিল। তিনি সুসঙ্গ দুর্গাপুরের সিংহবংশীয়দিগের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু উপকরণ সংগ্রহ করিতে করিতেই পরলোক গমন করিলেন।

অনেক সময় অনেক জটিল ঐতিহাসিক প্রশ্ন মীমাংসার জন্য ব্রজসুন্দরের নিকট প্রেরিত হইত এবং তিনি আনন্দের সহিত প্রশ্ন সমূহের সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিতেন। নিম্নে বিখ্যাত Dr. Wise সাহেবের একখানি পত্র দেওয়া গেল।—

Bostellen.
May 11th, 1875.

My dear Sir,

I have received your letter of the 9th April and its enclosures. I was very glad to hear that you are

quite well, but was disappointed that you had not taken your pension. In my opinion, you ought to do so. You have reached the highest grade you can; you have served Government long and faithfully; and the only thing you have to look forward to is retirement surrounded by friends. You will be happy and be free from the anxiety and responsibilities that official life necessarily entails. Besides, if you take exercise in the open air and amuse yourself with literary pursuits, you will live longer than if you continue on the bench. Mr. Lyall will tell you the same; and if you consult Mr. Weatherall he will confirm all that I write.

I have sent to the latter a list of questions about Kayasthas which I hope you will answer. Mr. Thomas will always address and post any letter you may wish to send to me.

I want to know if any other Kayasthas, except the Bangajas, are to be found in Eastern Bengal. If there are, please tell me what are their professions, padabis and gotras and whether or not, they intermarry with the Bangajas. As regards the Bhuyas, I fear your list is incorrect. I find in the work of a Spanish missionary who was in India in 1628—1641, that Bengal was ruled by twelve princes, "Baiones" he calls them, and that their provinces were—

1. Bengala.
2. Orissa.
3. Jagannath.
4. Chandikan.
5. Medinipur.
6. Dacca.
7. Hugli.
8. Catrabo.
9. Solimavas.
10. Bulna.
11. Bacala.
12. Rajamol.

I do not believe that these names are correct; but a later writer mentions that only three Bhuyas were Hindus, namely, those of Chandican, Siripur and Bakla, while the remaining nine were Mahomedans. Unfortunately he does not give the names of the nine. He goes on to say that "Masandolin" or "Macsudalin" was the most powerful. I leave you and the Mir Sahib to interpret for me the meaning and orthography of that title.

Strange that none of the Mussalman historians mention them. These twelve rulers are mentioned in the works, published as late as A. D. 1680.

Before leaving Calcutta, I mentioned to Mr. Blochman that probably Rajah Kangs Narayan of Tahirpur, the reformer of Barendra Brahmins was one of the Bhuyas. The question to settle, however, is when he lived. I have an idea that he might be the Rajah Kangs who ruled Bengal in the 14th century and whose son became a Mahomedan with the title of Jalaluddin. In Stewart's History, he is called "Zaminder of Bhatouriah," which is the name of a perganah in Rajshahi. Could you not ascertain from the present Rajah whether they have a history of their family? If they have, you could amuse yourself in publishing it along with that of Susang. It is only by obtaining access to old family records that we are ever likely to be able to add to our knowledge of the early history of Bengal.

Give my salam to the Mir. Sahib and to the Khajeh Sahib.

Yours sincerely
(Sd.) James Wise.

ঢাকায় অবস্থানকালে মিঃ ওয়াইজ ঐরূপ আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও উদ্ধৃত করা গেল।

Dacca.

My dear Sir,

Can you give any explanation of the following ? On a slab found at Sunnargaon by General Cunningham and myself, this was written, "Khuda Khan, Governor of the land of Tipprah and Vazir of the district Igtima (Muzzamabad.)"

In Calcutta, they are of opinion that at the period referred to (A. D. 1513), Sunnurgaon had been washed away by the Megna and that the seat of Government was removed to Muzzamabad. Wherever that was, Mr. Blochman asserts that Muzzamabad and Muazzampur are one and the same place. Do you know of any place with any of these names in the district of Tipperah or Sylhet ?

I intend visiting Muazzampur, north of Nanjall on the 16th inst, and hope to be able to pick up some traditions about its past history.

Yours sincerely

11—2—73 (Sd.) James Wise.

ঢাকায় মৃত স্বদেশ হিতৈষীর প্রতি প্রথম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

হরিশ্চন্দ্র মেমোরিয়ালের সাহায্য কল্পে চাঁদা সংগ্রহ ঃ—ব্রজসুন্দরের সম্মুখে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, তাহা সুসম্পন্ন হইতে আর বিলম্ব হইত না। ১৮৬১ সনের জুন মাসে "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। হরিশ্চন্দ্র স্বীয় বাসস্থান ভবানীপুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং এই সমাজের উৎসাহী সভ্য ও সম্পাদক ছিলেন। তিনিই

সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারার্থ ইংরাজীতে বক্তৃতা দিবার প্রথা প্রচলিত করেন।* ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যরূপে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ দেশহিতকর বিষয়ে একজন প্রধান পরামর্শদাতা ও সহায় ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের লেখনী লর্ড ড্যালহাউসীর অযোধ্যাধিকারের সময় অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনিই আবার নিজ লেখনী চালনা করিয়া লর্ড ক্যানিংএর পৃষ্ঠপোষকরূপে দেশে শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের নির্ভীক লেখনী একদিন নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণার্থে প্রতিবাদের তুমুল ঝড় সৃষ্টি করিয়াছিল। নীলকর অত্যাচার নিবারণ হরিশ্চন্দ্রের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। এই কার্য্যে তিনি দেহ মন অর্থ সামর্থ্য সকলই নিয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিতে পাই, ব্রজসুন্দরও নীলকরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে পারি নাই।

হরিশ্চন্দ্রের পরলোক গমনের সংবাদ ঢাকায় পৌঁছিলে ব্রজসুন্দর যে ঢাকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, অতি জীর্ণ এবং পুরাতন একখানি খাতায় উহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঢাকার শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি নিম্নলিখিত আবেদন পত্র (appeal) প্রেরণ করিয়াছিলেন :—

To

The Educated Bengalee Community of Dacca.

Gentlmen,

The painful intelligence of the death of our lamented country-man Babu Harishchandra Mukherjee, the late Editor of the Hindoo Patriot, has reached us not long ago. Every heart must have been impressed with the magnitude of the calamity that has befallen our nation. In consequence of the death of a patriot,

* রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ।

at a time when his assistance was most necessary, and who for a long time successfully fought the battle of constitutionalism and secured the rights of our countrymen from all aggressions on the part of foreigners, every heart must feel extreme regret at the loss of such a man, and every heart must be inspired with the gratitude that is justly due to him. While living, Babu Harishchandra Mukherjee devoted his whole energy, his fortune, his everything for the sake of promoting our cause ; and while dead, it is our duty to perpetuate his name and the memory of the very eminent services he has done to the country.

For this purpose, the members of the Hindu Society in Calcutta have held a meeting and appointed a Committee to take measures for raising necessary funds from amongst themselves. It is no less imperative on us here to contribute to this fund to the extent of our ability.

This book is therefore circulated with the view of raising a sum here and with the hope that every one will subscribe liberally to it. The sum raised will be sent to the Calcutta Committee for being appropriated to the wished-for purpose.

ব্রজসুন্দর ঢাকা হইতে কত টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন আমরা উহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি নাই।

তাঁহার ডায়েরীর একস্থলে লিখিত আছে :—

"The natives of Bengal presented an address to Sir J. P. Grant, Lieutenant Governor of Bengal, in connection with his impartiality on the Indigo question.

ঢাকা কলেজে ডনেলী মেডেল প্রদান।

ক্ষমা সহিষ্ণুতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে কৃতজ্ঞতা ব্রজসুন্দরের চরিত্রের এক বিশেষত্ব ছিল। তিনি কাহারও নিকট সামান্য উপকার পাইলে জীবনে তাহা ভুলিতেন না। পারিবারিক উপাসনার সময় কন্যাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতেন—"বিন্দুমাত্র উপকার পাইলে তাহাকে সিন্ধু প্রমাণ মনে করিয়া তাহার প্রত্যুপকার করিতে চেষ্টা করিবে। যদি কখনও কাহারও উপকার করিতে পার, পরের নিকটে তাহা কখনও প্রকাশ করিও না। ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে, ঈশ্বর তোমাদিগের সহায় হইবেন। যদি ৫০ বৎসর জীবিত থাক এবং তাহার মধ্যে ১০ বৎসর মাত্র ভাল কায কর, তবে তোমাদের জীবনের ৪০ বৎসরই ঈশ্বরের নিকট বাদ যাইবে, ঐ ১০ বৎসর মাত্র ভগবানের নিকট গ্রাহ্য হইবে।" বাস্তবিক তিনি যাহা উপদেশ দিতেন নিজ জীবনেও তদনুসারে কার্য্য করিতেন।

ব্রজসুন্দর যখন আবকারী কমিশনারের অফিসে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, তখন কমিশনার Mr. A. F. Donelly পরলোক গমন করেন। এই সদাশয় ইংরেজই ব্রজসুন্দরের প্রথম জীবনে তাঁহার চরিত্রে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিক ডনেলী সাহেব অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং এদেশীয়দিগের অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ব্রজসুন্দর তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসার ঋণ কখনই বিস্মৃত হন নাই। ডনেলী সাহেবের মৃত্যুর পর এই সহৃদয় উপকারী বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নিজ তহবিল হইতে এবং চাঁদা দ্বারা, পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য ঢাকা কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন। অদ্যাবধি ঢাকা কলেজের এফ্, এ, পরীক্ষায় ইতিহাসে কৃতিত্বের জন্য উক্ত টাকার আয় হইতে প্রতিবৎসর একটী মেডেল দেওয়া হইয়া থাকে।

এই উপলক্ষে ১৮৫৩ সনে মিসেস্ ডনেলী এডিনবারা হইতে ব্রজসুন্দরকে যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

Edinburgh.
Scotland.
July 26th, 1853.

Sir,

I have had the extreme gratification of receiving your communication and enclosure of the 23rd February, in which you inform me of the grateful and truly gratifying memorial to my lamented and beloved husband by the officers of Abkari who served under him.

I am quite unable to express all I feel on this occasion. Such sentiments are ever too deep for words. I can only beg of you to accept for yourself and each of the subscribers my heart-felt thanks for this valuable testimony of your respect and affection for him, evincing, as it does, so long after his lamented decease, your sincere and lasting gratitude and is as equally honourable to yourselves as to his dear memory.

Mr. Watson, so many years Magistrate of your great city of Dacca, to whom I sent these papers for perusal and under whom my lamented husband commenced his Indian career at Dacca writes in reply as follows :—

"Nothing could be more gratifying to you and all your dear husband's old friends than such a testimonial of his worth and of the respect in which he was held by the natives of India as well as by all who knew him. I know no one for whom I had a more sincere regard.

And excellent Dr. Wise (your late Principal of the College) has been able to mention this gratifying testimonial that you have offered to my husband's memory, in his report before the Houses of Parliament conducted by Sir Charles Trevelyan. All these proceedings will be published and, if not too late, your letter to me and the papers enclosed, which will, I sincerely trust and hope, in the present movement in favour of native encouragement and promotion, be of service to your cause and make this kind and grateful acknowledgement of my beloved husband's services in your behalf, return "tenfold unto your own bosoms", powerfully demonstrating, as it does, how capable the native character is, of appreciating the sincere exertions for their welfare.

I will only add, I should ever have personal and affectionate remembrance of India, specially of Dacca, but now that feeling has become one of imperative duty and obligation, since the proof you have given me, of your respectful devotion to the memory of my beloved and ever lamented husband.

I again beg of you to accept for yourself and present for me to all who are subscribers to this testimonial, my best wishes for their health, happiness and rapid promotion and long life to enjoy these advantages and believe in the sincere interest and good will of your

Obedient and grateful Servant
(Sd.) Margaret Donelly.

P. S. Should Nursing Chaprasi be still in the office, tell him about me if you please. I hope he is well and all his family. If I could serve him in any

way, I should be happy to do so; he attended my dear husband so faithfully in his illness.

বাল্যকালে মাসীমা ও তাঁহার পুত্র দীননাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট যে উপকার পাইয়াছিলেন তজ্জন্য ব্রজসুন্দর আজীবন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিলেন। সে সময়ে ঢাকায় কোন স্কুল ছিল না। ব্রজসুন্দর বাড়ীতে থাকিলে পাছে অপরাপর বালকদিগের সঙ্গে মিশিয়া দুষ্টামি করেন, এইজন্য দীননাথ ঘোষ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কাছারী লইয়া যাইতেন। ইহার জন্যই বা ব্রজসুন্দর তাঁহার নিকট কত কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি কত সময় বলিতেন, "আমার পিঠের চামড়া দিয়া বড়দাদার পায়ের জুতা তৈয়ার করিয়া দিলেও আমি তাঁহার ঋণ শোধ করিতে পারিব না।" ব্যবহারেও তদ্রূপই দেখাইতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য দীননাথ ব্রজসুন্দরকে কত নির্যাতন করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতেন না। কিন্তু তিনি সকল নির্যাতন অম্লানবদনে সহ্য করিতেন; বরং কোন প্রকারে দীননাথের তুষ্টিসাধন বা উপকার করিতে পারিলে তজ্জন্য নিজকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। ব্রজসুন্দরের মাসীমা তাঁহাকে শৈশবে মাতুলালয় হইতে আনিয়া নিজের নিকটে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার প্রতি তিনি যে আজীবন কিরূপ কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ করিতেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। মাসীমার ধন ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না; তিনি ধনীর পত্নী ও ধনীর জননী; আর ব্রজসুন্দর কতইবা উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু আমরা ব্রজসুন্দরের জমাখরচের বহিতে মাসীমাতা ঠাকুরাণীকে "প্রণামী" পাঠাইবার পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাই। লিখিবার ভঙ্গীই বা কি সুন্দর। "শ্রীযুক্তেশ্বরী মাসীমাতা ঠাকুরাণীর প্রণামী কাশীধাম—১০০ টাকা।" ইত্যাদি। স্বীয় জননীকে নিজ হাতখরচের জন্য মাসে মাসে যে টাকা দিতেন তাহাও ঐরূপ ভাবে লেখাইতেন।

ব্রজসুন্দর বাল্যকালে যখন ঢাকায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন তখন ছুটীর সময় গহনার নৌকায় কর্ণপাড়ায় যাইতেন। নৌকা কর্ণপাড়ার ঘাটে

পেঁাছিতে রাত্রি হইয়া যাইত এবং তাঁহাদিগের দুই ভ্রাতাকে নিতান্ত অল্পবয়স্ক দেখিয়া নৌকার মাঝি তাঁহাদিগকে বাড়ী পর্য্যন্ত পেঁাছাইয়া দিয়া আসিত। উত্তরকালে পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও ব্রজসুন্দর এই শৈশব স্মৃতি ভুলিয়া যান নাই। প্রতিবৎসর পূজা উপলক্ষে কাপড়ের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার সময় ঘেতু মাঝির নাম তিনি কখনও ভুলিতেন না। তাঁহার উপরও ঘেতু চিরকাল নানা আব্দার করিত এবং তিনিও সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা পূর্ণ করিতেন।

কলিকাতায় অধ্যয়নকালে দুঃখ দুর্দ্দশার দিনে ব্রজসুন্দর যাহার নিকট যে উপকারটুকু পাইয়াছিলেন উত্তরকালে তাহাদিগের সকলকেই কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেন এবং সকলের সহিতই যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে পারিলে ব্রজসুন্দর অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। এমন কি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গিয়া যাঁহাদের নিকট সহানুভূতি বা একটু আদর যত্ন পাইয়াছিলেন, ডায়েরীতে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ঢাকায় পানীয় জলের কল স্থাপনে ব্রজসুন্দরের হস্ত।—স্বাস্থ্যই যে দেশের একটা বড় রকম মূলধন এ কথাটা সম্প্রতি এ দেশে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু ব্রজসুন্দর যখন দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন এ সম্বন্ধে বড় কেহ চিন্তা করিতেন না। তখনও দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য এখনকার মত হীন হয় নাই। তবুও তিনি কর্ম্মোপলক্ষে যখন যে গ্রামে যাইতেন, স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে সেই গ্রামবাসীদিগকে উপদেশ দিতে কখনও ভুলিতেন না। নিজ-গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়েও তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। গ্রামের জঙ্গলাদি পরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর ডোবা ভরাট, রাস্তা প্রস্তুত, পথপার্শ্বে ছায়াযুক্ত বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি কার্য্যে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা জেলার কোন কোনও বদ্ধ খালের পঙ্কোদ্ধারেও তাঁহার হস্ত দেখা যায়।

১৮৭৪ সনে নবাব আবদুল গনি নবাব উপাধি প্রাপ্ত হওয়া উপলক্ষে ঢাকা সহরের উন্নতির জন্য একলক্ষ টাকা দান করিতে ইচ্ছুক হন। ঐ টাকা দ্বারা ঢাকায় জলের কল স্থাপিত হইবে কি বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় রাজপথ সুশোভিত করা হইবে, ইহা লইয়া কমিটিতে মহা তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। দূরদর্শী ব্রজসুন্দর জলের কল স্থাপনের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য আলোকের প্রস্তাবে মত দিয়াছিলেন; কেন না, এই আনন্দের ব্যাপারে আলোকেই অধিক আনন্দ প্রকাশ পায়। অবশেষে, ব্রজসুন্দর বাল্যবন্ধু আবদুল গনিকে এই অর্থ দ্বারা সহরবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারণের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন এবং আবদুল গনি বন্ধুর অনুরোধই রক্ষা করিলেন।

বাস্তবিক অপরিষ্কৃত জলপান করায় তখন সহরে প্রতিবৎসর দুইবার—একবার ফাল্গুন চৈত্র মাসে ব্রহ্মপুত্র স্নানের পর, আর একবার বর্ষাকালে—ভীষণ কলেরা রোগ দেখা দিত। তখন মনে হইত ঢাকা সহর যেন জনশূন্য হইয়া যাইবে। বুড়ীগঙ্গার জল তখন অপেয় হইয়া উঠিত। ব্রজসুন্দর নৌকা প্রেরণ করিয়া মেঘনা হইতে পানীয় জল আনয়ন করিতেন। সম্ভবতঃ সাহেব সুবা এবং পদস্থ বাঙ্গালীরাও তাহাই করিতেন। কিন্তু লোকে সাধারণত ঐ অপরিষ্কৃত জলই পান করিত। যে দিন ঢাকায় জলের কলের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, সেদিন ঢাকাবাসীগণের পক্ষে কি আনন্দের দিন গিয়াছে।

১৮৭৫ সনের ৫ই অগষ্ট লর্ড নর্থব্রুক ঢাকায় গমন করেন। গভর্ণর জেনারালদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ববঙ্গে পদার্পণ করেন এবং ইনিই জলের কলের ভিত্তি স্থাপন করেন। ব্রজসুন্দর এই সময়ে পীড়িত ছিলেন, তথাপি তিনি এই আনন্দোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

তাঁহার ডায়েরীতে দেখিতে পাই—

5th August, 1874.—His Excellency the Viceroy and Governor General of India, Lord North brook

arrived at Dacca and landed at Sadarghat at 5-30 P. M., accompanied by His Honour the Lieutenant Governor of Bengal. His Excellency drove to the Mitford Hospital, the Lalbagh Fort, and the old Cantonment. At this latter place, an elephant procession was exhibited.

Syed Golam and I was present at the time.

6th August.—His Excellency visited the College, the Pogose School, the Jagannath School, the Girls' School, the Madrassa, the Normal School and the Collectorate. He came into my Court room accompanied by his Secretary Mr, Bernard, the Commissioner Mr. Cockerell and the Collector Mr. D. R. Lyall.

His Excellency asked me several questions regarding the operation of the Road Cess Act.

At 4 P. M., His Excellency held a *levee* on board the Rhotus, where I was invited. At 6 P. M., he went to Chandney Ghat, accompanied by His Honour the L. G. and his Secretaries and others and laid the foundation stone of the Dacca Water-works. At 10 P. M., Khajeh Abdul Gani, entertained His Excellency in his house. I attended both these functions.

ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ইংরাজিতে অধ্যাপনা প্রচলনের জন্য চেষ্টা।—ঢাকা মেডিকেল স্কুলে তখন বাঙ্গলাভাষায় অধ্যাপনা হইত। ব্রজসুন্দর একদিন ঐ স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখেন যে অধ্যাপনা কার্য্য বাঙ্গলায় ভাল হইতেছে না, ইংরাজিতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ১৮৭৪ সনে ছোটলাট যখন ঢাকায় গমন করেন তখন তিনি ইহার জন্য তাঁহার নিকট একখানি দরখাস্ত দেন। আমরা শুনিয়াছি এই দরখাস্তের ফলে মেডিকেল স্কুলে ইংরাজি ভাষায় অধ্যাপনার নিয়ম হইয়াছিল।

তাঁহার ডায়েরীতে দেখিতে পাই:—25th April, 1874.—Submitted a petition to H. H. the L. G. of Bengal for introducing English teaching in the local Medical School.

এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বুড়ীগঙ্গার তীরে মিট্‌ফোর্ড হাঁসপাতালের বর্ত্তমান সুরম্য বাটী যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও অনেকটা তাঁহারই চেষ্টায়। যখন পুরাতন হাঁসপাতালের পরিসর বৃদ্ধির প্রস্তাব হয় তখন কমিটির মেম্বরদিগের মধ্যে অনেকে সহরের অভ্যন্তরে শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রায় মহাশয়ের বর্ত্তমান বাড়ীর সম্মুখস্থ ভূমিতে নূতন বাটী নির্ম্মাণের পক্ষে ছিলেন; কিন্তু ব্রজসুন্দর নদীতীরের নির্ম্মল বায়ু পরিত্যাগ করিয়া অপরস্থানে বাটী নির্ম্মাণ বিষয়ে একেবারেই সম্মত ছিলেন না। অনেক বাকবিতণ্ডার পরে নদীতীরেই নূতন ভূমি ক্রয় করিয়া বর্ত্তমান হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইল। এই জমির উপর মুসলমান-দিগের বসতি এবং অনেক দোকান ঘর ছিল। সে সমস্ত উঠাইয়া দেও-য়াতে ব্রজসুন্দরকে অনেক গালি খাইতে হইয়াছিল। জীবনে যিনি দরিদ্রের আশীর্ব্বাদই পাইয়াছিলেন এই ঘটনায় তাঁহাকে গালি খাইতে হইল।

এইরূপে দেখা যায়, যাহা কিছু দেশের কল্যাণকর তাহাই ব্রজসুন্দরের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এবং সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যের সহিত যোগরক্ষা করাই ব্রজসুন্দরের জীবনের এক মহা ব্রত ছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শেষ জীবন।

১৮৭০—৭৫

ঢাকায় আগমন—পত্নী বিয়োগ—দ্বিতীয়বার বিবাহ ও মৃত্যু।

১৮৭০ সনে ব্রজসুন্দর ২৪ পরগণা হইতে ঢাকায় বদলী হইয়া আসেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল ঢাকাতেই অতিবাহিত করেন। কেবল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দুইবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের ডায়েরী অতি সুন্দর ধারাবাহিক রূপে রহিয়াছে। তাহা হইতে আমরা সামান্য কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

১৮৭১ সনের ১লা জুন সহসা তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। শীরঘূর্ণন এবং বক্ষঃস্থলে দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন। ঔষধাদি প্রয়োগে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেও আবার কয়েকদিন পরে উহার সহিত উদরেও অত্যন্ত বেদনা হইল। ইহা নিশ্চয় যে বহুকাল সার্ভে কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতেই তাঁহার শরীর অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অসময়ে স্নানাহার, অবিরত ভ্রমণ, অত্যন্ত লোক সমাগম, গুরুতর পরিশ্রম ও বিশ্রামের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। কর্ম্মই তাঁহার বিশ্রাম ছিল। গভীর রাত্রিতে তিনি আহার করিতেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের ইষ্ট না হইয়া ক্ষতিই হইত; নিদ্রার সময় অল্পই পাইতেন। ইহার উপর আবার তাঁহার অনিদ্রা রোগ ছিল। শরীর আর কত অত্যাচার সহ্য করিতে পারে। এইরূপে পীড়িত হইয়া পড়িলে ডাক্তারের পরামর্শে তিনি ১৮৭১ সনের অগষ্ট মাসে দুই মাসের ছুটী লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার জন্য কলিকাতায় গেলেন। কিন্তু বন্ধুবৎসল ব্রজসুন্দর আর কলিকাতা পার হইয়া অন্যত্র যাইতে

পারিলেন না। তাঁহার এই সময়ের ডায়েরীতে দেখিতে পাই তিনি কলিকাতায় যাঁহাদের সহিত দেখা করিয়াছিলেন তাহাও লেখা রহিয়াছে—

August 9th to September 5th, 1871.—Halted at Calcutta. Visited the following friends and gentlemen:—

Raja Jotindro Mohan Tagore, his brother Sourindra Mohan Tagore, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, Babu Rajnarain Bose, Babu Dwijendra Nath Tagore, his brothers and brother-in-laws, Babus Goonendra nath Tagore, Jogesh Prokash Ganguli, Nil Kamal Mukherjee, Syama Charan Biswas, Kasiswar Mitra and Prasanna Kumar Sarvadhikari and many other friends at Calcutta.

Saw my daughter Uma several times, as also Babus Dina Nath Mullick, Sirish Chandra Mitra, Girish Chandra Mitra, Kali Mohan Das, Durga Mohan Das and many other friends at Bhawanipur.

Went to Ranaghat to see Ram Sankar. Interviewed Mr. Bernard, Secretary to the Government of Bengal.

Babu Gobinda Chandra Bose of Rajibpur, Deputy Collector of Hoogly and Babu Iswar Chandra Mitra of Calcutta, Deputy Magistrate of Barasat were kind enough to come to Calcutta to see me.

Got 72 copies of my photograph from Messrs. Bourne and Shepherd.

এই প্রকার আরও অনেক লেখা আছে। বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিতে করিতেই তাঁহার ছুটীর অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল এবং কলিকাতাতেই কিছু সুস্থ বোধ করায় তিনি আর পশ্চিমে না গিয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ী পরলোক গমন করেন। ব্রজসুন্দর চিরজীবনের সঙ্গিনীকে হারাইয়া সংসারে একাকী হইলেন। ব্রহ্মময়ী তাঁহার জীবনের সর্ব্বকল্যাণদায়িনী ছিলেন। কেবল তিন বৎসরের জন্য পতির অগ্রগামিনী হইয়া তাঁহাকে নানা দুঃখ বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গেলেন। এই বিষম শোকে ব্রজসুন্দর বাহিরে তত শোকাকুল হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনাকাশ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল; তিনি চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। জীবনের এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়া বসিলেন এবং আমাদিগকেও তাঁহার নির্ম্মল জীবনের একমাত্র কালিমার কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইল। এই ভ্রান্তিটুকু না ঘটিলে ব্রজসুন্দরের জীবন লোকসমাজে আদর্শ জীবন বলিয়া গণ্য হইত। ব্রজসুন্দর বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভ্রান্তি ও মোহের অবস্থা অচিরাৎ দূর হইয়া গেল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে তিনি কি মহা ভ্রম করিয়াছেন। তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার সকল কার্য্যকলাপেই তাহা নিরন্তর প্রকাশ পাইতে লাগিল। এক এক দিন ক্রন্দন পর্য্যন্ত করিতেন। সে যাহাহউক তখন নব্যব্রাহ্মদল এই বিবাহকে যে হিন্দুবিবাহ বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচার করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। পাত্রী হিন্দুসমাজের হইলেও পিতার দারিদ্র্যের জন্য বয়স্কা হইয়াছিলেন। বিবাহ, ব্রজসুন্দরের বাটীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে হইয়াছিল। ডাক্তার পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়, দীননাথ সেন, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, অভয়চন্দ্র দাস প্রভৃতি প্রবীণ ব্রাহ্মগণ বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। যাহাহউক আমরা কখনই এপ্রকার অনুষ্ঠানের সমর্থন করিতে পারি না।

ব্রজসুন্দর এই বিবাহের পরেও কিছুদিন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে সম্পত্তি লইয়া তাঁহার মাসতুত ভ্রাতা দীননাথ ঘোষের সহিত তাঁহার ভ্রাতাদিগের দারুণ গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়।

তাঁহারা আদালতের শরণাপন্ন না হইয়া ব্রজসুন্দরকে এই বিবাদ আপোষে মিটাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। এইজন্য তাঁহাকে দুরন্ত শ্রম করিতে হইয়াছিল। অত্যন্ত অনিয়ম এবং অত্যাচার হওয়ায় হঠাৎ আবার তাঁহার উদরের সেই যন্ত্রণাদায়ক বেদনা উপস্থিত হইল। চিকিৎসকেরা বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার জন্য পুনরায় কলিকাতা আগমন করিলেন।

এই সময়ে তাঁহার ডায়েরীতে দেখিতে পাই—

November 14th, 1874.—Was invited by Rajah Jyotindro Mohan Tagore and his brother Sourindra Mohan Tagore to a *Majlis* at their place to hear a great *ostad's* song. His name is Moula Bux of Madras. He is in the service of Gaikwar of Baroda. The *Majlis* sat at 8 P. M. in the *Baithukhana* of Sir Prasanna Kumar Tagore and lasted till midnight. Moula Bux is a very able *ostad.* He plays *Bin* very well also.

November 15th.—Had dinner at Babu Devendra Nath Tagore's house.

November 17th.—Started for Benares.

November 23rd.—Placed myself under Dr. Lokenath Maitra's treatment.

November 24th.—Babu Kalikumar Roy, retired Small Cause Court Judge and an inhabitant of Suapur, now residing at Benares and Babu Gobinda Prosad Roy, late Record-keeper of Tipperah and father of Deputy Magistrate Babu Tarini Prosad Roy and Pandit Mohesh Chandra Nayaratna of the Sanskrit College Calcutta, who came here for a change, came and saw me.

November 29th —Purchased 12 pieces of old coin of Emperor of Delhi's time.

November 30th.—Purchased a copy of printed Persian account of the *Kayastas.* Started for Cawnpur and reachad there next morning.

December 1st.—Had breakfast with Pandit Isswar Chandra Vidyasagar who was residing in his riverside Bunglow at Cawnpur. Started for Etwa.

*　　　*　　　*　　　*

December 21st.—Arrived Lucknow at 8 p. m. and put up with Rajkumar Sarvadhikari, brother of my dear friend Prosannokumar Sarvadhikari He is a Professor of the Lucknow College and a very excellent young man.

তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার সুন্দর বিবরণ ও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহার ডায়েরীতে আছে ; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

এইরূপে ছুটীর সময় পশ্চিমাঞ্চলে অতিবাহিত করিয়া তিনি ঢাকায় ফিরিলেন এবং পুনরায় রাজ কার্য্যে যোগ দিলেন। কিন্তু ১৮৭৫ সনের এপ্রিল মাসের শেষভাগে আবার পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার ডায়েরীতে লিখিতেছেন ঃ—

April 25th, 1875.—Got seriously ill at home. Vomited excessively and had severe pain in the stomach. Came to Dacca and placed myself under Pareshnath's treatment. Got better in a week and resumed work.

শ্বাস কষ্ট, উদরে দারুণ যন্ত্রণা এবং বমনই এই পীড়ার প্রধান উপসর্গ ছিল। পীড়ার কিঞ্চিৎ উপসম হওয়ায় তিনি পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন কি, ১৮৭৫ সনের ১৯ শে জুলাই খাজে আবদুল গণিকে নবাব খেতাব দিবার জন্য রোটাস্ জাহাজে যে দরবার হয় তাহাতেও তিনি উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার ডায়েরীতে লিখিত আছে—

July 19th, 1875.—His Honour the Lieutenant Governor of Bengal Sir Richard Temple held a Durbar at Dacca on board the Rhotas to confer the title of Nawab upon Khajeh Abdul Gani and that of Khan

Bahadoor upon his son Khajeh Asanullah. All the European and Indian gentlemen of the District were present. There was an evening party also on board the same day when there was a good gathering. H. H. the L. G. came to us where we, Indian gentlemen, were talking with each other, and addressed Babu Ram Chandra Banerjee, Zeminder of Moorapara, by saying, "Babu, be moderate in your demand of rent." Babu Ram Chandra respectfully agreed to do it and began to entreat His Honour to stop the disputes between the Zemindar and the rayats by fixing a proportion of the gross produce of the land to be paid by the rayats, i. e., by introducing something like the *Burga* system. Babu Parvati Charan Roy, Deputy Magistrate of Munshigunge, opposed Ram Chandra uncalled for, in every way he could. On this His Honour remarked, "I see you are a deadly enemy of the Zemindars. Have you got landed property?" He answered in the affirmative and said that he had experience of the whole district. I said, "He has land but not the management of it." The L. G. then asked him whether he was a Brahmo. Parvati Babu replied, "Yes, Your Honour." His Honour then said, "You should try to convert the people of Munshigunge into Brahmoism." His Honour then asked me whether I find any change in the condition of the rayats. I said, "About 20 years ago, when I used to go to the interior, I noticed the women rayats wearing a rag on the breast and another below and they had only earthen pots to carry water. I now see them wearing silver ornaments and good clothes and instead of earthen pots they have now brass ones." Parvati Babu tried to prove that my statement was not correct, as he said the ornaments spoken of were made of tin and not silver &c. &c". Upon this I said, "If there is any doubt about it, an enquiry may be made in the Bangla Bazar Poddar shops as to what quantity of these ornaments is sold yearly to these people." The L. G. then said thad he knew the condition of the rayats had improved.

ইহার ঠিক পরেই, অর্থাৎ ১৮৭৫ সনের মধ্যভাগে, ব্রজসুন্দরের শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু তখনও তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। মিঃ লায়েল তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বারংবার অবসর গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে আয় হ্রাস হইয়া যাইবে এবং সংসার অচল হইবে ইহা চিন্তা করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই সময় আর এক অন্তরায়ও উপস্থিত হইল। যুবরাজের (সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমনোপলক্ষে ঢাকার বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারী ব্রজসুন্দরের উপর সমুদয় কার্য্যের ভার দিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কার্য্যে থাকিতে হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্‌টারের অফিস এবং জেলের ভার পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। ক্রমে এই বৎসরের শেষভাগে তাঁহার শরীরের অবস্থা এরূপ হইল যে রাজকার্য্য করা আর সম্ভব হইল না; তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইল। ব্রজসুন্দর বুঝিলেন তাঁহাকে আর অধিক দিন ইহজগতে থাকিতে হইবে না।

ইহার অল্পদিন পরেই তিনি শয্যাগত হইলেন। বুকের ব্যথা অত্যন্ত বাড়িল এবং শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল। প্রথমে ডাক্তার ওয়াইজ, দুর্গাদাস রায়, কাশীচন্দ্র দত্ত, প্রিয়নাথ বসু ও সূর্য্যনারায়ণ সিংহ তাঁহাকে চিকিৎসা করিলেন। তাহাতে কোন উপসম না হওয়ায় তাঁহার কন্যা মাতঙ্গী কবিরাজী চিকিৎসা করাইলেন। তাহাতেও উপকার না হওয়াতে তাঁহাকে হোমিওপ্যাথ্ পরেশ বাবুর চিকিৎসাধীনে রাখা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। তখন ব্রজসুন্দরের ভ্রাতা দুর্গাদাস তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মাতঙ্গী তাহাতে সম্মত হইলেন না; বলিলেন, "ভগবানের যা ইচ্ছা পূর্ণ হইবে; কিন্তু আমি বাবাকে বিনা চিকিৎসায় মরিতে দিব না। কলিকাতায় গিয়া বড় বড় ডাক্তার দেখাইয়া বাবার উপযুক্ত চিকিৎসা করাইব। তাহলে আর আমার ক্ষোভ থাক্‌বে না। আমার মায়ের

চিকিৎসায় বাবা হাজার হাজার টাকা জল করিয়াছেন, আর আমি কি ৫০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াও বাবার চিকিৎসা করাইব না ?” দুর্গাদাস আর কি বলিবেন ? নানা গোলযোগে কলিকাতায় যাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। মাতঙ্গী অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে পরেশ ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া নৌকাপথে সপরিবারে ব্রজসুন্দর কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। সঙ্গে অন্য অভিভাবকের মধ্যে কেবল তাঁহার মধ্যম জামাতা কাশীচরণ ছিলেন। তিনখানি বৃহৎ নৌকায় সকলে যাত্রা করিলেন। পথে কাওয়ালি পাড়ার নিকট রামরতন ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষী পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, “বাবুর কোষ্ঠীতে নৌকায় মৃত্যু লিখিত আছে। অতএব তোমরা সাবধান হও।” কাশী বাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; মাতঙ্গীকে বলিলেন, “উপায় কি ? পথে যদি মৃত্যু হয় সৎকার করিবার কোন উপায় হইবে না। তাড়াতাড়ি মৈনটের ঘাটে গিয়া নবাবগঞ্জে আমার বাড়ীতে উঠাইতে পারিলে সুবিধা হয়।” মাতঙ্গী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ব্রজসুন্দরকে মৈনট হইতে পালকী করিয়া নবাবগঞ্জে আনয়ন করা হইল। ২রা পৌষ তিনি নবাবগঞ্জে পৌঁছিলেন। তৎপর দিন (৩রা পৌষ, ১২৮২ সাল) ব্রজসুন্দরের অদ্ভূত কর্ম্মময় জীবনের উপর যবনিকা পাত হইল। কলিকাতার চিকিৎসকগণের অপেক্ষা আর রহিল না। ভগবান তাঁহার প্রিয় সন্তানকে সকল রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিলেন। ব্রজসুন্দর বিদেশে পথিমধ্যে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; পরিবার পরিজন শোকে আকুল হইল। ভৃত্যগণ কতক বহুদূরে নৌকার রক্ষণাবেক্ষণে এবং চিকিৎসক আনয়নে অনুপস্থিত ; জামাতা কাশীচরণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্যাকুল হইলেন। বিধাতার কি আশ্চর্য্য কৃপা ! সেই সময়ে কাশীপুরের চৌধুরীগণ, কার্য্যবিশেষের জন্য ব্রজসুন্দরের জামাতা কাশীবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিপদ দেখিয়া নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমারোহের সহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সাহায্য করিলেন।

বিশ্বাসিনী মাতঙ্গী এই অযাচিত প্রসাদে বিধাতার হস্ত দেখিয়া তাঁহাকে সমুদায় অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ দিলেন।

তিনি তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থানটুকু ক্রয় করিতে চাহিলে কাশীপুরের চৌধুরীগণ কোন মতে মূল্য লইতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "এমন মহাপুরুষের দেহাবশেষ যে আমাদের জমিতে রক্ষিত হইল, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। ইহার জন্য কি আমরা মূল্য লইয়া অপরাধী হইতে পারি ?" তাঁহারা এই জমিটুকু দান করিলেন। সেখানে পরে একটী সুন্দর মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। *

ভগবৎভক্ত ব্রজসুন্দর রোগ যাতনার মধ্যে একদিনের জন্যও নিয়মিত উপাসনা ও সঙ্গীত করিতে বিস্মৃত হন নাই। শ্বাস কষ্ট হওয়াতে সকলে তাঁহাকে সঙ্গীত করিতে নিষেধ করিতেন; কিন্তু তাহা তিনি শুনিতেন না। শেষে যখন আর উঠিতে পারিতেন না এবং কথা বলিতেও কষ্ট হইত তখন বুকের উপর দুখানি হস্ত রাখিয়া ভগবৎ-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন।

মৃত্যুশয্যায় তাঁহার অন্তরে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য অত্যন্ত অনুশোচনা হইয়াছিল। যে মহা ভ্রম করিয়াছিলেন তাহা কিছুতেই আর অন্যথা হইবার নয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা ছোট মাকে ডাকিয়া দিবার কথা বলিলেই তিনি নিষেধ করিতেন; আর তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত। তিনি যে একজনকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া গেলেন, এ চিন্তা তাঁহার প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হইত। হায়! মানব মনের বিচিত্র গতি কে নির্ণয় করিতে পারে ?

পীড়িত অবস্থার একদিবসের ঘটনা।—ব্রজসুন্দরের পীড়ার অবস্থায় একদিন এক চাঁড়াল তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তিনি চেয়ারে বসিয়া আছেন, সম্মুখের পরদা সরানো। সে দূরে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে দর্শন করিতেছে। এমন সময়ে মাতঙ্গী ঔষধের গ্লাস লইয়া

---

* কন্যাগণ কর্তৃক।

উপস্থিত হইলেন। তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত পরদা টানিয়া পিতার হস্তে ঔষধ দিলেন। ব্রজসুন্দর কন্যার এই ব্যবহারে একেবারে আকুলস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কেন পরদা টানিয়া দিলে? আহা, গরীব লোক কত দিনের রাস্তা হইতে আমাকে দেখিতে আসিয়াছে, আমার কি অনিষ্ট করিতেছিল? তুমি কেন রূঢ় ব্যবহার করিলে?" ইত্যাদি বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার এত আবেগ হইয়াছিল যে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব (তখন তাঁহার রক্তদাস্ত হইত) হইয়া চেয়ার প্লাবিত হইয়া যাইতে লাগিল। বাস্তবিক মাতঙ্গী ব্রজসুন্দরের উপর লোকের উপদ্রব দেখিয়া একেবারে ত্যক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত, রজনীকান্ত ঘোষ, জগদ্বন্ধু লাহা, প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ১৮৮৫ সনে, ব্রজসুন্দরের মৃত্যুর দশবৎসর পরে, একবার নবাবগঞ্জে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন এবং তথায় উপাসনা, সংকীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেই পরম সুহৃদের পবিত্রাত্মার উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

চল্লিশ বৎসর হইয়া গেল, সেই ইষ্টকনির্ম্মিত মঠ এখনও নবাবগঞ্জের সেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া আছে। ইষ্টক প্রস্তর আজও ব্রজসুন্দরের স্মৃতির সাক্ষ্য দিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ কি তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। নবাবগঞ্জের মঠ কালে ধূলিসাৎ হইবে কিন্তু ব্রজসুন্দরের জীবনের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ দিন দিন পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নিকট উচ্চতর, উন্নততর হইয়া উঠিবে। নবযুগের আদর্শ-চরিত্র, অশ্রান্তকর্ম্মী, ব্রজসুন্দর মিত্রকে পূর্ব্ববঙ্গ সগৌরবে ঘোষণা করিবে।
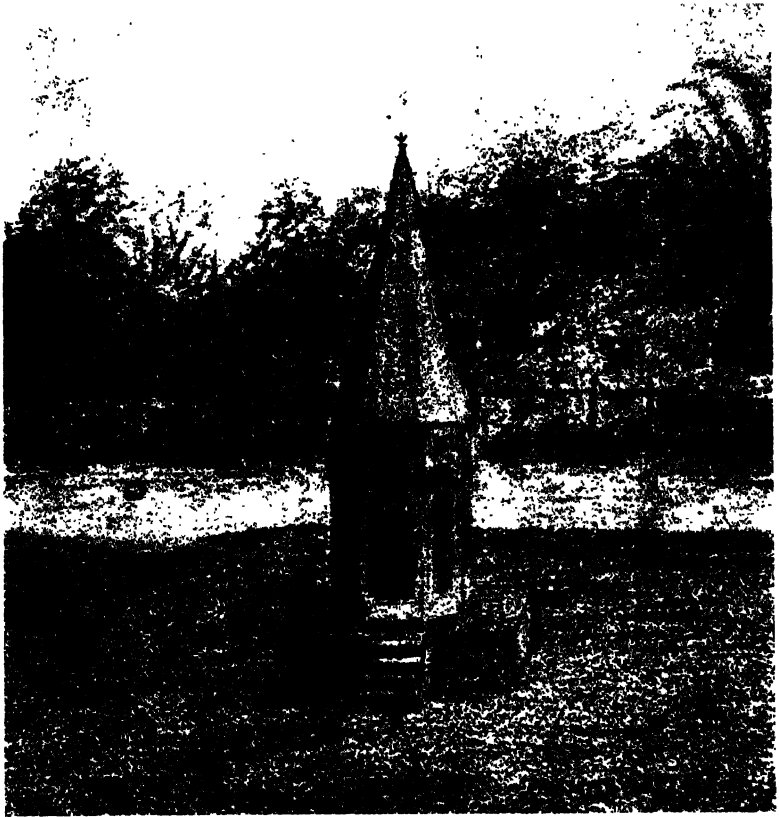
নবাবগঞ্জে ব্রজসুন্দরের শ্মশান মন্দির।

নিজকে এইরূপ ভাবে প্রস্তুত কর। তিনি জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন অন্ধ আতুর, দীনদরিদ্র, রোগার্ত্ত শোকার্ত্তের সেবা করিয়া গিয়াছেন। অনেক দান তিনি এত গোপনে করিতেন যে কি বাহিরের কি নিজ পরিবারের কেহ তাহা জানিতে পারিত না। হিসাবের খাতায় এই সমস্ত "নিজ খরচ" বলিয়া লেখাইতেন। এমন আশ্চর্য্যভাবে অভিজ্ঞতা পরম্পরার ভিতর দিয়া সুন্দর নবযুগের আদর্শচরিত্র কয়জন দেখাইতে পারিয়াছেন?

ব্রজসুন্দর কেবল পূর্ব্ববঙ্গের অদ্বিতীয় পুরুষ নহেন, সমগ্র বঙ্গেও এমন লোক বিরল বটে! তিনি ইংরাজী শিক্ষার সুপ্রভাতে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নিকট আদর্শ চরিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। যে শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ব্ববঙ্গ আজ উন্নতির পথে চলিয়াছে ব্রজসুন্দরই তাহার প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সকল সাধু-কার্য্যের অনুষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন। যথার্থই তিনি পূর্ব্ববঙ্গের পিতা। পুজনীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে ব্রজসুন্দর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি দেশকে যে অবস্থায় পাইয়া-ছিলেন মৃত্যুকালে তাহাকে অনেক অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিক একটী লোকের হৃদয়ের প্রেম, সংকল্পের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ে একটী দেশ কতদূর অগ্রসর হইতে পারে ব্রজসুন্দরের জীবন তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। পূর্ব্ববঙ্গবাসী তাঁহার প্রদর্শিত পথে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চলিয়াছে অথচ তাঁহার জীবনের বিষয় অবগত নহে। যিনি পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, নিজ ব্যয়ে শত শত পুস্তক বিতরণ করিয়া স্বদেশ বাসীর জ্ঞান ও ধর্ম্মের ক্ষুধার উদ্রেক করিলেন, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, সংবাদ পত্র প্রচার, ধর্ম্ম ও নীতির পবিত্র হিল্লোল প্রবাহিত করা, সভা সমিতি স্থাপন, দুঃখিনী বঙ্গরমণীর দুঃখ মোচন, দরিদ্র ছাত্র প্রতিপালন, লোন অফিস প্রতিষ্ঠা, ঢাকায় জলের কল স্থাপনের চেষ্টা প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান করিয়া গেলেন, কি গভীর পরিতাপের বিষয় আজ কেহ আর তাঁহাকে স্মরণ

করে না। জগন্নাথ কলেজ কাহার প্রাণের স্পন্দনে জন্মলাভ করিয়াছিল, ঢাকায় ইডেন ফিমেল্ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কে? ব্রাহ্ম সমাজের কথা ছাড়িয়া দিলেও পূর্ব্ববঙ্গবাসী ধনী, নির্ধন, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার এমন সুহৃদ আর কে ছিলেন? কেহ কেহ ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন, জগন্নাথ কলেজে ব্রজসুন্দরের ছবি নাই, ঢাকার কোনও পথ ব্রজসুন্দরকে স্মরণ করাইয়া দেয় না। চিত্র ও পথের নাম কি তাঁহার স্মৃতি রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়? তাহা হইলে আজ যে গ্রামে গ্রামে কত বিদ্যালয়ে চিত্র রক্ষার একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিম বঙ্গে আজ বিদ্যাসাগরের যে স্থান পূর্ব্ববঙ্গে ব্রজসুন্দরের তাহা হওয়া কর্ত্তব্য। সে স্থানই বা বলি কেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চ হওয়া কি উচিত নহে? কেননা ব্রজসুন্দর নানা বিভাগে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহার সকল কার্য্যের মূলেই গভীর ধর্ম্মভাব। পশ্চিমবঙ্গ তাঁহার সুসন্তানগণের সমাদর ও সম্মান করিতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়াছেন, এই আত্মবোধের দিনে পূর্ব্ববঙ্গ কি আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিবেন? যদি এই গ্রন্থখানি পড়িয়া কেহ আমার উক্তির যথার্থতা স্বীকার করেন তবেই আমার এই গ্রন্থরচনা সার্থক হইয়াছে মনে করিব। সমতলে অবতরণ করিয়া হিমালয়ের বিরাট মূর্ত্তি যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায় তেমনই বলিতে কি, যুগান্ত পরে আজ কালের দূরত্ব ঘুচাইয়া ব্রজসুন্দরের চরিত্র এবং নরহিতৈষণা হিমালয়ের চূড়ার মত পূর্ব্ববঙ্গের আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এই নবযুগের পতাকা বাহককে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের সহিত নমস্কার করিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করিলাম।